গিরিবালা দেবীর রচনাবলী

সম্পাদনা
শ্রীমতী বাণী রায়

রামায়ণী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬৪

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীমনোজ বিশ্বাস

গিরিবালা দেবীর গ্রন্থপঞ্জী

রায়বাড়ী

তৃণগুচ্ছ

হিন্দুর মেয়ে

দানপ্রতিদান

কুড়ানো মানিক

রূপহীনা

খণ্ডমেঘ

মুকুটমণি ইত্যাদি

রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১০৬/১, রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৯ হইতে
শ্রীস্বস্তি সান্যাল কর্তৃক প্রকাশিত ও ইম্প্রেশন, ৩৩/বি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসুধাতোষ বসু কর্তৃক মুদ্রিত।

আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ রাজ্যস্তর সমিতির প্রকাশনা উপসমিতি

কমলা দাশগুপ্ত
অশোকা গুপ্ত
কল্যাণী প্রামাণিক
মঞ্জুশ্রী সিংহ
বাণী রায় (আহ্বায়িকা)

সূচীপত্র

জীবনী ও সাহিত্যকৃতি

আজকের দিনের বাংলা সাহিত্যের যে বিশাল বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র ক্ষেত্র জীবনদর্শনের বহুমুখী গতির অভিব্যক্তিতে আমাদের চোখে পড়ে তা অতি বিস্ময়কর। এতে গত কয়েক দশক ধরে বাঙালী সাহিত্যিকগণ পদক্ষেপ করেছেন সাহসিক ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। সাহসিক এই জন্য যে সতর্কতার শম্বূক গতিতে সাবধানতার সঙ্গে তাঁরা পা ফেলেন নি। প্রায় আগতের জন্য তাঁদের লেখনী উন্মুখ ছিল না, অনাগতের জন্যই ছিল উৎসুক। সাহিত্যরসিক মাত্রেই লক্ষ্য করে থাকবেন এই কয়েক দশকের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের চেহারা শুধু সাময়িক পরিবর্তনের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে নি। আমাদের মনের দিগন্তের উপর তার প্রভাব কাজ করতে আরম্ভ করেছিল। সাহিত্যলোকের এই নূতন পথের পথিকৃৎদের মধ্যে এই প্রবন্ধে আলোচ্য গিরিবালা দেবী অন্যতম। প্রাচীনতার প্রাচীরের মধ্যে দিয়ে আলোর রেখা দেখে তিনি তাঁর পাঠককুলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়েছিলেন এবং ক্রমশঃ প্রকাশমান দিবালোকের তীর্থে পৌঁছেছিলেন।

গিরিবালা দেবীর নাম বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী ও বিশিষ্ট মত বহন করেছে। মেয়েদের কথা এমন করে, এমন ঘরোয়া পরিবেশে, এমন ব্যক্তিগত ছোঁয়া দিয়ে, এমন পুরাতনের মাধুরী দিয়ে বলাটাই বিশিষ্ট হয়েছিল এবং এই বলার ধারাটি অনন্যসাধারণ বলে মনে হয়েছে। গ্রামে তাঁর জন্ম, বাল্য ও কৈশোর গ্রামে কেটেছে, শুধু এই জন্য নয়, অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণতার জন্যও পল্লীবাসিনীদের মনের চেহারা তিনি অবিকল দেখতে পেরেছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের বিষয়বস্তু মেয়েলী

জগত থেকে আহৃত। সেই কারণেই তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তবানুগ।

পাবনা জেলার নাকালিয়া বন্দরের অন্তর্গত পেচাকোলা গ্রামে উনিশ শতকের শেষ দশকে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা দীননাথ শাস্ত্রী সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত, বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। কবি ও লেখক হিসাবে তাঁর পরিচিতি ছিল। সাধারণতঃ স্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ না থাকলেও সারাক্ষণ বাবাকে লেখাপড়ায় নিবিষ্ট দেখতে দেখতে তাঁর লেখাপড়ার দিকে ঝোঁক হয়, "জ্ঞানে ও মহিমায় উজ্জ্বল নেত্র আনত করিয়া বাবা পুস্তকের রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন।" ('রায়বাড়ী'—১ম খণ্ড)

বিদ্যাচর্চার অবকাশ তিনি পান নি। তার আগেই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র পূর্ণচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয়ে সুরু হয় গার্হস্থ্যজীবন। বৃহৎ এবং রক্ষণশীল জমিদার পরিবারের দায়দায়িত্ব, আচার-অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধের নানাবিধ নিয়মকানুনের মধ্যে বালিকাবধূর সাংসারিক শিক্ষাদীক্ষার হাতেখড়ি হয়। স্বামীর উদ্দীপনায় ও নিজের উৎসাহে গিরিবালার প্রাথমিক শিক্ষার শেষে সাহিত্যের অর্ধোন্মুক্ত দরজার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি পড়ে। তারপর আস্তে মৃদু করাঘাত সুরু হয় সংগোপনে ও নিভৃতে। তাঁর নিজের ভাষাতেই মনে হয়েছে 'কড়ি ও কোমল', সদ্য প্রকাশিত 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি', রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী, 'মেঘনাদবধ কাব্য'··· বিনু উঠিয়া সাগ্রহে বইগুলি বুকে চাপিয়া আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া আসিল।" (রায়বাড়ী'—১ম খণ্ড)। যৌথ-পরিবারের বিভিন্ন প্রকৃতির নরনারীর মধ্যে বড হতে হতে নিত্য অনুভূত বাল্যের সেই ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-কলহ, নৈরাশ্য-বেদনাগুলি লৌকিক জীবনের তুচ্ছতা থেকে পরবর্তীকালে যে অলৌকিক রসের জন্ম দেবে সেদিন কি তিনি ভাবতে পেরেছিলেন? পারেন নি। শুধু মনে হয়েছিল "যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না।"

গার্হস্থ্যজীবনের দায়িত্ব পালন করে ছেলেমেয়েদের মানুষ করতে করতে যেটুকু অবসর তিনি পেতেন তা ব্যয় করতেন লেখার চর্চায়। তারপর স্বামীর কর্মস্থল কলকাতায় তাঁকে চলে আসতে হল। অনভ্যস্ত নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতায় মন বিহ্বল। সাংসারিক কাজের চাপে নিরবসর জীবন। তার মধ্যে কিন্তু নিজস্ব একটি নিভৃত জগত তিনি হারাতে দেন নি। সেটি তাঁর লেখার জগত। উত্তর কলকাতার বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটের ছোট বাসাবাড়ীর

দক্ষিণের জানলার দাক্ষিণ্য তাঁর জীবনে ভরে দিচ্ছিল মনের সুধা। তাঁর এই সারস্বত-নিষ্ঠা উত্তরকালে তাঁর দুই পুত্র ডঃ সুশীল রায় ও অনিল রায় এবং একমাত্র কন্যা বাণী রায় উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছেন।

গিরিবালা দেবী সাংসারিক জীবনে ঐতিহ্য-নিষ্ঠ, পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও কর্তব্যসচেতন। সামাজিক জীবনে আত্মপরিচয়বিমুখ, ব্যবহারে কোমল ও মৃদু, সহানুভূতিসম্পন্ন ও স্নেহপরায়ণ। নিতান্ত অন্তরঙ্গ জন ছাড়া কোথাও নিজেকে উন্মুক্ত করেন না। তাঁর অতি পরিশীলিত মানসিকতা ও মর্যাদাবোধ এবং আচরণের আভিজাত্য তাঁর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যিক জীবনে তিনি নিজে শিব ও সুন্দরের উপাসক হলেও নব্য আধুনিকতায় স্পর্শকাতর নন। বরং সাহিত্যের নবরূপায়ণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সজাগ।

তাঁর প্রথম রচনা 'ছলনা' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয় 'মানসী ও মর্মবাণী'তে। তারপর চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় 'ভাগ্যহীনা' নামের গল্পটির দর্শন মেলে। প্রথম উপন্যাস 'রূপহীনা' বার হয় 'সচিত্র শিশির' পত্রিকায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সামাজিক চিত্র ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে তখনকার প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকাগুলিতে। সাধারণতঃ 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' ও 'মাসিক বসুমতী'তে নিয়মিতভাবে তাঁর লেখা বার হত। তাঁর বৃহৎ রচনাসম্ভারের মধ্যে 'রূপহীনা', 'হিন্দুর মেয়ে', 'দান প্রতিদান', 'কুড়ানো মাণিক', 'খণ্ডমেঘ', 'মুকুটমণি', 'রায়বাড়ী' (১ম খণ্ড) এই উপন্যাসগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে যে উপন্যাসগুলি বার হয়েছিল তাদের মধ্যে 'রায়বাড়ী' (২য় খণ্ড), 'করবী-মল্লিকা', 'বর্তমান', 'পঞ্চবর্ণ', 'আমীর আলির ঘাট' উল্লেখ্য। এ ছাড়া প্রচুর ছোট গল্প তিনি লিখেছেন। 'তৃণগুচ্ছ' একমাত্র প্রকাশিত গল্পসংগ্রহ। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় হয়তো পূর্বসূরীদের সামান্য ছাপ আছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের লেখার ধারা কিশোরী লেখিকাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। পরবর্তী পরিণত রচনা অবশ্য স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাঁর সাহিত্যে কাব্যধর্মিতার সঙ্গে চিত্রধর্মিতার মিলন ঘটেছে। তাঁর জন্মস্থান নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গ। বিশাল পদ্মার পাড়ে, প্রসন্ন আকাশের তলে, উদার বিস্তৃত দিগন্তছায়ার নীচে, তরুপল্লবমর্মরিত প্রকৃতির স্নেহকোলে তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ ভাগ কেটেছে। পল্লীগ্রাম তাঁর 'শৈশবের লীলানিকেতন। কৈশোরের সুখবৃন্দাবন।' "সমীরণে বিকম্পিত

মাধবীশাখার তলে” নায়িকার মত লেখিকারও হৃদয়কুসুম বিকশিত হয়েছিল ও তাঁর কবিসত্তা পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। তাই প্রকৃতি তার বিশাল পটভূমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে ও তাঁর কবিমানসকে বিচিত্রভাবে অনুরঞ্জিত করেছে। প্রথম জীবনের রচনাগুলি ছোটখাটো আশা-নিরাশা ও ছোটখাটো সুখদুঃখের অনুভূতিতে প্রোজ্জ্বল। জীবনের পথ তখনও হৃদয়ারণ্যের জটিলতায় পথ হারায় নি। প্রভাত আলোকের আনন্দ, নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের নির্জনতায় বিষাদের অশ্রুজল, চৈত্রসন্ধ্যায় উদাস করা আকুলতা এ সমস্তই পরিসমাপ্ত হয়েছে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তিতে। কিন্তু ক্রমশঃ দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে। সংসারের অভিজ্ঞতা, বাস্তবের রূঢ় সত্য, মনুষ্যচরিত্রের নিষ্ঠুরতা, সর্বোপরি ভাগ্যের অনিশ্চয়তা—এই সব প্রত্যক্ষ অনুভূতি তাঁর লেখনীর ধার বাড়িয়েছে, ভাবে তীক্ষ্ণতা এনেছে, রচনায় বৈদগ্ধ্যভঙ্গী ও রীতি সঞ্চার করেছে।

গিরিবালা দেবীর একটানা সাহিত্য সাধনার মাঝখানে কিছুদিনের জন্য একবার বিরতি টেনে দিয়েছিল তাঁর স্বামীর মৃত্যু। আনন্দমুখর স্বচ্ছন্দ সার্থক জীবনে কালবৈশাখীর ঝড়ের মত এই নিষ্ঠুর মৃত্যু বেঁচে থাকার সব আনন্দকে হরণ করে চিত্তবৃত্তিকে শূন্য করে দিয়েছিল। আবাল্য সঙ্গী, কৈশোরের সুহৃদ, যৌবনের সহচর, প্রৌঢ়ত্বের অবলম্বন স্বামীর অন্তর্ধানে প্রথম দিকের নিঃস্ব ব্যাকুলতা তাঁকে ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিকতার দিকে আকর্ষণ করতে থাকে। তিনি সাহিত্যজগত থেকে সরে গিয়ে আধ্যাত্মিকতার জগতে মৃত্যুর রহস্যভেদ করবার সাধনায় আত্মনিমগ্ন হন। কিন্তু জন্ম-সাহিত্যিক সহৃদয় যাঁরা দুঃখ তাঁদের কি করবে? বেদনার মধ্য দিয়েই আনন্দের অলৌকিকতার স্পর্শলাভ করে তাঁরা ধন্য হন। লেখিকা সীতাদেবী ও সুধীর চৌধুরীর সাগ্রহ অনুরোধ এড়াতে না পেরে এবং হয়ত খানিকটা নিজের অন্তঃপুরুষের তাগিদে তিনি আবার কলম ধরেন। যার ফলশ্রুতি ‘রায়বাড়ী’। আবার তাঁর উপাস্য দেবতা বাগ্‌দেবীর অপার করুণায় তাঁর মন বিগলিত বেদ্যান্তর হয়ে সারস্বতসাধনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেয়। তখন থেকে তাঁর কলম আর থামে নি। জীবনের গভীর রহস্যের তল খুঁজতে খুঁজতে তিনি যা হাতে পেয়ে আমাদের দিচ্ছেন তার মূল্য মহৎ ও বৃহৎ। তাঁর সাহিত্যকৃতির বিচার করবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আমাদের নেই, মহাকালের মানদণ্ডেই তার বিচার হবে। আমরা শুধু ভবভূতির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি “উৎপৎস্যতে মম তু কোঽপি সমানধর্মা। কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী।”

এই প্রবন্ধে আলোচ্য 'করবী-মল্লিকা' ও 'রায়বাড়ী'র সুর বিভিন্ন। 'রায়বাড়ী'র পরিধি বিরাট, চরিত্র ও রস বিচিত্র। একটি পরিবারের উত্থান-পতন, সুখদুঃখ সব মিলিয়ে গলসওয়ার্দীর 'ফরসাইট্ সাগা'র কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

'করবী-মল্লিকা' একটি প্রেমের উপন্যাস। নামের মহিমায় মত গল্পের কাহিনীটি শুভ্র সুন্দর নির্মল। বর্ণাঢ্য গৌরবে কিংবা সৌরভের গর্বে গোলাপ আর গন্ধরাজের সঙ্গে করবী ও মল্লিকা ফুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। কিন্তু এদেরও একটি স্বতন্ত্র রূপ ও গুণ আছে। অসাধারণত্ব নেই বলে অপাঙক্তেয় হতে হবে এমন বিধান না থাকলেও সাধারণের প্রতি লোকের অবজ্ঞা ও অসাধারণের প্রতি আকর্ষণ প্রায়শই দেখা যায়। তবু একথা মানতে হয় যে সাধারণ তার আপন পরিবেশের মধ্যে সহজ বলেই সুন্দর। এই গ্রন্থের যুগ্ম নায়িকা দুই মাসতুতো বোন পরস্পরের অনুরক্ত সখী ও বিশ্বাসভাজন বন্ধু। সদ্যোভিন্নযৌবনা কলেজী শিক্ষাপ্রাপ্তা আধুনিকা তরুণী দুটির প্রেমের কাহিনী এই উপন্যাসের উপজীব্য। এদের মন বিভিন্ন মানসিকতাসম্পন্ন ও আপন আপন অবস্থায় অত্যন্ত সচেতন হলেও পরস্পরের সম্বন্ধে এদের ক্ষমাশীলতা ও সখ্যের অভিব্যক্তি পাঠকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করে।

ধনীর নন্দিনী অত্যুচ্চশিক্ষিতা মহিলাকলেজের অধ্যক্ষার কন্যা ও উৎকটরূপে আলোকপ্রাপ্তা মল্লিকার সদা বৈচিত্র্যপিয়াসী মন অভিনবমধুলোলুপ ভ্রমরের মত ফুল থেকে ফুলে ধাবমান। জলে নামবার সাহস বা ইচ্ছা তার আদৌ নেই। জলের ওপর থেকে জল নিয়ে খেলতে তার সাধ। করবী দরিদ্র শিক্ষকের কন্যা। বাল্যে মাতৃহীনা। স্বভাবতঃই অপরাধবোধে সদা কুণ্ঠিত। নিজেকে নিয়ে বিব্রত। আধুনিক আদব-কায়দায় অনভ্যস্ত ও আনাড়ি হবার জন্য সে মাসীমার এটিকেট শেখার স্কুলে শিক্ষা নিতে এসে পদে পদে হোঁচট খায় ও তার অযোগ্যতার লজ্জা ঢাকতে গিয়ে ঘরের কাজে বেশী করে আত্মনিয়োগ করে। তাকে ছাড়া মাসীমার সংসার অচল। এই তার বাইরের চেহারা। তার ভিতরের জীবন অন্তর্মুখী। জলের ওপর থেকে খেলায় তার রুচি নেই। সে গভীরে ডুবতে চায় এবং এই অতল নিমজ্জনের চিহ্ন কোথাও রাখতে চায় না। মল্লিকার পদক্ষেপ বেপরোয়া, করবীর সতর্ক সাবধান। তবুও এদের আত্মসমর্পণ করতে হল একদিন। প্রেমের কাছে দুজনেই নতি স্বীকার করলে। দুই সখীর এই মধুর পরাজয় লেখিকা একটি

স্নিগ্ধ ও সুমিষ্ট রসের মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করেছেন। এই দুই তরুণীর আশা ও আশাভঙ্গের প্রাবল্য, আনন্দ ও বেদনার উচ্ছ্বাস, জীবনপ্রবেশের প্রারম্ভে হৃদয়াবেগের বিচিত্র অনুভূতি—সব মিলে কাহিনীকে একটি নিটোল সুন্দর মুক্তার রূপ দিয়েছে। বস্তুতঃ এমন অনাবিল স্বভাব-সুন্দর অকুটিল প্রেমের কাহিনী আজকের দিনে দুর্লভ হয়ে গেছে। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা ভালবাসার সহজ সৌন্দর্য আস্বাদন করতে ভুলে গেছি। কৈশোরোত্তীর্ণা প্রায়তরুণী যাদের কাছে জীবনরহস্যের দ্বার সবেমাত্র উন্মুক্ত হতে আরম্ভ করেছে, অর্থহীন হাসি, অকারণ অশ্রুজল, বেদনামিশ্রিত পুলক ক্ষণে ক্ষণে যাদের উন্মনা করছে, রোম্যান্টিকতার রঙে যাদের মনের দিগন্ত ক্ষণে ক্ষণে রঙ পালটাচ্ছে, কেবল তাদের জন্য তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য এমন গ্রন্থ মেলে না। শিশু-সাহিত্য ও কিশোর-সাহিত্যের মত এদের জন্যও এই শ্রেণীর সাহিত্যের প্রয়োজন যাতে এদের মনের ক্ষুধা মেটে। কিন্তু এখনকার সব লেখাই "যুবতী লক্ষ্যঃ পঞ্চাভ্যধিকো শরঃ।" জেন অষ্টিন, সার্লৎ ব্রণ্টে প্রভৃতির রচনা ইংরেজি সাহিত্যের এই অভাব মিটিয়েছিল। গিরিবালা দেবীর 'করবী-মল্লিকা' বাংলা সাহিত্যের এই অভাব পূরণ করেছে। সহজ স্বাভাবিক জীবনের রসাস্বাদনে যাঁদের স্পৃহা আছে গ্রন্থখানি নিঃসংশয়ে তাঁদের মনোরঞ্জন করবে।

দুইটি জীবন—একটির সূর্য উদীয়মান আর একটির অস্তংগমিত মহিমা, শাপের দ্বারা অবশ্য নয় বার্ধক্যের দ্বারা। দুটি জীবনের পাশাপাশি প্রদক্ষিণ চলেছে স্ব স্ব কক্ষপথে। স্বাভাবিকভাবে বিপরীতধর্মী হলেও জাতিগত বৈশিষ্ট্যে কিছুটা সমধর্মী। কারণ উভয়েই নারী। এই নবীনা ও প্রাচীনার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ী'তে। 'রায়বাড়ী' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস হলেও ঔপন্যাসিক মূল্য ছাড়া এর একটি স্বকীয় মূল্য আছে। একটি বিশেষকালের নারীসমাজের পরিবর্তনের ইঙ্গিত এতে দেখানো হয়েছে। এই গ্রন্থে বিনু ও ঠাকুমা দুটি বিভিন্ন যুগের প্রতীক। তাই এদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চিন্তা ও পরিণতির ধারা বিভিন্ন। দুটি পরিবারের বাতাতপও বিভিন্ন। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীর গৃহে স্থানান্তরিত বিনুর কালিদাসের শকুন্তলার মত মনে হয়েছিল "পিতার অঙ্ক হতে পরিভ্রষ্ট হয়ে মলয়তটোন্মূলিত চন্দনতরুর মত দেশান্তরে গিয়ে কি করে জীবনধারণ করব ?"

কিন্তু দেশান্তরের বিধিনিষেধ, আচার-ব্যবহার, চালচলন আত্মসাৎ করে নিয়েছে বিন্নু নারীপ্রকৃতির সহজাত মানিয়ে চলার বুদ্ধি দিয়ে। শুধু বুদ্ধি নয়, হৃদয়ও তাতে সহায়তা করেছে।

বাল্যবিবাহের সমস্যা ও দোষ থাকলেও তারও যে কতকগুলি গুণ ছিল অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লেখিকার লেখনীতে সেটি ব্যক্ত হয়েছে। অনাত্মীয়ের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনে ও নিবিড় পারিবারিক বন্ধনসৃজনে বাল্য-বিবাহের উপযোগিতা কিছু নিশ্চয়ই ছিল। বলাবাহুল্য অপরিপক্কবুদ্ধি অচেতনস্বার্থ বালিকা বা কিশোরীর পক্ষে যে পারিপার্শ্বিক, যে অনুশাসন মেনে চলা সম্ভব কোন ব্যক্তিত্বসম্পন্না তরুণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব বালিকাবধূর আগমনে বিপর্যস্ত হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিণতবুদ্ধি তরুণীবধূর আত্মসচেতনতা ও ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির সঙ্গে যৌথ পরিবারের ভিতে কিঞ্চিৎ ফাটল ধরতে আরম্ভ হয়েছিল। ফলে তার লোপপ্রবণতা অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্যই হয়ে এসেছে।

'রায়বাড়ী'র বিন্নুর মধ্যে দিয়ে লেখিকা একটি অপরিণতমন বালিকার মধ্যে নারীত্বের বিকাশ অতি নিপুণভাবে ও সূক্ষ্মভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কুঁড়ি নিজে নিজে ফোটে না, বাইরের আলো হাওয়া মাটি জল দিনে দিনে তার ভিতরে রসের যোগান দেয় তবে সে উন্মীলিত করে তার দলকে। বিন্নুর চিত্তকমল তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে অমনি করে বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ বিকাশ মধুর, মর্মস্পর্শী ও রোম্যান্টিক সন্দেহ নেই। যুগযন্ত্রণা অবক্ষয় ও কালজনিত মানসিকতাকে অতিক্রম করে হৃদয়বৃত্তির স্থান সাহিত্যে কতটা থাকবে সেটা আজকের দিনের পাঠক-পাঠিকা বিচার করবেন। কিন্তু আদর্শের ভাবলোক ও হৃদয়াবেগের মাধুর্যকে সাহিত্যলোক থেকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সেটাও বিচার্য।

'রায়বাড়ী'র প্রথমা নায়িকা বিন্নু। ঠাকুমাকে দ্বিতীয়া নায়িকা বললে কি ভুল বলা হবে? অস্তাচলচূড়াবলম্বী ঠাকুমার জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে চিত্তাকর্ষক লাগে। বার্ধক্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে। লুপ্তৈশ্বর্য, হৃতগৌরব নির্বেদমিশ্রিত এই সৌন্দর্যকে দেখতে গেলে যে দরদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন গিরিবালার সেই দৃষ্টিভঙ্গী। ঠাকুমার মধ্যে ফেলে-আসা হারিয়ে-যাওয়া বেদনাদায়ক হলেও মেনে নেওয়া বাল্যস্মৃতির মধুরতার একটি সাদৃশ্য আছে। তাই ঠাকুমা-চরিত্রের আবেদন পাঠকচিত্তের কাছে। বিন্নুর মধ্যে

সনাতন ও অধুনাতন ভাবাদর্শের একটা দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্নভাবে দেখা যায়। পুরানোর প্রতি প্রবল সংস্কার ও নূতনের প্রতি নিবিড় আকর্ষণ তাকে দোটানার মধ্যে ফেলে দিয়ে বিচিত্র স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে।

বস্তুতঃ 'রায়বাড়ী' গিরিবালা দেবীর অত্যন্ত পরিণত মন ও বুদ্ধি, অত্যন্ত পরিপক্ব অভিজ্ঞতা ও মানবচরিত্রের অত্যন্ত মর্মজ্ঞতার স্বাক্ষর বহন করছে। চরিত্রচিত্রণে তাঁর দক্ষতা ও বৈচিত্র্যবোধ প্রশংসার্হ। বৃদ্ধা ঠাকুমার চরিত্রে কালের অবশ্যম্ভাবী লীলা, বালবিধবা তরুণী সরস্বতীর চরিত্রে হিন্দু সমাজের অনুশাসনের কঠোর নিষ্ঠুরতার প্রতিক্রিয়া, বামাকুমারণীর চরিত্রে সহানুভূতি-সম্পন্ন কৌতুকের বিজলীছটা মনে রেখাপাত করে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ না করলে লেখিকার সাহিত্যিক পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে। এটি তাঁর রচনাশৈলীর কথা। লোকপ্রবাদ ও ছড়া তাঁর রচনাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। এগুলি যেমনই সহজ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা তেমনই অর্থবহ। ছড়াগুলির অধিকাংশই রোদে ঝড়ে জলে পোড়খাওয়া seasoned কাঠের মত বৃদ্ধা ঠাকুমার মন্তব্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি যুগের বাঙালীর সমাজে তার পারিবারিক জীবনের প্রতিফলনকে লেখিকা অতি স্বচ্ছতার মধ্যে ফুটিয়েছেন। বাঙালী-জীবনের সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের ধারা অন্তঃপুরের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়ে স্ত্রী-সমাজের মধ্যে বর্ধিত হয়ে ছড়া, প্রবাদ, ব্রতকথা, পূজা, অর্চনা, নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে 'রায়বাড়ী' একাধারে তথ্য, তত্ত্ব ও সাহিত্যের আকর।

গিরিবালা দেবীর সাহিত্যকৃতির কথা বলতে গেলে তাঁর ছোট গল্পগুলির বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। কারণ এদের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিমানস ও লেখকসত্তা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ছোট গল্পগুলিতে বিষয়নির্বাচনের নৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। আরম্ভ এবং উপসংহারে সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্যও লক্ষণীয়। বাঙালীর জীবন বৈচিত্র্যহীন এবং ততোধিক বৈচিত্র্যহীন বাংলাদেশের নারীর জীবন। ঘর সংসারের গণ্ডীঘেরা চৌহদ্দির স্বল্পপরিসরে কাজকর্ম ও সুখদুঃখ সবই সীমাবদ্ধ। বাইরের দিক থেকে দেখতে গেলে সেই সাংসারিক খুঁটিনাটির মধ্যে সাহিত্যের উপকরণ বলে কিছু চোখে পড়ে না। গল্পলেখক কিন্তু সেই তুচ্ছতার মধ্যে থেকেই আহরণ করেন ক্ষণিকের মণি। গিরিবালা

দেবীর ছোট গল্পগুলি সেই ক্ষণিকের মণি দিয়ে গাঁথা মালার মত মধুর উজ্জ্বল ও মনোহর। 'জগাই' গল্পে শিশুর চরিত্র ও মনস্তত্ত্বের দিকে লেখিকার মনোযোগ লক্ষ্য করবার বিষয়। তাদের সুখদুঃখকে প্রায়শই আমরা অবহেলা করি। কত তুচ্ছ বেদনায় তাদের বুক ভাঙ্গে কত ক্ষুদ্র সুখে তাদের হৃদয় উদ্বেল হয় 'জগাই' গল্প তার নিদর্শন। এই সব গল্পের ভাষাও যেন স্নেহে সঞ্চিত। সর্বব্যাপী ভালবাসা না থাকলে এমন সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা মানুষ লাভ করতে পারে না।

এই সব ছোট গল্পের মধ্যে মনুষ্য চরিত্রের এক একটি বিভিন্ন দিক যেগুলি সহসা চোখে পড়ে না, অথচ যেগুলি গোপনে গোপনে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করে মনকে সেই সব দিকগুলি লেখিকার সূক্ষ্ম কলমের খোঁচায় হঠাৎ হঠাৎ দেখা দিয়েছে। এই খোঁচা হল ব্যঙ্গের খোঁচা। এ ব্যঙ্গগুলি অবশ্য আক্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা নয়। এতে কোথাও কোথাও সামাজিক অন্যায় এবং নৈতিক ও মানসিক অসঙ্গতির রূপটি তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে 'দিবাভিসার' গল্পটি চোখে লাগার মত। "সাতবোনের মধ্যে চারটি বিবাহিতা। ...বিত্তশালী বাপের মেয়ে বলে তারা শ্বশুরালয়ে যায় না। জামাইরাই মাঝে মাঝে শুভাগমন করে চিরবিরহিনীদের বিরহব্যথা লাঘব করে। সপ্ত সমুদ্রের বৃদ্ধা ঠাকুরমা অদ্যাপি বিদ্যমান। তিনি আবার বিষম নারীবিদ্বেষী। সেই জন্যেই বোধহয় বাঘের ঘরে ঘোগের বাসার মত তার ভিটেয় সাত নাতনী ঘুঘু চরাতে উদ্যত হয়েছে।" Wit-এর ফুলঝুরি অপেক্ষা Satire-এর খোঁচা লেখিকার রচনায় অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। 'একনিষ্ঠ' গল্পে যে বগলা দক্ষবালার স্বামী বিলাসের নৈতিক চরিত্র নিয়ে শ্লেষবিদ্রূপে জর্জ্জরিত করে তাকে নদীর জলে ডুবে মরার বিধান দিয়েছিল তারই কপালে ঘটল অতি বিশ্বস্ত ও প্রেমময় স্বামীর দাসীর প্রতি আসক্তি-দর্শন। মাথার বালিশের পাশে চাঁপা ও বকুল ফুলের বাটি রেখে প্রিয়মিলনের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে সে দেখল "বগলার অত সাধের জোড়া খাটে তারিণীচরণ একাকী নেই।" লেখিকা বগলার ইতিকর্তব্য নির্দেশ করতে গিয়ে হতাশ হয়ে বলেছেন, "বগলা কি করিতে পারে? অপরকে বিধান দিলেও সে এখন তাহার স্বামীর গোঁফ দাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিতে পারিল না। নদীর শীতল জলে ডুবিয়া মরিবার কথাও মনে পড়িল না।"

গিরিবালা দেবী ছোট গল্পে পাত্রপাত্রীদের চরিত্রচিত্রণেও অসামান্য দক্ষতা

দেখিয়েছেন। তাঁর রচনা সাধারণতঃ স্ত্রী-সমাজভিত্তিক। তাই তাঁর নারী-চরিত্র পুরুষচরিত্র অপেক্ষা স্পষ্ট ও বাস্তব। ছোট গল্পে ছোট ছোট ঘটনার বিন্যাস চরিত্রবিকাশে সহায়ক। স্বভাবতই স্ত্রী-সমাজ ক্ষুদ্র, আপন সীমানায় সীমিতসত্তা। রবীন্দ্রনাথের সেই "সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী"দের জীবনে বাইরের ঘাত প্রতিঘাত কম। জীবনের খণ্ডাংশ নিয়েই তাঁদের তাই কারবার। ছোটখাটো ঘটনা ছোটখাটো সুখদুঃখের পটভূমিতে মেয়েরা আত্মপ্রকাশ করেছে। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উদার-সঙ্কীর্ণচেতা, সমস্ত মেয়েদের মধ্যে যে চিরন্তন রমণী-প্রকৃতি কাজ করছে, যাকে "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ", সেই রমণী-প্রকৃতিকে দীর্ঘ দিন ধরে লেখিকা পর্যবেক্ষণ করেছেন ও তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। তাঁর নায়িকারা কালিদাসের ইন্দুমতীর মত, "গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয়া শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"—নানা রূপে প্রতিভাত হলেও গৃহিণীত্ব ও তার সফল পরিণাম মাতৃত্বের মধ্যে সার্থকতার পথ পেয়েছে। নারীত্বের লাবণ্যকে মাতৃত্বের কল্যাণময় মাধুর্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি নারীবন্দনা করেছেন। 'হিসাবের খাতা'র নায়িকা অতি আধুনিক ইলা তার সভা, সমিতি, অধিবেশন, পার্টির চোখধাঁধানো গ্ল্যামারের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর কাছে স্বীকার করেছে, "মুক্তি আমার দরকার নেই। আমি চাই বন্ধন।" এ বন্ধন মাতৃত্বের বন্ধন। মাতৃত্বের এই স্নেহধারা উদ্বেল হয়ে উঠেছে 'দুধ-মা' গল্পটিতে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সাম্প্রদায়িকতার কোন বাঁধ দিয়েই যে ভালবাসার প্লাবনকে রোধ করা যায় না লেখিকা সেই কথাটি জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পেরেছেন। তাই মুসলমানী আমিনার ব্রাহ্মণবাড়ীর মেয়ে ফুলির দুধ-মা হতে কোন বাধা দেখা দেয় নি। সদ্যকন্যাবিয়োগব্যথাতুরা রমণীর শোকার্ত হৃদয় ও সান্ত্বনার উৎস লেখিকা একই সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আমিনার স্নেহের ফুলজান অর্থাৎ ফুলির গায়ে বসন্তের গুটি বেরিয়েছে। খবর পেয়ে সে ছুটে গিয়েছে। বারান্দায় ওঠার অধিকার না থাকায় সারাদিন পৈঠায় বসে রোদে পুড়েছে এবং ধর্মের অনুশাসন লঙ্ঘন করে প্রার্থনা করেছে, "মা শেতলা ঠাকুর, আমাগো ফুলিমারে রক্ষা কর, আরাম করি দেও।" তারপর পীরের দরগায় সিন্নি দিতে ছুটেছে। আবার সকাল হতেই "অচল অনড় হয়ে আশ্রয় নিয়েছে পৈঠায়।" আমিনার এই সর্বাভিভব মাতৃস্নেহের জয় লেখিকা ঘোষণা করেছেন। ফুলির প্রাণরক্ষার জন্যে কবিরাজের নির্দেশে আমিনা ফুলির

শয়নকক্ষে ঢুকতে অনুমতি পেয়ে, "বাঁধভাঙা নদীর মত ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। দুই ব্যগ্র বাহু মেলে বুকে জড়িয়ে ধরল ফুলির পীড়িত দেহ। অপার স্নেহে করুণায় বিগলিত কণ্ঠে ডাক দিল, 'ফুলজান, ফুলিমা আমাগো, চাহি ত্থাখ্, এই যে মুই আইচি, আর তোর ডর নাই ; মুই মুছি দিমু সকল আপদ বালাই।" 'দুধ-মা' গল্পটি অবিভক্ত বাংলার হিন্দু মুসলমানের একটি অবিকৃত সহজ সৌহার্দের ছবি। মানবিক সম্বন্ধের এমন অকৃত্রিম অভিব্যক্তি আমরা ভুলেই গেছি।

সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের জীবনদর্শন সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা নতুন নতুন লেখার রসদ এনে দিয়েছে। যেমন গভীর ভাবে তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে লক্ষ্য করেছেন তেমনি করেই করেছেন নিম্নশ্রেণীকে। এ দেশের লোকেরা যে কি পরিমাণে দীনদরিদ্র নিঃস্ব ও নিষ্কপর্দক ; 'সরম' গল্পটির থেকে তা আমরা জানতে পারি। এদের জীবনে সর্বোত্তম সুখের স্থান ও বেদনার ক্ষত যা হৃদয়ের তলদেশে একেবারে লুপ্তাকারে মিশিয়ে থাকে তাকে তিনি দেখতে পেয়েছেন সমানুভূতির সমান্তরাল ক্ষেত্র থেকে। 'জগাই' ও 'মোহানা' গল্পের দুটি হতভাগ্য দুঃখী জগাই ও সুখনকে তিনি অত্যন্ত নিকট থেকে অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে দেখতে পেরেছিলেন বলে চরিত্র দুটি এমন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

গিরিবালা দেবীর নায়িকারা বিচিত্ররূপিণী। তাই চিত্তাকর্ষক ও সময় সময় কৌতূহল ও কৌতুকের পাত্র। 'বিদায় করেছ যারে' গল্পের নায়িকা রাজবালা শিক্ষাহীন, আভিজাত্যগর্বিত দাম্ভিক মনের প্রতিচ্ছবি। 'যাত্রাসঙ্গী' গল্পে উচ্চাভিলাষিণী কেরিয়্যারিস্ট গর্বিতা বেণুর বুদ্ধির জটিল পথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে হৃদয়ের সরল পথের কাছে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ একটি স্বচ্ছ কৌতুকরসের দ্যুতি বিকীরণ করেছে। 'কৃপণস্বামী'র নায়িকা কার্পণ্যদোষদুষ্ট স্বামীর কার্পণ্যহেতু দৈন্যদশার জীর্ণতার আচ্ছাদনে যখন লজ্জা নিবারণ করতে না পেরে বিতৃষ্ণা ও বিরূপতায় বিমুখ হয়ে উঠেছে ও একমাত্র পুত্রের অনাড়ম্বর নিরুৎসব বিবাহে অত্যন্ত তিক্ততায় বোধ করেছে "হাড়কৃপণ স্বামীর অপব্যয়ের আশঙ্কা", তখন সহসা "আনন্দের তরঙ্গ" এসে তাকে প্লাবিত করেছে। হাড়কৃপণ অমানুষ পতির অর্থসাহায্যেই যে আনন্দস্বামীর দানছত্র শত শত নিরন্নকে অন্ন যোগাচ্ছে ঐ তথ্য তার কর্ণগোচর হয়েছে। গল্পের এই নাটকীয় ভঙ্গী পাঠককে পরিতৃপ্তি দেয়। 'কাঁকন' গল্পের নায়িকা তিন ভাই-এর

ছোটবোন মাতৃহীনা কাঁকনের ভাগ্যবিপর্যয় বড়ই আকস্মিক। শ্লেষ ও ব্যঙ্গের সূক্ষ্মতায় এই বিপর্যয়কাহিনী বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। প্রৌঢ় বিপত্নীক পাঁচ সন্তানের জনক পিসির ভাসুরপোর সঙ্গে অতিবাঞ্ছিত ও সম্ভাবিত বিবাহকে নস্যাৎ করে দিয়ে, তার দাদা-বৌদিদের সমস্ত আশাকে ভূমিসাৎ করে দিয়ে তরুণ ডাক্তার অরুণের কাঁকনকে বিবাহের প্রস্তাব চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। ভালবাসার প্রাবল্য ও তীব্রতা যে সব ভালবাসাতেই সমান, 'দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা' এই প্রিয় ও সত্য তথ্যটি তাঁর 'হীরক' নামক গল্পে ফুটে উঠেছে। প্রারম্ভে যে পরকীয় রস পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে উপসংহারে তা একটি স্নেহময় পবিত্রতায় পর্যবসিত হয়েছে। নায়ক হীরক নায়িকার পৌত্র। "বয়সটা কাঁচা, রং ধরার বিলম্ব আছে। সবে পাঁচ বছরে পড়িয়াছে।" বাৎসল্য রসেই আসল রূপ পরকীয় প্রীতির।

আমাদের প্রচলিত সামজিক অনুশাসনের হৃদয়হীনতা ও নিষ্ঠুরতা লেখিকার মনকে সময় সময় নাড়া দিয়েছে। বিভিন্ন গল্পে এই বেদনার্ত মনোভাব তিনি ব্যক্ত করেছেন।

তাঁর হালের রচনাগুলি পড়লে মনে হয় মুছে-আসা-রঙ দিগন্তের মত বৈরাগ্যের একটি অস্পষ্ট ধূসরতা নেমে এসেছে লেখিকার মনে। হয়তো এটি তার জীবনদেবতার দান। 'চোখ গেল' গল্পে এক অনুচ্চার্য অপ্রকাশ্য ট্রাজেডির ব্যঞ্জনা তাঁর বেদনালব্ধ জীবনদর্শনের একটি নিরপেক্ষ অনাসক্তির স্বাক্ষর বহন করছে। কত দুঃখ, কত আশাভঙ্গের বিবাদ চেতনার তলে মিশে থাকে ফল্গুধারার মত। একদা অনুভূত তার তীব্রতার উপর কালের হাত ধীরে ধীরে পর্দা টেনে দেয়। বিস্মরণ এসে কখন মুছে দেয় স্মৃতির দাহ অলক্ষ্যে এবং অগোচরে। না হলে মানুষ বাঁচত কি করে? কিন্তু সংস্কার তো মুছেও মোছে না। অকস্মাৎ কখন কোন্ তুচ্ছ উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করে 'স্মৃত্বা স্মৃত্বা যাতি দুঃখং নবত্বম্।' পূর্বানুভূত বিস্মৃত দুঃখ নূতনাকারে দেখা দেয়। সেই দুঃখের প্রাবল্যে চাপা পড়ে যায় নূতন করে সুরু করার আকাঙ্ক্ষা। "চোখের ভালো ওষুধ চোখ গেল পক্ষীর ডিমের লালা", বেদেনীর এই প্রেসক্রিপসনে শিবানী ভাল করে দেখতে পাবার আশায় আশ্বস্ত হলেন। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতায় আলপনায় কাঁথায় লতাপাতা, ফুল, পাখী, পাখাবোনার সেলাইতে এখন তাঁর পূর্বদক্ষতা প্রকাশ পায় না। তাঁর বড় সাধ কলকা পাড় দিয়ে মাছের সারি, হাতি ঘোড়া পাখী আঙুরলতা সেলাই করে নাতনির সদ্যোজাত পুত্রকে

উপহার দেন। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবার আশায় শিবানী বালকভৃত্য নফরাকে একটাকা বকশিস দিয়ে রাজি করান দুটো ডিম এনে দিতে। 'পক্ষীর ডিম' এলো। কিন্তু তা চোখে লাগিয়ে দৃষ্টি ফিরে পাবার সব আগ্রহ মুহূর্তে নিবে গেল শিবানীর। হৃতডিম্ব পাখী দুটির সম্ভাব্য শাবকের জন্য চংক্রমণ তাঁর প্রথম জীবনে প্রথম মাতৃত্বের ব্যর্থতার বেদনাকে মনে পড়িয়ে দিল। কি করুণ কি মর্মান্তিক এই ব্যর্থতার ছবি। স্নানের ঘাটে পা পিছলে পড়ে গিয়ে শিবানীর একটি মৃতা কন্যা ভূমিষ্ঠ হল। স্বামী-স্ত্রীর স্বপ্ন দেখা 'ভুবনমোহিনী' স্নানের ঘাটের অদূরে যেখানে শিমূল, শিরীষ, বাবলা, বকুল জড়াজড়ি করে নদীর স্বচ্ছ জলে মুখ দেখে তাদের নীচে ভাঁটিফুলের আস্তরণে ঘুমিয়ে থাকল। "শোকে দুঃখে প্রথম জীবনের তাঁর মাতৃত্ব সুকোমল বুকে একটি তীক্ষ্ণধার কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে।..............নব বসন্ত সমাগমে......শোকবিহ্বলা জননীর মানসচক্ষে ভেসে আসত ভুবনমোহিনী যেন শিমূল গাছের রাঙা চেলি পরে নাকে বাব্লা ফুলের নাকছাবি ও ভাঁটিফুলের নোলক দুলিয়ে পাকা শিরীষ ফুলের নূপুর পায়ে সন্ধ্যার আবছা আলোয় নদীতীরে নেচে বেড়াচ্ছে। দিনে দিনে যে স্বপ্ন কল্পনার চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গিয়েছিল আজ আবার তারা যেন জাগ্রত হল চোখের সামনে। "জীবনের শেষ সীমায় এসে আর কি হবে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে? সূচিশিল্পের আর কি প্রয়োজন?......দূরে সুদূর হতে খেয়া নৌকায় ভেসে আসছে তার বৈঠার শব্দ......তীরে তরী ভিড়তে যা বিলম্ব।" শিবানী 'চোখ গেল' পাখীর ডিমজোড়া নিয়ে তাদের বাসায় রেখে আসবার জন্য নফরার সঙ্গ নিলেন। অকালমৃত্যুর প্রথম অনুভব তার সমস্ত তীব্রতা নিয়ে নেমে এসেছে শিবানীর বর্তমান জীবনে এবং পরিসমাপ্ত হয়েছে একটি বৈরাগ্যময় একতারার সুরে। প্রকৃতির মধ্যে জীবন ও মৃত্যুর এই হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকার অপরূপ অনুভূতি বিভূতিভূষণ লিখেছেন। তারপর দেখছি গিরিবালার লেখায়। মৃত্যু তাঁর কাছে পরম স্থিতির একপিঠ, যার অন্যপিঠে জীবন, ভাগ্য ও দুর্ভাগ্য উভয়ের সহচর ও নিয়তির মত অমোঘ। বস্তুতঃ অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘ্য মৃত্যুর আকস্মিক আবির্ভাবের কাছে মূলছেঁড়া জীবনের নিরুপায় আত্মসমর্পণ, নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান, ক্ষমতা ঐশ্বর্য এবং প্রতাপের সর্বোচ্চ শিখর থেকেও অনিবার্য পতন, প্রতিমুহূর্তে সম্মুখীন হওয়া জীবনের এই সব সত্য তার অপরিহার্যতাকে নিয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর লেখায়।

উপন্যাস ও গল্পের লেখিকা ছাড়া গিরিবালা দেবীর আর একটি পরিচয় আছে। তিনি সুনিপুণ প্রবন্ধকার ও সমাজচিত্রের শিল্পী। তাঁর পল্লীচিত্রগুলি বিদ্যা ও পণ্ডিতম্মন্যতার তথ্যভারে ও আড়ম্বরে ভারাক্রান্ত হয় নি। এদের একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট চেহারা আছে। গ্রাম বাঙলার পালাপার্বণ, পূজা অর্চনা, ব্রত নিয়ম উৎসব ও শুভ অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক রূপ এদের মধ্যে বিধৃত। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা অবিভক্ত বাঙলার কি ঐশ্বর্য গরিমা ছিল, আনন্দের কি অজস্রতা ছিল, হৃদয়ের কি দাক্ষিণ্য ছিল তা আমরা কল্পনা করতেও পারি না। সেই বৃহতের আস্বাদ পাওয়া যাবে তাঁর স্মৃতি-চিত্রণগুলিতে। এই সব রচনার একটি সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একালের' কথা মনে পড়ে। বাঙলা দেশকে জানতে গেলে এগুলি অত্যন্ত সহায়তা করবে। বাঙালীর জাতিগত ও সমাজগত বৈশিষ্ট্য, ধ্যানধারণা, স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি মমত্ববোধ সর্বোপরি মানবতার একটি অকুণ্ঠ প্রকাশ যা এককালে বাঙালীর গৌরবের বিষয় ছিল সেটি লেখিকা মেলে ধরেছেন তাঁর সামাজিক প্রবন্ধগুলিতে। সেকালে ধর্মের সঙ্গে উৎসবের একটি অন্তরঙ্গ যোগ ছিল বলেই ধর্ম শুষ্ক নীরস কর্তব্যের আকার ধারণ করে নি। দোলযাত্রা ও রথযাত্রার স্মৃতি-চিত্রণে এই উৎসবের আমন্ত্রণলিপি সবাইকে একত্র করেছে। আমষষ্ঠী, পৌষপার্বণ, নববর্ষের প্রথমদিন প্রকৃতি-চিত্রগুলিতে বঙ্গজননী যেন বাংলা- দেশের হৃদয় হতে বাহির হয়ে অপরূপ রূপে দাঁড়িয়েছেন।

লেখিকার প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে এই নক্‌শাগুলিতে। তাঁর অপ্রমত্ত ভক্তি একটি সংযত পূর্ণতার দিকে যাত্রা করেছে। শ্রী ও সৌন্দর্যের শুভ্র আল্‌পনা এঁকে গেছে হৃদয় মন্দিরের অঙ্গনে। সদাব্যস্ত, সমস্যাজর্জরিত, অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ আজকের জীবনে তাঁর এই বঙ্গজননীর মঙ্গলআরতি বসন্ত বাতাসের মতই সুখস্পর্শ ও স্নিগ্ধ বলে মনে হয়।

—ডক্টর সন্ধ্যা ভাদুড়ী

রায়বাড়ী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

উৎসর্গ

জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান সুশীলকুমার রায়

কল্যাণীয়েষু

রায়বাড়ী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(প্রথম খণ্ডের চম্বক)

[প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বের অবিভক্ত বাঙলাদেশে পাবনার হরিণহাটি গ্রামে এক বালিকা বধূ বনেদী জমিদার পরিবারে পদক্ষেপ করে। তাহার বিস্ময়, তাহার বিকাশোন্মুখ চিত্তের নিত্য নূতন ভাবসম্পাত সারা বৎসরের পাল-পার্বণ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আবর্তিত হইয়া রায়বাড়ীর দুইখণ্ডে বিচিত্রিত। শ্বশুর মহেশ রায়, তাঁহার জননী ঠাকুরমা, পত্নী মনোরমা, তিন পুত্র—প্রসাদ, ক্ষিতি, সুমন্ত্র ; বিবাহিতা কন্যা ভানুমতী, মধুমতী, বিধবা কন্যা সরস্বতী ও কুমারী কন্যা তরু। পরিজন, দাস-দাসী পরিবৃত সংসারে অনভিজ্ঞা, সরলা বধূ বিনুর নানা সংঘাত, নানা সমস্যা। স্বামী প্রসাদ কলিকাতায় উচ্চশিক্ষার্থে প্রবাসী। যখন সে দেশের বাড়ীতে আসিতে পারে বিনুকে হাতে ধরিয়া সে লেখাপড়া শিখায়। পার্শ্ববর্তী পাথরকুচি গ্রামে বিনুর পিত্রালয়। এই পুস্তকের পূর্বখণ্ডে দুর্গাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর্যন্ত বর্ণিত আছে। সেই খণ্ড বাজারে প্রচলিত রহিয়াছে। এইখণ্ডে অন্যান্য উৎসব, বাঙলার প্রবাদ-প্রবচন বিবৃত হইয়া গ্রন্থখানি আকরগ্রন্থ ও লোকসাহিত্যের মর্যাদা পাইল।]

১

হেমন্তের বেলা যাই-যাই করিতেছে। রায়বাড়ী নীরব নিস্তব্ধ। অবিরত উৎসব অনুষ্ঠান পালন করিয়া সকলে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছে। শুধু ঘুম নাই ঠাকুমার চোখে। তিনি হাতীর চিরন্তন সিংহাসন ছাড়িয়া আজ আশ্রয় লইয়াছেন বিনুর শয়নগৃহের বারান্দার সিঁড়িতে।

বৃহৎ আঙ্গিনা, তার একদিকে রায়বাড়ীর পুরাতন বিরাট অট্টালিকা। দুই ভাগে বিভক্ত 'বাহির ও অন্দর। বাহিরের দিকে প্রশস্ত সারি সারি মোটা থামযুক্ত গোল বারান্দা, গোল সোপান শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট। গোল বারান্দার সামনে প্রকাণ্ড হল। তার পরেই কতকগুলি শয়ন-গৃহ। শয়ন-গৃহের কোলে চওড়া বারান্দা, হাতীমুখী সিঁড়ি।

পল্লীগ্রামের চতুঃশালা বাড়ী, কোন দিকের কোন ভিটে খালি থাকে না। তাই দক্ষিণের ভিটেয় মহেশবাবু বড় ছেলের জন্য নূতন কোঠা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কোলাহল কলরব হইতে বিনুর শয়ন-গৃহখানা যেন স্বতন্ত্র সুদূর মনোরম শান্তির নীড়।

ঠাকুমা সোপানে বসিবার পূর্ব্বে সেই ঘরে একটু বিচরণ করিয়া ছল ছল চোখে গম্ভীর গলায় বলিয়াছিলেন "শ্যাম যে চলিয়া গেছে পদচিহ্ন পড়ে আছে।"

বিনু তখন ঘরেই ছিল। ঠাকুমা বাহির হওয়া মাত্র সে সারা গৃহে পদচিহ্ন খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল। কিন্তু পায় নাই। এখানে গোটা দিনমানে প্রসাদ পদক্ষেপ করে নাই। তাহার ব্যবহারের জামাকাপড় জুতা রাখা হইত বাহির মহলে। রাত্রি দশটার পরে প্রভাত না হওয়া অবধি এখানে ছিল তার অবস্থিতি। সে যেন এক নিশাচর পাখী, নিশাসমাগমে আবির্ভাব, নিশা অবসানে অন্তরাল।

এই গণ্ডগ্রামে রক্ষণশীল রায়বাড়ীর আবেষ্টনে দিবাভাগে নব বর-বধূর পক্ষে দেখা-সাক্ষাৎ ও বাক্যালাপ করা অতি অভাবনীয় কাণ্ড। শুধু অভাবনীয় নহে, মহাপাতক।

বছর কতক পরে অবশ্য ইহার শিথিলতা দেখা যায়। নিরন্তর একত্রে বসবাস করিবার ফলে স্বামী-স্ত্রীর ভিতরে সময় সময় বাধিয়া যায় কলহ-কোন্দল-কথা কাটাকাটি, তর্ক-বিতর্কের চাপা গুঞ্জন। বাতাসে তাহার এতটুকু আভাস গুরুজনদের কানে আসিলে সেটাও তাঁহারা প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। পাড়ায় পাড়ায় মেয়েমহলে আন্দোলন জটলা চলে 'ব্যাপিকা' 'লজ্জাহীনা' বধূর বিরুদ্ধে। তাঁহাদের ঘরের ছেলেরা অতি সাধু-সজ্জন। পরের মেয়েরাই বেহদ্দ-বেহায়া। তাহাদের লঘুগুরু জ্ঞান নাই। তাঁহারাই আবার সখী সম্মিলনে ছড়া কাটিয়া থাকেন—"নূতন নূতন তেঁতুলের বাঁচি, পুরাণো হলে বাতায় গুঁজি।"

এ হেন পরিবেশে বিনু প্রসাদের পদচিহ্ন কোথায় খুঁজিয়া পাইবে? পদচিহ্ন যে পড়িয়া আছে চটি জুতার মধ্যে।

না, প্রসাদের কোন চিহ্নই এখানে নাই। থাকিবার ভিতরে রহিয়াছে বিনুর পাঠ্য পুস্তকে ও হাতের লেখার খাতায় লাল-নীল পেনসিলের লেখা। সেটা বিনুর নিতান্ত অপ্রিয় ঘটনা।

যে ব্যক্তি কৌশলে অপরের চিহ্ন লইয়া সরিয়া যায়, সে কেন নিজের এতটুকু একটুও চিহ্ন রাখিয়া যায় না, কেন?

হঁ্যা, সুচতুর প্রসাদ বিদায়ের পূর্ব্বে ছলনার আশ্রয় লইয়াছিল।

মাইল দুই দূরে ইহাদের ষ্টীমার ঘাট, বন্দরের গায়ে সাধুগঞ্জের ঘাট। সেখানে দুইবার ষ্টীমার আসিয়া ভেড়ে—প্রথম ষ্টীমার আসে মধ্যাহ্নে, তার নাম 'উজান' ষ্টীমার—সেইটা ধরিতে আসিতে হয় শিয়ালদহ, তাহার পরে ঢাকা মেলে। গোয়ালন্দ হইতে কালিগঞ্জের ষ্টীমারে সাধুগঞ্জে অবতরণ করিলেই গ্রামে আসা যায়। যাইতে হয় 'ভাটাইলে'। জলপথ, সময়ের স্থিরতা নাই। কখনও আসে আগে, কখনও পরে। সেই কারণে সময় হাতে রাখিয়া রওনা হইতে হয়।

প্রসাদের যাত্রার সমারোহ চলিতে ছিল প্রভাত হইতে। দুই রন্ধনশালায় রান্নার আয়োজন। ছোট ঠাকুমার হাতের নিরামিষ তরকারি খাইতে প্রসাদ বড় ভালবাসে। আবার মায়ের রান্না কইমৌরি, মাছের কাঁটার সুক্তোর সে পরম ভক্ত।

ফলে স্নানান্তে মা ঢুকিয়াছেন মাছের দিকে। ছোট ঠাকুমা নিরামিষে।

বিনু নিয়মের ঘরের বারান্দায় বঁটি পাতিয়া বসিয়াছে। কচ কচ খচ খচ তরকারির পরে তরকারি কুটিয়াই চলিয়াছে থালা ভরিয়া গামলা বোঝাই করিয়া। তবু শেষ হইতেছে না। এ যেন 'রাবণের চিতা নির্ব্বাণ' নাই।

বেলা হইলে এক সময় মনোরমা হঠাৎ আসিয়া তাড়া দিলেন, "কি বৌমা, এখনও তোমার তরকারি কোটা শেষ হ'ল না? যা হয়নি তা ফেলে রেখে তুমি চট্ করে নেয়ে এস। এ বাড়ীর নিয়ম—বাড়ীর কেউ রওনা হবার আগে বাড়ীর মেয়েদের নেয়ে-ধুয়ে নিতে হয়। ওগুলো থাক পড়ে। নেয়ে এসে কুটে দিও।"

বিনু শাশুড়ীর আদেশে তখনই উঠিয়া গিয়াছিল, ব্যস্তসমস্ত হইয়া হারাণীকে লইয়া স্নান করিতে।

স্নানান্তে ভেজা শাড়ী বদলাইয়া সে ঢুকিয়াছিল তাহার ঘরে প্রসাধন টেবিলের সামনে। রায়বাড়ীর নিয়ম স্নানান্তে চুলে চিরুণী না দিয়া, সিঁদুর না পরিয়া কোন কাজে হাত দিতে নাই। তাহার মন কিন্তু পড়িয়া ছিল আধ-কোটা তরকারির উপর। এমনি তাহার নাম "অকর্ম্মা" "অগোছালো" "কুঁড়ের বাদশা" "গতরপোষা", তাহার উপরে সে অসমাপ্ত কাজ রাখিয়া আসিয়াছে।

বিনুর চুলের রাশি যেন আগাছার জঙ্গল। জট পাকাইয়াই আছে। ঘন কোঁকড়া চুলের অরণ্যে সহজে চিরুণী ঢুকিতে চায় না। জট ছাড়াইয়া দিলে

ফের জটা বাঁধিয়া যায়। লবঙ্গ বলিয়াছিল একদিন, "যাদের কোপন স্বভাব তাদের চুলে জট হয়।"

বিনু সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারে নাই। জানিলে ত করিবে?

বিনু আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কেশের জাল সরাইয়া সিঁথিটা খুঁজিয়া বাহির করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে যে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়া বাহির হইতে হইবে।

এমনি গোলমালের সময় সে সহসা শুনিতে পাইল প্রসাদের কণ্ঠস্বর। প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিতেছিল, "মা, আমার একটা তোয়ালে পাচ্ছি না?"

রন্ধনশালার দ্বারে উপনীত হইয়া মা জবাব দিলেন, "তোয়ালে যাবে কোথায়? তোর ঘরে বিছানায় টিছানায় পড়ে রয়েছে কি না দেখ্‌গে।"

নিমেষে প্রসাদ উপস্থিত বিনুর পশ্চাতে।

আচমকা বিনু মাথায় কাপড় তুলিয়া দিবারও সময় পাইল না।

প্রসাদ বাঁ-হাতে তাহার কেশের গুচ্ছ চাপিয়া দক্ষিণ হস্তের আঙ্গুলে জড়াইয়া এক থোকা চুল ছিঁড়িয়া লইয়া অনুচ্চস্বরে বলিল, "তোমার একটা চিহ্ন নিয়ে যাচ্ছি। তুমি ভাল হয়ে থেক। লেখাপড়া করতে ভুলে যেয়ো না বিনু।"

বিনুর কথা বলার অবকাশ হয় নাই। আঙ্গিনায় পদশব্দ শুনিয়া প্রসাদ সচকিত হইয়া মুঠায় কেশের গুচ্ছ চাপিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

কথা না হইলেও তাহাদের চোখ, অধরের হাসি নিদ্রিত ছিল না। বিনুর হৃদয় অনুশোচনায় ভরিয়া গেল। প্রসাদের অমন ঢেউ-খেলানো কুঞ্চিত কেশের এক থোকা সে কেন কাঁচি দিয়া কঁ্যাচ করিয়া কাটিয়া রাখে নাই।

সে জানিত না চুলের মহিমা। জানিবে কিরূপে? তাহার ত সংস্কৃত ইংরেজী কাব্য কবিতার সহিত পরিচয় হয় নাই। সে ইতিপূর্বে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই—

"বাঁধিতে অবোধ হিয়া তোমার অলকে প্রিয়া,
কোথা হতে এল এত ফাঁস?
তোমার চরণচ্ছায় স্বপনেরা পায় পায়
হৃদয় হরিতে করে বাস।"

বিনু স্বামীর কোন স্মরণ-চিহ্ন খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে তাহার বিছানায় গিয়া আশ্রয় লইল।

নূতন পালিশ-করা জোড়া খাট, গদির ওপরে নূতন তুলার তোশক পাতা।

তাহার উপরে দুগ্ধফেননিভ চাদর। শিথানে জোড়া বালিশ। মোটা পাশ বালিশ, সূচী-শিল্পের নিদর্শন তাহার ওয়াড়ে। সাটিনের জড়ির কাজ-করা আচ্ছাদনী দিয়া বিছানা ঢাকা।

বিছানার ঢাকা তুলিয়া বিমু আগ্রহভরে প্রসাদের মাথার বালিশ কোলের উপরে তুলিয়া লইল। না—বালিশে একগাছা চুলও লাগিয়া নাই। অমলিন ধপ ধপ করিতেছে ওয়াড়। কোথায়ও মাথার তেলের ছোপটুকুও নাই। থাকিবে কিরূপে? প্রসাদের স্নানপর্ব বিমু আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়াছে। মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত চন্দনের সাবান দিয়া শরীরের কি মার্জ্জনা! অত সাবান ব্যবহারের জন্যে তাহার সর্ব্বশরীর মাজ্জিত ঝক্‌ঝকে।

বিমু বালিশ লইয়া নাকের কাছে ধরিল, হঁ্যা, বালিশে তাহার অঙ্গের সৌরভ লাগিয়া রহিয়াছে। চন্দনের সুমিষ্ট মৃদু সুবাস। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যেমন ব্যক্ত করিয়াছিল—

"তাহার অঙ্গের বাস মলয় বহিয়া আনে,
চলে যাই তার কাছে কিবা কাজ কুলে মানে।"

বিমু যথাস্থানে বালিশ রাখিয়া শুইয়া পড়িল। এই গন্ধটুকুই যা কতটুকু সময় স্থায়ী হইবে? নবীন চাকর ক্ষিতিকে লইয়া গিয়াছে প্রসাদকে ষ্টীমারে তুলিয়া দিতে। রায়বাড়ীর বিছানার ভার তাহার উপরে। সে বাড়ী থাকিলে এতক্ষণ এ-বিছানা তনছন হইয়া দ্বিতলের কোণের ঘরে বাড়তি বিছানার গাদায় স্থান লাভ করিত!

রায়বাড়ীর বালিশ-বিছানা রক্ষিত হয় দ্বিতলের কোণের ঘরে সাবেকী একখানা বিরাট্ খাটে। সেখান হইতেই সেগুলিকে মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া রাখা হয়। প্রয়োজন মত বিছানা ওঠা-নামা করে। ধোপা-খানায় চলিয়া যায়।

খানিক বাদে ছোট ঠাকুমার বিছানা আসিয়া এখাটে বিরাজ করিবে ভাবিতে বিমুর ভাল লাগিল না।

কোথায় সুন্দর সুঠাম এক তরুণ। আর কোথায় বৃদ্ধা বৃষকাঠ ছোট ঠাকুমা। দুধের পরিবর্তে ঘোল।

বিমুর দিবা-নিদ্রার অভ্যাস নাই। ঘুমের পরীরা সন্ধ্যা না হইলে তাহার চোখে বাসা বাঁধে না। কিন্তু আজ হইল তাহার ব্যতিক্রম। বিমু সহসা ঘুমাইয়া পড়িল।

২

তাহার সুখনিদ্রা ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল।

সাধুগঞ্জের ষ্টীমারের তীক্ষ্ণ তীব্র ভোঁঃ ভোঁঃ শব্দ দূর হইতেই শোনা যায়। ওই শব্দে গ্রামবাসীরা অনুমান করিতে পারে কোন্ ষ্টীমার কখন তটে ভিড়িয়াছে এবং ছাড়িয়া যাইতেছে।

বিনু তার পায়ের দিকের দেয়াল-ঘড়িটার প্রতি চোখ তুলিল,—তিনটে বাজিয়া সাত মিনিট। ক্ষণকাল পরেই ক্ষিতি নবীনরা ফিরিয়া আসিবে। তাহাদের আগেই ফিরিবে রায়বাড়ীর বিস্ময়কর দুইটি জীব। তাহাদের নাম আছে, কিন্তু সাধারণ লোক বলে মানিক-জোড়। তাহাদের বিষয় রায়বাড়ীতে উল্লেখ করা হয় নাই। আশিকালের বাসী কথা বলিতে বসিলে কত ভুল-ভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়াই থাকে।

বিনু ঘড়ির পানে চোখ মেলিয়া তেমনি বিছানায় পড়িয়াই রহিল। তাহার চিত্তে হর্ষও নাই, বিষাদও নাই, কিন্তু তাহার অগোচরে বুকের ভিতরে একটা তীক্ষ্ণধার কাঁটা যেন বিঁধিয়া খচ খচ করিতেছে। এ অনুভূতি পূর্ব্বে তাহার জানা ছিল না, তাই সে বুঝিতে পারিল না। না বুঝিলেও সে বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে পদক্ষেপ করিল না। সকলে মজা করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছে, তাহার কি দায় তরতর থরথর করিয়া সকলের অনুসন্ধান লওয়া।

সে একবার মাথা তুলিয়া ঠাকুমাকে লক্ষ্য করিল; তিনি দেয়ালে ঠেস দিয়া মুখ ঢাকিয়া তেমনি বসিয়া আছেন। নাতির বিচ্ছেদ বেদনায় ম্রিয়মাণ হইয়া তিনি ঘুমাইতেছেন কিংবা ঝিমাইতেছেন বিনু তাহা টের পাইল না।

ষ্টীমারের বংশীধ্বনিতে তাহার আচকা কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এমন আর কোনদিন এত সহজে তাহার ঘুম ভাঙ্গে না। সে জানে না, তাহার অচেতন মনে বোধহয় এই ধ্বনি শুনিবার আগ্রহ ছিল।

বিনু মুদিত নয়নে ফের ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে উঠানে কুকুর কান্নার বিকট শব্দে বিনুর আবার তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। সে সচমকে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইল।

কুকুরের আর্ত্তনাদে সকলেই বাহির হইয়াছে। ঠাকুমা মুখের কাপড় তুলিয়া মৌনব্রত ভঙ্গ করিয়া বলিতেছেন, "লালজী, কালজী, আমার পেসাদকে ধুমা-কলের নায়ে তুলে দিয়ে এলি? আয়, কাছে আয়। তার তরে কাঁদিস নে।

বাছা আমার আবার ভালোয় ভালোয় তোদের কাছে ফিরে আসবে। তোরা পশু হ'লেও মায়ার বাঁধনে বাঁধা পড়েছিস—

'মায়ার বাঁধন সোজা নয়, বাসলে ভাল কাঁদতে হয়'।"

মনোরমা সুমন্তর হাত ধরিয়া আঙ্গিনায় নামিয়া আসিলেন। সারা দুপুর ছেলেকে লইয়া তিনি জ্বালাতন হইয়াছেন। সুমন্ত দাদার জন্যে কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির। সে যাইবে দাদার সহিত নৌকায় চাপিয়া। তরুও ষ্টেশনে যাইবার জন্য বায়না ধরিয়াছিল। মা মেয়েকে যাইতে দেন নাই।

গলির বর্ষার জল শুখাইয়া কাদা থক থক করিতেছে। কোথায় বা পায়ের পাতা ডোবা জল। গ্রাম্য-পথের এই অবস্থা। 'গায়ের জোরে পুকুর ঠ্যালা' করিয়া বাড়ীর ছোট ডিঙিখানায় প্রসাদ রওনা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের বাহির হইলেই বিল, বিলের পরে হীরা সাগর। হীরা সাগরের বুকে সাধুগঞ্জ। এত হাঙ্গামার পথ, মনোরমা সেইজন্য ক্ষিতি নবীনের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যাইতে দেন নাই। নহিলে সতর্ক প্রহারায় তাহাদের যাতায়াতের অভ্যাস আছে।

ছোটরা প্রসাদকে ডাকে দাদা বলিয়া। ক্ষিতি তাহাদের ফুলদাদা। ফুল-দাদা অপেক্ষা দাদারই বেশি বাধ্য তাহারা। বিশেষতঃ সুমন্ত, সে যেন 'রামের ভাই লক্ষ্মণ।'

একে দাদা চলিয়া গিয়াছে, তাহার পরে তাহার একান্ত অনুগত নবীনও অদৃশ্য। ইহাতেই শিশু-চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়াতে সে অবিরত ক্যান ক্যান খ্যান খ্যান করিতেছিল। এখন লালজী কালজীর সকরুণ রোদনে সুমন্ত যোগ না দিয়া চুপ করিয়া রহিল না।

"ছেলে কাঁদে কুকুর কাঁদে এ কি বাড়ীর অলক্ষণ!"

সুলক্ষণ-অলক্ষণের প্রতি সরস্বতীর সজাগ দৃষ্টি।

সে ছুটিয়া আসিয়া মহা রাগতস্বরে কহিল, "দিনে-দুপুরে কুকুরের কান্না তোমরা দেখছ দাঁড়িয়ে? কুকুর-বেড়ালের কান্নায় যে অকল্যাণ ডেকে আনে তা কি জান না? হারাণি, লাঠি পিটে দে ত অলক্ষী দুটোকে বাইরে তাড়িয়ে।"

সুমন্ত নিজের কান্না ভুলিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "না না, লালজী-কালজী যাবে না। আয় আয়।"

লালজী কালজী অকস্মাৎ কান্না থামাইয়া তাহাদের ক্ষুদে প্রভুর পদতলে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তাহাদের পরিশ্রম কম হয় নাই। নৌকা ছাড়া মাত্র মাঠ ঘাট খাল বিল পার হইয়া তাহারা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিল। পথে স্বজাতিদের সহিত ঝগড়া-বিবাদ অনিবার্য্য। এই মানিকজোড় দু'টি ভ্রমেও অন্য কুকুরের সংশ্রবে যাইতে পারে না। রায়বাড়ীর অন্নে পালিত হইয়া তাহাদের আভিজাত্য প্রবল হইয়াছে। কুকুর দম্পতি বাড়ী হইতে নড়ে না। নড়ে শুধু কর্তা ও তাঁহার ছেলেরা বাহিরে পা বাড়ানো মাত্র।

জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তাকে যদি পাবনা শহরে যাইতে হয় তাহা হইলে লালজী-কালজী তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হইতে উধাও হইয়া যায়। তাঁহার গন্তব্যস্থানে পৌছিবার পূর্বে তাহারা সেখানে পৌছে। আবার তাঁহার ফিরিবার আগে তাহারা বাড়ীতে আসিয়া কর্তার প্রত্যাগমন সংবাদ জ্ঞাপন করে। কি বর্ষা, কি গ্রীষ্ম কিছুতেই ইহার ব্যাতিক্রম হয় না। তাহারা যায় কিরূপে আসে কিরূপে কেহ তাহা জানে না।

ঠাকুমা বলেন, কে কোথায় যাইবে শ্বেত মাছি তাহা উহাদের কানে বলিয়া দেয়। উহারা কুকুর জন্ম লইলেও আসলে শাপভ্রষ্ট দেবতা। উনপঞ্চাশ পবনে উহাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়, ইত্যাদি।

কিন্তু উহারা যাই হোক রায়বাড়ীর বিস্ময়কর বস্তু। সন্ধ্যার পরে কেহ রায়বাড়ীতে পদার্পণ করিতে সাহস পায় না। সমস্ত রাত্রি দুই কুকুর সগর্জ্জনে পাহারা দিয়া বেড়ায় বাড়ীর এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত অবধি।

লালজী পুরুষ, ভীষণ তাহার আকৃতি। কালজী মেয়ে, স্বামীর তুলনায় কিছু খর্ব্ব।

কুকুরের চিৎকারে মেয়েরা দাসীরা সকলেই আঙ্গিনায় উপনীত হইয়াছিল। সরস্বতীর আদেশে হারাণী 'লাঠির ঘায়ে কুকুর পাগল' করিয়া লালজী-কালজীকে বাহির মহলে বিতাড়িত করিল না দেখিয়া সরস্বতীর আক্রোশের সীমা রহিল না। কুকুর ছুঁইয়া দিবার আশঙ্কায় সে তাড়াতাড়ি নিয়মের ঘরের বারান্দায় আশ্রয় লইল।

মনোরমা হারাণীকে আদেশ করিলেন, "তখন ওদের ভাল করে খাওয়া হয় নি, ভাত-মাছ ঢাকা রয়েছে রান্নাঘরের কোণে, আঁস্তাকুড়ে নিয়ে ওদের টিনের থালায় ঢেলে দিয়ে আয়।"

লালজী-কালজী কথা বোঝে, তাহারা লেজ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল রন্ধনশালার পিছনে। মনোরমা ছেলের হাত ধরিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

মধুমতী পান চিবাইতে চিবাইতে বলিল, "কুকুর দুটো শেয়ানা ঘুঘু, আপন-পরের জ্ঞান টনটনে। দিদি জামাইবাবু যে চলে গেল, তখন কিন্তু তাদের সঙ্গে গেল না। কান্না ত দূরের কথা একবার কুঁই কুঁই শব্দটা পর্য্যন্ত করলে না। অথচ দাদার বেলায় দেখ না কাণ্ড। লালজী যেন গেল বুঝলাম, তুই কোন্ আক্কেলে হিল বিল পার হয়ে বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে দৌড়ে গেলি। তোর পেটে একপাল বাচ্চা না কিলবিল করছে? কখন বা হয়ে পড়ে। পশু আর কাকে বলেছে?"

কামিনীর মা ঝাঁটা হাতে বিনুর ঘর ঝাড় দিতে আসিয়াছিল। সে দাড়াইয়া হাসিতে হাসিতে বলে, "তোমাগো কথা শুনি আর বাঁচি না ঠাকুঝি, কুত্তা বিলাইয়ের আবার বিয়োবার জাগা বেজাগা। ছাও হইয়া পড়িত জঙ্গলে, শেয়াল ধরি খাইত। কয় বিয়ান দিইচে, তার একটাও রইল না। বেবাগগুলান গেইচে শেয়ালের প্যাটে। এবার তোমাগো বাড়ীতে মা ষষ্ঠীর দয়া হইবে, কুকুর বিলাই তিনডা গরুর ছাও হইবে। দুধ খাইও কলস কলস।"

ঠাকুমা সারা দুপুর চুপ করিয়াছিলেন। কুকুরদের ফেরার পরে তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত মেঘ অনেকটা হাল্কা হইয়া আসিয়াছিল।

এখন তিনি সেই মেঘভার শব্দের বাতাসে উড়াইয়া দিতে মনস্থ করিয়া মুখ খুলিলেন—"ভাইরে ভেইয়া, গাই বিয়ালো এঁড়ে বাছুর, বৌ বিয়ালো মেইয়া।"

মধুমতী খিল খিল শব্দে হাসে, "কি বললে ঠাকুমা, বউ না ছোট, ওকে সবুরে মেয়া ফলতে দাও। এখন যে তোমার বড় নাতনীর দরকার। বল, রায়বাড়ীর বড় কন্যা বিউইলো ম্যাইয়া।"

'কেবল বড় কেনে, সেজ কি গাঙের জলে ভেসে এইচে? তার কি মেঘে মেঘে বেলা হয় নি? বড় মেয়ের সেজ মেয়ের সোনার কোলে মানিক দোলে, না হ'লে যে সাজন্ত হয় না?

মধুমতী লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া ত্বরিত পদে সরিয়া গেল।

ঠাকুমা আকাশের পানে তাকাইয়া বেলার পরখ করিতে করিতে আপনার মনে বিড় বিড় করিতে লাগিলেন, "বেলা পড়ো পড়ো হইচে। ক্ষিতিরা এক্ষুণি ফিরে আসবে। আমার পেসাদ এতক্ষণ কলকেতা ধর ধর হ'ল। ধূমাকলের

নায়ের যে দাপট, এক দণ্ডে পদ্মা যমুনা পার হইয়ে যায়। কাঁচা বয়েসের বৌ রইল ঘরে, ছেলে গেলেন লেখন-পড়ন করতে। ভেবে চিন্তে কি করব— জন্মকালে ক্ষয় নাই, মরণকালে ওষুধ নাই।"

বিনু ঠাকুমার পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। নবীন ফেরার পূর্ব্বে তাহার একটা কাজ আছে।

ঠাকুমাও উঠিয়া পড়িলেন। বারেক বিনুর দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'রামের লাগি সীতা কাঁদে, সীতার লাগি রাম; মধ্যিখানে সিন্ধু কাঁদে বিধি হইল বাম।"

কামিনীর মা খাটের দিকে পিছন দিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছিল। বিনু প্রসাদের বিছানার পাশে উপস্থিত হইয়া একবার এদিকে-সেদিকে চাহিয়া ক্ষিপ্রহস্তে প্রসাদের মাথার বালিশের ওয়াড দু'টি খুলিয়া লুকাইয়া রাখিল তাহার গদির নীচে।

নবীন ফেরামাত্র বিছানা তনছন করিয়া ফেলিবে। সে কি খুঁজিবে না বালিশের খোল? খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ধরিয়া লইবে তাহার আদরের দাদুবাবু প্রয়োজনবোধে উহা লইয়া গিয়াছেন।

সামান্য দু'টি নক্সাকাটা ওয়াড়ের জন্য রায়বাড়ীতে কেহ মাথা ঘামাইবে না। অমন বালিশের খোল এ বাড়ীতে রাশি রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। ইহাদের যতই থাকুক না কেন কিন্তু বিনুর নিকটে উহার মূল্য আছে।

যে ব্যক্তি বলা নাই, কহা নাই বিনুর একগোছা কেশ অকস্মাৎ ছিঁড়িয়া লইতে পারে, বিনু যদি তাহার সৌরভমাখা স্মরণ-চিহ্ন লুকাইয়া রাখে, তাহাতে কিসের অন্যায়?

কামিনীর মা'র ঝাঁট দেওয়া শেষ হইলে সে ডাকে, "বৌমা, চিরণ ফিত্যা নয়ে আইস, তোমাগো চুল বাঁধি দেই। একডা পরে একডা কামের ঠ্যালায় কতদিন ভরি 'চোকে সরষে ফুল' দেখিচি। মিটে গ্যাল পূজ্যা পরব; বাড়ী হইচে পাত্‌লা। এহন আমি করি দিব তোমার চুলের জাত।"

বিনু উদাস স্বরে জবাব দিল, "থাকগে চুল বাঁধা। চুল নিয়ে বসতে ভাল লাগছে না।"

"সোয়ামী দেশান্তরে চলি গেলে কারোর কি ভাল লাগে মা? চুন বাঁধন কিন্তুক সধ্‌বা মানুষের করতি হয়। চুল বাঁধন, সিঁদুর দেওন সোয়ামীর মঙ্গলের লাগি।"

স্বামীর মঙ্গল কামনায় স্ত্রীর প্রসাধনের কথাটা বিন্নু উপেক্ষা করিতে পারিল না।

চিরুণী-কাঁটা-ফিতা লইয়া কামিনীর মা'র সামনে বসিয়া কহিল, "তুমি মন খারাপের কথা বলছ কেন মাসী। এখানে থাকতে আমার ভাল লাগে না, তাই চুল বাঁধতে চাই নি। একজনা পড়তে গেছে, তাতে আমার কেন খারাপ লাগবে?"

কামিনীর মা মুচকি হাসিয়া মনে মনে বলে, এক ফোঁটা একটা হাবাগোবা মেয়ে তাহার চোখে ধূলা দিবে, এ জিনিষের আস্বাদ সে যেন পায় নাই। যখন তাহার বয়েস ছিল, সে কামিনীর মা হয় নাই, রাজেশ্বরী ছিল, সেই অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তাহার হৃদয়ে সহসা জাগ্রত হইয়া ক্ষণেকের জন্য তাহাকে বিমনা করিয়া তুলিল।

কবি মিছে বলেন নাই—"জীবনে বারেক আসে প্রেমের স্বপন, হৃদয় করিয়া যায় দেব-নিকেতন।"

কামিনীর মা'র আঁটিয়া-সাঁটিয়া চুল বাঁধা বিন্নুর অভ্যাস ছিল না। চুলে টান লাগিতেছিল। সে বাঁ-হাতে খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিতেই কামিনীর মা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "চুলে টান লাগিছে বৌমা? আঁটি-সাঁটি চুল বাঁধনই ভাল। চুল জাতে থাকে। তোমরা একালের ঢিলা-ঢালা ঝুঁটি বাঁধ, তাতে চুল ভাল থাকে না। আমি দিন কতক তোমারে চুল বাঁধি দিলেই তোমাগো সইয়া যাইবে। 'শরীরের নাম মহাশয় যা সহাও তাই সয়।' জানি না, সকলি জানি। বেড়াবেণী বাঁধন জানি, বেনে খোঁপা, ফিরিঙ্গি কোনটাতেই রাজেশ্বরী অপারক লয়। এখন হাত-পা ধুইয়া ধোয়া কাপড় পরি নিয়মের ঘরে যাও। অবেলায় গা ধোয়নের কাম নাই। আমিও উঠি আমার চরকায় ত্যাল দিতি। 'বাঁধন-ছাঁদন হইয়া গেল নতুন বৌয়ের চুল। বাকি থাকিল খোঁপায় দিতে কলমি শাকের ফুল'।" বলিতে বলিতে কামিনীর মা চলিয়া গেল তাহার চরকায় তেল দিতে।

৩

মা আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে ক্ষিতি, প্রসাদকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে এলি? সে ভাল ভাবে উঠে গেছে? ষ্টীমারে ভিড় কেমন?"

ক্ষিতি বলিল, "খুব ভিড় মা, ছুটির শেষে সকলেই যে ফিরে যাচ্ছে। আমি

ষ্টীমারে উঠে দাদাকে ভাল জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বৌঠান কোথায় মা? তার কাছে আমার একটু দরকার আছে।"

ক্ষিতির সঙ্গে বিনুর মুখোমুখি বাক্যালাপ না হইলেও সে তাহাকে বৌঠান বলে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া ছেলেকে প্রশ্ন করেন, "বৌমার সঙ্গে তোর দরকার, সে কি তোর সঙ্গে কথা বলছে?"

ক্ষিতি ফেটে পড়ে, "তোমরা কথা না বলালে সে বলবে কি করে মা? যত সব ইয়ে—এ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। দেখলে ঘোমটা টানবে। ওসব আমার বিশ্রী লাগে। দাদা যাবার সময় বলে গেল, 'মা যদি বলেন তবে বৌয়ের সঙ্গে কথা বলিস্। বাবার আলমারি থেকে বই দিস্ পড়তে। যে খাতায় হাতের লেখা লেখে, মাঝে মাঝে লেখাগুলো পরীক্ষা করে দেখিস্ ঠিক লিখছে কি না।' ওই ত বৌঠান তার ঘরেই রয়েছে তুমি বলে দাও আমার সঙ্গে কথা কইতে। না বললে কথা বলবে না।"

মা এগিয়ে গিয়ে বলেন, "বৌমা, ক্ষিতি তোমাকে যেন কি বলবে, তুমি ওর সঙ্গে কথা বল। ও তোমার ভাইয়ের মত। ওকে লজ্জা করতে হবে না।"

ক্ষিতি ছাড়পত্র পাইয়া সদর্পে বুক ফুলাইয়া বিনুর নিকটস্থ হইয়া বলিল, "নিন বৌঠান, দাদা আপনাকে চিঠি দিয়েছেন। আমার কাছে আপনি আর মুখ ঢেকে চুপ করে থাকতে পারবেন না।"

সমবয়সের প্রতি সাধারণতঃ মানুষের একটা আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। ক্ষিতির সহিত মেলামেশা করা ও কথা বলিবার আগ্রহ বিনুর কম ছিল না। কিন্তু এতদিন তাহার ভাগ্যবিধাতাদের নির্দ্দেশ না পাইয়া তাহার একান্ত ইচ্ছাকে সে দমন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ অপ্রত্যাশিত রূপে মাহেন্দ্র-লগ্ন দ্বারে আসিয়াছে।

বিনু সঙ্কুচিত হইয়া নোটবুকের ছেঁড়া পাতায় পেনসিলে লেখা খোলা চিঠিটা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিল। কাগজে বেশি কিছু লেখা ছিল না।

"শ্রীমতী বিনু,

আমার ষ্টীমার আসিয়াছে, চলিলাম। পৌছিয়া চিঠি লিখিব। আসিবার সময় তোমাদের ওখানে দেখা করিয়া আসিয়াছি। শুনিলাম উহারা শীঘ্রই তোমাকে লইয়া যাইবেন। তোমার হাতের লেখা ক্ষিতি মাঝে

মাঝে দেখিয়া দিবে। মা'র মত হইলে ক্ষিতির সহিত কথা বলিবে। লেখাপড়া করিতে ভুলিও না। ইতি—

প্রসাদ।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠি পাঠ করিয়া বিনু আস্তে আস্তে বলিল, "আমি ত ইচ্ছে করে আপনার সঙ্গে কথা না বলে থাকি নি। ওঁরা যে বারণ করে দিয়েছিলেন। আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন, বসুন না ওই চেয়ারে।"

ক্ষিতি তেমনি দাঁড়াইয়াই জবাব দিল, "এই ত ফিরে এলাম আমরা। আমার মাষ্টারমশাই এক্ষুণি আসবেন। বসলে চলবে না। আচ্ছা বৌঠান, আপনি আমাকে আপনি বলছেন কেন? দাদা হিসাব করে দেখে বলেছেন আপনি নাকি বয়েসে আমার তিন মাসের বড়। বয়েসে বড়, সম্পর্কেও বড়, আপনি আমাকে আর আপনি বলবেন না।"

বিনু ক্ষোভের সহিত বলিল, "না বললে যে বকুনি খেতে হবে আমাকে। ওঁরা যে তরুকে সুমন্তকেও আপনি বলতে বলেছেন 'তুমি' শুনলে রাগ করবে সবাই।"

"কে শুনতে আসবে, কে রাগ করবে! আমার দিদিদের কথা ছেড়ে দিন। যত সব ইয়ে—"

"ইয়ে হলে তুমিও আমাকে আপনি বলো না।"

"না, সেটা হয় না। যিনি পূজনীয়া বয়েসে বড় তাঁকে আমি 'তুমি' বলতে পারব না। আপনি খাতার পাতায় হাতের লেখা করে রাখবেন; আমি এক-একদিন এসে দেখে দেব। গাঁয়ে আমাদের উঁচু স্কুল নেই। যেতে হয় পড়তে বন্দরের স্কুলে। দাদা এখানে ছোটদের জন্যে একটা স্কুল করে দিয়েছেন, খেলার ক্লাব করে দিয়েছেন। আপনি বুঝি জানেন না, দাদা মস্তবড় খেলোয়াড়। সব খেলায় ওস্তাদ। দাদা এখানে থাকলে কত উন্নতি করতেন গাঁয়ের। আপনাকে কত লেখাপড়া শেখাতেন। কাল এসে আমি আপনার লেখা সংশোধন করে দেব।"

ক্ষিতি বাহির হইয়া গেলে বিনু ভাবিতে লাগিল, ছেলেটি মন্দ নয়। কিন্তু রায়গোষ্ঠীর রক্তের ধারা, কি অহঙ্কার! আমার হস্তাক্ষর উনি সংশোধন করিয়া দিবেন। ওঁর লেখা কে সংশোধন করে তার ঠিক নাই।

বিনু তখনও ক্ষিতির হস্তাক্ষর দেখে নাই। ক্ষিতির লেখা যেমন নির্ভুল তেমনি মুক্তার মতন নিটোল সুন্দর।

ক্ষিতির অল্পবয়েস হইলেও সে বিনুর হস্তাক্ষর পরীক্ষকের দাবি করিতে পারে।

ক্ষিতি চলিয়া গেলে বিনু আর-একবার প্রসাদের চিঠিটা চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। তাহাকে শীঘ্রই ঠাকুরদারা লইয়া যাইবেন—এই সংবাদটা তাহার হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহারা যদি যাইতে না দেয়? বিনু আর ভাবিতে পারিল না।

৪

নবীন গৃহে গৃহে আলো দিয়া বেড়াইতেছিল! সেই আলো দেখিয়া বিনু সজাগ হইল। কামিনীর মা কত আগে তাহাকে হাত-পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া নিয়মের ঘরে যাইতে বলিয়াছে। বিনু তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সেখানে যে সৃষ্টির কাজ পড়িয়া রহিয়াছে। উনুনের উপরে এক মণ দুধ অপেক্ষা করিতেছে ছানা মাখন সরের নাড়ু ক্ষীরের নাড়ুর অপেক্ষায়।

বিনু কাপড় ছাড়িয়া পশ্চিমের বারান্দায় হাত-পা ধুইতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কি আশ্চর্য্য, মণ্ডপের গা ঘেঁষিয়া বোধনের ঝাঁকড়া বেলগাছের সংলগ্ন নূতন বাঁশের মাথায় যে আকাশ প্রদীপটি মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে বিনু তাহা এতদিন লক্ষ্য করে নাই। রায়বাড়ী অরায়বাড়ীর এদিকে-সেদিকেও কয়েকটা আকাশপ্রদীপ আকাশ-পথে ক্ষীণরশ্মি বিতরণ করিতেছে। তাহার পিত্রালয়েও আকাশপ্রদীপ নিয়মিত প্রজ্বলিত হইয়াছে। সেই আকাশপ্রদীপের দিকে তাকাইয়া তাহার মনে পড়িল অকালে হারাইয়া যাওয়া স্নেহের ছোট ভাইটিকে। কিন্তু আকাশপ্রদীপের দিকে চাহিয়া থাকা বৃথা, কখনও তাহার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত আকাশপথে প্রতিভাত হয় নাই। হইবে কিরূপে? সে যে দিদির কাছে থাকিবে বলিয়া এ-বাড়ীতে সুমন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সে বিনুর বাহুবন্ধনে ধরা দিলেও বিনু তাহাকে ভুলিতে পারে না।

আকাশপ্রদীপের প্রতি চাহিতে চাহিতে বিনুর হৃদয় মথিত করিয়া চোখ জলে ভরিয়া গেল। এ অশ্রু সমাগমের সহিত প্রসাদের বিদায়ের কোন সংযোগ ছিল কি না বিনু তাহা বুঝিতে পারিল না। তাহার মনের কুঁড়ি ফুটি ফুটি করিয়াও পূর্ণ বিকশিত হইতেছে না।

বিনু নিয়মের সিঁড়িতে পা দিতে দিতে শুনিতে পাইল সরস্বতী মাকে বলিতেছে, "এ বাড়ীতে এ কি কাণ্ড করলে মা—ক্ষিতি অত বড় ছেলে তার

সঙ্গে নতুন বৌকে কথা বলতে দিলে? যে বেহায়া বৌ, কবে হাতাহাতি লাগিয়ে দেবে?"

মা বলিলেন, "কথা বললেই কি হাতাহাতি করবে? বৌমার ভাই নেই, ভাইবোনের মতন দু'জনা মিলেমিশে থাকুক।"

বিনুর আড়ি পাতিয়া পরের কথা শোনার অভ্যাস ছিল না। সে থামিল না, ঘরে ঢুকিয়া গেল।

মনোরমা দুধ জ্বালের উনুন ধরাইয়া সারি সারি বাটিঘটি ভাল জলে ফের ধুইয়া লইতেছেন।

সেই ফাঁকে বিনু যাইয়া উনুনের সামনে খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া দুধ জ্বাল দিতে বসিল।

মনোরমা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তুমি দুধ জ্বাল দেবে বৌমা? আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি।"

'সাবধানের বিনাশ নাই।' মনোরমা ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, দুধে চিনির ভার বধূকে দিয়া চলিবে না।

চিনি-মিশ্রিত দুধ ফুটিতেছে টগবগ করিয়া, ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছে। বাটিতে বাটিতে ভাগে ভাগে দুধ তুলিয়া মনোরমা বলিলেন, "কড়ার সব দুধ এবার ক্ষীর হবে। এবার উনুনে বেশি কাঠ দিও না। তা হ'লে নীচে ধরে যাবে। তুমি ভাল করে দুধ নাড়তে থাক, আমি সুমন্তকে দুধ খাইয়ে দিয়ে আসি। প্রসাদের জন্যে ছেলেটার মন খারাপ রয়েছে। তাই ছুতোনাতায় ঘ্যান ঘ্যান করছে।"

মনোরমা দুধের বাটি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সরস্বতী জপের আসনে বসিল।

বিনু মুখের ঘোমটা কম করিয়া দুধ নাড়িতে লাগিল।

সরস্বতী জপে মগ্ন, গৃহে কেহ নাই। বিনু বাম হাতে হাতা ধরিয়া উনুনের মুখ হইতে নির্ব্বাপিত কাঠকয়লা লইয়া পরিষ্কার নিকানো উনুনের গায়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লিখিল—

এসে কেন চলে যায়—এ বাড়ীর বড় ছেলে,
বালিশেই রেখে যায়, চন্দন সুবাস ঢেলে।
শিখেছে একটা কথা, 'বই পড় লেখ খাতা।'
আমি যদি পড়ি বই, ও এসে নাড়ুক হাতা।

"এ কি বৌমা, পরিষ্কার লেপা-পোঁচা উনুনের পাড় কয়লা দিয়ে হিজিবিজি কেটে নোংরা করছ কেন?"

বিনু চমকিয়া উঠিল। সে ভাবে বিভোর হইয়া রচনায় মন দিয়াছে। তাই শাশুড়ীর পদশব্দ টের পায় নাই। হাতা-ধরা বাম হস্ত তার দুধের কড়ায় আবদ্ধ। ডান হাতে সে তাড়াতাড়ি লেখাগুলি মুছিয়া শাড়ীর আঁচলে হাত মুছিতে লাগিল। মনোরমা বিরক্ত হইলেন, "এ কি করলে? ধোয়া ভাল শাড়ীকে যে কালিমাখা করলে? তুমি উঠে এস, ক্ষীর হয়ে এসেছে, আমি দেখে নামাচ্ছি। সুমন্ত ফের বায়না ধরেছে। 'বইদির কাছে ঘুমোব।' নব্‌নে তেতো হয়ে গেছে। তুমি সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে আমার বিছানায় যাও। কালিমাখা কাপড়ে বিছানায় শুলে বিছানা ময়লা হয়ে যাবে।"

সরস্বতী 'নমো বিষ্ণুঃ তদা বিষ্ণুঃ' বলিয়া জপ সাঙ্গ করিয়া ঘাড় ফিরাইয়া বলিল, "দেখ না উনুনের পাড়টায় কি কাণ্ড করেছে? কচি খুকী, খেলার সাধ; কাজের সময় 'ঘোড়া দেখে খোঁড়া' হয়ে যান।"

বিনু সে মধুর বচন আর শ্রবণ করিল না। ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। তপ্ত মরুভূমির মধ্যে যে সুশীতল জলাশয়ের সন্ধান পাইয়াছে, তাহার বিলম্ব সহিবে কেন?

পরের দিন হঠাৎ রায়বাড়ীর সেজ জামাতা তারকনাথ মধুমতীকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। তারক পাবনা কোর্টের নব্য উকীল।

মধুমতী বাহিরে চাপা শান্ত হইয়া থাকিলেও ভিতরে ভিতরে হয়ত উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছিল। নহিলে তারকনাথের 'টনক নড়িবে' কেন?

ঠাকুমা তাঁহার যথাস্থানে হাতীর মাথায় সমাসীনা। তারক প্রণত হইতেই তাহাকে সাদরে হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া প্রশ্নের পরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন— "হ্যাঁ তারক, পূজোয় এলে না কেনে? মাধ্যি আমার 'মনের জালায় ঝালাপালা, দেয় না দেখা চিকণ কালা, কিসের আমার ফুলের মালা'?"

তারক হেমন্তের মত সপ্রতিভ নয়। লাজুক প্রকৃতির।

সে নতমস্তকে বলিল, "আজ্ঞে পূজোয় মামা ধরেছিলেন, সেই জন্যে আসা হয়নি। একেবারে পূজোপার্ব্বণ মিটে গেলেই নিতে এলাম। জগদ্ধাত্রীপূজোয় আমাদের কাছারি দুই দিন বন্ধ। এর ভেতরে আমাদের ফিরে যেতে হবে।"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ন হইয়া বলিলেন, "আসতে না আসতেই তোমার যাই যাই বুলি, এ কেমন ধারা, তারক? তোমার 'রঁাধতে সইল, বাড়তে সইল না।' তুমি এলে মরা কাত্তিকে বৌ নিতে।"

"ছুটি যে নেই ঠাকুমা?"

ঠাকুমা তারককে ধমক দিলেন, "জগদ্ধাত্রীর পর রাস, রাসের পরে কার্ত্তিক পূজো। সবগুলো এক মাসে জড়ো করলে কত দিন হয়, আমি যেন জানি না। কত কাল পরে জামাই এল ঘরে ঝলক দিতে।"

তারক চট করিয়া সরিয়া পড়িল।

আবার রায়বাড়ীতে সুরু হইয়া গেল কোলাহল, জামাই-ভোজনের আয়োজন। লোক ছুটিল বেড়ার বন্দরে পাকা রুইমাছ আনিতে। গৃহপালিত একটা খাসির শিরচ্ছেদন হইল। দোতলার বন্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়া-মোছা হইতে লাগিল। বিছানা-বালিস রৌদ্রে দেওয়া হইল। উচ্চ খাড়া সিঁড়িতে পদধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলিল ধুপ ধুপ।

তারকনাথ রহিল মাঝে একদিন মাত্র। তাহার মধ্যে যতটা সম্ভব ভোজের সমারোহের ত্রুটি রহিল না।

ফের সেই সাতসকালে রন্ধন, ষ্টীমার ধরিবার ত্বরা।

রায়বাড়ী ধীরে ধীরে শূন্য হইয়া যাইতেছে। উৎসবমণ্ডিত জনরব-মুখর দিনগুলি বিনুর মন্দ কাটে নাই। বাড়ীর প্রত্যেকটি মানুষ খাটিয়া হাড় চূর্ণ করিয়াছে, সেক্ষেত্রে বিনুর পরিশ্রমের কে হিসাব রাখে? বিনু কি কাজের? 'হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল'।

মধ্যাহ্নে বিনু তাহার নিভৃত গৃহে মেঝেয় মাদুর পাতিয়া বই খাতা লইয়া বসিয়াছিল বটে কিন্তু সেদিকে সে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। বার বার মনে হইতেছিল মধুমতীর মুখখানি। মেয়েটি দিব্য হাসিখুশী, শান্ত স্বভাবের। জগদ্ধাত্রী-পূজার ছুটিতে মধুমতীর স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল। কই, এ গ্রামে ত জগদ্ধাত্রী পূজার ঢাক-ঢোল কাঁসি-বাঁশী বাজিতেছে না? হয়ত এখানে হয় না। তাহাদের গ্রামেও জগদ্ধাত্রী-পূজা নাই। কিন্তু বিনুর সহিত জগদ্ধাত্রী-পূজার পরিচয় আছে।

হরিহরপুরে তাহার দাদামশায়ের বাড়ীতে বিনু কত পূজা দেখিয়াছে। কার্ত্তিক মাসব্যাপী দুর্গোৎসব, যাহার নাম 'কাত্যায়নী' পূজা, বিনু দেখিয়াছে। কাত্যায়নী পূজা গোকুলের গোপকন্যারা প্রচলিত করিয়াছিল শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ

করিবার মানসে। তিন দিন দুর্গাপূজা করিতেই লোক অস্থির, তায় আবার এক মাস ভরিয়া পূজা বলি ভোগ আরতি। ভাবিতে বিভীষিকা লাগে।

সকল পূজা হইতে জগদ্ধাত্রী পূজাই বিনুর মনের মত। এক দিনেই তিনবার পূজা, তিনবার বলি, তিনবার ভোগ। দিনমানেই সমস্ত মিটিয়া যায়। কালীপূজার মতন অমাবস্যার ঘোর নিশীথে ডাকিনী-যোগিনী ভূত-প্রেতের উপাসনা বিনু ভালবাসে না।

দাদামহাশয়ের একমাত্র সন্তান মেয়েকে কোন্ জন্মে পার করিয়া দিয়া স্বামী-স্ত্রী শুধু পূজা-পার্ব্বণ লইয়া প্রসাদ বিতরণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ঐ যেন উঁহাদের এক মহাযজ্ঞ—কত লোক অন্ন পাইতেছে, বস্ত্র পাইতেছে। পরিশ্রমের মূল্য দিয়া ভাঙ্গা ঘর তুলিতেছে।

দাদামহাশয়ের মত রায়বাড়ীর পূজা বাতিক হইলেই বিনু গিয়াছিল। ঠাকুমা যে বলেন, 'একা রামে রক্ষা নাই সুগ্রীব মিতা।' মিছে বলেন না।

নানারূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে বিনু উদাস হৃদয়ে তাহার লেখার খাতাখানা খুলিল। লিখিতে তাহার ভাল লাগে না। পড়ার বই পড়িতেও তাহার ভাল লাগে না। গল্প উপন্যাস কবিতার বই পাইলে তাহার চিত্ত ভরিয়া যায় এক অজানা আনন্দে। সে পুস্তকের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও যে রস তুলনাবিহীন।

৫

"বৌঠান, চুপ করে বসে কাঁদছেন নাকি বাপের বাড়ীর জন্যে? রায়বাড়ীর বৌরা কিন্তু নাকে কান্না কাঁদে না।"

বিনু সচমকে ক্ষিতির দিকে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত সকালেই তোমার স্কুল হয়ে গেল? তুমি বসো, ওই চেয়ারে।"

ক্ষিতি চেয়ারে না বসিয়া খাটে পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "আজ যে শনিবার, হাফ স্কুল। সকাল কোথায়, বেলা গেছে।"

বিনু ভাবিল হেমন্তের এমন স্নিগ্ধ কোমল বেলাকে ঠাকুমা সাধে কি মরা কার্ত্তিক নাম দিয়াছেন। মরা কার্ত্তিকের বেলা দেখিতে দেখিতে সরিয়া যায়।

বিনুর নীরবতা ভঙ্গ করিয়া ক্ষিতি সহাস্যে বলে, "বৌঠান, আপনার জন্যে আমি একটা জিনিষ এনেছি, তার জন্যে আপনি আমাকে কি পুরস্কার দেবেন?"

বিনুর কাছে কেউ নাকি পুরস্কার চায়? সে আবার একটা মানুষ? ক্ষিতি কি আনিয়াছে তাহার জন্যে? কি আনিতে পারে? কই, তাহার হাতে ত কিছুই নাই?

বিনু হাসিয়া আগ্রহভরে বলে, "কি এনেছ দেখি? আমার কি জিনিষ নেবে?"

"মেয়েলী জিনিষে আমার দরকার নেই বৌঠান। বন্দরের দোকানে দেখে এলাম ভারি একটা মজার খেলার জিনিষ, তার নাম 'ব্যাগাটেল'।"

বিনু বোকা হইলেও ক্ষিতিকে আর বলিতে হইল না।

বিনু উঠিয়া তাহার কাপড়ের আলমারি খুলিল। চন্দনের ছোট বাক্সে তাহার খরচের জন্যে মা যে কয়েকটা টাকা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে পাঁচটা রূপার টাকা বাহির করিয়া ক্ষিতির হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল, "এই নাও, এতে যদি না হয় আবার নিয়ো। এখন দাও আমাকে কি দেবে?"

ক্ষিতি শার্টের পকেটে টাকা রাখিয়া অন্য পকেট হইতে খামে আবদ্ধ প্রসাদের চিঠি বাহির করিল।

বিনু সবিস্ময়ে কহিল, "এরই জন্যে এত? চিঠি যে আজ আসবে তা আমি জানতাম।"

"নাও ত আসতে পারত? দাদার চিঠি পেয়ে আপনি কি খুশী হলেন না বৌঠান?" বলিতে বলিতে ক্ষিতি উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে এখনই বন্ধুমহলে খেলার মাঠে যাইতে হইবে।

বিনু চিঠি হাতে লইয়া কুণ্ঠার সঙ্গে কহিল, খুশী হয়েছি। তুমি এক্ষুণি যাচ্ছ কেন ঠাকুরপো? আমার খাতার লেখা—"

"সে আর একদিন দেখব। আপনি খাতা ভরে ভরে লিখে রাখুন। খাতার পাতা ফুরিয়ে গেলে, আমাকে বলবেন। আমি ফের খাতা এনে দেব। আমি এখন ক্লাবে যাচ্ছি। লেখা দেখার সময় নেই।"

পকেটে টাকা বাজাইতে বাজাইতে প্রসন্নচিত্তে ক্ষিতি বাহির হইয়া গেল।

সরস্বতী আগু বাড়াইয়া তাহাকে পিছু ডাকিতে লাগিল, "ও ক্ষিতি, স্কুল থেকে এসে কিছু না খেয়েই যে ছুটে গেলি বৌয়ের কাছে। আয়, জল খেয়ে যা।"

ক্ষিতি চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া উত্তর করিল, "ভরা পেটে ফুটবল

খেলা যায় না মেজদি। খেলে এসে খাব। বৌঠানের কাছে একটু দরকার ছিল বলে গিয়েছিলাম।"

"কি দরকার ?" জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বে ক্ষিতি অন্তর্ধান।

সরস্বতী মহা বিরক্ত হইল, ইহারই মধ্যে তাহার ভাইটিকে বৌ বশীভূত করিয়া লইয়াছে। তাহাদের গোপন কথা ক্ষিতি দিদির কাছেও ফাঁস করিয়া দিতে পারিল না। ও আবার নতুন বৌ। "রাইএর রঙ্গ দেখে অঙ্গ জ্বলে।"

ওদিকে সরস্বতীর অঙ্গ জ্বলিলেও এদিকে বিনুর অঙ্গ শীতল হইল প্রসাদের চিঠি পাইয়া।

চিঠিতে প্রসাদ লিখিয়াছে, সে নিরাপদে পৌছিয়াছে, ভাল আছে। বিনুর বাপের বাড়ী যাইবার দিন ঠিক হইল কি ? তাহারা সকলে কেমন আছে ? চিঠি পাইয়াই যেন সে রাত্রে বসিয়া উত্তর লিখিয়া রাখে। পরের দিন সকাল বেলা নবীনের হাতে চিঠি দিলেই সে ডাকবাক্সে দিবে। নবীনকে এ বিষয়ে বলা আছে।

বিনুর চিঠি পড়িলেই প্রসাদ বুঝিতে পারিবে তাহার লেখার উন্নতি হইতেছে কি না। ক্ষিতি লেখার খাতা দেখিতেছে ত, ইত্যাদি।

স্বামীর চিঠি নয়, ঠাকুরদা যেন নাত্নীকে চিঠি লিখিয়াছে। না আছে 'দু'টি সোহাগের বাণী', না আছে একটি প্রীতিসম্ভাষণ। এ আবার চিঠি, খালি 'লেখ পড়', আর কথা নাই। যেমন দাদা তার তেমনি ভাই। একটা ছুতো ধরে পাঁচ পাঁচ টাকা আদায় করে নিয়ে উধাও। খাতাখানার প্রতি তাহার একবার নজর দিবার সময় হইল না। কেনই বা হইবে ? একজনার কাঁচা লেখা পাকা করিবার ক্ষিতির কিসের দায় ?

যাহার দায় সে নিজে আসিয়া মাষ্টারী করুক না কেন ? লেখাপড়া শিক্ষার কারণে নিজের যাইতে হয় বিদেশে, থাকিতে হয় ছাত্র-নিবাসে। শিক্ষার যেমন আয়োজন, তেমনি সমারোহ। আর বিনুর বেলায় লেখাপড়া হইল 'ছেলের হাতের মোয়া'। 'একবার শ্যাম রাখ, একবার কুল রাখ।' না—বিনু আর লেখাপড়া করিতে পারিবে না। পত্রোত্তরে সে তাহাই লিখিয়া দিবে। যাহার অত সখ সে আসিয়া বসিয়া বসিয়া শিক্ষা দিক।

প্রসাদের চিঠিখানা লুকাইয়া বিনু পূবের বারান্দায় বসিল। এ দিকটা নির্জ্জন স্তব্ধ, এখন ঢেঁকিশালার কাজ নাই। সহসা মনে পড়িতে লাগিল হরিহরপুর, সই কুসুম, তাহার স্বামীর প্রেমপূর্ণ লিপির আকুলতা, উচ্ছ্বাস।

তাহার প্রতি ছত্র বিনুর হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। সেই চিঠি আর এই চিঠি! 'কোথায় বাঁশীর ধ্বনি, কোথায় ঝিল্লীর গুনগুনি।'

মূঢ় বিনুর জানা ছিল না—'অল্প জলে পুঁটি মাছের খেলা, গভীর নীরে রুই কাতলার লীলা।" সে ফল্গুনদী দেখে নাই। বাইরে তাহার প্রকাশ নাই, উচ্ছ্বাস নাই—সে অন্তঃসলিলা।

বিনুকে একাকিনী দেখিয়া কোথা হইতে ঠাকুমা আগাইয়া আসিয়া পাশে বসিলেন। বসা মানে পায়রার মত বক বক, "শোন লো মণিমালা, আজকে পেসাদের পত্তর এইচে? আহা, আমার ব্রেজের গোপাল ব্রেজ আঁধার করে গিয়েছে মথুরায়। একাল তবু ভাল, পত্তরের চলাচল আছে। আমাদের কালে এর চলন ছিল না। তখনকার বুড়া বুড়ীরা কইত, 'মেয়েমানুষ লেখন-পড়ন করলে বিধবা হয়।' বিদ্যার দেবী সরস্বতীর স্বামী নেই। তার সেবা করলে মেয়েমানুষের স্বামী থাকে না। দেখ্ মণি বৌ, পেসাদ তোরে কি লেখে লো? পত্তরখানা পড়্ না একবার, শুনি?"

বিনু বলিল, "কি আবার লিখবে, ভাল আছে।"

"দেখ্ লো, তোর মনটা যেন ভার ভার লাগছে? একে একে চলে যাচ্ছে সকলে। হেমন্ত-ভাগ্নি গেল, পেসাদ রওনা দিল। মাধুও গেল। লঙ্গও গেইচে মামার বাড়ী, মেয়েটার বাপ মা নেই, 'যে বলে আয় রে, তারি কাছে যাইরে।' মেয়েটা এদিকে মন্দ না। দোষ চলন-বলনে, আর দিনরাত হাসায়। অত হাসা কি ভাল। কথাতেই আছে, 'যত হাসি তত কান্না কয়ে গেছে রাম শর্ম্মা।' সকলেই চলে যাচ্ছে, এবার তুইও যাবি। মায়ের বাছা, মা'র কাছে যাবিই ত? আজ তোদের সেখানকার চাকর এসেছিল, তোর শ্বশুরের কাছে পত্তর নিয়ে।"

বিনু সচকিত হইয়া কহিল, "তা ত শুনি নি ঠাকুমা? কবে আমি যাব শুনেছেন নাকি?"

ঠাকুমা সে কথার উত্তর দিবার পাত্রী নন। নিজের কথার সূত্র ধরিয়া আপনার মনে বকিতে লাগিলেন, "রায়বাড়ীর বৌদের বাপের বাড়ী যাওয়া কর্ত্তারা ভালবাসে না। নিজেদের মেয়ে পুষতে বড় ভালবাসে। কোন্ মান্ধাতার কালে এয়েছিলাম এ বাড়ীতে, এখন তা মনেও নাই। যখনি কর্ত্তারে কয়েছি, 'আমারে একবার পাঠায়ে দাও, সকলকে দেখে আসি।' কর্ত্তা মুখের পরে সাফ কয়ে দিছেন, 'তুমি যাবে সবাইকে দেখতে বড় বৌ, আমাকে

দেখবে কে? কার কাছে তুমি আমাকে থুয়ে যাবে?' শোন কথা, যে পাঁচখানা গাঁয়ের মাথা—যার পরতাপে 'বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়', তারে দেখবে কে?"

ঠাকুমা নীরব হইলেন। অতীতের কথা স্মরণে আসাতে তাঁহার শুষ্ক মলিন মুখে একটা কোমল আভা খেলা করিতে লাগিল।

এমন সময় ছুটিতে ছুটিতে তরু আসিয়া উপস্থিত। আঁচলের নীচ হইতে একটা পাথরের বাটি বাহির করিয়া তরু চুপে চুপে বলিল, "বৌদি, খাবে? কচি তেঁতুল শিলে ছেঁচে নুন-লঙ্কা দিয়ে মেখে এনেছি। মেনীটা কি বোকা, সকলের সামনে তেঁতুল ছেঁচতে গিয়েছিল, ধরা পড়ে গেছে। ওর মা ওকে আটকে রেখেছে। কচি তেঁতুল খেতে খুব ভাল লাগে, খেয়েই দেখ।"

ঠাকুমাকে কাহারও সমীহ করিবার দরকার হয় না। বিশেষ তরুর সাদর আমন্ত্রণ, বিন্নু হাত বাড়াইল।

ঠাকুমা সেদিকে তাকাইয়া বলিলেন, "পড়েছ যবনের হাতে খানা খেতে হবে সাথে।"

তরু তেঁতুল চুষিতে চুষিতে মুখে চুক্ চুক্ শব্দ করিয়া বলে, "ঠাকুমা, তুমি আমায় যবন বললে? খাবে একটু? এখনও বাটি এঁটো হয় নি, তোমাদের নিরামিষ শিলেই থেঁত করে এনেছি।"

ঠাকুমা মাথা দোলান—"না লো, এখন টক খেতে পারি না, আম্বল তাম্বল হয়। তোরা খা, বৌ চলে গেলে কার সাথে তখন খাবি? ও-সকল দেব্য একলা খেয়ে সুখ নেই।"

"একলা খেয়ে যদি সুখ নেই, তা হ'লে পাকা কামরাঙ্গা কুড়িয়ে তুমি একলা খেয়ে কি সুখ পাও? বৌদির যাবার দেরি আছে, বাবা বলেছেন নবান্নের পরে পাঠাবেন। নবান্নের আগের দিন রবিবারে আমার 'নাটাই পূজো' হয়ে যাবে। বৌদি দেখে যাবে। শেষেরটায় ফিরে আসবে।"

ঠাকুমা সাগ্রহে প্রশ্ন করেন "তা হ'লে ক'দিন থাকবে মণি বাপের বাড়ীতে?"

"তা অনেক দিন থাকবে, দশ-বারো দিনের কম নয়। মা বলছিলেন অগ্রাণ মাস পড়তে পড়তেই বৌদিকে ছেড়ে দিতে। বাবা বললেন, 'নবান্নের পরে।' বাবার ইচ্ছে নয় বৌদি বেশি দিন সেখানে থাকে। নিজের মেয়েদের রাখতে বেশ লাগে।"

ঠাকুমা 'ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে' এ বাড়ীর নাড়ী-নক্ষত্রের সংবাদ সংগ্রহ

করেন। তিনি তরুর কথার উত্তর স্বরূপ বলেন, "নবান্নের দিন অগ্রাণ মাসের কোন্ তারিখে পড়ছে লো? আমাদের আবার মূলো ষষ্ঠী আছে। পাষাণ চতুর্দ্দশীর বত্ত আছে। কালকেই কার্ত্তিক মাসের শেষ দিন।"

বিন্নু জানিত কার্ত্তিক সংক্রান্তিতে কার্ত্তিক পূজার বিধি। কি ভাগ্য রায়-বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজার সমারোহ আরম্ভ হয় নাই। আগেই ত ঠাকুমা গাহিতেছেন—'মূলো ষষ্ঠী', 'নবান্ন', 'পাষাণ চতুর্দ্দশী', 'নাটাই পূজা'। গাহিলে কি হইবে, কার্ত্তিক যে যায়। অগ্রহায়ণ মাসে বিন্নুর ছুটি হইবে। কয়দিনের ছুটি তাই ভাবিতে তাহার হৃদয়ে পুলক-মিশ্রিত বিষাদ ঘনাইয়া আসিতেছিল।

তরু কহিল, "তুমি তেঁতুল খাচ্ছ না কেন বৌদি? মাথা ভাল হয় নি?"

"এই ত খাচ্ছি, বেশ সুন্দর হয়েছে। এ গাঁয়ে বুঝি কার্ত্তিক পূজো নেই?" বলিতে বলিতে আনমনা বিন্নু পাথরের বাটি হইতে এক খাবলা তেঁতুল মাখা তুলিয়া হইল।

তরু সগর্ব্বে বলে, "আমাদের গাঁয়ে এমন পূজো নাই যে হয় না। তোমাদের গাঁয়ে কত বাড়ী কার্ত্তিক পূজো হয়?"

"সাহা বাড়ী, কুণ্ডু বাড়ী, গয়লা—"

তরু বিন্নুকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। আসলে এখানে কার্ত্তিক পূজার তেমন প্রচলন ছিল না। কিন্তু জমিদার-তনয়া ভিন্ন গ্রামের মেয়েদের কাছে সে পরাভব মানিবে কেন? তরু তেঁতুলের হাত চাটিতে চাটিতে তাচ্ছিল্যভরে কহিল, "আমাদের গাঁয়ের লোক কিসের দুঃখে কার্ত্তিক পূজো করবে? আমি ছোট ঠাকুমার কাছে শুনেছি, যাদের ছেলেমেয়ে নেই তারাই কার্ত্তিক পূজো করে, গণেশ পূজো করে। আমাদের গাঁয়ে সবারি গাদা গাদা ছেলে-মেয়েয় ঘর ভরা। আমাদের কুকুর-বেড়ালদেরও মাসে সাতবার করে বাচ্চা হয়।"

তেঁতুল ফুরাইয়া গিয়াছে। বাটির গায়ে, আঙ্গুলে তাহার চিহ্নও নাই। বিন্নু চুপ করিয়া আছে। তরু উঠি-উঠি করিতেছে। এমন সময় গরর গরর শব্দ করিতে করিতে লেজ ফুলাইয়া ফুলমণি বেড়ালের আবির্ভাব। তরুকে কোনখানে স্থির হইয়া বসিতে দেখামাত্র ফুলমণি ছুটিয়া আসে তাহার কোলে বসিতে। বালিকার সুকোমল ক্রোড় তাহার অতিশয় আরামপ্রদ স্থান।

এক্ষেত্রে ফুলমণি সেই আশায় আসিয়াছিল। কিন্তু ফুলমণির ভাগ্য আজ বিরূপ। তরু বিড়ালকে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিল, "বুড়ীর

সথ দেখে বাঁচি নে, বসামাত্র আমার কোলে এসে বসবে। পেটের ভেতরে যে বাচ্চাগুলো নড়ে-চড়ে সে খেয়াল নেই। আমার গা শির শির করে।”

তরু সবেগে প্রস্থান করিল, তাহার পিছনে ফুলমণি।

৬

পরের দিন প্রভাতে বিনুর ঘুম ভাঙ্গিতে দেরি হইয়া গিয়াছিল। দেরির অপরাধ নাই। রাত্রে অনেকগুলি চিঠির কাগজ নষ্ট করিয়া অবশেষে বিনু স্বামীর নিকটে একখানা চিঠি লিখিয়া শেষ করিতে পারিয়াছিল। কর্ত্তার আবার হুকুম, বৈকালে চিঠি পাইলে রাতে তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিবে। এবার আবার বিদ্যার দিগ্‌গজ বিনুর হস্তাক্ষর পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, লেখা উন্নতির পথে যাইতেছে কি না। রাতের আহারাদি মিটিবার পরে বিনুর আর জ্বালা-যন্ত্রণা থাকে না। ছোট ঠাকুমা বিনুর পাহারাদার। দিবালোকে তিনি এ-গৃহের ত্রিসীমানা মাড়ান না। তাঁহার সারাদিনের আশ্রয়স্থল ছোট ভোগের ঘর, যাহার এক অংশে নিত্য ভোগ রান্না হয়। অপর অংশে ছোট একখানা সরু তক্তাপোষে থাকে ছোট ঠাকুমার বেতের ঝাঁপি, কাপড়, গায়ের চাদর, পূজার সরঞ্জাম, জপের মালা ইত্যাদি।

বিনুর নৈশ ভোজনের পরে ছোট ঠাকুমা প্রসাদের খাটে আসিয়া শয়ন করেন। তাঁহার একমাত্র নির্দ্দেশ, বধূ যেন গৃহে শব্দ না করে; কাগজের বেষ্টনী দিয়ে উজ্জ্বল আলো ঢাকিয়া রাখে। ইহার বেশি তাঁহার চাহিদা নাই। কাজেই বিনুর চিঠি লেখার ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু ব্যাঘাত করে বিনুর অবাধ্য ঘুম। ঘুম যেন বাঘের মত আড়ালে আড়ি পাতিয়া বসিয়া থাকে; বিনুকে পাইলে আর রক্ষা নাই। ঝাঁপাইয়া পড়ে ঘাড়ে নয়, চোখের পাতায়।

ভোরে ছোট ঠাকুমা বিনুকে ধাক্কা দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন নিজের কাজে। বিনু ফের সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিল। পত্র পর্ব্বে রাত আড়াইটে পর্য্যন্ত তাহাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। সকলেই কি সব পারে। বিনুর হইয়াছে ‘ভালুকের হাতে খন্তা’।

পুকুরের দিক্ হইতে একটা অস্পষ্ট গোলমাল শুনিয়া বিনুর ঘুম সভয়ে অন্তর্হিত হইল। দিনের বেলা কাহারও ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে, না আগুন লাগিয়াছে?”

বিনু মুখ ধুইয়া আঙ্গিনায় পা দিতেই তরু কহিল, “ও বৌদি, শুনেছ, মথুর দত্তের বাড়ীতে কি কাণ্ড?

বিন্নু মথুর দত্তকেও চেনে না ; কাওও জানে না। যে সন্ত নিদ্রাভাঙ্গা বিহ্বল নেত্র তরুর মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করে, "মথুর দত্ত কে ? কোথায় থাকে।"

"মথুর দত্ত আমাদেরই প্রজা। ওরা বেনে কি না, বন্দরে বেনেতি মশলার দোকান আছে। থাকে পুকুরের ওই দিকে, গলির ওপারে। দত্তর দুটো বৌ ; ছেলে হয় না। আজ ভোরবেলা পাড়ার দুষ্টু ছেলেরা দুষ্টুমি করে ওদের ঘরের সামনে জোড়া কার্তিক ঠাকুর রেখে গেছে। দোর খুলেই কার্তিক দেখে হাউ-মাউ করে মরছে সবাই। আমি কামিনীর মা হারাণীর সাথে গিয়েছিলাম ওইখানে। কি সুন্দর কার্ত্তিক ঠাকুর , টুলটুল করছে মুখ।"

ঠাকুমা আগাইয়া আসিলেন, "কি কইলি তন্বি, মথুরের বাড়ীতে কার্ত্তিক এয়েছে ? ভাল কথা—শুভ সংবাদ। এতকাল এ কথাটা গাঁয়ের লোকের খেয়াল ছিল না। ছোট-বড় দুই-দুইটি বৌ, কারোর কোলে সোনার কার্ত্তিক আসে নি। নাতির তরে দত্ত গিন্নীর কত আক্ষেপ। পয়সা আছে, খাবার লোক নেই। 'কেউ বলে ভাত কি দিয়ে খাব—কেউ বলে ভাত কোথায় পাব'।"

কামিনীর মা, হারাণী-পসারী-খেঁসারী সকলে দত্ত-বাড়ী প্রদক্ষিণ করিয়া একে একে ফিরিয়া আসিতেছিল।

ঠাকুমার কথায় সায় দিয়া কামিনীর মা বলে, "যা কইলে মাঠান, যেখানে খাওনের দুঃখ নাই সেখানে ছাওয়াল ম্যায়ার পাল যায় না। যত আমদানি হা-ভাতের কাছে।"

ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করেন, "ঠাকুর পেয়ে দত্ত গিন্নী তুষ্ট হয়েছে ত রাজেশ্বরী ? কি করছে ওরা ? বৌদের কোলে দিয়েছে ?"

"হা রে আমাগো মরণ দশা—দত্তমশাই হাড় কেপ্পন, পূজ্জ্যার খরচ লাগিবে বলি চটে-মটে আগুন। দত্ত গিন্নী বুড়া মানুষ, নাচন-কোঁদনের সাধ্যি নাই। তবু বুড়ী 'আশার দুয়ারে বান্দা খাটে'। দুই বৌরে ডাকি বসায়ে কোলে ঠাকুর দিতে যায়, বড় হাসি হাসি কোলে নয়া বসে। ছোট মুখ বাঁকায়ে কয়, 'আমার ঠাকুর-দ্যাবতায় দরকার নাই। মাটির ঠাকুর, অত বড় ভার দেব্য কোলে নিলে আমার কাঁকাল টন টন করিবে।' বুড়ী বৌরে হাতে ধরে ব্যাগাতা করি তার কোলের কাছে এতটুকু বসায়ে দিইছেল। তক্ষুণি তড়াক্ করে ঢলানি উঠি পড়ল। সাধে কি ওয়ার নাম থুইছে গেরামের লোক মথুরা-

বাসিনী। যখন দত্তমশাই বুড়া বয়েসে যোয়ান বয়েসী বৌ বিয়ে কর্যা আনিছেল 'বাড়ীতে কাকের বাসা বাঁধিল।' মিছে কয় নাই। শুনি, পাড়ার চাষাভুষার ডবকা ছাওয়ালরা বাড়ীর চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। গায়েন গায়, ঢিল দেয় টিনের ঘরের চালে।"

হারাণী বলে, "সে গায়েন কি য্যামন-ত্যামন গায়েন, কথা-গুলান মন্দ না—'আজি যে গোলাপ ফুল, সৌরভে করে আকুল, কালি যে ঝরিয়া যাবে কে তারে চায় রে।"

মনোরমা চায়ের ঘর হইতে এইদিকে আসিতেছিলেন, কামিনীর মা সেইদিকে তাকাইয়া ক্ষুদ্র জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল—"যা তোরা, যে-যার কাজে যা। দত্তবাড়ীতে কার্ত্তিক আইচে তাইতে আমাগো কি ? 'যার ঝি তার জামাই, পড়শী বাড়ীর কাটনা কামাই।' বৌমা তরকারি নয়া বসগে।"

যে যাহার কাজে চলিয়া গেলে ঠাকুমা হেলিতে-দুলিতে রওনা হইলেন ভোগশালার দিকে।

ছোট ঠাকুমা স্নানান্তে তুলসীতলায় জল দিতেছিলেন।

ঠাকুমা সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া মুখ খুলিলেন,

"কত দুঃখ দিলে হরি, সংসারে আনিয়া
বসায়ে হাটের মাঝে, রহিলে সরিয়া।"

ভূতের মুখে রাম নাম শুনিয়া ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "তুলসীতলায় একটু বসবে দিদি ? কুশাসন পেতে দিই। সাত সকালে নেয়ে-ধুয়ে আঁস্তাকুড়ে ঘুর ঘুর করছ। যাবার ত সময় হ'ল, একন পারের কড়ি সম্বল কর।"

"তোরাই সম্বল করতে থাক্। আমার কিসের দায় পড়েছে। যে এখানে আমাকে পাঠিয়েছে, নেবার দায় তারই। আমি তার ভরসায় ঘুরে বেড়াই।" বলিতে বলিতে ঠাকুমা চলিয়া গেলেন বিনুর ঘরের পিছনের বাগানে।

তরকারির বোঝা নামাইয়া বিনু স্নান করিতে গেল হারাণীর সঙ্গে। বাসন মাজার ঘাটে পসারী বাসন মাজিতেছিল। গলির মুখে পুকুরের চোখের পাশে রায়বাড়ীর আর একটা ছোট বাঁধানো ঘাট আছে। গলির ওপারের মেয়েরা ওই ঘাটে স্নান করে, জল লইয়া যায়। সেই ঘাটের সোপানে বসিয়া তিতপোল্লার খোসায় সাবান মাখিয়া গা ঘষিতেছিল মথুর দত্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ললিতা, যাহাকে পাড়ার সকলে মথুরাবাসিনী বলে। সেটা তাহার অসাক্ষাতে, সাক্ষাতে সে ললিতা।

ললিতা দেখিতে ভাল, বয়েস কুড়ি-বাইশের বেশি নয়। লাবণ্যে ঢল ঢল মুখখানি। সর্ব্বদা ছিমছাম ভাব।

হারাণী আগাইয়া ডাকে, "ও ললিতা বৌ, নাইতে আইছ ? তোমাগো কার্ত্তিক পূজার কি হইচে ? ঢাক ঢোল কাঁসির বাদ্যি শুনছি না ত ?"

পায়ের নখে সাবান মাখিতে মাখিতে ললিতা মুখ তুলিয়া উত্তর দেয়, "যাগরে পূজ্যা তারাই জানে বাজনবাদ্যির বিত্তান্ত। আমরা আদার ব্যাপারী, আমাগো জাহাজের খবরে কাজ নাই।"

"কি কইছিস্ লো ললিতা বৌ ? তোর নেগেই না দত্তমশাইয়ের কার্ত্তিক পূজা – দাঁত পড়া চুল পাকা বড়কীর মা হওনের বয়ক্রম পার হইয়া গিইচে। এখন তোর কাছেই কার্ত্তিক ঠাকুর ব্যাটা হইয়া আসিবে।'

"ব্যাটায় আমার কাজ নাই হারাণীদি, পরের সোয়ামীকে সোয়ামী বলিই মানি না, তার আবার ব্যাটা ? যে স্যাবা করে কাছে শোয় বুড়াডার, তার কাছেই ব্যাটা আসুক।"

"তুই থাকিস্ না ক্যানে সোয়ামীর ঠাঁই ? স্যাবাই বা করিস্ না ক্যানে ? বড়কী এখন বুড়া হইয়া গিইছে, তারই স্যাবা নাগে। তারও য্যামন সোয়ামী তোরও তেমনি।"

"আমাগো আবার সোয়ামী, আখার ছাই। 'ভাত দেওনের করতা নয়, কিল দেওনের গোঁসাই।' বয়েস কালে যারে নয়া নীলা করিছে, এখন বুড়াকালে সেই করুক গা স্যাবা-দ্যাবা। ভাঙ্গা মাজায় বাতের ত্যাল ডলিতে আমার বালাই পড়িচে। ত্যালের গন্ধে আমাগো বমি আসে বলি. আমি পাও দেই না বুড়ার ঘরে।"

হারাণী গালে হাতে দেয়, "ওমা, কি কইলি ললিতা বৌ ? যার সাথে বিয়া বইছিলি তারে হেনেস্তা করে কেউ ? বুড়ারে তোর যদি এত ঘেন্না তা হ'লি বিয়া বইছিলি ক্যানে ?

ললিতাবৌয়ের সাবান সর্ব্বাঙ্গে মাখা হইয়া গিয়াছিল। সে জলে নামিয়া ডুবের ওপরে ডুব দিতে দিতে কহিল, "ছোট কালে মা-বাপ মরা আমি, ভাইগরে গলায় পড়িছিলাম। ভাত-কাপড় দেওনের ভয়ে ভাইরা বুড়া শয়তানের কাচ থেইক্যা লুক্যায়ে-চুরায়ে পাঁচশো টাকা ঘুষ খায়ে আমারে বেচে দিইছেল বুড়ার কাছে। তারে বিয়া কয় কেডা হারাণীদি ? যার সাথে বিয়া হইছেল সেই বিয়ার বৌ কার্ত্তিক পূজা নয়ে নাচুক গা।"

ললিতা বৌ স্নান সারিয়া ভরা কলসী কাঁখে লইয়া নামিয়া গেল গলি পথে। পথে বোধহয় কেহ তাহার প্রতীক্ষায় ছিল, তাই নারী কণ্ঠের সুমিষ্ট খিল খিল হাস্য ধ্বনি ভাসিয়া আসিল বাতাসে।

হারাণী "মরণ মরণ" কহিয়া বড় ঘাটে ফিরিয়া আসিল।

বিনু গলা-জলে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে ইহাদের বাক্যালাপ শুনিতেছিল। তাহার মনে পড়িতেছিল হরিহরপুরের জমিদার ভবনের দু'টি নারীকে 'একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে কাঁদেন রাখববাঞ্ছা'র মতন সেই দুই বিষাদ প্রতিমা। তাঁরা ভদ্র, শিক্ষাসম্পন্না, সেই জন্যে সকলের অগোচরে গোপনে অশ্রুপাত করিয়া হৃদয়ের অবর্ণনীয় বেদনার ভার লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। ললিতা বৌএর কি আছে? সে গর্ব্বে প্রকৃতির প্রতিশোধ লইতেছে।

৭

তরুর হইয়াছিল আজ সুপ্রভাত। গত সন্ধ্যায় বধূর নিকটে তাহাদের গ্রামে কার্ত্তিক পূজার উল্লেখে সে একটু খর্ব্ব হইয়াছিল। প্রভাতের সোনার আলোয় তাহার গ্রাম্য মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইয়াছে। দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে সে সারা বাড়ীতে প্রচার করিতে লাগিল, ফুলমণির চারিটা শাবক প্রসবের বার্ত্তা। রায়বাড়ীর শস্যপূর্ণ মাচার জালার আড়ালে ফুলমণির সূতিকাগার।

সর্ব্বঘটে বিরাজমান ঠাকুমা সানন্দে মাথা দুলান, "ভাল দিনেই বাচ্চা হইচে। অদিনে অক্ষণে কুকুর-বেড়ালের বাচ্চা হওয়া ভাল নয়। তাতে গৃহস্থের বাড়-বাড়ন্ত হয় না।"

কামিনীর মা চাপিয়া ধরে তরুকে, "হেই ছোটু-ঠাকুজ্জি, তোমাগো নাতি নাতিন হইচে, মেঠাই-মণ্ডা খাইতে দেও সকলেরে।"

তরু চটিয়া যায়, "মেঠাই খেতে চাও খাওয়াব কামিনীর মা। কিন্তু তুমি আর কখনও ওই অসভ্য কথা বলতে পারবে না।"

কামিনীর মা হাসে খিল্ খিল্ শব্দে। তরু তাহার হাতে মানুষ। খাইতে চাহিলে দরাজ হাতে খাইতে দেয় তাহাকে। পিতার নিকট হইতে টাকা চাহিয়া আনে, লোক পাঠাইয়া বাজার হইতে মিষ্টান্ন আনিয়া দাস-দাসী মহলে বিতরণ করে। তরু পিতার অত্যন্ত আদরিণী।

আদরিণীর আজ আর পিতার কাছে প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইতে হইল না।

অপরাহ্নে মথুরা দত্ত দই, ক্ষীর, গামলাভরা ক্ষীর-চমচম ও সন্দেশ লইয়া জমিদারকে যুক্তকরে সবিনয়ে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল পূজার আঙ্গিনায় পদধূলি দিতে।

তরু আনন্দে ডগমগ। সত্যই ফুলমণির ছানাদের পয় আছে। কত মিষ্টি আসিয়াছে ভারে ভারে, কে কত খাইবে?

ইতিমধ্যে তরু বাহির-মহল হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বিনুকে জানাইয়া দিয়াছে, আগামীকাল অগ্রহায়ণ মাস আরম্ভ হইবে। কাল রবিবার। এ রবিবারের পরের রবিবারে রায়বাড়ীর নবান্ন। নবান্নের পরের দিন বিনু যাইবে পিত্রালয়ে। সেখান হইতে কাহাকেও আসিতে হইবে না। রায়বাড়ীর গরুর গাড়িতে বধূকে পৌছান হইবে। নিজেদের দুইখানা গাড়ি, দুই জোড়া বিশালকায় বলদ থাকিতে রায়বাড়ীর বধূ ভাড়াটে গাড়িতে পদক্ষেপ করিতে পারে না।

পল্লীগ্রামবাসীদের প্রধান যানবাহন বর্ষায় নৌকা, গ্রীষ্মে গরুর গাড়ি অথবা পাল্‌কি। কিন্তু এ সময়টা পাল্‌কি-বেহারা কুর্মী কাহারের দল বৎসরান্তে দেশে চলিয়া যায় ধান কাটিতে। বিবাহের মরশুমে ফের ফিরিয়া বন্দরে বন্দরে আস্তানা গাড়ে।

তরু আরও খবর দিয়াছে, দিন পনেরর বেশী বিনু সেখানে থাকিতে পারিবে না। পৌষ, চৈত্র ও ভাদ্র মাসকে রায়বাড়ীর নববধূকে এক বছর মানিয়া চলিতে হইবে। যাতায়াত চলিবে না। অগ্রহায়ণের শেষে বিনুকে আবার ফিরিতে হইবে। এ ব্যবস্থায় বিনু খুশী হইতে পারিল না। যে মাসে যাওয়া সেই মাসেই যদি আসিতেই হয় তাহা হইলে মাস-পয়লা পাঠাইয়া দিলে কি ক্ষতি হইত?

ইহাদের কাটা নূতন ধানের আঁটিতে মণ্ডপের আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেখানে কি ভরিয়া যায় নাই? ইঁহারাই নবান্ন করিতে জানেন, তাঁহারা কি নবান্ন করেন না? নবান্নের ছুতা ধরিয়া বৌকে আটকাইয়া রাখে কে?

দিনের আলো নিবিয়া গেলে বিনু তাহার কর্ম্মশালায় অভ্যাসবশতঃ একবার ঢুকিয়াছিল। মনোরমা তাহাকে অব্যাহতি দিলেন। এ বেলা সমস্ত দুধের

ছানা কাটিয়া রাখা হইবে। যে দই-ক্ষীর আসিয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করা চাই।

মনোরমার হাতে জিলেপি ও পানতুয়া উতরাইয়া যায় অপূর্ব্ব স্বাদের। মাঝে মাঝে স্বহস্তে ছানা কাটিয়া বিধবাদের জন্য ভোগের ঘরে বসিয়া তাঁহাকে পানতুয়া জিলেপি ভাজিতে হয়। যেখানে রন্ধন হইবে তাহার সন্নিকটে বিধবাদের হবিষ্যি করিবার নিয়ম। অন্যত্র হইতে প্রস্তুত খাদ্য তাহাদের অচল।

নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ও বিধবারা ভাজা জিনিষ 'ভাতের পাত' ভিন্ন খাইতে পারে না। মনোরমা খুঁত খুঁত করেন তাঁহার বিপুল পরিশ্রমের পানতুয়ায় রস ঢোকার অবকাশ পায় না বলিয়া। তবু ঘরে ছানা করিয়া নানাবিধ খাদ্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে হয় সরস্বতীর জন্য। বেচারা জীবনে কিছুরই আস্বাদ পাইল না।

সন্ধ্যা-সমাগমে দত্তবাড়ীতে কার্ত্তিক পূজার ঢাক-ঢোল, কাঁসি বাজিতে লাগিল। মশালের আলোয় গলিপথ আলোকিত হইল। কার্ত্তিক পূজার ঢাকের বোল বিনু জানে। তাহার বোল হইল—"জিজিং জিজিং জিংলা কার্ত্তিক ঠাকুর হ্যাংলা, একবার আসে মায়ের সাথে, আবার আসে একলা।"

কোন্ পূজায় ঢাকের কি বোল বিনু তাহা শুনিলেই বুঝিতে পারে। পারিবেই না কেন—জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পূজা-পার্ব্বণের মধ্য দিয়া তাহার জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে।

আলো-আঁধারে পূবের বারান্দায় বিনু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, বাজনার শব্দ তাহাকে যেন কেমন উন্মনা করিয়া তুলিল।

তাহাদের বাড়ীর সংলগ্ন সাহাদের গৃহে কার্ত্তিক পূজায় কত ধূম, আনন্দ, এবার তাহার কার্ত্তিক পূজা দেখা হইল না। জগদ্ধাত্রী পূজায় যোগ দেওয়া হইল না। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপ বিনু নাকালিয়ায় রাসের মেলায় যাইতে পারিল না।

নাকালিয়া বন্দরেই বিনুদের আদিনিবাস ছিল। হীরাসাগরের আক্রমণে খানিকটা দূরে তাহারা সরিয়া আসিলেও বন্দরের সহিত যোগ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

বন্দর ব্যবসায়ীদের স্থান। বিত্তশালী ব্যবসায়ীরা সকলে মিলিয়া মহা সমারোহে রাসযাত্রা নির্ব্বাহ করে। রাসের মঞ্চ হয় মনোরম। বৃক্ষের শাখায় পল্লবে ফুলে প্রস্তুত হয় বিরাট্ রাস-মঞ্চ। মাঝখানে বেদীতে বন্দরের জাগ্রত

দেবতা জগন্নাথদেবের দারুমূর্ত্তি বিরাজ করেন। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া অগণিত গোপিনী, অগণিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তির সমাবেশ।

বিরাট্ মেলা বসিয়া যায় দিগন্ত-প্রসারিত প্রান্তরে। দেশ-দেশান্তর হইতে মহাজনী নৌকায় পণ্যদ্রব্য আসে ভারে ভারে।

যাত্রা, কবি গানের ও পুতুল নাচের আসর বসিয়া যায়। বাউলের দল একতারা বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গান ধরে—

"আমার যেমন বেণী তেমনি র'বে, চুল ভেজাব না।
জলে নামিব, জল ছিটাইব,
আথালি-পাথালি সাঁতার কাটিব,
চুল ভেজাব না।"

বিনুর অত্যাচারে আবদারে অতিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরদা তাঁহাকে নৌকা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেন রাসের মেলায়। কি ভিড়, লোকে লোকারণ্য। স্তূপ স্তূপ কত জিনিষ।

খেলার তৈজসপত্র কিনিয়া দিয়া, পুতুল নাচ দেখাইয়া ঠাকুরদা সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাহাকে লইয়া নৌকায় ফিরিতেন।

অনন্ত নীলাকাশ হইতে রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র গলিত রজত-ধারা ঢালিয়া দিতেন ভুবনে। হীরাসাগরের কল-কল্লোলে মিশিয়া যাইত বাউলের স্বর—"যেমন বেণী তেমনি র'বে, চুল ভেজাব না।"

৮

নবীন টেবিলের উপরে আলো রাখিয়া গিয়াছে। বিনু টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া খাতা দেখিতেছিল। খাতার সাদা পাতা যেমন ছিল তেমনি পড়িয়া আছে; তাহাতে কালির আঁচড় পড়ে নাই। লিখিতে তাহার ভাল লাগে না। পড়ার বই পড়িতেও না। গত রাত্রে চিঠি লিখিতে বসিয়া অনেক কাগজ ছেঁড়া হইয়াছে। আজ কাজকর্ম্ম বিশেষ নাই, একটু ঘুমাইয়া লইলে মন্দ হইবে না। কত কাল সন্ধ্যাবেলা বিনু ঘুমাইতে পারে নাই। কামিনীর মা পিছনে লাগিয়া থাকে। ঠেলিয়া পাঠায় কর্ম্মশালায়।

আজ কামিনীর মা বাড়ীতে নাই। দল বাঁধিয়া গিয়াছে কার্ত্তিক পূজা দেখিতে। তাহাদের শুধু "রথ দেখা ও কলা বেচার" উদ্দেশ্য নয়। কৌতূহল প্রবল, মথুরবাসিনী মধুরহাসিনী ললিতা বৌয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া দেখার।

কামিনীর মা না থাকুক, তরু ছিল বাড়ীতে। তরু পিছন হইতে ডাকিল, "ও বৌদি, একা কি করছ? সবাই গেছে ঠাকুর দেখতে। নবীনের কোলে চেপে সুমন্ত গেল ফুলদার সাথে।

বিনু মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নেমন্তন্ন খেতে বুঝি? তুমি গেলে না তরু?"

তরু বলে, "শূদ্দরের বাড়ীতে কি ব্রাহ্মণ পাতা পেতে নেমন্তন্ন খায় বৌদি? ওদের ত ঠাকুর-দেবতাকে অন্নভোগ দিতে নেই। ফুলদাকে বাবা পাঠিয়েছেন নেমন্তন্ন রক্ষে করতে ঠাকুরের প্রণামী দিয়ে। ফুলদার ইচ্ছে হ'লে একটা মিষ্টি মুখে দেবে, নয়ত এক খিলি পান কি একটা এলাচ তুলে নেবে। আমাদের নিয়ম, রাজা প্রজা যে হোক্ না, নেমন্তন্ন রাখতে বাড়ীর ছেলেদের একজনাকে যেতেই হয়। রায়বাড়ীর মেয়েরা তাদের প্রজার বাড়ী নেমন্তন্নে যায় না। বাবা একশ' টাকা দিয়েছেন ঠাকুরের প্রণামী, ফুলদার হাতে।"

বিনু জমিদার-ভবনের রীতি-নীতি জানে না। সে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে, "টাকা দিয়ে ওরা করবে কি?"

"পূজোয় খরচ করবে। ওদের দেওয়া খাবার আমরা খাব"—বলিয়া তরু আঁচলের ভিতর হইতে কলার পাতায় মোড়া একটা সন্দেশ ও চমচম বিনুর হাতে অর্পণ করিয়া কহিল, "বৌদি, একটু চেখে দেখ, সুন্দর তৈরি করেছে। মা ছানা-মাখন নিয়ে ঢক ঢক করছেন। তাঁর কাজ সারা হ'লে সবাইকে ভাগ করে দেবেন। ভাগ হবার আগেই আমি চেখে দেখে তোমার জন্যে নিয়ে এলাম, খাও।"

বিনু কুণ্ঠিত হইল, এ তেঁতুল কামরাঙ্গা নয়, সন্দেশ চমচম। তরু লুকাইয়া খাইতে পারে, খাইয়াও থাকে। কিন্তু বিনু কেন চুরির ভাগ লইবে?

বিনু সবেগে ঘাড় নাড়ে—"না, আমি খাব না, তুমি খেয়ে ফেল। মা যখন দেবেন তখন খাব।"

"টক খেতে যখন ডাকি তখন ত না কর না বৌদি? আজ মিষ্টি দিতে এলাম অমনি না বললে? যাই, আমি যেখানকার জিনিষ সেইখানে রেখে দিই গে। মা এক্ষুণি ভাগ-জোক করতে বসবেন। ঠাকুর দেখে সবাই ফিরে আসবে। আর কখনও তোমাকে আমি কিছু দিতে আসব না।"

অভিমানে তরু ঠোঁট ফুলাইল।

তরুকে অসন্তুষ্ট করিতে বিনুর সাহস হইল না। মেয়েটি পাকা মুখরা হইলেও তাহাকে ভালবাসে।

সন্দেশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিতে দিতে বিনু বলিল, "তুমি আমার কাছে আজ থেকে শোবে তরু, মস্ত বিছানা।"

তরু উত্তর দেয়, "তুমি বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এলে তখন শোব বৌদি, তোমার ঘর বিছানা সবই ত ভাল। ভাল না ছোট ঠাকুমার ঘুমের মধ্যে ফুঃ ফুঃ শব্দ। আমার ভাল লাগে না।"

বিনুরই কি ভাল লাগে? ছোট ঠাকুমার দাঁত নাই। ঘুমাইলে ফোকলা মুখ হইতে একটা ফুঃ ফুঃ বিকট শব্দ বাহির হয়। শুনিয়া বিনু ভাবে, ইহা অপেক্ষা নাসিকাগর্জ্জন অনেক ভাল। আসল কথা প্রসাদের ঝকৃঝকে মেহগনি খাটে পোড়া-কাঠ ছোট ঠাকুমাকে বিনু সহিতে পারে না। ওই নরম শুভ্র শয্যায় শোভা পায় বলিষ্ঠ গঠনের প্রিয়-দর্শন এক তরুণকে। যাহার টানা টানা চোখ, মাথাভরা ঘন কালো কুঞ্চিত কেশের স্তবক, সর্ব্বাঙ্গ চন্দন সৌরভে সুবাসিত। নহিলে বিনু একবার বিছানা লইলে কোথায় থাকেন ছোট ঠাকুমা, কোথায় তাঁহার ফুঃ ফুঃ।

সন্দেশ চমচম খাওয়া হইলে বিনু জল খাইয়া মুখহাত মুছিল।

তরু বলে, "তোমার কাছে শোব না, শুনে তুমি কি রাগ করলে বৌদি?"

"না, রাগ করব কেন? ক'দিন পরেই ত শোবে বললে। ভারী ত পনেরটা দিন, একদণ্ডেই ফুরিয়ে যাবে।"

"পনের দিন কি অল্প হ'ল তোমার? আমি মাষ্টারমশাইয়ের কাছে শুনেছি, ওকে এক পক্ষ বলে। এক পক্ষ থাকবে—তাতেও তোমার মন ওঠে না। না যাওয়ার চেয়ে 'নাই মামার থেকে কাণা মামা কি ভাল নয়'? দাদা নেই, দিদিরা নেই, তুমিও থাকবে না, তাতে কি আমাদের ভাল লাগবে? সেই জন্যেই আমি বাবাকে বলেছিলাম 'বেশী দিন বৌদিকে বাপের বাড়ী রেখ না'।"

তরুব গলার সুরটা সহসা কেমন যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা নরম শোনাইতেছিল।

সেই স্বরে বিনুর হৃদয় ঈষৎ স্নেহে সিক্ত হইল। সে বলে, "তোমাদের ছেড়ে থাকতে আমারও বোধ হয় তেমন ই-য়ে"—

কার্ত্তিক দর্শন করিয়া সকলেই ফিরিয়া আসিয়াছে। মা মিষ্টি বিলাইতে সকলকে ডাকিতেছেন। দাস-দাসীদের নাম ধরিয়া।

বিন্নুর মন্তব্য শেষ হইল না। তাহারা উভয়ে গোপনে গাছের খাইয়াছে, এখন তলার খাইতে হাত ধরাধরি করিয়া বাহির হইল।

সরস্বতী জপের মালা লইয়া বসিয়াছিল।

হারাণীকে নিকটে পাইয়া মালা কপালে ঠেকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে হারাণি, কেমন পুজো দেখে এলি? বেনে-বাড়ীতে ঠাকুরের ভোগ দিচ্ছে কি দিয়ে? পুরুত পেয়েছে ত?"

হারাণী হাসিমুখে বিবরণ দিতে লাগিল, "হুঁ, ঠাকুজ্জি পুরুত আইচে বাপে ব্যাটায়। বাপে পূজ্যায় বসিছে, ব্যাটায় লুচি-পুরী হালুয়া করিছে ভোগের নাগি। দত্তর দুই বুন আসিছে ছাওয়াল ম্যায়া নিয়া। কাছে-পিঠের কুটুম-কাটমে বাড়ী ভরি গিইচে। মেঠাই-মণ্ডা ফল-পাকুড়ে দই-ক্ষীরে পূজ্যার ঘর থই থই করিছে। করিবে না, টাকাওয়ালা দত্ত, দত্ত-গিন্নীরও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকায় ছাতা পড়ি যাইচে। কিন্তুক টাকায় কারুর সুখ নাই। নলিতা বৌডা জ্বালায়ে মারিচে সকলকে।"

সরস্বতীর আঙ্গুলের মধ্যে জপের মালা মধ্যদেশে পৌঁছিয়াছিল, সুতরাং সে এখন কথা বলিতে পারে না।

সরস্বতী হারাণীকে সমর্থন করিয়া ঘাড় নাড়িল। হারাণী মহা উৎসাহে ফের সুরু করিল, "এই যে পূজ্যা হইছে, বৌয়ের সেদিকে নজর নাই। সাজিয়া-গুজিয়া চপ চপ কইর‍্যা পান খাইছে, আর হাসি-মস্করা করিছে সগলের সাথে। বড়বৌ, বুড়া শাউড়ী খাটি খাটি খুন। দত্তগিন্নী আমাগো ডাকি কইল, 'হারাণি মা, দেখিছিস্ ছোটবৌর ব্যাভারখানা? নাতির আশায় আমি বড়বৌরে দাগা দিয়া ব্যাটারে ভজায়ে ভজায়ে আঁটকুড়ির বিটিরে 'খাল কাটি কুমীর' আনিছিলাম। ও না করে ঘরের কাজ, না থাকে সোয়ামীর কাছে। খাই-দাই পক্ষী হইয়া সাজি সাজি ঘুরে বেড়ায় নাগরের খোঁজে। বড়বৌর কাছে দোষ করিছিলাম—সে এহন আমাগো ছাড়ি কথা কয় না। তোরা আশীর্ব্বাদ কর্ বড়বৌর কোলে কার্ত্তিক ঠাকুর ছাওয়াল হইয়া আসুক।'

"আমি কইলাম, 'চুবাও মা চুবাও; নোকজনের মধ্যি শুভকর্ম্মে ছেনালের কথা দিয়া কাজ নাই। দেওনওয়ালার মজ্জি হইলে তোমার বড়বৌর কোলেই সোনার চাঁদ আসিবে। মরাশুকান ডালেই ফুল ফুটিবে'।"

সরস্বতীর জপের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছিল। সমাপ্তির কেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট, হরে

রাম হরে আবৃত্তি করিল, "হরে কেষ্ট হরে কেষ্ট কেষ্ট কেষ্ট হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

ঠাকুমা হাতীর মাথায় বসিয়া নিঃশব্দে সাধুপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেছিলেন। রাত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার শয়নের সময় হইয়াছে। তিনি উঠিয়া যাইবার সময় নাক-সমান ঘোমটার ভিতর হইতে একটি তীর নিক্ষেপ করিয়া গেলেন—

"বুড়া যদি করবি বিয়া বুড়ী ধরে কর,
ছুঁড়ি কেনে ছোঁড়া থুয়ে করবে বুড়ার ঘর।"

৯

রাত্রির তরল আবছা অন্ধকার মিলাইয়া যাইতে না যাইতেই ধানভানুনীরা আসিয়া হাজির হইয়াছে। নবান্নের নূতন ধানের চাল করা হইবে। সম্পূর্ণ ধান এখনও মাড়াই হয় নাই। মণ্ডপের আঙ্গিনায়, কাছারি বাড়ীর আঙ্গিনায় আঁটি আঁটি কাটা ধান পাহাড়ের মতন স্তূপ করিয়া 'পালা দিয়া' রাখা হইয়াছে। এখনও গরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া আঁটি-বাঁধা কাটা ধান মাঠ হইতে আসিবার বিরাম নাই।

কর্ত্তা কেবল জমিদারী লইয়া প্রজা ঠেঙ্গাইতেই ভালবাসিতেন না, তাঁহার ক্ষেত-খামারের সখও ছিল অপরিসীম। তাই রায়বাড়ীর শস্যপূর্ণ ক্ষেতের সংখ্যা সংখ্যাতীত।

কয়েকটা দিন ঠাকুমা যেন কেমন নিস্তেজ বিমনা হইয়া ঝিমাইতেছিলেন। ছোট হোক বড় হোক, উৎসবের সূচনায় আজ তিনি সজীব হইয়া উঠিয়াছেন। আসন লইয়াছেন বিনুর শয়ন গৃহের বারান্দার সোপানে।

সামনেই ঢেঁকিশালা—ধানভানুনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে ধুম ধুম। পাড়নের সম্মুখে খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া কামিনীর মা ধান 'আলাইয়া' দিতেছে।

ঠাকুমা কহিলেন, "কয়কুড়ি ধান আনাইছিলি মরাই থেকে রাজেশ্বরী? টুকটাক পূজো-পার্ব্বণ হলেও মাসভরা লেগেই থাকবে। তন্থির চারটে নাটাই বত্ত, চার দিন নুনে আনুনে পিঠা করে দিতে হবে পূজোর। নবান্নের পরেই মূলোষষ্ঠী। যত জনার ষষ্ঠী বত্ত তত জনের নামে নামে নতুন চালের পিঠালি দিয়া কলার পাতায় গরু-বাছুর বানিয়ে দিতে হয়। ফল-মিষ্টির সাথে জোড়ায় জোড়ায় মুলো লাগে। পূজো হ'লে ষষ্ঠীর কথা শুনে ফুল-জল নিয়ে পাতার গরু-বাছুর দিতে হয় বিন্না ঝোপের ঝাড়ে।

"আমার মহেশের নবান্নে কি সোজা চাল লাগবে নাকি রাজেশ্বরী? কতকাল হ'তে তুই দেখছিস, করছিস।

নবান্নের একধামা চাল আধ-ভাঙ্গা করে রাখিস আলাদা। আধ-ভাঙ্গা চাল না হ'লে মাখা নবান্ন মজে না। শুধু কি আধ-ভাঙ্গা চাল! ওর ভেতর মাজা তিল, কোরা নারকেল, ছড়ি ছড়ি কাঁঠালি কলা, নতুন গুড়, ঘি, মধু, কর্পূর, তবে না নবান্ন মাখা। কতগুলো ভোজ্য দিতে হবে। তারপরে ধামাখানেক চালের গুঁড়ো করতে হবে পিঠাপুলির জন্যে। ধান বেশী করে না ভানলে চলবে কেনে?"

কামিনীর মা সাবধানে পাড়নের ধান উল্টাইয়া দিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "কয় কুড়ি ধান মরাই থাকি নামাইয়া দিছে ছোট সরকার আমি তা জানি না। তোমাগো ঘরে কি ধান-পানের দুঃখ আছে মাঠান, না খাওন-দাওনের। এই আগনেই না তোমাগো 'পাটাই' পূজ্যা আছে, পিঠাপুলির বাজার আছে। চাল কমতি হইলে ফের ভানি নিয়ো।"

দুই ধানভানুনী ঢেঁকিতে পাড় দিতে দিতে বলিল, "হ, মাঠান, ধান থাকিলেই চাইল হইব। যখনি খবর দিইবা তহনি আইস্যা কুটি দিইব ধান।"

ঠাকুমা সে কথার জবাব না দিয়া ছড়া কাটিলেন—

'আইল আগুন মাস অন্তরের অভিলাষ
রোদে বসি পিঠাপুলি খাই।
পইথানে আগুন থুয়া, কাঁথার তলায় শুইয়া
আনমনে জাড়ি গান গাই।'

ধানভানুনীরা হাসিয়া অস্থির—"তোমরা বড়নোক মাঠান, জাড়ের কালে নিত্যি পিঠাপুলি খাইবা না ত খাইবে কে? এ বাড়ীত 'বাড়া বানিতে' আইলে কত ভাল ভাল কথা শুনিতে পারি। আমাগো মাঠান হইল কথার রাজা।"

প্রভাতের রৌদ্র লুটাইয়া পড়িয়াছিল বারান্দায়। ঠাকুমা সেখানে আর অবস্থান করিতে পারিলেন না।

কথার রাজা বা রাণী কথিকা চলিলেন 'নাটাই' ব্রতপরায়ণা তরুর উদ্দেশে।

তরু খুবই ব্যস্ত। রায়বাড়ীর ছোট সরকার হেম ঘোষ কলাগাছের ডাঁটা দিয়া নাটাই ঠাকরুণ গড়িবার ওস্তাদ। তরু পূর্ব্বের বলা সত্ত্বেও ইহারই মধ্যে দুইবার তাহাকে তাগিদ দিয়া আসিয়াছে।

ছোট সরকার তরুকে আশ্বাস দিয়াছে—"সাঁঝের আগে ত তুমি পূজা করিবে না দিদি, তখন ঠাকুর পাইলেই হ'ল।"

সেদিকে নিশ্চিন্ত হইয়া তরু অন্যদিকের তদ্বির করিতেছে। আঙ্গিনার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র একটা পুকুর কাটিয়া পুকুরের মাটি দিয়া গাঁথা বেদীতে প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার বিধি। নাটাই দেবীকে কেহ বলে মঙ্গলচণ্ডী, কেহ বলে বনদেবী। যে যাহা বলুক, তরু তাহা লইয়া কখনও মাথা ঘামায় না। দিদিরা কুমারী কালে এই ব্রত পালন করিয়া একের পরে এক বিবাহান্তে শ্বশুরালয় চলিয়া গিয়াছে। এখন পালা পড়িয়াছে তরুর। তরুর কুমারীত্ব ঘুচিয়া গেলে আর কে লইবে পূজার ভার?

তরু এবার কার্য্যরতা ভূমিমালী বৌএর পিছনে ধাওয়া করিল, "ও বৌ, তুমি আমার পুকুর কেটে কখন বেদী গেঁথে দেবে? গোটা উঠোনটা তোমাকে লেপে দিতে হবে।"

"হ, ঠাকুজ্জি, জানা আছে আমাগো। এখন ন্যাপাপোঁছা করি থুইলে কি থাকিবে ভাল? কুত্তা-বিলাই চলাচল করি তলাতল করিবে। আমরা মাগীমদ্দ যে রইচি…'মলমেনের ঠাঁই'। দুপুরে খাওন-নাওনে যাইবার সময় তোমাগো সগল সাইর‍্যা টলটলে করি দিইয়্যা যাইব।"

"বেদীর ওপরে পুকুরের চারদিকে যে আলপনা দিতে হবে বৌ, মাটি ভেজা থাকলে আলপনা হবে না।"

মালীবৌ হাসিয়া বলে, "ম্যায়ার কতা শুনি বাঁচি না। এ টানের দিনে মাটি নাকি ভেজা থাকে? আমি যাই—ধানের জাত কয়্যা দিইয়া আগেভাগে তোমাগো কাজ সারি দেই।"

মালীবৌ চলিয়া যায় ধান মাড়াইবার কাজে।

কৃষাণরা দুই ভাগে ধান মাড়াই করিতেছে। দুই জোড়া বলদ ঘুরিতেছে তাহাদের 'ডাইনে-বাঁয়ে' ইঙ্গিতে চক্রাকারে। আঁটি আঁটি শুষ্ক ধান আঙ্গিনায় বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বলদের পদপিষ্ট হইয়া ধান খড় হইতে বিচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে মৃত্তিকায়। ভূমিমালীরা লম্বা লাঠি দিয়া খড় সরাইয়া কুলার বাতাসে আবর্জ্জনা উড়াইয়া দিতেছে। ভূমিমালী স্ত্রীলোকেরা সারপাউ দিয়া টানিয়া ধান জাত করিয়া রৌদ্রে দিতেছে। দুই-তিন দিন রৌদ্রে থাকিয়া ধান স্থান পাইতেছে সযত্নে মরাইতে। উহাদের পারিশ্রমিক ধান। যে যেমন কাজ করিবে ধানের বরাদ্দ তাহার তেমনি।

ঠাকুমা আসিয়া দাঁড়াইলেন রায়বাড়ীর অন্দর বাহিরের দরজায়। সামনে দুই আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হইতেছে। ধানের আঁটির অর্দ্ধাংশ এখনও পালায়।

ঠাকুমা ক্ষণেক ধান মাড়াই দেখিয়া ধরিলেন জানকী সরকারকে—“ও জানকী, তাড়াতাড়ি মলাই করে ধানগুলো মরাই জাত কর। এবার কাতালী ভাল হয় নাই। দেয়া নাম্‌লে কিন্তু তোমার পাকা ধান হেজে যাবে। সকালে আকাশ ঘোলা ঘোলা দেখেছিলাম।”

জানকী সরকার বিনীত ভাবে উত্তর করিল. “এ শীত নামবে ব’লে ঘোলা ভাব। বৃষ্টি এখন হবে না। ভয় নাই মাঠান্, ক’দিনের মধ্যেই ধান জাত হয়ে মরাইতে উঠবে।”

ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া অগ্রসর হইলেন গোশালার দিকে। প্রকাণ্ড গোশালায় অনেকগুলি গরু থাকে। গোশালার একদিকে বাছুরের পৃথক্ জায়গা।

দিনের বেলা গাভীরা বাহিরের আম-কাঁঠালের বাগানে জাব খায়, বাছুরেরা চরিয়া বেড়ায়। আসন্নপ্রসবা গাভী দু’টিকে ঠাকুমা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন। না, আর দেরি নাই, ‘ওলান’ বড হইয়াছে, বাঁট হইয়াছে চাটিম কলা।

বাগানের পরে রায়বাড়ীর স্নানের পুকুর। দূরে-নিকটে রায়দের আরও পুকুর রহিয়াছে। নদীশূন্য গ্রামবাসীরা সেই সব পুকুর ব্যবহার করে। এ পুকুরে পাড়ার বৌ-ঝিরা স্নান করে। পুরুষ সমাগম নাই। ঘাট জনশূন্য। জল পরিদর্শন করিয়া ঠাকুমা চলিলেন ছোট ভোগের ঘরের সামনে। মনোরমা পানতুয়া ভাজিতেছে। ছোট ঠাকুমা ও বিনু মোটা মোটা লম্বা করিয়া পানতুয়া গড়িয়া দিতেছে। আজ ভোগের রান্না হইবে সংক্ষিপ্ত। এ বেলা তরকারি কুটিতে বসিয়াছে সরস্বতী।

ঠাকুমা বিনুর গৃহের পেছনের বাগান প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিলেন আঙ্গিনায়—তরু তখন চীৎকার করিতেছে—

“গোলাঘরে তিলের জালার আড়ালে ফুলমণিও নাই, চারটে বাচ্চাও নাই। হারাণী, তুমি খুঁজে দেখ কোথায় গেল তারা। কামিনীর মা, আজ কি তোমাদের ঘুম লেগে গেছে, কোথায় গেল ফুলমণি? পাড়ার হুলো বেড়াল এসে বাচ্চাগুলোকে খেতে খেতে ফুলমণিকেও খেয়ে ফেলেছে।”

কামিনীর মা ছুটিয়া আসে, তরুকে সান্ত্বনা দেয়—“অত বড় বুড়া বিলাইভারে

হলো বিলাই কি খাইতে পারে? ফুলমণিই ঘাড়ে কামড় দিইয়া মুখে করি লইয়া থুইচে ষ্যান কোন ঠাঁই। আমি খুঁজি বার করচি।"

কামিনীর মা, হারাণী, অনেক অনুসন্ধানের পরে তরুর হারাধনের সন্ধান পাইল চায়ের ঘরের বেঞ্চির নীচে। 'হারাধনে'র দশটি ছেলের মতন ফুলমণির দুইটি ছেলে অন্তর্দ্ধান। তরু কাঁদিয়া অস্থির।

কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া ঠাকুমা পরম পুলকিত হইলেন। হাতীর আসন হইতে তখন রৌদ্র সরিয়া গিয়াছে। ঠাকুমা স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুখ খুলিলেন, "ভরা দুপুরে কাঁদে না তন্বি, আজ তোর নাটাই পূজোর শুভদিন। চোখের জল ফেলতে হয় না। লালজী-কালজীর ভয়ে হুলো বেড়াল এ বাড়ীর তেসীমায় উঁকি দিতে সাহস পায় না। কুকুর-বেড়ালের মায়েরা ছা খায় একটা করে। একটা খেতে ও দুটো পেটে দিয়েছে। বেড়ালের ছানা বেশি থাকা ভাল না। ওরা মনে মনে বলে, 'গৃহস্থ কানা হোক, আমরা পাতায় বসে দুধে মাছে খাব।' কুকুররা বলে, 'গৃহস্থের বংশ বৃদ্ধি হোক, আমরা আগেপিছে ধাওয়া করি'।"

কামিনীর মা সায় দেয়, "যা কইলে মাঠান, বেশী বিলাই ভাল না। বচ্ছরে তিন-চারবার যাগরে ছা হয় তার নেগে আবার দুঃখু! তোমাগো ফুলমণি 'সেয়ান বিলাই ধরি কিলাই'। দুধের বরণ ছা ও দুইডা থুইয়া কালা কুটকুটে দুইডারে উদরে দিইচে।"

সকলের সান্ত্বনায় তরু শান্ত হইল।

১০

বেলাশেষে আলপনায় বিচিত্র বেদীর উপরে নাটাই প্রতিমা স্থাপিত হইলেন। ছোট সরকার দক্ষ কারিগর। কলাগাছের মোটা ডাঁটা দিয়া অপূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তি গঠন করিয়াছে। দেবী চতুর্ভুজা, করবী ফুলের পাতায় তাঁর জিব হইয়াছে। সেই জিব সিঁদুরে রঞ্জিত হইয়া লকলক করিতেছে। চোখ-নাক আঁকা হইয়াছে কালির আঁচরে। মাথায় ফুলের মুকুট, সর্ব্বাঙ্গে ফুলের গহনা।

বিন্নু আলপনা দিয়াছে। বেদীর উপরে শঙ্খ পদ্ম। জলাশয় বেষ্টন করিয়া কলাগাছ কলমিলতা তরুলতা কুঞ্জলতা ইত্যাদি।

ঠাকুমা বিন্নুর অঙ্কন নিরীক্ষণ করিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ—"আহা কি সোন্দর

আলপনা দিচে মণিমালা, তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। কেউ ডেকে নিয়ে কাজ দেখিয়ে-শুনিয়ে না দিলে নতুন মানুষ করবে ক্যাম্‌নে ? কথায় আছে—

'নাই কইতে যে করে কর্ম্ম তারে কই উত্তম,
কহিলে যে করে কর্ম্ম সে হইল মধ্যম।
কহিলেও যে না করে কর্ম্ম সে হইল অধম।'

মণিবৌ উত্তম না হলেও মধ্যম।"

মায়ের চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ী পরিধান করিয়া পূজারিণী তরু আসনে বসিল। পাশে কুশাসনে হোতা সরস্বতী। পূজা-অর্চ্চনায় তাহার যেমন অনুরাগ তেমন মন্ত্রেতন্ত্রে দখল।

ধূপ দীপ জ্বলিল, পূজার উপকরণ বিনু দেবীর সামনে সাজাইয়া দিল। দুই পাশে রাখা হইল নুনে ও আনুনে পিঠে।

মেনির সহিত সম্প্রতি তরুর 'আড়ি' হইয়াছে। মেনি অনুপস্থিত, সেও পূজা করিতেছে। সেই কারণে বিনুর সহিত তরুর সখ্য গড়িয়া উঠিতেছে।

পূজার মন্ত্র সুরু হইল "নমো বনদুর্গা" বলিয়া। বিনু ভাবে জিব-বারকরা দেবী কালী না হইয়া বনদুর্গা হইল কিরূপে ?

বিবিধ উপাদান, ধূপ দীপ পুষ্পমাল্য ভোগ সমস্তই বনদুর্গার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেওয়া হইল। অনেক দিন পরে ঠাকুমা প্রাণ ভরিয়া উলুধ্বনি দিয়া বাঁচিলেন।

পূজান্তে ব্রতকথা আরম্ভ হইল। গরীব বামুনের দুই মেয়ের বিয়ে হয় না। তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, বিয়ে হবে কি দিয়ে ? মনের দুঃখে মেয়েরা একদিন বনের ধারে সরোবরে ডুবে মরতে গেল।

বনের ধারে ছিল কাঠুরেদের বাড়ী। সেখানে তাদের মেয়েরা নাটাই মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করছিল। কুমারী বামুনের মেয়ে দেখে তারা আদর করে ডেকে নিলে পূজোয় যোগ দিতে। পূজা করে ব্রতকথা শুনে প্রসাদ খেয়ে তারা ঘরে ফিরল। পরের দিন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্র এসে তাদের বিয়ে করে নিয়ে গেল রাজপুরীতে।

কথা সাঙ্গ হইলে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল দেবীকে। ঠাকুমা আবার উলু দিয়া রায়বাড়ী মুখর করিয়া তুলিলেন।

কোন্‌টা নুন দেওয়া, কোন্‌টা আনুনে সেটা ব্রতচারিণীকে না জানাইয়া

দেবীর ডাইনে বামে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসনে বসিয়াই পূজারিণীকে সর্ব্বাগ্রে পিঠা প্রসাদ মুখে দিতে হয়।

তরু পিঠা মুখে দিয়া কহিল "আলুনে"। না, এ বছরেও তরুর বিবাহের ফুল ফুটিবে না। নুনে পিঠা খাইলে কুমারীর বিবাহের ফুল ফোটে।

তরু ও বিনু ছোট ছোট কলার পাতায় প্রসাদ ভাগ-বণ্টন করিয়া বাড়ীর দাসদাসী হইতে সকলকে বিতরণ করিতে লাগিল।

পানতুয়ার ভারে ঠাকুমাদের পেটে হইয়াছিল স্থানাভাব, তবুও মুখরা নাতনীর ভয়ে তাঁহাদিগকে যৎসামান্য গ্রহণ করিতে হইল। মনোরমা পূর্ব্বেই সরস্বতীর জন্যে শুদ্ধাচারে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। যেখানে-সেখানে বসিয়া যা-তা মুখে দেওয়া তাহার পোষায় না। বৈধব্য তাহাকে দেবতার উর্দ্ধে উচ্চাসন দিয়াছে।

সরস্বতী পূজার জিনিষপত্র গোছাইতে গোছাইতে বলিল, "তোমাদের সে তিন কাঁদি কাঁঠালি কলা এক সাথে পেকে গেল মা? নবান্নে এক কাঁদির বেশি লাগবে না। সেদিন নতুন চালের পিঠের ভেতরে কলার বড়ার হাঙ্গাম করবে কে? কলা দিয়ে পরশু ভোরে উষা মঙ্গলচণ্ডী পূজোটা সারলে হয়? অনেকদিন হয় না, মাসটা ভাল।"

রায়বাড়ীর কাহারও কোন কথা ঠাকুমার কান এড়াইতে পারে না। কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার বোধ না করিলেও তিনি সর্ব্বদা বলিতে উন্মুখ হইয়া থাকেন।

সরস্বতীর কথা শেষ হওয়ামাত্র ঠাকুমা বলিয়া ওঠেন, "তাই করিস্, সরি, কাল সকল দেব্যজাত গোচ করে রাখিস্। এক বাটি তেল, মারা সিঁদুর পান-সুপারি কলা-বাতাসা এই হ'লেই উষা মঙ্গলচণ্ডী হয়ে যায়। রাত পোয়ালে লক্ষ্মীর কড়ির ঝাঁপি থেকে মঙ্গলচণ্ডীর শিলটা বের করে ধুয়ে-মুছে রেখে দিতে হবে। পূজো হয়ে গেলে তিন দিন সিঁদুর চন্দনমাখা শিলকে রেখে দিতে হয় বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের ওপরে। তার পরে আবার তিনি লক্ষ্মীর কড়ির ভেতরে থাকবেন। দেখ্ সরি, মনে করে ত্রিদল বেলপাতা দুর্ব্বোর অর্ঘ্য সাজাতে নতুন চাল দিস্ দুটো, আর নতুন চালের নৈবিদ্যি। তেমাথায় পূজো করতে হয়। তা তোদের বাড়ীর মধ্যে এঘর-ওঘর যাবার কত তেমাথা পথ রয়েছে। যেখানে পূজো হবে সেখানটা রাতে ভাল করে গোবর দিয়ে লেপিয়ে রাখিস্। উষাকালে পূজো, সূয্যি ঠাকুর ওঠবার আগে।"

ঠাকুমার বাক্যস্রোত থামিলে ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "অত কলা পেকেছে, তার ক'টাই বা যাবে মঙ্গলচণ্ডী পূজোয়, এয়োদের ডেকে তাদের কপালে তেল-সিঁদুর দিয়ে আঁচলে পান সুপারি কলা বাতাসা দিলেও কলা থাকবে ঢের। পাড়ায় আর এয়ো ক'টা।"

ঠাকুমা বলিলেন, "তোমার কথায় বাঁচি না ছোটবৌ। 'দেওনওলার কাছে আবার খাওনওয়ালা—'। ঝি-চাকরদের তিন-চারটে করে দিয়ে দিস্, তারা প্রাণভরে খাবে। আমার মহেশের বাগানের কলা। আর এক কাঁদিতে পাক ধরেছে, সেটা পাড়ার সকল বাড়ী বাড়ী পাঠালেই হবে।"

ঠাকুমা পাকা কলার ব্যবস্থা করিয়া সরিয়া গেলেন। বিনু প্রসাদ খাইতে বসিয়া ভাবে, "বাবা, কি বাড়ী! এক পূজোর আসনে বসিয়াই আর এক পূজোর ব্যবস্থা। লোকে যে বলে, 'কাজ নাই কাঁথা সেলাই'। ইহাদেরও সেই দশা।"

আবার শেষরাত হইতে সেই ধুম ধুম ঢেঁকির পাড়। নবান্নের চাল কম পড়িবার আশঙ্কায় বেশি বেশি ধান ভানাইয়া রাখিতে হইতেছে। এই চালের কতক গুঁড়া কুটিতে হইবে পিঠার জন্য। গুঁড়া হইবে দুই ভাগে—একটা নিয়মের, একটা অনিয়মের। অনিয়মের জন্য চিন্তা নাই—সেটা হয় কামিনীর মা'র তত্ত্বাবধানে। নিয়ম লইয়াই মুশকিল, মণিরাম কণিরাম উৎকলবাসী দুই ভাই, দরকার হইলে ঢেঁকির ওপরে উঠিয়া ঢেঁকুস ঢেঁকুস করিতে আপত্তি করে না। তাহাদের পেটে খাইয়া পিঠে সহিতেছে। সহৃদয় মনিবের কৃপায় তাহারা দেশে একটার পরে একটা ধানের জমি করিয়াছে। পাকা ঘর করিয়াছে।

ঠাকুমার চিন্তা, চালের গুঁড়া কে পাড়নের ভিতরে হাত দিয়া উল্টাইয়া দিবে, চালনায় ছাঁকিয়া লইবে।

মনে পড়িতেছে ভানুমতীকে। "ছাই ফেলার সময় ভাঙ্গা কুলার আদর।"

ঠাকুমা নাতনীদের ভালবাসেন না। মেয়েদের ধরণ "খাই দাই পাখীটি বনের দিকে আঁখিটি।" কেবল ঝোল টানা নিজেদের দিকে। খাইয়া-দাইয়া লইয়া-থুইয়া 'পগার পার'। কিন্তু কাজের সময় ভানুমতীকেই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। একজনাই একশ'। তাহার চোপা নাড়ায় রায়বাড়ী থরথর কম্পিত হইলেও 'যে গরু দুধ দেয় তাহার চাঁট' সহিতেই হয়।

ঠাকুমা বিমনা হইয়া নিয়মের চালের গুঁড়া লইয়া চিন্তা করিতেছিলেন,

এমন সময় বাহির মহল হইতে তরু খবর আনিল, গত রাতে কালজীর চারটা ছানা হইয়াছে খড়ের গাদায়। তখনই ঠাকুমাকে উঠিতে হইল শাবকগুলির তত্ত্বাবধানে।

পথে হারাণী জিজ্ঞাসা করিল, "মাঠান, কুত্তার ছাও দেখিতে যাইছেন নাকি?"

সকালবেলা হইতে ঠাকুমা কথা বলিবার তেমন সুযোগ পান নাই। এখন মুখর হইলেন, "যাই, দেখে আসি বাচ্চাগুলোর কি গতি হইবে? 'যে কাজে যায় না শিবা সে কাজের সুসার কিবা'। গরু-বাছুর দিলে লাভ হয়, তা না কুকুর-বেড়ালের ছানায় বাড়ী-ঘর ভরে ফেলছে। কেষ্টের জীব, একবার গিয়ে দেখতে হয়। দেখ হারাণি, কাল দিনটা ভালই ছিল না? নাটাই বর্ত্ত হ'ল। ভোরে তরু নাটাই ঠাকুর পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েই না খবর এনেছে।"

হারাণী সায় দিল, "হ, মাঠান, দিন ভালই ছেল, কিন্তুক্ এ কি মানুষের ছাওয়াল-ম্যায়া, দিনক্ষণ দেখন নাগবে? কুত্তা-বিলাই মিতালি করি বিয়েন দিচে, ওয়ারো চারডা, এয়ারো চারডা।"

'দেখ্ হারাণি, চোখ দিস্‌নে, চোখে বিষ থাকে। ফুলমণির দুটো ত চোখেই গেচে। ওর চারটে এখন থাকলে হয়। সকলেই কেষ্টের জীব—'যত জীব তত শিব'।" বলিয়া ঠাকুমা রওনা হইলেন গোশালার দিকে। গোশালার পশ্চাতে গরুর প্রধান খাদ্য মস্ত দুইটি খড়ের পালা। দুই পালার সঙ্কীর্ণ ফাঁকে কালজীর বাচ্চা হইয়াছে।

দিব্যসুন্দর হৃষ্টপুষ্ট শাবক কয়েকটিকে বুকের নিকটে লইয়া কালজী শুইয়া আছে।

ঠাকুমাকে দেখিয়া কালজী লেজ নাড়িতে লাগিল, অনুচ্চ স্বরে বার কতক ভেউ ভেউ করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল।

কুকুর-পর্ব্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঠাকুমা অন্তঃপুরে ঢুকিলেন। ধানভানুনীরা নবান্নের চাল প্রস্তুত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। চাল উঠিয়াছে ভাঁড়ারে।

আজ তরু বিনুর সহিত স্নান করিয়া পূবের বারান্দায় কাপড় ছাড়িতেছিল—ঠাকুমা সেইখানে থমকিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাত পোয়াতে না পোয়াতে যে তোদের উষা মঙ্গলচণ্ডী, তার ত যোগাড় দেখচি না লো তন্নি? আজ গুছিয়ে-গাছিয়ে না রাখলে শেষ রাতে উঠে লাগবে হুলুস্থূল ব্যাপার। আগের কাজ ভাল, পিছের কাজ ভাল না।"

তরু বিরক্ত হইল, "সারাদিন তোমার 'আবোল-তাবোল' ঠাকুমা, কাল সকালে তোমার মঙ্গলচণ্ডী, এখনই তার যোগাড় করতে হবে। এবাড়ীতে নিত্যি যেন লেগে থাকে ঘটা-পটা।"

"ভাল কাজে নজর দিতে হয় না তন্বি। মহেশ আমার বেঁচে বর্ত্তে থাকুক, পূজো আচ্চা লেগে থাকুক, গরীব-দুঃখীরা পেট পুরে পাতা পেতে পেসাদ পেয়ে বাঁচুক। 'নিজের বেলায় আঁটি সাঁটি, পরের বেলায় দাঁত কপাটি'। তুই নাটাই পূজো করলি কেন? তুই সায়েব বিয়ে করে বিবি হয়ে হিন্দুর গাঁওয়ালি পার্ব্বণ উঠিয়ে দিস। এতেই এই, এখনও ত মাঘ মাস আসে নি।"

বিনু সভয়ে প্রশ্ন করে, "মাঘ মাসে এখানে কি হয় ঠাকুমা?"

"মাঘে মাধবীলতা মথুরায় গমন
দশদিক্ অন্ধকার শূন্য বৃন্দাবন।"

ঠাকুমা বিনুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ছড়া কাটিতে কাটিতে চলিয়া গেলেন অন্যদিকে!

মেনি তাহার মা'র সঙ্গে ঘাটে যাইতেছিল স্নান করিতে, তাহাদের পুকুর নাই। এই পুকুরেই ঘাটের কাজ সারে। তরু ভেজা কাপড় ছাড়িয়া বারান্দার নীচে দাঁড়াইয়া ছিল। তরুর সহিত চোখাচোখি হইবামাত্র চোখ ফিরাইয়া লইল। মেনি হাসিভরা মুখে তরুর সন্নিকটে আগাইয়া ডাকিল, "তরু, টু, আড়ি নয় ভাব, ডাব নয় ভাব।"

আর তরুকে আটকায় কে? চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, গলায় কল কল।

তরু মেনির বাহু ধারণ করিয়া চলিল ঘাটে। সেদিকে তাকাইয়া বিনু খুশী হইতে পারিল না। আড়ির কল্যাণে বিনু কয়েকটা দিন তরুর সহচরী না হইয়াও সাহচর্য্য পাইয়াছে। সব কাজে তরু সহযোগিতা করিয়াছে। ফুরাইয়া গেল সে সুখ। বনের পাখী বনে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে।"

১১

ঠাকুমাকে সকলে সাবধান করিয়া দিয়াছিল, তিনি যেন 'গারসী' পূজার মতন রাত একটার সময় সকলের দরজায় করাঘাত না করেন। তা ঠাকুমা এবার কথা রাখিয়াছেন। আকাশের আলো ও শুকতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি রাত্রি পাঁচ ঘটিকার সময় সকলকে জাগাইয়া দিলেন। দাসদাসী হইতে ছেলেমেয়ে কেউ বাদ গেল না।

তেমাথায় উষা মঙ্গলচণ্ডী পূজা করিবার বিধি। রায়বাড়ীর অন্দরে তেমাথার অভাব নাই। এঘর হইতে ওঘর, ওঘর হইতে সেঘর।

ভোগশালা, কর্ম্মশালা ও কাষ্ঠশালার মধ্যের স্থানটা কামিনীর মা গোবর দিয়া লেপিয়া রাখিয়াছিল। যার এক পাশে একটা ঝাঁকরা সপেটা ফলের গাছ ফলভারে অবনত। অন্য পাশে কাগজি লেবুর গাছ। বারমাস লেবু ফলে।

ব্রতী সরস্বতী, অব্রতীরাও বসিয়া গেল ভিড় করিয়া। কালো মসৃণ একখানা লম্বাকৃতি শিলা হইলেন উষা মঙ্গলচণ্ডী। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে উষাকালে ইহার আরাধনা হয় বলিয়া নাম হইয়াছে 'উষা মঙ্গলচণ্ডী'। সোমবারের বিদায়ক্ষণে মঙ্গলের সূচনায় ইনি শুভাগমন করেন মর্ত্ত্যে।

ত্রিদল বিল্বপত্রে দেবী সমাসীন হইলেন। স্নানান্তে অর্ঘ্যপাদ্য ফল ফুল গ্রহণ করিলেন। ধূপ দীপ কিছুরই ত্রুটি হইল না। ঠাকুমা বসন্তের কোকিলের অনুরূপ পঞ্চম স্বরে উলু দিয়া পাড়া সজাগ করিয়া তুলিলেন।

পূজাশেষে ব্রতকথা আরম্ভ হইল। এবার কাঠুরিয়া নহে, সদাগরের কাহিনী।—

সওদাগর শ্বেতদ্বীপে বাণিজ্যে যাইতেছে। সাতডিঙ্গা মধুকর সুসজ্জিত। অনুকূল পবনে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়া সওদাগর উপস্থিত হইল শ্বেতদ্বীপে।

শ্বেতদ্বীপের রাজ্যে যাহা নাই, তাহাই বিনিময় হয় সেই দেশে। জিরার বদলে হীরা, মুক্তার বদলে সুক্তা (পাট পাতা), শঙ্খের বদলে বঙ্গ, হরিদ্রার বদলে সোনা ইত্যাদি বিনিময় করিয়া সওদাগর সাতডিঙ্গা মধুকর মণি-মাণিক্যে, হীরা মুক্তা সোনায় বোঝাই করিয়া প্রভাতে রওনা হইল দেশে। তেমাথা পথে ঘটিল বিভ্রাট। গোয়ালার মেয়েরা উষা মঙ্গলচণ্ডী পূজা করিতেছিল। সওদাগরকে যাইতে দেখিয়া ডাকিয়া কহিল, 'বিদেশী, মঙ্গলচণ্ডীকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া যাও।'

পাষাণ শিলার দিকে তাকাইয়া সওদাগর বিদ্রূপের হাসি হাসিল। প্রণাম করিল না, প্রসাদ লইল না।

মা মঙ্গলচণ্ডী কুপিত হইলেন। তখনই ছুটিয়া আসিল শ্বেতদ্বীপের পেয়াদা পাইক। রাজ-ভাণ্ডারে চুরি হইয়াছে। সে চোর সওদাগর। তাহাকে কারাগারে বন্দী করা হইল। সাতডিঙ্গা মধুকর আটক করিয়া রাখা হইল।

দিনের পরে দিন যায়, বছরের পরে বছর। দেখিতে দেখিতে বারো বছর কাটিয়া গেল। এদিকে সওদাগরের বৌ কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইবার উপক্রম।

পাড়ায় ছিলেন এক দয়াবতী ব্রাহ্মণী। তিনি দয়াপরবশ হইয়া বৌকে দিয়া ঊষা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত উদ্‌যাপন করাইলেন।

মা প্রসন্ন হইয়া রাজাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, 'আমি ঊষা মঙ্গলচণ্ডী, আমার পরম ভক্ত সওদাগর। তাহাকে সসম্মানে মুক্ত করিয়া ধনে-রত্নে সাতডিঙ্গা মধুকর ভরিয়া দেশে পাঠাইয়া দে। না দিলে তোর সর্ব্বনাশ সাধন করিব।'

রাজা সভয়ে আদেশ পালন করিলেন। সওদাগর জয়ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

স্ত্রীর নিকটে ঊষা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতের মহিমা শুনিয়া সোনার মঙ্গলচণ্ডী প্রস্তুত করাইয়া নিত্য পূজার ব্যবস্থা করিল।

"ঊষা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত করিলে কি হয়? দরিদ্রের ধন হয়। পুত্রহীন পুত্র পায়। বন্দী মুক্ত হয়। বিপদ্-আপদ্ দূর হইয়া যায়।"

প্রত্যেকে এক একটা ফুল হস্তে ভক্তিভরে ব্রতকথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে দেবীর মস্তকে পুষ্প অর্পণ করিয়া প্রণাম করিল। ঠাকুমা উলু দিতে লাগিলেন।

ক্ষিতিকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, পূজা সাঙ্গ হইলে ফুল বেলপাতা সমেত দেবীকে মাথায় লইয়া দৌড়িয়া গিয়া রাখিয়া দিতে হইবে বড ঘরের লোহার সিন্দুকের উপরে।

ক্ষিতি চিলের মতন ছোঁ দিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

সুমন্ত কাঁদিয়া অস্থির, "ফুলদা ঠাকুর নিলে, আমাকে দিলে না।"

মা ছেলেকে শান্ত করিলেন, "ঠাকুর নিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে হয়। তুমি পারতে না, ফেলে দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে। তুমি আর একটু বড় হ'লে ঠাকুর নেবে। ফুলদা নেবে না।"

সুমন্ত শান্ত হইল। আকাশের পূর্ব্ব প্রান্ত তখন ঊষা-অরুণের সম্মিলনে লালে লাল।

বেলা হইলে পাড়ার সধবা মেয়েদের ডাকা হইল। তাঁহারা একের পর এক আসিয়া মাথাভরা তেল, কপালভরা সিঁদুর ও আঁচল ভরিয়া পান সুপারি বাতাসা কলা লইয়া চলিয়া গেলেন। তখন কাহারও গাল-গল্প করিবার অবকাশ হইল না। সকালে রাজ্যের কাজ পড়িয়া ছিল।

১২

কামিনীর মা ডালায় করিয়া কতকগুলি সুপারি কাটিতে বসিয়াছিল। রায়বাড়ীর পানের ভার তাহার উপরে। সকলকে মুখে মুখে পান যোগাইতে হয়।

ঠাকুমা তাহার কাছে বসিয়া কহিলেন, "সুপারি নিয়ে বসেছিস্ রাজেশ্বরী? কয় কুড়ি পান বানাইবি কয় কুড়ি সুপারি কেটে?"

রাজেশ্বরী বলে, "গুনিগাঁথি করি না মাঠান, ভাগে ভাগে পান বানায়ে বিড়িদানিতে রাখি দেই। যার যখন খাওনের ইচ্ছা যায়। গুয়াও গুনি কাটি না। কাটিকুটি কৌটা ভরি থুয়ে দেই।"

পান-সুপারির উল্লেখ ঠাকুমার গৌরচন্দ্রিকা। আসল কথায় আসিলেন এবার। "শোন্ লো রাজেশ্বরী, নতুন গুড়ের তিলের নাড়ুর তিল ত মাজলি না নবান্নের জন্যে? তিলের নাড়ুর আবার নানান ল্যাঠা। শনি-মঙ্গলবারে রবিবারে বৃহস্পতিবারে তিল মাজতে, নাড়ু করতে হয় না।"

কামিনীর মা কচ্‌কচ্ করিয়া সুপারি কুচাইতে কুচাইতে জবাব দেয়, "তিল মাজন, তিল ধোওন ত হইয়া গিইচে মাঠান। কাল বুধবারে নাড়ু পাকান হইবে।"

ঠাকুমা ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার অগোচরে কোন্‌দিন এত বড় কাজ সমাধা করা হইয়াছে? তখন তিনি কোথায় ছিলেন? যাহা হইবার হইয়াছে, যাহা বাকী আছে তাহাই লইয়া তাঁহার গবেষণা সুরু হইল—"নবান্ন যে এসে গেল রাজেশ্বরী, নারকেল ছাড়াতে দিচ্ছে না কেনে? নবান্নেও পাঁচটা দেব্য করে দেব-দেবী, পূর্ব্বপুরুষকে দিতে হয়। সে কম নয়, দেবপক্ষ দেবীপক্ষ পিতৃকুল মাতৃকুল গুরুকুল সকলকার নামে নামে নিবেদন। নামে নামে ভোজ্য। আমার মহেশ নতুন চাল নতুন গুড় মুখে দেবে। ধোপা নাপিত কামার কুমোর ছুতোর ভূমিমালী গাঁয়ের বামুন বোষ্টম কারোকে কি বাদ দিতে পারে? তা নারকেলের তক্তি-নাড়ু ঢের লাগবে। কয় কুড়ি নাড়কেল ছাড়িয়ে দিতে হুকুম দিচে কর্ত্রীরা শুনেছিস্?"

"না, কয় কুড়ি ছুলিবে শুনি নাই। যারা ছুলিতে কইচে তাগরে বরাদ্দ রইচে মাঠান। তোমাগো বাড়ীতে নিত্যি পরব, 'কত ধানে কত চাল' ওয়াগরে জানা হইয়া গিইচে।"

"হ'লেই ভাল, তা হ'লে আমার আর গলা ফাটাতে হয় না। চালের গুঁড়োর কি হবে রাজেশ্বরী? তোদের এদিকেও না চাল কুটতে হবে?"

"আমাগরে অল্পসল্প, কুটে খোব একদিন। আপুনিগরে ওদিকেই ত আসল ব্যাভার। নারাণ ঠাকুরের ভোগরাগ, আপুনিগরে তিন বিধবার খাওন-দাওন। পিঠা-পরমান্ন ত ওইদিকে হইয়া থাকে। কাঁচা বয়সের ম্যায়ার ওই দশা হইচে, মা'র পরাণে সয় না। যা ভাল দেব্য, মা আপন হাতে ভোগের ঘরেই বানায়ে দেয়। মণিরাম ঠাকুররাই তুই ভাই খাওন-দাওনের পরে গুঁড়া করি ছাঁকি দিবি কইছে। কর্ত্তার থনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা মারিচে 'মুখ দেখি কি'? 'যেমতি দেওন তেমতি করণ' না করিলে চলিবে ক্যানে?"

সরস্বতী বারান্দায় বাহির হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে ঠাকুমার দিকে তাকাইল। দাস-দাসীর সহিত ঠাকুমার আলাপ-আলোচনা তাহার অসহ্য। ঠাকুমার তাহাতে বিরতি নাই।

নাতনীর সহিত চোখোচোখি হওয়ামাত্র ঠাকুমা উঠিলেন। বলিতে বলিতে চলিতে লাগিলেন "পোড়া কপাল পুড়ে গেছে, ফুলের মালি মরে গেছে।"

ভরাত্বপুর, ভোগ রান্না প্রায় হইয়াছে। রন্ধনশালায় সমস্ত প্রস্তুত। হারাণী খাবার জায়গা করিতেছে। রায়বাড়ীর বিরাট্ রান্নাঘর। মাঝখানে "জলপিঁড়ি" গাঁথিয়া রান্নার স্থান ভাগ করা। "জলপিঁড়ি" মানে অনুচ্চ চওড়া একটা দেয়াল গাঁথা। উপরে সারি সারি পাঁচটা জলের কলসী বসে। তুই দিকে অনেকগুলি কুলুঙ্গি। রান্নার দিকে রান্নার তেল-মশলা সরঞ্জাম থাকে। খাবার দিকে নুন ঘি আচার ইত্যাদি। খাবার পূর্ব্বে ঘর মুছিয়া পাতা হয় বড় বড় সেগুন কাঠের পিঁড়ি। পিঁড়ির বাঁদিকে মস্ত মস্ত কাঁসার ঝকঝকে ঘটিতে মাটির কলসীতে রাখা কর্পূর স্থবাসিত জল ভরিয়া কাঁসার গেলাসে ঢাকিয়া রাখা হয়। উহার নাম 'খাবার ঠাঁই করা'।

বিনু তাহার গৃহে পূবের দরজায় ছোট্ট মাছুরে খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিয়াছে। তাহার পিছনে একফালি রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে। এ সময় রৌদ্র গায়ে লাগিলে বড় মিঠা বোধ হয়। সুদূর দেশ হইতে শীত এখনও আসিয়া জমিতে পারে নাই, কিন্তু শীতল বাতাস তাহার আসন্ন আগমন-বার্ত্তা বহিয়া আনিতেছে।

নিয়মের কাজ আজ বিশেষ কিছু ছিল না। কাল হইতে আরম্ভ হইবে নবান্নের সমারোহ।

সকলে ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে বিনু পালাইয়া আসিয়াছে। বিধবারা আহারে বসিলে বিনুকে সেখানে উপস্থিত থাকিতে হইবে। খাবার জায়গা

করিয়া লবণ ঘৃত দই দুধের বাটি সমস্ত পাতার গোড়ায় আগাইয়া দিতে হইবে। খাওয়া হইলে বাসন আঙ্গিনায় নামাইয়া দিয়া গোবরজলে ঘর ধুইয়া দিতে হইবে।

বাড়ীর নূতন বধূর এটা অবশ্যকরণীয়। কামিনীর মা শিখাইয়া দিয়াছে। পাথরকুচি গ্রামের গৌরব ও ব্রজেশ্বরীর শিক্ষার গৌরব কামিনীর মা নষ্ট করিতে পারে না, তাই তাহার এত প্রয়াস।

বিনু হাতের লেখা লিখিতে তেমন ব্যস্ত নহে। প্রসাদের চিঠি আজই হয়ত আসিবে। রাতেই তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে। সে ১, ২ নম্বর দিয়া অনেকগুলি খাতা দিয়া গিয়াছে বিনুকে। তাহার চিঠি মানে, কয় নম্বরের খাতার কত পাতা লেখা হইয়াছে তাহার বিশদ বিবরণ জানাইতে হইবে। নহিলে বিনুর দায় পড়িয়াছে খাতার পাতা ভরাইতে।

বিনু প্রসাদকে মিছে কথা লিখিতে পারে না।

বিবাহের পূর্ব্বে সে তাহাদের ওইখানেই 'দক্ষযজ্ঞ' যাত্রা গান শুনিয়াছিল, পতিনিন্দা শুনিয়া সতীর দেহত্যাগ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। মনে হইলে দুই চোখ জলে ভরিয়া যায়। 'পতি পরম গুরু', তাঁহার সহিত ছলনা প্রতারণা করিতে নাই। কিন্তু স্বামীর প্রতি রাগ করিতে দোষ কি? উনি যেন জানেন না রায়বাড়ীর হালচাল! ইহাদের আচার-বিচার কর্ম্মপদ্ধতি ফাঁকশূন্য, ছিদ্রশূন্য। কর্ম্মের গুহায় প্রবেশ করিলে বাহির হইবার পথ থাকে না। এখান হইতেই বুড়ো মদ্দ হইয়া ভুলিয়া বসিয়াছেন। "যাঁর জন্যে রামের মা, তাঁকে উনি চেনেন না।"

বর্ত্তমানে ক্ষিতির সহযোগিতায় বিনু দুই-একখানা বই পাইতেছে। সেকালে পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের অন্য পুস্তক-পাঠ নিষিদ্ধ ছিল।

পিতার গ্রন্থাগার হইতে ক্ষিতি গোপনে আনিয়া দিয়াছে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকা। 'হিতবাদী', 'বঙ্গবাসী' কত কি পত্র-পত্রিকা আসে বাহির মহলে, অন্তঃপুরে সেসব প্রবেশ করিতে পারে না।

ভারতী খুলিয়া বিনু তাড়াতাড়ি টুকিয়া লইতেছিল খাতায়—

"আজি, শরত তপনে প্রভাতী স্বপনে
কি জানি পরাণ কি যে চায়,
ওই, শেফালির শাখে কি বলিয়া ডাকে,
বিহগ-বিহগী কি যে গায়।

"বৌমা, ওনারা যে খাইতে বসিবে এখন, যাও যাও ভোগের ঘরে। কি নম্বা বসি রইচ? তুলে থুয়ে যাও।"

কামিনী মায়ের তাড়নায় বিনুকে তখনই উঠিতে হইল। শরত তপন খাতায় পাতায় শেষ হইতে পারিল না। মনের মধ্যে ভ্রমরের মত গুঞ্জন করিতে লাগিল—

"কোন ফুলবাসে সুনীল আকাশে
কিসের আবেশে পরাণ ধায়।"

১৩

আকাশে 'কোদালে' মেঘ দেখা দিয়াছে, গত সন্ধ্যায় রক্ত-সন্ধ্যা হইয়াছিল। সূর্য্যদেব অস্তগামী হইলেও আকাশ যদি লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে, তাহাকে রক্তসন্ধ্যা বলা হয়। ঘোলাটে আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া সাদা মেঘকে পল্লীবাসীরা কোদালে মেঘ বলে। ওই রক্তসন্ধ্যা কোদালে মেঘ বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস।

ধানের আঁটি মাড়ানো শেষ হইয়াছে। এখন বাকী রৌদ্রে দিয়া মরাইতে তুলিয়া রাখা। মণ্ডপের আঙ্গিনা, কাছারির আঙ্গিনা, গোলবারান্দার আঙ্গিনায় ধান রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অকুলান হওয়াতে অন্দরের উঠানে মেলিয়া দেওয়া হইয়াছে রাশি রাশি ধান।

ঢেঁকিশালার সামনে স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে চিটা ধান। চিটা গরীব-দুঃখীদের বিলাইয়া দেওয়া হইবে।

গোয়ালের পাশে গাদা গাদা খড়। যাহাদের গাভী আছে তাহারা বাড়তি খড় চাহিয়া লইয়া যাইতেছে।

ধানের আধিক্যে ঠাকুমা পুলকিত। তাঁহার মহেশকে মা লক্ষ্মী কৃপা করিয়াছেন। ঘাটে মাঠে বাটে আসন পাতিয়া বসিয়াছেন। এখন কোদালে মেঘে বর্ষণের আগে ধান সুরক্ষিত হইলে তিনি আরামের নিঃশ্বাস মোচন করিতে পারেন।

মালী-বৌ দুই পায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠানের ধান উল্টাইয়া দিতেছিল। ঠাকুমা একদৃষ্টে ধান নাড়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে আসিয়া বসিল তরু ও মেনী। মেনী তরুর বয়সী, দিব্য ফুটফুটে মেয়েটি।

তরু ভাণ্ডার হইতে কয়েকটা কমলালেবু আপন হাতে লইয়া আসিয়াছে। সকলের অগোচরে। নিজের হাতে ফল মিষ্টি সংগ্রহ না করিলে তরুর খাদ্য মধুর হয় না।

তরু মেনীকে দু'টি কমলালেবু অর্পণ করিয়া নিজে আর দু'টির সদ্ব্যবহার করিতেছিল।

মেনী লেবুর কোয়া মুখে পুরিয়া আব্দার করে—"ঠাকুমা, একটা শাস্তর বল না? কতদিন তোমার শাস্তর শুনি নি।"

ঠাকুমা আনন্দে ডগমগ। কে আবার তাঁহার গা ঘেঁষিয়া চাঁদমুখে শাস্তর শুনিতে চায়?

ঠাকুমা হাসিয়া বলেন, "দিনের বেলা কইলে শাস্তর থাকে না তার বস্তর। দেখ্ লো মেনু, না কইতে কইতে শাস্তর আমি ভুলে গেছি। তন্বিরা যখন ছোট ছিল ডালিমকুমার, কাঠের ঘোড়া, বেঙ্গমা-বেঙ্গমির কত শাস্তর কইছি। এখন মনে নাই।"

তরু বলিল, "ছড়া ত খুব মনে আছে? দিনরাত শুনিয়ে শুনিয়ে সকলের কান ঝালাপালা করে দিলে। বুড়ো বয়েসে তোমার মত ছড়া-পাঁচালি কেউ বলে না।"

ঠাকুমা হাসিয়া জবাব দিলেন—

"রায়বাড়ীতে বাস করি আমি এক বড়াই বুড়ী
আপন মনে হাসি কাঁদি, কাজের সময় মারি তুড়ি।"

তরুরা দুই সখী খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল। ঠাকুমা নাতনীদের হাসিতে যোগ না দিয়া গম্ভীর হইয়া সুরু করিলেন—

"আইলে দেশালি (বিদেশী) বঁধূ কতেক দিবস পরে,
তোমার সোনার ধানে আঙ্গিনা গিয়াছে ভরে।
নগরে নাগর হয়ে কাটালে এতেক কাল
সাপটে (ঝড়ে) উড়িয়া গেছে ঘরের দু'খানা চাল।
শাওনে দেয়ার ডাকে তরাসে মরিয়া যাই,
সরম ঢাকিতে বঁধূ, দোসরা (দুই) বসন নাই।
সকলি হইবে মোর, তুমি যে আসিছ ফিরে,
যাইতে দিব না আর, দিলাম মাথার কিরে।
বিছানো ধানের পরে আঁচল পাতিয়া দেই,
আমার চামর কেশে পদধূলা মুছে নেই।
ভাল করে বোস বঁধূ, বহিছে পবন মিঠা,
পরাণ ভরিয়া খাও খাজুর রসের পিঠা।"

তরু কহিল, "ঠাকুমা, তুমি যে চাষা-বৌএর কথা বললে? ও, আমাদের বৌকে ত কমলালেবু দেওয়া হ'ল না?"

মেনী বলে, "বৌদি যে নারকেল কুরতে বসেছে?"

"হ্যাঁ, নবান্নের ঘটা লেগে গেছে। তুই যা না মেনি, বল্‌গে, 'তরুর পায়ে কাঁটা ফুটেছে, তোমাকে ডাকছে বৌদি।' আমি ডাকলে ওকে বেরোতে দেবে না, তুই ফাঁকি দিয়ে ডেকে আন্।" বলিয়া তরু উঠিয়া বিনুর ঘরে গেল।

ঠাকুমাও চলিয়া গেলেন বাহিরের ধানের তদারকে।

তরুর পায়ে কাঁটা ফুটিয়াছে।

মনোরমা বলিলেন, "দিন-রাত বনবাদাড় একাকার করে দস্যি মেয়ে। বৌমা যাও, ওর পায়ের কাঁটাটা তুলে দিয়ে এস গে। স্থচ-স্থতোর কৌটায় স্থচ আছে। দেশলাইয়ের কাঠি জেলে স্থচ পুড়িয়ে নিয়ে তবে কাঁটা তুলে দিও।"

বিনু নারকেল কোরানো ফেলিয়া মেনীর পিছনে চলিল তরুর পায়ের কাঁটা তুলিতে।

তরুর কাছে উপনীত হইয়া বিনুর চক্ষুস্থির। তরু নিভৃতে বসিয়া মনের স্থখে কমলাবেবু খাইতেছে। দুইটা লেবু বিনুর দিকে তুলিয়া তরু হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন জব্দ হ'ল ওরা বৌদি, আমার পায়ে কাঁটা না ছাই ফুটেছে। কাঁটা ফুটলে আমি তুলতে জানি। নাও, নেবু দুটো চট্ করে খেয়ে ফেল।"

বিস্মিতা বিনু কুণ্ঠায় এতটুকু হইয়া গেল। সবেগে ঘাড় দুলাইল, "না তরু, আমি খাব না, তোমরা খাও। মা আমাকে দেবেন। ওঁরা টের পেলে—"

তরু ধমক দিল, "কাল বেড়ার হাট থেকে ঝাঁকা ভরে নেবু এনেছে। গোণা-গাঁথা কিছু নেই। টের পাবে কে? ওঁদের যখন ফুরসৎ হবে তখন দেবেন হাতে হাতে। আমি খাবার জিনিষের প্রত্যাশায় বসে থাকতে পারি না। তুমি এত ভয়কাতুরে কেন বৌদি? ভয়ে সারা হয়ে থাক। এত ভয় ভাল নয়, ভীত স্বভাব হয়ে যায়। নাও ছাড়িয়ে খেয়ে ফেল। আমরা অনেকগুলো খেয়েছি।"

মেনী বলে "খাও না কেন বৌদি? আমার বৌদি খুব ভাল, আমি যা বলি তাই শোনে।"

ইহাদের নিকটে ভাল হইবার প্রলোভনে বিনু আর আপত্তি করিতে পারিল না।

লেবু নিঃশেষ হইলে মেনী তাহার লাল শালুর থলিটা খুলিল। মেনী কড়ি খেলিতে খুব ভালবাসে। কতকগুলি ছোট-বড় কড়ি ও ছক-কাটার একখণ্ড খড়িমাটি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

ক্ষিপ্র হস্তে খড়ি দিয়া ছক আঁকিয়া মেনী ছক্কা-পাঞ্জার গুটি সাজায়।

তরু বলে, "এক পাট্টি খেলে যাও বৌদি।"

"খেলতে বস্‌লে দেরি হবে তরু, অনেক কাজ রয়েছে ওখানে। সবগুলো নারকেল এখনও কোরানো হয় নি।"

"রেখে দাও তোমার নারকেল, যারা রয়েছে ঘর হেঁতে তারাই করুক গে।" বলিয়া তরু বড় বড় পাঁচটা কড়ি লইয়া দান ফেলিল। "ছক্কা, জোড়া ছক্কা, এইবার পাঞ্জা। পাঞ্জার পরে পোয়া।"

তরুর এক দানেই দুই গুটি বাহির হইয়া একটা পাকিয়া ঘরে উঠিল। তরুর পরে মেনী, তাহার পরে বিনু।

দুই পাকা কড়ি-খেলুনির নিকটে বিনু হারিয়া গেল। কোন্ কাজে কবেই বা জিতিতে পারিয়াছে। তাহার হার পদে পদে।

নূতন গুড় সংযোগে তিলের নাড়ুর সুগন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। বিনু ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আমি যাই, নাড়ু পাকাতে হবে।"

মেনী তাহার হাত চাপিয়া ধরে, "আর একদান খেলে যাও বৌদি। না, তোমার দেরি হবে না। দেরি হবে বলেই না দশ-পঁচিশের কোট আঁকি নি। ছক্কা-পাঞ্জা খেলা এক ফুঁয়ে শেষ।"

এক ফুঁয়ে শেষ হইবার পূর্ব্বেই কামিনীর মা উপস্থিত। "একি বৌমা? তিলের নাড়ুর চার নামিছে। তোমাগো খুঁজি হয়রান, তুমি বসি গেইচ—এই নয়া বৌমানুষের একি কাণ্ড? ছিঃ ছিঃ, নজ্জা নজ্জা।"

কড়ির কোটে কড়ি বসিয়া রহিল, বিনু ছুটিল কর্ম্মশালায়।

পাথরের তেলমাখা প্রকাণ্ড থালায় তিলের স্তূপ নামিয়াছে। ছোট ঠাকুমা, সরস্বতী, মনোরমা নাড়ু পাকাইতেছেন।

বিনু এক ঘটি জল হাতে-পায়ে ঢালিয়া ঘরে ঢুকিতেই মনোরমা কহিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? পায়ের কাঁটা তুলতেই কি এত সময় লাগে? ঘরে যে গিয়েছিলে, বিছানা ছুঁয়ে ত আসনি?"

সরস্বতী রুক্ষস্বরে বলিল, "বিছানা ছোঁয়া, কড়ির খট্ খট্ শব্দ শোন নি? হাড় বাজিয়ে আসা হ'ল নিয়মের কাজে। হাড় ছুঁলে নাইতে হয়।"

ছোট ঠাকুমা কহিলেন, "কাপড় ছেড়ে আসুক, এদিকে যে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। নাড়ু পাকানর হাত চাই।"

মনোরমা গম্ভীর হইয়া আদেশ করিলেন, "বারান্দায় আমার গরদ রয়েছে, তাড়াতাড়ি ওসব ছেড়ে সেইটে পরে এস। একটু গঙ্গাজল মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছি।"

১৪

নাড়ু পাকাইতে পাকাইতে বিনু ভাবে, অগ্রহায়ণ মাসের দিনগুলি কি দীর্ঘ, দুই হাতে ঠেলিয়া দিলেও তাহারা যাইতে চাহে না। কবে প্রাণান্তকর নবান্ন শেষ হইবে।

তাহার পরের দিন। দিন যায়, বিনুর নিকটে দিন দীর্ঘ হইলেও অগ্রহায়ণের স্বল্পায়ু দিবা দেখিতে দেখিতে বিলীন হয়।

নবান্নের পূর্ব্ব দিন শিশির-সিক্ত প্রভাতে রায়বাড়ী সচকিত হইল। গত রাত্রে খড়ের গাদার ফাঁক হইতে কালজীর দুইটি ছানা শেয়ালে লইয়া গিয়াছে। 'বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।' যে কুকুরদের প্রচণ্ড প্রতাপে কাকপক্ষী রায়বাড়ীতে 'নাক গলাইতে' সাহস পায় না, তাহাদের সন্তান অপহরণ!

সকলে অনুমান করিতে লাগিল, সুচতুর শৃগালরা দল বাঁধিয়া আসিয়াছিল। একদল পুকুড়পাড়ে হুক্কা-হুয়া জিগির তোলায় লালজী গিয়াছিল সেই দিকে শেয়াল তাড়াইতে। আর একদল মণ্ডপের কাছে শব্দ করায় কালজী সন্তান ফেলিয়া কর্ত্তব্য-কাজে রত হইয়াছিল, সেই সুযোগে শেয়াল দুই বাচ্চাকে মুখে করিয়া বাঁশবনে ভোজের আয়োজন করিয়াছিল। আরও কয়েকবার কুকুর-শাবকদের এইরূপ পরিণতি হইয়াছে। যাহারা পরের কাজে ব্যস্ত, তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে! পশু আর কাহাকে বলে? বুদ্ধির দোষে পশু, বুদ্ধির গুণে মানুষ।

নবীন চাকর ভিতরে বিছানা রৌদ্রে দিতে আসিয়াছিল। ঠাকুমা তাহাকে লইয়া পড়িলেন, "দেখ্ নবনে, তোরে একটা কথা কই, তুই ছাওয়াল বয়েসে এবাড়ী এইছিলি, এখন তোর যুবা বয়েস হইচে। তোর মতন আর কারোর এত টান নাই, কেউ এমন করে রায়বাড়ীর হিত কামনা করে না। লালজী-কালজীর বয়েস হয়ে যাচ্ছে। একটা বাচ্চাও থাকছে না, এর পরে রায়বাড়ী চৌকি দেবে কে?"

নবীন বলে, "দিবে, আরও কত কুকুর আসবে।"

"তা হয় না, তৈরি করে নিতে হয়। তুই থাকতেই শেয়াল খেলো দুই-দুইটা বাচ্চা।"

"আমি তার কি করব মাঠান? ভেতর বাড়ীতে থেকেও বিলাই-ছানা গেল। যেমন পালে পালে হয়, তেমনি যায়।"

"বেড়ালের ছানা বেড়াল খায়, তার কথা ধরি না নবনে। কুকুর হ'ল প্রভুভক্ত জীব, তাকে রক্ষে করতে হয়, যত্ন করতে হয়। শেয়ালের লোভ হয়েছে, 'লোভ হয়েছে ছাগল খেয়ে, নিত্যি আসে কানছি বেয়ে।' যে দুটো আছে আজকেই শেষ করে দেবে।"

"তার আমি কি করব মাঠান?" বলিয়া নবীন সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ঠাকুমার কণ্ঠে মিনতি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, "তুই কি করবি, তাই জিজ্ঞেস করছিস্? এতক্ষণ ভরে আমি কি অরণ্যে রোদন করলাম সাধে? তোর ঘরের চৌকির তলায় বিচালি পেতে বাচ্চা দুটোকে রেখে দেগে। কেষ্টের জীবকে যত্ন করলে ভগবান তুষ্ট হন। ভাগবতে কয়েছে, যদি কেষ্ট চাও, সর্ব্বজীবে দয়া করে গোলকধামে যাও।"

"আপনি য্যান কইলেন মাঠান, কিন্তু কুত্তার বাচ্চা নিয়া শোয়া কি সোজা কথা! গাছের পাতা পড়লেই বাইরে বেরোবে। তখুনি আবার ফিরা আসি কপাটে থাবা দিয়া ভেউ ভেউ করে কাঁদবে। কে খুলবে কপাট, কে করবে বন্ধ?"

"তুই করিস বাবা সোনা, তোরে আমি আশীর্ব্বাদ করব। ক'টা দিনই বা কষ্ট করবি। হাঁটা-খাওয়া শিখলে ভেতরে এনে রাখিস। সারাদিন ঘুর ঘুর করে বেড়াবে। এরা যখন থাকবে না, ওরাই হবে চৌকিদার।"

ব্রাহ্মণ-কন্যার অনুরোধ-উপরোধ নবীন এড়াইতে পারিল না। কহিল, "তাই রাখি দিব মাঠান. আমার চৌকির তলায়।"

ঠাকুমা খুশী হইয়া নবীনকে ঝুড়ি ঝুড়ি আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান লইয়া থাকিলে কি তাঁহার চলে? এ বাড়ীর ভূত ভবিষ্যৎ তিনি না ভাবিলে ভাবিবে কে?

নবান্নের দিন আসিল। রাত্রি হইতেই আয়োজন করিয়া রাখা হইয়াছে। বিরাট পাথরের থাদায় মনোরমা ঠাকুমা-বর্ণিত সমস্ত উপকরণ সংযোগে নবান্ন প্রস্তুত করিলেন।

স্নানান্তে গরদের জোড় পরিধান করিয়া মহেশবাবু আসনে বসিলেন। পুরোহিত মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। ছোট ছোট কলার পাতায় পাতায় থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ফল, মূল, নাড়ু, তক্তি, নবান্নের নূতন চাল মাখা। দেবপক্ষ দেবীপক্ষ গুরুপক্ষ মাতৃপক্ষ পিতৃপক্ষ। পক্ষের আর শেষ নাই। যত পক্ষ, যত পক্ষকে উৎসর্গ করা হইবে তত পক্ষের নামে ভোজ্য নিবেদন হইতেছিল।

ছোট ঠাকুমা ভোগের ঘরে নূতন চালের পায়েস চড়াইয়া দিয়াছেন। নূতন গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী আমোদিত। সরস্বতী পিঠা প্রস্তুত করিতে বসিয়াছিল। চালের গুঁড়োর সিদ্ধ পিঠাতে বিনুর হস্তার্পণ করিবার উপায় নাই। ক্ষীরের ও ছানার জিনিষ পাকের পর্য্যায়ে পড়ে না। তাহাকে কাঁচা বলিয়া ধরা হয়। চালের গুঁড়া সেদ্ধ হইলেই সে হয় পাকা, অন্নের সমতুল্য। বিধবারা বিনুর রান্না গ্রহণ করেন না। অতটুকু মেয়ে, যার আচার-বিচার বোধ নাই, পূজা-অর্চ্চনা নাই, কুলগুরুর নিকট হইতে ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া দেহকে শুদ্ধ করা হয় নাই, বিধবারা তাহার ছোঁয়া রন্ধন-সামগ্রী খাইয়া পরলোকের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতে পারেন না।

নবান্ন শেষ হইলে মনোরমাকে এদিকে আসিতে হইবে পিঠেপুলির সমারোহে।

বিনু আছে শাশুড়ীর সঙ্গে ফাই-ফরমাইস খাটিতে। ক্ষিতি সুমন্ত তরু রহিয়াছে পূজার কাছে। ঠাকুমা দূরে থাকিয়া মন্ত্র পাঠ শুনিতেছেন। তাঁহার ভয় আছে বিলক্ষণ, কি জানি ভুলবশতঃ যদি পূর্ব্বপুরুষদের কাহারও নাম বাদ পড়িয়া যায়।

না, একটা নামও বাদ পড়িল না। রায়বাড়ীর নবান্ন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গেল।

পুরোহিত জলযোগ করিতে বসিলে মহেশবাবু পাতায় করিয়া নবান্ন লইয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন কাকদের ভোজন করাইতে। কাকরা না খাইলে নবান্ন সিদ্ধ হয় না।

নবান্ন প্রস্তুতে অনাচার স্পর্শ করিলে কাকরা নাকি সে দ্রব্য আস্বাদ করে না। নবান্ন অসিদ্ধ হইলে পুনরায় করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে নবান্ন সুসিদ্ধ হইল। এক ঝাঁক কাক পরমানন্দে উড়িয়া আসিয়া খাইতে লাগিল।

কাকদের খাওয়াইয়া গরু-বাছুরদের খাইতে দিয়া কর্ত্তা প্রসাদ মুখে তুলিয়া নবান্ন সমাধা করিলেন।

ছেলেমেয়েরা প্রসাদের পাতা লইয়া বসিয়া গেল। দাসদাসী কুকুর-বেড়াল কেহ বাদ গেল না।

সকলকে নবান্ন করাইয়া গৃহিণী ঢুকিলেন ভোগশালায়, সেখানে বিপুল আয়োজন।

বিনু ঠাকুমার সামনে নবান্নের থালি রাখিতেই ঠাকুমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর নবান্ন হ'ল মণিমালা? ছোট বৌ সরি যে ভোগ নিয়ে মত্ত। নবান্ন খেয়ে কাজ করুক। তিথি ছেড়ে গেলে তখন আবার নবান্ন কিসের? শিবের মাথায় নতুন চাল না দিলে খেতে নেই। কাল বুঝি ওরা সকলে শিবের মাথায় নতুন চাল দিয়েছিল? তোকে মাটির শিবঠাকুর গড়তে দেখেছিলাম?"

বিনু প্রকাশ্যে ঠাকুমার সহিত বাক্যালাপ করে না। সে চকিত দৃষ্টি চারিদিকে নিক্ষেপ করিয়া চুপে চুপে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, কাল সকলে শিব পূজো করে নতুন চাল শিবের মাথায় দিয়েছেন। এখন মা প্রসাদ নিয়ে গিয়েছেন ভোগের ঘরে। ওঁরা তিনজনা নবান্ন করবেন। আমাকেও দিয়ে গেছেন। আপনি খান ঠাকুমা, আপনার ত শিবের মাথায় দেওয়া নেই?"

"কে তোকে কয়েছে আমার শিবপূজো নেই? আঁচলে বেঁধে দুটো নতুন চাল নিয়ে শুয়েছিলাম কাল রাতে। প্রাতঃস্নান করি, গোটাকতক ডুব দিয়ে চালজল নিবেদন করি দিলাম জলে।"

"কাকে নিবেদন করলেন ঠাকুমা?"

"কাকে আবার, শিবকে। ও, বুঝতে পারলি নে? তবে শোন্ মণিমালা, তোকে গোপনে কই; কারোকে কোস্ নে যেন। আমি চাল ধুয়ে নিয়ে দিলাম তোর দাদাশ্বশুরকে। চাল দিয়ে অঞ্জলি ভরে জল দিয়ে কইলাম—'এই নাও, চাল-জল গেরণ করো। আজ তোমার মহেশ কত দেব্য দেবে তোমাকে। তার আগে আমি তোমাকে পেয়েছিলাম, তুমিই আমার দেব্তা, শিব। তোমার নামে জল দিলেই আমার পূজো-আচ্চা হয়। আমার বুদ্ধি নাই, মন্তর তন্তর জানি না, তা তুমি ত জানই'।"

বিনু তরলমতি, তাহার ভিতরে গভীরতা নাই। সে হাসিয়া কহিল, "আপনি বুঝি রোজ নেয়ে-ধুয়ে দাদুকে জল দেন? আর কিছু দাদুর উদ্দেশে দেন না?"

"দেই না আবার! যা খাই, আগে মনে মনে তাঁরে দিয়ে তবে মুখে দেই। নেয়ে তিন গণ্ডুষ জল দেই নিত্য—যখন গলা-জলে দাঁড়িয়ে জল দেই চোখ বুঁজে, তখন মনের মধ্যে দেখতে পাই তিনি আমার কাছে গঙ্গাজলে এসে দুই হাত পেতে জল নিয়ে হাসতে হাসতে মুখে দেন। আমার ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পূজো হয়ে যায়।" বলিয়া ঠাকুমা নবান্নের মাথা চাল তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া মুখে দিলেন।

বিনু ফিরিয়া চলিল যথাস্থানে।

মধ্যাহ্ন হইতে না হইতে বাড়ী ভরিয়া গেল নিমন্ত্রিত জনসমাগমে।

ঘরে বারান্দায় উঠোনে পংক্তি-ভোজনে বসিয়া গেল সকলে। ভোজের পরে প্রসাদ বিতরণ, পায়েস পিঠে-পুলির মহোৎসব।

১৫

বেলা একটার ভিতরে বিনুকে শুভলগ্নে যাত্রা করিতে হইবে। তাহার পরে বারবেলা, যাত্রা নাস্তি।

তরু একটা বাক্সে বিনুর জামাকাপড় গোছাইয়া দিল। চুল বাঁধিয়া দিল। মনোরমা গহনা পরাইতে আসিলে তরু জানাইল গহনা পরিতে বিনুর আপত্তি, "বৌদি যে আর গয়না পরতে চাইছে না মা। বলে, 'গয়না আমার ভাল লাগে না শরীর ভারী লাগে। বিয়েবাড়ীতে ত যাচ্ছি না, গয়নার কি দরকার'।"

তবু বাছা বাছা কয়েকটা গহনা মনোরমা বিনুকে পরাইয়া দিলেন। রায়বাড়ীর বৌ ন্যাড়া হইয়া যাইবে নাকি বাপের বাড়ী, লোকে বলিবে কি?

সকলকে প্রণাম করিয়া বিনু যাইয়া নিজেদের গো-যানে চড়িল। জুড়ান চাকর সর্ব্বাপেক্ষা গো-শকট পরিচালনায় দক্ষতা লাভ করিয়াছে। সে-ই হইল গাড়োয়ান, বিনুর সঙ্গে চলিল কামিনীর মা ও নবীন চাকর।

রায়বাড়ীর সদরে সিংহদরজার নীচে গলিপথ। পথে নামিবার সারি সারি সোপান।

সদর দিয়া যাত্রা প্রশস্ত। সিংহদরজায় বিনুর শ্বশুর-শাশুড়ী, দুই ঠাকুমা, তরু, দাসীর দল উপস্থিত হইল বধূকে বিদায় দিতে। শুধু সরস্বতী আসিল না। ক্ষিতি স্কুলে গিয়াছিল। হঠাৎ সুমন্ত তারস্বরে কান্না জুড়িয়া দিল "আমি বইদি যাব, বইদি যাব।"

তাহাকে ভুলাইতে হরি চাকর লইয়া গেল পচা পুকুরের বুড়ো কচ্ছপ দেখাইতে।

ছইওয়ালা গাড়ির দুই দিকে পর্দা ঝুলানো। সম্মুখে বসিয়াছে কামিনীর মা, ভিতরে বিনু।

গলিপথে এখন বর্ষার জলকাদার কোন চিহ্ন নাই। শুখ্‌না মাটি খট্‌ খট্‌ করিতেছে, ধূলা উড়িতেছে। তরু-শ্রেণী ক্রমে পত্রবিরল হইয়া আসিতেছে। গলির দুই পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে ঘন বসতি।

গাড়ি চলিতেছিল চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিতে করিতে। সুমন্তর কান্নায় বিনুর অসীম আনন্দে একটুখানি যেন সীমার রেখাপাত হইল। কর্ণকুহরে ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল, "বইদি যাব, বইদি যাব।" বিনু ভাবে এ আবার কি, "শাঁখের করাত দুই দিকেই কাটে।"

ঠাকুমা যে বলিয়াছিলেন "মণিমালা, আহ্লাদে আটখানা হয়ে চললি, দেখিস্ এদের জন্যে মন খারাপ লাগবে। শ্বশুরবাড়ীর মায়া কি কম লো, আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—'খাঁচার পাখী উড়তে চাই, ডানায় আমার বল নাই'।" ঠাকুমার কথা মিছে নয়। বল মানে বুঝি মায়া ?

"টু টু"! গলির পাশে ডাক্তার বাড়ী, সামনে রাস্তায় হেলিয়া পড়িয়াছে বিরাট্ জাম গাছ। সেই ছায়াময় জামতলা হইতে কচি কোমল স্বর হইতেছিল, "টু টু"।

কামিনীর মা সামনে হইতে বলিল, "ওই গ্যাখ বৌমা, তোমাগো ছোট ননদ পুকুরের চালা ঘুর্যা আসিছে। যাওন কালে পিছে ডাকিতে নাই। তাই টু দিইচে।"

বিনু পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাহির করিয়া হাত নাড়িয়া হাসিতে লাগিল। তাহারও সাধ হইতেছিল তরুর ধ্বনির প্রতিধ্বনি তুলিতে, 'তরু টু, তরু টু'। কিন্তু সে যে এই গ্রামের বৌ, সঙ্গে সাঙ্গ-পাঙ্গ রহিয়াছে। হাসিয়া হাত নাড়া ছাড়া তাহার 'টু' দেওয়া হইল না।

গাড়ি বাঁক লইল, তরু মিলাইয়া গেল জামতলায়। কিন্তু বিনুর হৃদয় হইতে মিলাইতে পারিল না।

হরিণহাটি গ্রামখানা বৃহৎ। জয়দুর্গার মন্দির শ্যাম রাইয়ের মন্দির। খেলার মাঠ বাজার বালিকা বিদ্যালয় বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার স্কুল। নদীবিরল গ্রাম, স্থানে স্থানে অসংখ্য পুষ্করিণী দীঘি গ্রামের কোলঘেঁষা বিল

হীরাসাগরের সহিত সংযুক্ত। তবু কাণা গ্রাম লোকে বলে। 'নদী শূন্য গাঁ, হাল শূন্য না', অনেকে পছন্দ করে না। গ্রাম নদীশূন্য হইলেও সমৃদ্ধিশালী। আঁকিয়া-বাঁকিয়া গলিপথগুলি গোলকধাঁধার মতন।

গলিপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ি দিগন্ত প্রসারিত মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিরাট্ মাঠ, মাছখানে সড়ক সোজা চলিয়া গিয়াছে হীরাসাগর নদী অবধি। সড়কের দুইপাশে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। ধান কাটিবার পরে ধান-ক্ষেতগুলিতে চাষীরা পুনরায় লাঙ্গল চষিতেছে। শস্যক্ষেত্রে সোনার সরিষা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। কড়াই ক্ষেত বেগুনি ফুলে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

এই মাঠের পরেই বিনুদের গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। দুই গ্রামের সীমানা এক বৃহৎ প্রাচীন বটগাছ। ও গাছ যে কত যুগের দুই গ্রামবাসীরা তাহার সঠিক খবর দিতে পারে না। কিংবদন্তী, বটগাছটি ভূতপ্রেতের আদি নিবাস। রাত্রে কেহ একাকী বটগাছের নিকট দিয়া যাইতে সাহসী হয় না।

বিনু বিস্ফারিত নেত্রে চাহিতেছে ক্ষণেক ডাইনে, ক্ষণেক বামে। পূজার সময় সে প্রসাদের সহিত গিয়াছিল জলপথে। কতকাল পরে এই মেঠোপথের অপরূপ শোভা সম্পদে তাহার জীবন যেন জুড়াইয়া গেল। সড়কের দুইদিকে জল-নিকাশের পগার। পগারের গায়ে শ্রেণীবদ্ধ বাবলা ও খেজুর গাছ। শ্যাওড়ার বন, ছাতিম কদম ও পিটালি বৃক্ষের ছায়ানিবিড় ঝোপ। কৃষকরা ক্ষেতের কাজ করিতে করিতে রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়া ওই সব ঘন ঝোপে আসিয়া বিশ্রাম করে। কৃষাণীরা স্বামী-পুত্রের নিমিত্ত মধ্যাহ্নে ভাত-জল বহিয়া আনে গাছের ছায়ায়। পগারের গভীর গহ্বরে জায়গায় জায়গায় বর্ষার জল জমিয়া থাকে। গাভীরা পশুপক্ষীরা সেই জল পান করে।

বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। অপরাহ্ণ আগতপ্রায়, শস্যক্ষেত কড়াইফুলের সৌরভ গায়ে মাখিয়া বাতাস উতলা হইয়াছে। ঘন শাখায় লুকাইয়া পাখী ডাকিতেছে 'বৌ কথা কও, বৌ কথা কও।' বৌ কথা না কহিলেও পাকুড় গাছের ভিতর হইতে আর এক পাখী ডাকিতেছে 'চোখ গেল, চোখ গেল।' ঘুঘুর ঝাঁক মাঠে চরিয়া বেড়াইতেছিল। কতক ক্লান্ত হইয়া তরুশাখে বসিয়া উদাসস্বরে বনভূমি মুখরিত করিতেছিল।

কতকাল পরে আজ যেন বিনুর নূতন এক জগতের সহিত পরিচয় হইল। শ্রবণ মন প্রাণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। কি রাখিয়া কি সে আস্বাদন করিবে? স্বপ্নের ঘোরে সে যেন বিভোর, বিহ্বল।

অকস্মাৎ তাহার স্বপ্নের আবেশ ভাঙ্গিয়া গেল পথিপার্শ্বের কুকুরের উচ্চ কোলাহলে।

কামিনীর মা বলে, "দ্যাখ নব্‌নে, কি কাণ্ড, কুত্তা দুডা যে আইচে পিছে পিছে তা পরখ করি নাই এতক্ষণ।"

বিনু সবিস্ময়ে তাকাইল গাড়ির পশ্চাতে, সত্যই লালজী, কালজী আসিয়াছে গাড়ির সঙ্গে। শুধু আসা নয়—সামনে সমগোত্রের যাকে দেখিতেছে, তাহারই সহিত তুমুলবেগে কলহ করিতেছে।

নবীনের দিদির নাম রাজেশ্বরী, সেই সুবাদে নবীন তাহাকে দিদি বলিয়া ডাকে। নবীন বলে, "আর কও কেনে দিদি, জ্বালায়ে মারিল পচা কুত্তা দুডা। বাড়ীর নোকেরা পথে পা বাড়াইলে ওরা সাথে যাইবে। রায়বাড়ীর ম্যায়াগরে কিছুক পিছ লয় না। সেয়ান ঘুঘু, বজ্জাতের নাজীর।"

"মা যে আইল, ছাওগুলানের কি দশা হইবে নব্‌নে? সেগুলা যদি গলা শুকায়ে মরি যায়? তুই খেদায়ে দে কুত্তা দুডারে বাড়ীর পথে।"

নবীন গাছের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া কুকুরকে তাড়া করিল। লালজী, কালজী পগার পার হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল গাড়ি লক্ষ্য করিয়া। গাড়ি আসিল দুই গ্রামের সীমানায় বটের ছায়ায়। জুড়ান গাড়োয়ান উচ্চারণ করিল, "আল্লা রসুল,।" কামিনীর মা "রাম রাম।"

নবীন হাসে হিঃ হিঃ করিয়া, "দিন দুপুরে বটের তলে আসি ভয় পালি নাকি জুড়ান?"

"না বাই, ভয় পাওনের কি হইচে? খোদা তাল্লার নাম করন কি মন্দ? ভয় পাইচে তোর দিদি।"

দিদি বন্দরের কুণ্ডুদের মেয়ে, তারা মচকায় তবু ভাঙ্গে না। দিদি ঝাঁঝিয়া উঠিল, "কি কইচিস্‌ জুড়ান, আমাগো কিসের ডর? গলায় তুলসীর মালা রইচে না? তোরে নাম লইতে শুনি আমাগো নাম লইতে ইচ্ছা হইছিল। তোর আল্লা রসুল রইচে য্যামন, আমাগো রাম-নক্ষণ ত্যামন।"

নবীন ঝগড়ার সূত্রপাত করিয়াছিল, সেই ফের সন্ধি ডাকিয়া আনিল, "দ্যাখ দিদি, বটগাছটার কি ত্যাজ, এই যে ঝড় ঝাপটা যায়, কোন দিন একখানা ডাল ভাঙ্গন দেখি না। ও জুড়ান, তোর গরু যে পগারে যাইচে—খেদাইয়া নে।"

"না বাই—পগারে যাইবে ক্যান? ওই নকপকে ঘাসের চাপড়াডা মুকে নয়া এই ত ফিরি আইল সড়কে। হ, গাছডার বড় ত্যাজ—দিনমান মাঠের রদ্দুর পায়—পগারের পানি শুষি নয়া বড় ত্যাজ হইচে।"

কামিনীর মা বলে "তোরা ছাওয়াল পায়াল মানুষ—জানিস না, গাছের ওপর ভর করি যেঁই রইচে—তেনাই দিইচে গাছের ত্যাজ। রাম নক্ষ্মণ, রাম নক্ষ্মণ।"

বটগাছ ছাড়াইয়া গাড়ি চলিয়াছে পাথরকুচি গ্রামের সড়ক দিয়া। কানন কুন্তলা বনশ্রী আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, কৃষকের ছোট ছোট খড়ের কুটির, নদী রহিয়াছে বনের শেষ প্রান্তে।

বিনু পর্দ্দার ফাঁক দিয়া অনিমেষে চাহিয়া রহিল। তাহার চঞ্চলচিত্তে অনুক্ষণ যাহারা জাগ্রত থাকিয়া আকর্ষণ করে—ওই ত তাহাদের সেই আকাশস্পর্শী নারিকেল বৃক্ষের চূড়া দেবদারুর সুউচ্চ শির, সরল বংশের ছত্র। আর দেরি নাই, বিনু আসিয়া গিয়াছে।

১৬

বিশালকায় সারিবদ্ধ শিরীষ গাছের নীচে গাড়ি থামিল। সাম্‌নেই পেটকাটা বাংলো প্যাটানের প্রকাণ্ড গৃহ। দুই পাশে দুইটি মনোরম ফুলের বাগান। নানা বর্ণের গাঁদা ফুলে বাগান আলো করিয়া রাখিয়াছে।

এখানকার সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল বিনুর আগমন আশায়।

গাড়ি আসামাত্র সকলে ছুটিয়া আসিল, তাহাদের অগ্রগামী ঠাকুরদা। তিনি সস্নেহে আহ্বান করিলেন, "দুলালি, এলি,—আয়।" ঠাকুমা নাতনীকে বাহু ধারণ করিয়া গাড়ি হইতে নামাইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন। মা বৌমানুষ, আধ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত। দাস-দাসীরা একে একে কাছে আসিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিল। স্বাগত সম্ভাষণ করিল।

নকর্ত্তা প্রবাসে, তাই সঙ্গীতের অভ্যর্থনা হইল না।

গাড়ির সামনে বিনুদের ভুলু ও বাঘা কুকুরের সহিত লালজী-কালজীর হঠাৎ বাধিয়া গেল গোলমাল, গোঁ গোঁ ভেউ ভেউ শব্দে পাড়া সচকিত হইতে লাগিল।

ভগীরথ চাকর লাঠি হস্তে অগ্রসর হইয়া দুইপক্ষকে থামাইবার চেষ্টা

করিতেই ঠাকুরদা পত্নীর প্রতি চোখ তুলিয়া সহাস্তে কহিলেন, "দুলালীর সাথে পাইক-পেয়াদা এসেছে, ওদের ভেতরে ডেকে নিয়ে কিছু খেতে দাও গে, প্রকাণ্ড সুন্দর কুকুর দুটো বাঘের মতন।"

নবীন কর্ত্তার পদধূলি লইয়া বলিল, "যা কইলেন করতা বাবু, ওরা দেখিতে যেমতি, গায়ের বলও তেমনি। ওয়াদের তরাসে রায়বাড়ীতে কাকপক্ষী ঢুকিতে পারে না, যে যেখানে পা নাড়িবে ওয়াগরে যাওন চলিবে সাথে সাথে।"

ঠাকুরদা হাসিতে লাগিলেন। সকলকে সমাদর করিয়া সঙ্গে করিয়া ঠাকুমা অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন।

কুটুম্ব বাড়ীর সকলকে আদর করিতে হয়। সে মানুষ, জীব জন্তু যাই হোক্ না কেন।

গাড়ির বলদ দুটিকে খুলিয়া জাব খাইতে দেওয়া হইল। লালজী-কালজীকে আর দেখা গেল না। গন্তব্য স্থান চিনিয়া তাহারা শাবকের টানে প্রস্থান করিয়াছে।

কতকাল পরে ব্রজেশ্বরীর সহিত রাজেশ্বরী মিলিত হইল। পরস্পর পরস্পরের গলা জড়াইয়া অঝোরে কাঁদিতে বসিল।

বিনুর মা বলিল, "কান্না কেন? মাঠের এক পারে এক বোন অন্য পারে আর এক বোন থাক। যখন খুসী মাঝে-মাঝে আসা-যাওয়া করলেই পার তোমরা? তোমাদের গাড়ি-ঘোড়া লাগবে না। পায়ে হেঁটেই মেয়ে লোকরা দিনরাত আসা-যাওয়া করে।"

ব্রজেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলে, 'তুমি কি জান না বৌঠান, 'গাঙে গাঙে দেখা হয় তবু বুনে বুনে দেখা হয় না।' নলাটে না থাকলে বোনের সঙ্গে বোন দেখা করতে পারে না। কতকাল পরে দেখা, তাই চোখে জল এসে গেল।"

কেন দেখা হয় না, কোথায় বাধা, তাহার বিশদ বিবরণ শুনিবার হেমাঙ্গিনীর সময় ছিল না।

নবীন তাগিদ দিতেছে এখনই তাহাদের রওনা হইতে হইবে। সম্মুখে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, গলিপথ। ভাগার পগারের অভাব নাই, ইত্যাদি।

কুটুম বাড়ীর লোকদের সযত্নে জলযোগ করাইতে হইবে। শাশুড়ী বধূ তাহাই লইয়া ব্যস্ত।

বিনুর ব্যবস্থা পরে হইবে। সে প্রতিবেশিনী পরিবেষ্টিত হইয়া সকলের আদর সোহাগ কাড়িয়া লইতেছে।

এ বাড়ীর নবান্নও গতকাল হইয়া গিয়াছে। সুতরাং গৃহে খাদ্যাদির অভাব ছিল না। বন্দর হইতে লালমোহন ও ক্ষীরমোহন মিষ্টান্ন আনা হইয়াছিল।

ঠাকুমা দুর্গাসুন্দরী সকলকে সমাদর করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়া বিদায় দিলেন।

এতক্ষণে বিনু মাথার কাপড় ফেলিয়া হাল্‌কা হইল।

ঠাকুরদা খড়ম ঠকাস্‌ ঠকাস্‌ করিতে অন্তঃপুরে দেখা দিলেন। সাধারণতঃ ভোজনের ও শয়ন সময় ভিন্ন তিনি বিশেষ ভিতরে আসেন না। ভিতরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী গৃহিণী।

নাতনীর খবরে কর্ত্তা আসিয়াছিলেন। স্ত্রীকে কহিলেন, "দুলালী কই? কাপড়ের পুঁটলি হয়ে ত গাড়ি থেকে নামল। ওকে ভাল করে দেখাই হয় নি।"

বিনু আগাইয়া আসে। ঠাকুরদার অসীম স্নেহ উপভোগ করিতে তার ভাল লাগে, কিন্তু ভাল লাগে না তাঁহার দুলালী সম্বোধন। ছোট বেলায় আদর করিয়া যা বলিয়াছেন, বড় হ'লেও কি তাহাই বলিতে হইবে? এই দুলালী শব্দটা সেখানকার ঠাকুমার কানে গেলে তিনি কি ছাড়িয়া কথা কহিবেন? দুলি বুলি ফুলি কত কি বিকৃত শব্দের অবতারণা করিবেন।

ঠাকুরদা সস্নেহে নাত্‌নীর ললাটের এক গুচ্ছ অবাধ্য চুল সরাইয়া দিয়া প্রশ্ন করলেন "জল খেয়েছিস্‌ দুলালী? মুখটা শুখনো দেখাচ্ছে।"

বিনু বলে, "এখুনি খাব ঠাকুরদা। পাড়ার সকলে এসেছিলেন তাই দেরি হ'ল। আপনি আজ সন্ধ্যায় বন্দরে যাবেন না?"

"হ্যাঁ, একটু পরেই যেতে হবে বৈ কি! আজ বেশি দেরি করবো না, যাব আর আসব।"

ঠাকুমা কাছেই ছিলেন, ঠেস দিলেন, "একবার নাও ভাসালে তোমার কি আর ফেরার কথা মনে থাকে? সেখানে গেলেই ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাও।"

"তুমি ভুলে যাও কেন বড়বৌ, সেইটেই আমার আদি নিবাস। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই সেখানে। তা ছাড়া কয়েকটা রোগীও রয়েছে—"

ঠাকুমা বাধা দেন, "যত রোগের আড্ডা হয়েছে তোমার নাকাসিয়ার বন্দরে। রোগী দেখা একটা ওজর।"

কলহের পূর্ব্বাভাষ টের পাইয়া ঠাকুরদা আস্তে আস্তে সরিয়া গেলেন।

কতকাল পরে বিনু মা'র কাছে শয়ন করিল রাত্রে। বাল্যকাল হইতে সে ছিল ঠাকুমার শয্যাসঙ্গিনী।

ঠাকুমা আজ আদেশ করিলেন, "বিনু, তুই আজ মা'র কাছে শো। ও একলা খাটে থাকে—বুকের ভেতরে ওর ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ করে।"

করিবে না—আহা, মা'র যে বুকজোড়া ধন বিনুর ছোট ভাইটি কেদার ফুলের মত মার বুক হইতে ঝরিয়া গিয়াছে চিরতরে।

ঠাকুমা-ঠাকুরদার শয়ন-গৃহ মস্ত বড় দক্ষিণ-দ্বারী। দুই দিকে চওড়া বারান্দা। মাঝখানে দরজাযুক্ত দেয়াল, দুই ভাগ করা। এক ভাগে থাকেন কর্ত্তা, তাঁহার বয়স হইয়াছে। শরীরও তেমন ভাল নয়। ঠাকুমা স্বামীকে সারারাত নজরে রাখেন।

ছেলেরা বিদেশে, বধূই বা পৃথক্ গৃহে কাহাকে লইয়া থাকিবে? সেই কারণে ঠাকুমা থাকেন বিনুর মাকে লইয়া এদিকের অংশে।

দুই পাশে দুইখানা খাট পাতা। মাঝখানে অনেকটা জায়গা পড়িয়া থাকে। ঠাকুমা তাঁহার শুদ্ধাচার বজায় রাখিয়া শয়ন করেন।

সরস্বতীর মতন দুর্গাসুন্দরী বা ঈশানচন্দ্রের ঈশানীর একচোখো শুচিতা না থাকিলেও আচার-নিষ্ঠায় তিনি ফেল্‌না যান না।

বাহিরে রজনীর গভীরতা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চন্দ্রদেব আলোক বিতরণে বিরত থাকিয়া এখন প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় চারিদিক প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে।

বিনু মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আমি আসব শুনে বাবা ত এলেন না মা? কাকাও এলেন না।"

মা বিনুর চুলে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে ফিস্ ফিস্ করিয়া জবাব দিলেন, "এখন আসবেন কি রে? এই ত কালীপুজোর পরে গেলেন। তোর কাকারও কলেজ খুলে গেছে। এর পরে আবার যখন তুই আসবি আগে থেকেই ওঁকে জানিয়ে আসতে লিখে দেব।"

বিনুর বাবা কলিকাতায় অধ্যাপনা করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি আছে। বাবার নিকটে বিনু বিশেষ থাকিতে পারে না। কারণ এদিকের সমস্ত ছাড়িয়া ঠাকুরদা-ঠাকুমা শহরে গিয়া থাকিতে পারেন না। যান আবার দিন কতক পরে ফিরিয়া আসেন। বাবাও স্ত্রী-কন্যাকে নিজের কাছে রাখিতে পারেন না। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে সেবাযত্ন করিবার জন্য হেমাঙ্গিনী দেবীর

নিরন্তর থাকা হয় না স্বামীর নিকটে। বাবা অবশ্য সুযোগ-সুবিধা পাইলে দেশে আসেন। ছোট ছেলে রতীশও চলিয়া গিয়াছে ডাক্তারী পড়িতে।

মায়ের কোলে শয়ন করিয়া আজ যেন বিনুর বেশি করিয়া মনে পড়িতেছে জ্ঞানে প্রদীপ্ত স্নেহে সারল্যে সমুজ্জ্বল পিতার অপূর্ব্ব মুখচ্ছবি বিনুর হৃদয়ের পটভূমিকায় উদয় হইতেছিল। বিনু চুপ করিয়া বাবাকে ভাবিতে লাগিল। মা কহিলেন, "ঘুমোলি বিনু? তুই তাঁকে চিঠি-পত্র লিখিস্ ত?"

"লিখি মা, বেশি লিখতে পারি না। এখানে আসবার আগে বাবার চিঠি পেয়েছিলাম। তার উত্তর দেওয়া হয় নাই।"

"কাল লিখিস্। প্রসাদের চিঠির ঠিক ঠিক উত্তর দিস? না ভুলে যাস?"

"ভুলে যেতে কি দেয় মা। চিঠিতে হুকুম চালায় বিকেলে চিঠি পেয়ে রাতে উত্তর লিখে রাখতে হবে। ক' পাতা হাতের লেখা হ'ল তার খবর দিতে হবে। কোন্ অবধি বই পড়া হ'ল তা জানাতে হবে। আমি আর পারি না মা, আমার ভাল লাগে না। এখন আমার মনে হয়, বাবার কাছে গিয়ে আমি পালিয়ে থাকি।"

মা সকৌতুকে হাসিতে লাগিলেন "লেখা-পড়ার ভয়ে তুই যে পালিয়ে যাবি তোর বাপের কাছে, সেখানেও যে প্রসাদ প্রায় দিন আসে। সে তোকে কক্ষণো মুর্খ হয়ে থাকতে দেবে না।"

"না দেয় না দেবে, আমি যাব না বাবার কাছে। যেমন আছি এমনি থাকব। আমি এখন ঘুমোই মা, আমার ঘুম পেয়েছে।" বিনু চোখ বুজিল।

১৭

বিনুর সেই গভীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল জগাইগাছির ডাক-হাঁকে। জগাইগাছি খেজুর গাছের জিরেনকাটা রস বিনুকে দিতে হাজির হইয়াছে।

রসের মাটির হাঁড়ি হাতে তারস্বরে ডাকিতেছিল জগাই, "বিনুদি, এখনও ঘোম ভাঙ্গিল না, সাবাস্ ঘোম, বলিহারি যাই। আইস, তোমাগো লেগে খাজুরের জিরেন কাটা রস আনিছি। মুকে-চোকে জল দিইয়া খাইয়া লও ঢক ঢক করি।"

বিনু ত্রস্তে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া কহিল, "জগাইদা, রস এনেছ? আমি যে এসেছি তুমি জানলে কি করে?"

"শোন কথা, আমি যে তহন পগারের পারে খাজুর গাছ কামাইতেছিলাম।

রায়বাড়ীর গাড়ির সাথে সাজপাঙ্গ দেখে হদিশ পাইলাম বিনুদি আসিছে। নেও বিনুদি, মুকে জল দিয়া আগে ফ্যানে সমেত রস খাইয়া নও। ফ্যানা মরি গেইলে খাজুরের রসের স্বোয়াদ লষ্ট হইয়া যাও। দেও একটা পাত্তর, ঢালি দিয়া যাই।"

ব্রজ দাঁড়াইয়াছিল আঙ্গিনায়। সে তাড়াতাড়ি একটা মাজা পিতলের বড় ঘটি আনিয়া উপস্থিত করিল।

জগাই মাটির ভাঁড়ের রস ঘটিতে ঢালিয়া দিতে দিতে ব্রজেশ্বরীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি এহনি রস খাইবা বেজদিদি, একডা খোরা ধর, ভাঁড়ে আরও রস রইচে।"

ব্রজ রাগিয়া অস্থির। "কি কইচিস জগাই, আমাগো নাওন-ধোওন হয় নাই, তুলসীতলায় জল দেওন হয় নাই। বিহানে উঠি চ্যাংড়া মানুষের নাগাল আমি রসে চুমুক দিব নাকি? দিদির পরে যদি এত দরদ থাকে তা হইলে রসের ভিয়ান হইলে দিয়া যাইস এক সরা পাটারি গুড়।"

পেমো ও তাহার মা কাজে আসিয়াছিল। তাহারা ছুটিয়া গিয়া ঢেঁকিশালা হইতে লইয়া আসিল পিতলের বাটি-ঘটি।

বাকী রসটা সেই ঘটি-বাটিতে ঢালিয়া দিয়া জগাইগাছি বিনুকে প্রশ্ন করিল, "হ বিনুদি, তুমি হাজারি না সরার পাটারি গুড় ভালবাস? আছ ত পুষ মাস নাগাত? পুষ মাসের গুড় জমে ভাল।"

বিনু বলে, "না জগাইদা, এই মাসেই আমাকে যেতে হবে। আমি হাজারিও ভালবাসি, সরাও ভালবাসি। তোমার বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত, ছেলে-বৌরা?"

"আছেন বিনুদি, আমাগো সময় নাই। এহনও বেবাক খাজুর গাছের রসের হাঁড়ি নামাইতে পারি নাই। বৌ খাজুরতলায় কলসী নয়া খাড়াইয়া রইচে।"

ঠাকুমা অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "বিকেলে একবার বৌকে পাঠিয়ে দিস জগাই, ভোগের প্রসাদ নিতে।"

জগাইগাছির সারাটা মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরিয়া গেল। সে মাথার বাবরী চুল ঝাঁকাইয়া কহিল, "বৌ আইবে মাঠান, সে খাড়াইয়া রইচে খাজুরতলায়।"

বলা শেষ হওয়া মাত্র জগাইগাছি দৌড়াইল। তাহার বেবাক গাছের রসের ভাণ্ড নামান হয় নাই। বৌ খাজুরতলায় অপেক্ষা করিতেছে।

বিন্নু মুখ ধুইতে চলিয়া গেল। কাল সে ভালরূপে কিছু পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে নাই। তাহার শ্বশুরালয়ের লোকজনদের ভূরিভোজন করাইয়া বিদায় দিতেই দিনের আলো নিবিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে প্রতিবেশিনীদের মেলা বসিয়াছিল। এক-এক জনার হাজার-প্রশ্ন, "বিন্নু শ্বশুরবাড়ীতে কখন শোয়, কখন ঘুম থেকে ওঠে, খায় কখন? কি দিয়ে খায়? তোদের বাড়ীতে চাকর ক'জনা? ঝি ক'টা? তারা তোকে তেল-হলুদ মাখিয়ে ইঁদারার পাড়ে ঘটি ঘটি জল দিয়ে নাইয়ে দেয় না কি? না নিজেই পুকুরে ডুব দিয়ে আসিস?"

বিন্নু দুই-একবার 'হাঁ' 'না' উত্তর দিয়া চুপ করিয়াই ছিল। ঠাকুমা নাত্নীর মুখপাত্র হইয়া প্রত্যেকের কথার জবাব দিয়াছিলেন। সকলে বিন্নুকে ভালবাসে, ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কথার উত্তর না দিলে কি চলে?

সকলে চলিয়া গেলে রাত্রি হইয়া গেল। তখন সাঁজালের ধোঁয়া লইয়া গরু-বাছুর গোয়ালে উঠিয়াছে। শীতের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত গোশালার সামনে খড়ের আগুন জ্বালাইয়া গাভীদের গায়ে ধোঁয়া লাগান হয়। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তাদের গায়ে মশা বসিতে পারে না। বিন্নুর সহিত গরু-বাছুরের সাক্ষাৎ হয় নাই। পায়রার খোপেও শ্যাম চাকর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। কাকার কত আদরের পায়রা, তিনি পড়িতে যাইবার সময় বিন্নুকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বিন্নু দিয়া গিয়াছে পেমোর ভাই এ বাড়ীর গরুর রাখাল বালক শ্যামচরণকে। দধিমুখী বেড়াল ও ভুলু বাঘা কুকুর সে না শোয়া অবধি পায়ে পায়ে ঘুরিয়াছে।

মুখ ধোওয়া হইলে বিন্নু প্রথমেই আসিয়া উপনীত হইল পায়রার খোপের পাশে। "শিগ্‌গির-কর্ম্মা" শ্যাম ইহারই মধ্যে খোপের দরজা খুলিয়া দিয়াছে। পায়রারা চরিতে গিয়াছে ধানের ক্ষেতে। সকল ক্ষেতের ধানকাটা এখনও শেষ হয় নাই। সোনার বরণ পাকা ধান এখনও অনেক ক্ষেতে ঝম্ ঝম্ করিতেছে। বিন্নুদের বাহিরের আঙ্গিনা ও মণ্ডপের আঙ্গিনায় কাটা ধান স্তূপ হইয়া রহিয়াছে, মাড়ান হয় নাই।

বিন্নু গাভীদের সন্ধানে পা বাড়াইতেই ঠাকুমা ধরিয়া ফেলিলেন। "বিন্নু মুখ ধুলি, কিন্তু বাসি কাপড়টা ত ছাড়লি না? বিছানার কাপড়ে থাকতে নেই, অলক্ষী লাগে। চট্ ক'রে কাপড় ছেড়ে আয়, রস খা। রসের ফেনা মরে গেলে তেমন স্বাদ থাকে না।"

"না থাকুক, খেজুরের কাঁচা রস আমি ভালবাসি না। আমার গন্ধ লাগে।"

"লাগুক গন্ধ, কেউ ভালবেসে কিছু খেতে দিলে ভাল না লাগলেও মুখে দিতে হয়। আমি ভোগের ঘরে রেখেছি রসের ঘটি। ঠাকুরের আগ ঢেলে রেখে তোকে দিচ্ছি। তুই কাপড় ছেড়ে ধোয়া কাপড় পরে আয়।"

বিনু পড়িয়াছিল শক্তের পাল্লায়। তখনই তাহাকে কাপড় ছাড়িয়া ছোট পাথরের বাটির এক বাটি রস খাইতে হইল। মা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তাড়া দিলেন, "তোর ফ্যানা-ভাত চড়িয়েছি বিনু, কোথায় যাচ্ছিস্ ঘুরে এসে খেতে বোস্।"

বিনু মহা বিরক্ত। "তোমাদের খালি খাওয়া খাওয়া মা, এক্ষুণি এক বাটি রস খেয়ে ওঠলাম। রাতে নবান্নের কাঁড়ি কাঁড়ি খাবার আমাকে খাইয়ে রেখেছ। আমার ক্ষিধে নেই, আমি ফ্যানা-ভাত খাব না।"

মায়ের মুখের ওপরে জবাব দিয়া বিনু চলিল পুকুরপাড়ে। পুকুরের জল অনেকটা নীচে নামিয়া গিয়াছে। দুই পাড়ের গায়ে মাষকলাই ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। একদিকে মটরশাক লক্ লক্ করিতেছে। নীল নীল ফুল ফুটিয়াছে। মাষকলাই গাছেও সাদা সাদা ফুল ছাইয়া ফেলিয়াছে। মাষকলাই গাভীদের জন্য, মটরশাক গৃহস্থের।

প্রভাতে গরু-বাছুরগুলিকে বাঁধিয়া দেওয়া হয় পুকুরের সংলগ্ন মাঠে কাঁচা ঘাস খাইতে।

বিনুর সাড়া পাইয়া লালমণি ধলিমণি আদরিণী সোহাগিণী উচ্চকিত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। একটা লাল রংএর নালকে বাছুর লেজ উর্দ্ধে তুলিয়া উহাদের মধ্য দিয়া কেবল ছুটিতেছে, আবার ছুটিতেছে।

বিনু সবিস্ময়ে নব-প্রসূত বৎসটির প্রতি চাহিয়া ভাবে, এ আবার আসিল কোথা হইতে? উহাকে ত সে দেখিয়া যায় নাই।

বালিকা ঝি পেমো কোমরে শাড়ী জড়াইয়া মা'র সহিত ঘাটে বাসন মাজিতে বসিয়াছিল। বিনুর আগমনে তাহার আর বাসন মাজা হইল না। সে হাত ধুইয়া বিনুর কাছে আসিয়া কহিল, "বাছুর ত্যাখিচ ঠাকুজ্জি, ওইডা তোমাগো নালমণি গাই-এর বাছুর।"

বিনু জিজ্ঞাসা করে "কবে হয়েছে রে? আমি যাবার পরে বুঝি? লালমণির বাছুর ঠিক লালমণির মতন হয়েছে, কি সুন্দর।"

"হ, ঠাকুজ্জি, যেমতি সোন্দর মা, তেমতি বাছুর। আজ ওডার বয়ক্রম একুশ দিন হইল। কাল হইবে গোরক্ষ ধার। দুধ শুদ্ধ হইলে ঠাকুর ভোগে নাগিবে।"

বিনু পেমোর কথায় জবাব না দিয়া প্রত্যেকটি গাভীর গলা জড়াইয়া পিঠে মাথা রাখিয়া আদর করিতে লাগিল। বিনু বিলক্ষণরূপে জানিত নূতন দুধ একুশ দিন বাদ দিয়া ভোগে দিতে হয়। গোক্ষুর দেবতাও তাহার অজানা নয়।

গাভীরা বিনুকে পাইয়া বিনুর আদরে অভিভূত হইয়া কেহ তাহার হাত চাটে, কেহ মুখ চাটে, লেজের চামর বুলাইয়া দেয় সর্ব্বাঙ্গে।

গাভীদের আদর শেষ হইলে বিনু ধরিতে গেল বাছুরটিকে কিন্তু বাছুর ধরা দেয় না। তড়াক তড়াক করিয়া কেবলই দৌড়ায় এদিক হইতে সেদিকে। লালমণি তাহাকে চোখের অন্তরাল করিতে পারে না। ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করিয়া কাছে ডাকে। বিনুর সাধ হইতেছিল বাছুরের কোমলমসৃণ অঙ্গে হাত বুলাইয়া সোহাগ করে। কিন্তু বাছুর ধরা দেয় না।

পেমো এখানকার যাহা কিছু তথ্য বিনুকে জানাইতে উৎসুক। নূতন খবরের আছেই বা কি, পল্লীবাসীদের গতানুগতিক জীবনযাত্রা, তাহার মধ্যে বৈচিত্র্য নূতনত্বের কি বা থাকিবে। থাকার ভিতর জীবন মৃত্যু বিবাহ তিনটি প্রধান ঘটনা। জেলেপাড়ার, সাহা-পাড়ার এবং কুম্ভকার-পাড়ার বিবাহের সংবাদ বিনু গত রাতেই পাইয়াছে। এখন নূতন খবর দিতে লাগিল পেমো কলাবাগানে একটা নন্দন পাখী কোথা হইতে আসিয়াছিল। পাকা কলার গন্ধে কয়েকদিন আগে। লেজ তাহার এক হাত, মাথার ঝুঁটি চূড়ার মতন। লাল টুকটুকে ঠোঁট, দুধের বরণ। বিনুকে পেমোর পিছনে তখনই ছুটিতে হইল কলাবাগানে নন্দন পাখীর সন্ধানে। কোথায় নন্দন পাখী! নবান্নের পূর্ব্বে কাঁদি কাঁদি পাকা কলা কাটিয়া লওয়া হইয়াছে। কলার কাণ্ডও গিয়াছে মানুষের পেটে। পড়িয়া আছে খোলা ও ডাটা।

১৮

বিনু ফ্যানাভাত খাইতে বসিয়াছে। লাল বরণের চালের ভাত, ঘরের সরবাঁটা ঘি, বড়ি, বেগুন, রাঙ্গা আলু ও কাঁঠালের বীচি ভাতে। বিনুর আর একটি প্রিয় খাদ্য মা সংগ্রহ করিয়াছেন। কুচো চিংড়ি মাছ লাউডগা পাতায় জড়াইয়া ভাতে সিদ্ধ।

বিনু খাইতেছে রন্ধনশালার বারান্দায়, তাহার অদূরে নারিকেল-তলায় ফ্যানা-ভাত খাইতেছে পেমো। সে নমঃশূদ্রের মেয়ে, রান্না ভোগ মণ্ডপের

বারান্দাতেও তাহাদের বসিবার অধিকার নাই। বিনুর সামনে কাঁসার থালা-গেলাস। পেমোর পিতলের থালা-ঘটি।

মেয়ে শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবার পরে এখানে আর ফ্যানা-ভাতের চলন ছিল না। কে খাইবে ফ্যানা-ভাত, বাড়ীতে বালক-বালিকার অভাব। প্রভাতে ঝি-চাকররা কড়কড়ে ভাত ও সরাপরা বেনুনে প্রাতঃকালীন প্রাতঃরাশ সমাধা করিত। শীতকাল সেও কিছু মন্দ খাদ্য নয়। সরিষা তেল কাঁচা লঙ্কা কাঁচা মূলা সংযোগে ইহারা কড়কড়ে ভাতকে মুখরোচক করিয়া লয়।

আজ 'বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িয়াছে', তাই পেমোও বসিয়াছে ফ্যানা-ভাত লইয়া।

বিনু কাঁঠালের বীচি চিবাইতে চিবাইতে বলে, "মা তোমাদের কাঁঠালের বীচি এখনও ফুরিয়ে যায় নি? ওখানে কত খাবার ঘটা। ওরা কিন্তু লাউডগা দিয়ে কুচো চিংড়ি ভাতে খায় না। ইলিশ মাছ ভাতে খায়। এত সকালে মাছ তুমি কোথায় পেলে মা?"

মা ভাত মেখে দিতে দিতে উত্তর দেন, "নদীতে কাশের বনের গোড়ায় শ্যাম তোর জন্যে 'দোয়ার' পেতে রেখেছিল কাল বিকেলে, ভোরে তুলে এনেছে। তুই ভালবাসিস ব'লে কুঁচো চিংড়ি ছাড়িয়ে তেল-নুন-হলুদ দিয়ে একটু সরষে-লঙ্কা বেঁটে ভাতে দিয়েছিলাম। আমাদের বীচিও ফুরিয়ে গেছে। তোর জন্যে বালির হাঁড়িতে ক'টা সরিয়ে রেখেছিলাম। হ্যাঁরে বিনু, ওখানে তোরা ফ্যানা-ভাত খাস্ নে?"

"খাই কখনো-সখনো, যেদিন তরু সখ করে রান্না করে। ক্ষিতি স্কুলে যায় তার জন্যে তাড়াতাড়ি রান্না চড়ায় ঠাকুর, আমরা তখন ভাত খেয়ে নিই।"

"তরু তোর চেয়ে বয়সে ছোট, সে কেন রাঁধবে? তরুর যেদিন ফ্যানা-ভাত খাবার ইচ্ছে হয় তুই রান্না করে দিস। কুচো চিংড়ি লাউপাতায় জড়িয়ে ভাত নামাবার আগে ভাতে গুঁজে দিস। ওরা খেয়ে কত ভালবাসবে। ফ্যানা-ভাত রান্না করতে করতে কত রান্না শিখে যাবি। মেয়েদের সবচেয়ে বড় গুণ রান্না শেখা। সকলকে খাওয়ানো, যত্ন করা।"

'চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী'। ভাত মাখার ছলে মায়ের হিতোপদেশ বিনুর ভাল লাগিল না। সে সে-প্রসঙ্গ এড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখন নদীতে নাইতে যাবে মা? আমি আজ তোমার সাথে নাইব। এখনও আমি তীরে সাগরকে দেখে নি। জল পাড়ের তলায় নেমে গেছে না?"

বিন্নুর খাওয়া হইয়াছিল, মা তাহার মুখে জলের গেলাস ধরিয়া জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, জল নেমে গেছে অনেকটা, আজ তুই ঠাকুমার সঙ্গে নদীতে নাইতে যাস! আমার এদিকে তাড়া আছে। আমি পুকুরে স্নান সেরে নেব। কাল তোকে নিয়ে যাব নদীতে।"

"আজ তোমার কিসের তাড়া মা?"

"স্নান করে মণ্ডপে পূজোর সাজ, নৈবিদ্য করে নিজের পূজো সেরে আসতে হবে ভোগের যোগাড়ে। জগাই অত খেজুরের রস দিয়ে গেছে, জ্বাল দিয়ে ঘন করে না রাখলে মা বুড়ো মানুষ তাঁর ঘাড়েই পড়বে। এমনি নিত্যি তিরিশ দিন তাঁকে ভোগ রান্না করতে হয়। আমাকে থাকতে হয় মাছ নিয়ে।"

"রস জ্বাল দিয়ে আজ তোমাদের কি হবে মা, পায়েস না পিঠে? আমার পিঠে-পায়েস খেতে খেতে অরুচি হয়ে গেছে। ওদের বাড়ীর সবাই খাবার কুমীর—খালি খাওয়া, খালি খাবার জিনিস তৈরি।"

মা হাসিলেন, "সেই জন্যে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। খাবার কুমীরদের পাশে আমার চুনোপুঁটি ভাগ পায়। তবু অভ্যাস যায় না—তোমাদের বাড়ীতে কার্ত্তিক মাস বৈশাখ মাস ভোর পায়েস দিয়ে শ্রীধরকে ভোগ দিতে হয়। নিত্য একজনা করে ব্রাহ্মণ ভোজন করেন। পায়েসের কড়া চেঁচে চাঁচি-হাতে আমি তোকে দিতে যাই। তুই যে চাঁচি ভালবাসিস। শেষকালে সেটা ভাগ করে দিই শ্যাম ও পেমোর হাতে।" মা'র চোখ অশ্রুসজল হয়। মেয়ে কিন্তু মহাখুশী, "তাই দিও মা, ওরা বড় দুঃখী, তোমরা না দিলে ওরা পাবে কোথায়?" ব'লে বিন্নু যায় পুকুরে মুখ ধুইতে।

লালমণির বাছুর হইয়াছে মঙ্গলবারে, ঠাকুমা তাহার নাম রাখিয়াছেন মঙ্গলা। মঙ্গলা পেট পুরিয়া মায়ের দুধ পান করিয়াছে। এখন রৌদ্রে শুইয়া নিদ্রায় অচৈতন্য। কি নধরকান্তি তাহার দেহ, কাঁচা লাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। বিন্নু তাহাকে স্পর্শ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। কিন্তু মঙ্গলার নিকটে বিন্নু যাইতে পারিল না, লালমণি শিং বাগাইয়া ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দে ছুটিয়া আসিল।

বিন্নু সাত হাত দূরে পিছাইয়া অকৃতজ্ঞ গাভীর পানে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল।

মা পুকুরে স্নানে আসিয়া কহিলেন, "বিন্নু, তোর ঠাকুরকাকা সাজি ভরে রোজ ফুল রাখে, কিন্তু পুরুষ মানুষ ভাল দূর্ব্বো তুলতে পারে না। নিত্যি

আমাকে দুর্ব্বো তুলে নিতে হয়, আজ আমার সময় নেই। তুই যা ত মা, চারটি দুর্ব্বো তুলে নিয়ে আয়। গোয়ালের পেছনে থক্‌থকে দুর্ব্বো হয়েছে।"

বিনু মাতৃ আদেশ পালন করিতে চলিল।

এ বাড়ী ঢুকিতেই দুই পাশে দুইটি ফুলের বাগান। একটা বাহিরে, অন্যটা গোশালার পিছনে অন্দরের সহিত সংযুক্ত। সামনেই ঈশানচন্দ্রের বিরাট্‌ ঔষধের ভাণ্ডার বা "আরোগ্য নিকেতন"। চওড়া বারান্দায় এক সারি কাঠের চেয়ার, অন্য পাশে লম্বা বেঞ্চি সংরক্ষিত। বিনু দুর্ব্বা তুলিতে আড়চোখে তাকাইয়া দেখিল এক সুসজ্জিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া ঠাকুরদার সহিত কথা কহিতেছে। ঠাকুরদার স্বর উত্তেজিত, "ম্যানেজার বাবু, আমি আমার ধনী বিধবা রোগিণীকে অসম্মান করলাম কোথায়? যে রোগের যে বিধান তাই ত আমাকে দিতে হবে। তিন দিন ওষুধ খেয়ে ব্রাহ্মণ-কন্যা ঝিম সামলে নিয়েছেন। এক মাসে আমি তাঁকে স্বাভাবিক করে দিতে পারব। আমার ওষুধের সঙ্গে পথ্য দিতে হবে, তাজা কই-মাগুর মাছের ঝোল, দাদখানি চালের ভাত। দুই বেলাই ওই পথ্য। আপনার আপত্তি, ব্রাহ্মণের বিধবাকে মাছের ব্যবস্থা দিচ্ছি কেন? কিন্তু আপনার মনিব বিধবা নন, তাঁর হাত বিধবা। বিধবার গর্ভপাতজনিত সূতিকা রোগ হয় না, হয় হাত বিধবার।"

বিনু ঠাকুরদার মন্তব্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। সে আজ একটা নূতন কথা শুনিল 'হাত বিধবা'। ওকথার মানে কি বিনুর জানিতে হইবে।

দুর্ব্বা লইয়া মণ্ডপে উপনীত হইয়া বিনু নিরীক্ষণ করিল পাথরের বাণেশ্বর শিব টাটে বসাইয়া মা ধ্যানস্থ। বিনু সেইখানে হাতের দুর্ব্বা নামাইয়া ঠাকুমার উদ্দেশে ছুটিল। বিনুর ঠাকুমা গ্রাম্য সাধারণ স্ত্রীলোক নন। বাংলা ভাষায় তাঁহার রীতিমতন দখল আছে। সংস্কৃত অল্পস্বল্প জানিলেও শাস্ত্রজ্ঞান টনটনে। রামায়ণ মহাভারত গীতা চণ্ডী তাঁহার কণ্ঠস্থ। প্রসাদ তাঁহার নাম দিয়াছে 'বিদ্যাবতী ঠাকুমা'।

বিদ্যাবতী ভোগশালার বারান্দায় ঝাঁকাখানেক তরকারি লইয়া কুটিতে বসিয়াছেন। পূজার সময়কার 'রাবণের গোষ্ঠী' পূজান্তে লঙ্কায় ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহারা অবস্থান করিতেছে তাহারাও সংখ্যায় কম নহে। কর্ত্তার সাত-আটটি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন-রত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান, এখানেই প্রতিপালিত হইয়া থাকে। তাহার উপরে দাসদাসী। দাসী-পুত্র দাসী-কন্যা। শ্রীধরের পূজারী, অতিথ অভ্যাগত।

বিনু ঠাকুমার কাছে বসিয়া প্রশ্ন করিল, "ঠাকুমা, হাত বিধবা কাকে বলে?"

ঠাকুমা বঁটি হইতে চোখ তুলিলেন, "তুই একথা কোথায় শুনলি?"

—"ঠাকুর্দা এক ভদ্রলোককে বলছিলেন।"

"ও, বুঝেছি, কদিন আগে এক জমিদারণী রোগী দেখে এসেছেন, তার কথাই বলছিলেন হাত বিধবা। সে বিধবার আচার-নিষ্ঠা পালন করে না অথচ লোক-দেখান হাতে গয়না পরে না, তারই নাম হাত বিধবা। এখন প্রসাদ হয়েছে তোর শিক্ষাগুরু, তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে তোকে বুঝিয়ে দেবে। হ্যাঁ, তোর কাছ থেকে যে শোনা হয় নি, তোর লেখাপড়া শেখা কতদূর হ'ল?"

"অনেকদূর হয়েছে ঠাকুমা, আমি ইংরাজিতে নাম লেখা শিখেছি, নাম পড়তে পারি। বাংলা পড়া তেমন এগোয় নি। কেউ দেখিয়ে না দিলে কি কারোর লেখা পড়া হয়?"

"এতকাল পরে যে সে বোধ হয়েছে তোর এই আনন্দের। কিন্তু তুই যে ইংরাজ বনে গেলি বিনু? নিজের দেশের ভাষায় জ্ঞান হ'ল না, সংস্কৃত আদি ভাষায় অক্ষর চিনলি নে। ইংরাজিতে নাম লেখা শিখে 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' হ'ল।"

বিনু প্রসাদের ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল, "ইংরাজি না জানলে ভদ্র সমাজে মেশা যায় না, সভ্য হওয়া যায় না।"

ঠাকুমা মুচকি হাসি হাসিলেন, "বেশ ত, মন দিয়ে সব ভাষাই শেখ বিনু, বিদ্যার কি শেষ আছে, 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।' পরের ভাষা শেখার আগে নিজেদের দেশের ভাষা শিখতে হয়। ইংরাজরা বাংলা ভাষা জানে না বলে ত লজ্জা বোধ করে না? তোর বাবা সংস্কৃত ভাষায় অত বড় পণ্ডিত, তুই সংস্কৃত অক্ষরই চিনলি নে, তাতে তোর লজ্জা হয় না?"

বিনু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "আজকেই আমি বাবাকে চিঠি লিখে দেব সংস্কৃত প্রথম ভাগ পাঠাতে। আচ্ছা, ঠাকুমা, তুমি যে বাবাকে পণ্ডিত বল, আমার ঠাকুরদা কি কম পণ্ডিত? আমার সকল ঠাকুরদাই পণ্ডিত, আমাদের পণ্ডিতের বাড়ী।"

"হ্যাঁ, পণ্ডিতের বাড়ী ব'লেই মেয়ে হয়েছে 'বিশ্বকর্ম্মার পুত্র চামচিকে।' তোর ঠাকুরদার পাণ্ডিত্য ছাপিয়ে চিকিৎসায় নাড়ী-জ্ঞানের খ্যাতিই বেশি।

কিন্তু হ'লে হবে কি, স্পষ্ট কথার জন্যেই ভয়ে কেউ এগোতে চায় না। সাক্ষাৎ দুর্ব্বাসা মুনি।"

বিন্নু সহসা আবদার করে, "বল না ঠাকুমা, ঠাকুরদা সাহাবাবুদের বাড়ীতে রোগী দেখতে গিয়ে কি করেছিলেন ?"

"সাহাবাবুরা এ অঞ্চলের বিরাট্ ধনী। 'টাকার গরমে ধরাকে সরা দেখে।' তোর ঠাকুরদাকে তারা নিয়ে গিয়েছিল তাদের মা'র চিকিৎসা করাতে। কবিরাজের নাড়ীজ্ঞান কতখানি তাই পরীক্ষা করতে বলে, 'আমাদের মা খুব পর্দ্দানসিন, তিনি আপনাকে হাত দেখাবেন না। তাঁর হাতে আমরা সুতো বেঁধে দিচ্ছি, আপনি পর্দ্দার আড়াল থেকে সুতো ধ'রে নাড়ী পরীক্ষা করুন।'

তোর ঠাকুরদা মনে মনে চটে গেলেও দমলেন না। বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে, তবে একটা মোটা সুতো রোগীর বাঁ-হাতের ধমনীতে শক্ত করে বেঁধে দেবেন।'

পর্দ্দার আড়ালে মেঝেয় বসলেন উনি, সুতো এনে দিল ওরা। হাতে সুতো নিয়ে চোখ বুজে বসে রইলেন ধ্যানস্থ হয়ে। কতক্ষণ পরে বিনামেঘে বজ্রপাত হ'ল। কর্ত্তা চিৎকার করে উঠলেন, 'কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে প্রতারণা—কুকুরের পায়ে সুতো বেঁধে আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। আমি চললাম প্রতারকের বাড়ী থেকে।'

সকলে এসে হাতজোড় করে পায়ে লুটিয়ে পড়ল, "কবরাজ মশাই, মাপ করুন। আপনার মতন এমন নাড়ীজ্ঞান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই, এখন চলুন মাকে দেখবেন।'

কর্ত্তা ফেটে পড়লেন, 'না, প্রতারকদের মা'র চিকিৎসার ভার আমি নিতে পারব না। অসৎদের সংসর্গে মুহূর্ত্তকালও থাকতে পারব না। আমি চললাম।'

কর্ত্তার সঙ্গেই ঘাটে পানসী-নৌকা বাঁধা ছিল। নৌকায় উঠে মাঝি-মাল্লাদের হুকুম দিলেন নৌকা ছেড়ে দিতে। সাহাবাবুরা কত মিনুতি করতে লাগল, প্রলোভন দেখাতে লাগল, পাঁচ হাজারের থেকে দশ হাজার, দশ হাজারের থেকে বিশ হাজার। উনি অটল-অচল হয়ে বললেন, "আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চিরকাল গরীব হয়েই থাকব। প্রতারকের টাকা স্পর্শ করে ধনী হ'তে চাই না।" দুর্ব্বাসা নৌকা ভাসালেন।"

ঠাকুমার আষাঢ়ে গল্প শুনিয়া বিন্নু সকৌতুকে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

১৯

মা ভোগশালায় কাজে আবদ্ধ। ঠাকুমা বিনুকে তেল মাখাইয়া স্নান করিতে লইয়া চলিলেন নদীর ঘাটে। ভরা বর্ষায় যখন নদীনালা এক হইয়া যায় তখন ভিন্ন দুর্গাসুন্দরী আর পুকুরে স্নান করেন না। চলতি জলে যে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী মিশিয়া রহিয়াছে। এইখানেই ডুব দিলে গঙ্গাস্নানের ফল পাওয়া যায়।

বিনু গোয়ালপাড়ার ভিতর দিয়া নদীতে যাইতে শুনিল যশোদা-বৌ পিত্রালয়ে গিয়াছে।

বিনু ক্ষুণ্ন লইল, যশোদা-বৌ তাহাকে বড় ভালবাসে, দেখা হইবে না। যশোদা-বৌএর শাশুড়ী ননদিনী বাহির হইয়া বিনুকে কুশল প্রশ্ন করিল। আরও কতজনা পথে আসিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। বিনু যে গোটা গ্রামের স্নেহের দুলালী।

কতদিন পরে হীরাসাগর। জল নামিয়া গিয়াছে কাশের শ্রেণীর নিম্নে, উঁচু তটের কোলে বালি ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পারে সেই হেলিয়া-পড়া বটবৃক্ষ, যাহার শাখায় শাখায় অগণিত পাখীর বাসা। মাছরাঙ্গার আবাসস্থল। টিটি পক্ষী টিহি টিহি শব্দ করিয়া উড়িতেছে, সঙ্গে শঙ্খচিল।

বিনু তীরে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে তাকাইয়া রহিল নদীর তরঙ্গভঙ্গের দিকে। হীরাসাগর তাহার কাছে পুরাতন হয় না। যতবার চোখ মেলে বিনু ততবার নব নব রূপে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ঠাকুমা বিনুর গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন সাবানে নহে, সাজিমাটিতে।

ঘাটে একে একে দেখা দিতে লাগিলেন গৃহিণীর দল। তাহাদের সহিত স্নানে নামিল পণ্ডিত বাড়ীর আকাশি। আকাশি বিনু অপেক্ষা বছর-দুইয়ের বড়। তাহার সাদামাঠা সরল স্বভাবের জন্যে বিনুর সহিত বন্ধুত্ব আছে। প্রখর বুদ্ধিসম্পনা মেয়েদের সহিত বিনু তেমন মিশিতে পারে না, বাধ-বাধ লাগে। সেই কারণে গ্রামে তাহার বন্ধুর সংখ্যা বিরল।

বিনু গলা-জলে দাঁড়াইয়া একের পরে এক ডুব দিতেছিল। শীতের প্রারম্ভ হইলেও রৌদ্রকিরণে জলের শীতলতা নাই।

আকাশি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া বিনুকে ডাকে, "বিনু, কশাড় বনের দিকে স'রে আয়, তোর সাথে আমার কথা আছে। তুই এসেছিস শুনে কাল সন্ধ্যাবেলা আমি তোর কাছে যেতে চেয়েছিলাম, মা যেতে দিলেন না।"

ঘাটের বর্ষিয়সী হাসলেন মুখ টিপিয়া। কেউ অনুচ্চস্বরে আর একজনাকে বলেন, "বিয়ে ঠিক হয়েছে, তাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলবে ওকে। স্বর সইচে না হুলির।"

"যেই না আমার বিয়ে তার আবার চিতরি বাজনা" বলিয়া আর এক বর্ষিয়সী জল ডুব দিতে থাকেন।"

ঠাকুমার স্নানের পরে গলাজলে দাঁড়াইয়া সূর্য্য প্রণাম, পূর্ব্বপুরুষদের নামে নামে জলগণ্ডুষ প্রদান, জপ পূজা কম থাকে না, এই অবকাশে বিনু উপস্থিত হয় আকাশির কাছে।

কশাড় বনের গাছে তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে উভয়ে উপবেশন করে—আকাশি বলিতে আরম্ভ করে, "দেখ বিনু এতদিনে তোদের হুলির বিয়ের ফুল ফুটল রে! বোনেদের বিয়ের বাধা ঘুচে গেল। আমি সকলের রাস্তা জুড়ে আপদ-বালাই হয়েছিলাম। দুটো মন্তর পড়ে ফুল ছিটিয়ে দিয়ে আমাকে উদ্ধার করবার লোক ঠিক হয়েছে।"

বিনুর নিরুত্তরে ভেজা চোখে আকাশির মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। ভাগ্যবিড়ম্বিতা আকাশি।

আকাশির বাবা যাদব পণ্ডিত বন্দরের হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত। তাঁহার চার কন্যা এক পুত্র। মেয়েরা বড়। আকাশি তাঁহাদের প্রথম সন্তান। বিকলাঙ্গ অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। তাহার ডান হাতখানা প্রায় বুকের সঙ্গে সংলগ্ন, শুষ্ক কাঠের মতন ডান পায়ের জোর কম হইলেও চলাফেরা করিতে অসুবিধা নাই। এই খুঁত ছাড়া আকাশির ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে সচরাচর কাহারও চোখে পড়ে না। আকাশির বিবাহ হয় না। দক্ষিণহস্ত অনড তাহাকে কে বিবাহ করিবে? পরের বোনগুলি বিবাহের বয়সপ্রাপ্ত হইতেছে। শাস্ত্রানুযায়ী জ্যেষ্ঠার বিবাহ না হইলে সেগুলির গতি-মুক্তি করিতে কেহ অগ্রসর হইতে চাহে না। পণ্ডিতমশায় আকাশিকে লইয়া বিষম বিপাকে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। এমন সময় আকাশির ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইলেন।

আকাশির এত বড় সৌভাগ্যের খবরে বিনু চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া আকাশি ঈষৎ আহত হইয়া কহিল, "তুই চুপ করে রয়েছিস কেন রে? এই মাসের সাতাশে তারিখে আমার বিয়ে, গয়নাও গড়ানো হয়েছে। দেখতে আসিস একদিন গয়নাগাঁটি।"

আকাশির যে কখনও বিবাহ হইতে পারে বিন্নু তাহা প্রত্যাশা করে নাই, তাই ক্ষণেকের জন্য বিমূঢ় হইয়াছিল সে। এখন সে উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কার সাথে তোর বিয়ে রে? তার নাম কি? কোন গাঁয়ে থাকে? বিয়ে হলেই যে তোকে যেতে হ'বে শ্বশুর বাড়ীতে। একখানা হাত নিয়ে সেখানে তোর খুব কষ্ট হবে আকাশি।"

"না রে বিন্নু তারা কেন মুলো বউকে ঘরে নিতে যাবে? আমি যেমন আছি তেমন থাকব। সাগরপুরের কুলীন বামুন, এখন ত নাম নিতে দোষ নেই, সাতপাক ঘুরি নি। বরের নাম দয়াময় ভাদুড়ী। মা আছে, বাপ নেই, বড় গরীব, বাড়ীতে একখানার বেশি ঘর নেই। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে আছে, পয়লা মাঘ বিয়ে হবে। বৌএর জন্যে একখানা ঘরের দরকার। বাবা তাকে ঘর তুলতে একশ' টাকা দেবেন, তাই সে সাতপাক ঘুরে মন্তর পড়তে রাজি হয়েছে। বিয়ের পরের দিনই টাকা নিয়ে চ'লে যাবে। তারপরে বাতাসী উদাসীর বিয়ে। একঘরের দুই ভাইয়ের সাথে ঠিক হ'য়ে রয়েছে। বড়র না হলে ছোটদের হ'তে পারে না এই জন্যেই এতদিন দেরী হল। আমাদের বোনেরা সুন্দর ব'লে লোকে আদর ক'রে নিতে চায়।"

বিন্নু বলে, "তোর মতন কেউ অত সুন্দর নয় আকাশি। সকলে বলে তুই পরী। তোর হাতটার জন্যেই যত জালা। হ্যাঁরে, তোর কি গয়না হয়েছে? ডান হাতে গয়না পরবি কি করে? সোজা হয় না?"

"মুলোরা যেমন গয়না পরতে পারে মা তেমনি গয়নাই গড়িয়েছেন। নারকেলফুল সুতোয় গাঁথা, মুরখী মালা, কাণবালা আংটি নথ, পায়ে গুজরী। মা নিজের গয়না ভেঙ্গে আমাদের তিন বোনের একসমান করে গয়না গড়িয়ে রেখেছেন। সুহাসী এখনও ছোট, ওর জন্যেও কাটা তাবিজ আর চিক রেখেছেন। মা'র সোনা ছিল তাই রক্ষে। এমনিইত কত জমি বাবার বিক্রি করতে হ'ল বিয়ের খরচের জন্যে।"

আকাশির সংসারীর কথা শুনতে বিন্নুর ভাল লাগছিল না। তাকে টানছিল হীরাসাগরের কল কল ছল ছল জলকল্লোল।

বিন্নু বলিল, "ঠাকুমার জপ-তপ হয়ে গেল বুঝি, এক্ষুনি তাড়া দেবেন। আমার একটুও সাঁতার কাটা হ'ল না।"

আকাশি চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "কাকে নিয়ে সাঁতার দিবি রে, পাড়ার মেয়েরা এখনও নাইতে আসে নি। এসেছে নাকটেপা বুড়োর দল।

আর একটা কথা তোকে বলে দেই—সাবধান, আমার বিয়ের কথা কাউকে বলিস নে। লোক জানাজানি করলে ভাংচি দেবে।"

"ভাংচি?"

"হ্যাঁ, ভাংচি। আমার মতন হুলোর বিয়ে, আবার দায়মুক্ত, এই হিংসায় বরের কাছে গাঁয়ের লোকের লাগানি-ভাঙ্গানির নাম ভাংচি দেওয়া। সেই ভয়ে মা এখন আমাকে কারোর বাড়ীতে যেতে দিতে চান না।"

"না, আমি কাউকে বলব না।" বলিয়া বিনু জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার পরে সুরু হইয়া গেল সাঁতার কাটা, জলের সহিত মাতন।

ক্ষণকাল পরে দুর্গাসুন্দরীর জপ-তপ শেষ হইলে তিনি হাঁক-ডাক আরম্ভ করিলেন, "এই বিনু, আর নয় খুব হয়েছে, এখন উঠে আয়। বেলা হয়েছে, আমার সৃষ্টি পড়ে রয়েছে।"

ঠাকুমার তাড়নায় বিনুকে অনিচ্ছার সহিত জল হইতে উঠিতে হইল। তখন আকাশি স্নানে নামিয়াছে। তাহার মাথাভরা কালো কুচকুচে চুল আলগা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে চোখে-মুখে। বিনুর মনে হইল একটি প্রফুল্ল কমল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া ঘাট আলো করিতেছে।

২০

দ্বিপ্রহরের আহারাদির পর বিনু বাবাকে চিঠি লিখিতে বসিল। ঠাকুমার হাতে পৈতার টেকো, মা'র হস্তে তুলা। ইঁহাদের দিবানিদ্রার অভ্যাস নাই। গোটা দুপুর কাটিয়া যায় শাশুড়ী-বধূর নানারূপ হালকা কাজে। দুর্গাসুন্দরীর মত পৈতা কাটিতে কেহ পারে না। হেমাঙ্গিনীর কাটা পৈতা অমন সমান সরু হয় না। বাড়ীতে অজস্র জটা কার্পাসের গাছ। হেমাঙ্গিনী সময় পাইলেই তুলা পিঁজিয়া বাঁশের চোঙ্গার ভিতরে 'সাজ' করিয়া রাখিয়া দেয়। দুর্গাসুন্দরী সুতা কাটেন কুরুরর কুরুরর শব্দ করিয়া। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বিশেষতঃ রাবণের গোষ্ঠিদের পৈতা অল্প লাগে না। দুর্গাসুন্দরীর হাতের মিহি পৈতার সমাদর সর্ব্বত্র। দেশ-দেশান্তরে পৈতা চালিত হয়। পালা-পার্ব্বণেও যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন হয়। ইহা ভিন্ন পশম ও ক্রুশকাঠি লইয়া অবকাশ সময় দুই শাশুড়ী-বধূ বসিয়া যান টুপি মোজা গলাবন্ধ বুনিতে। কখন বা ফুলপাতা নক্সার কাঁথা সেলাইতে অবকাশ অতিবাহিত হয়। আমের সময় সেলাই তোলা থাকে। আমসী হইতে আচার মোরব্বা আমসত্ত্বে আমকাল কাটিয়া যায়। ইহার মধ্যে

ঘরে ঘরে বিবাহের পিঁড়ি আলপনা আছে। কড়ি সংযোগে পাটের শিকা বোনা আছে। পুরাণ পাঠ আছে।

বিনুর বাবাকে চিঠি লেখা শেষ হইল। সে চিঠিখানা আগাইয়া দিল মায়ের দিকে।

ঠাকুমা টেকোয় সুতা জড়াইতে জড়াইতে নাত্‌নীর পানে চোখ তুলিয়া কহিলেন, "তোর বিয়ের সময় মেজবৌ যে বাণ্ডিল ধরে পশম দিয়েছিল তোর বাক্সে, সেগুলো দিয়ে কিছু বুনেছিস কি? তুই ত দিব্যি বুনতে শিখেছিলি বিনু?"

বিনু সহসা ঝাঁজিয়া ওঠে, "বুনব কখন? সময় পেলে ত? একবার খাতা লিখতে হবে, বই মুখস্ত করতে হবে, আবার নিয়মের ঘরে ঢুকতে হবে, পত্তর পাওয়া মাত্তর উত্তর দিতে হবে। এত সবের ভেতরে উল বোনা।"

ঠাকুমা কামিনীর মা'র নিকট হইতে বিনুর কর্ম্মতালিকা শুনিয়া লইয়াছিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "যাদের কাজের অত লোকজন সেখানে একটু টুটুর-পুটুর করেই কি গলে যাবি বিনু? দেখ ত তোর মা দিনরাত কত কাজ করে? কাজকে ভয় পেলে কাজ বোঝা হয়। হালকা ভাবলে গায়ে লাগে না। দেওর ননদরা রয়েছে, শীতের সময় তাদের কিছু বুনে দিস, ফিরে গিয়ে। তারা কত খুসী হবে।"

"তাদের খুসী করতে আমার বয়ে গেছে।" বলিয়া বিনু ঘরের বাহির হইল।

বিনুর অপেক্ষায় কয়েকটা ডাঁসা পেয়ারা সংগ্রহ করিয়া পেমো বসিয়াছিল ঢেঁকিশালায় ঢেঁকির উপরে।

প্রভাতে পায়রাগুলিকে ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় নাই। পায়রার ঝাঁক মাঠে গিয়াছিল খাদ্যানুসন্ধানে। খোপে ছিল ডিমে তা-দেওয়া-রত কপোতীরা আর শক্তিহীন শাবক।

ভরা দুপুর, বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পায়রার ঝাঁক মাঠ হইতে ফিরিয়া যে-যাহার খোপে বিশ্রাম করিতেছে। কোন কোনটা মৃদু মৃদু গুঞ্জন তুলিতেছে "বাক বাক কুঁ, বাক বাক কুঁ।"

বিনু খোপের সামনে উপনীত হইয়া ডাকিতে লাগিল "এই লোটন, ছোটন, তিলমণি, টগরফুলি, আয়, আয় আয়।"

পায়রা বিশ্রাম-সুখ অবহেলা করিয়া বিনুর সস্নেহ আহ্বানে সাড়া দিল না। বাহিরে আসিল না।

অভিমানে বিনুর চোখ জলে ভরিয়া গেল। কি অকৃতজ্ঞ জগৎ! দুই দিনের অদর্শনে সকলে সকলকে ভুলিয়া যায়। নহিলে যে লালমণি বিনুর পদধ্বনিতে চকিত হইয়া ছুটিয়া আসিত, সেই কি না তাহার বাছুরের কাছে বিনুকে দেখিয়া শিং বাঁকাইয়া তাড়িয়া আসিয়াছিল।

বিনু গিয়া পেমোর অদূরে ঢেঁকিতে উপবেশন করিল। পেমো সাগ্রহে অঞ্চল হইতে বাহির করিয়া দিল চারটা পেয়ারা—তাহার অন্বেষণের ফল।

বিনু সানন্দে প্রশ্ন করিল, "এখনও কি আমাদের গাছে পেয়ারা আছে? কোথায় পেলি রে?"

"সগল গাছ খুঁজিপাতি পাইচি ঠাকুজ্জি। আরও একটু একটু কষা রইচে পাতার মধ্যি।"

"সেগুলো বড় হ'তে হ'তে আমাকে ওরা নিয়ে যাবে। তুই মজা করে খাস পেমো।"

পেমো ক্ষুণ্ণ হইয়া চুপ করিয়া রহিল। বিনু দুইটা পেয়ারা পেমোকে দিয়া একটা পেয়ারা আঁচলে মুছিয়া কামড় দিতে লাগিল। পেয়ারা মুখে তুলিয়া মনে পড়িল তরুকে। সে কত দুর্লভ জিনিষ বিনুকে গোপনে খাইতে দিয়াছে। সে এখানে আসিবার সময় পথের পাশে দাঁড়াইয়া কেমন 'টু' দিয়াছিল। 'বইদি যাব' বলিয়া সুমস্ত কত কান্না কাঁদিয়াছিল। মানুষ মানুষকে যত ভালবাসিতে পারে তাহা কপোত-কপোতী, লালমণি গাভী কোথায় পাইবে? উহাদের অপেক্ষা হীরাসাগর নদী তাহাকে ভালবাসে। ঘন অরণ্যানী ভালবাসে। তাহারা কথা কহিতে না পারিলেও বিনু হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে পারে তাহাদের অব্যক্ত ভাষা। হীরাসাগরের জলে ডুব দিলেই বিনু শুনিতে পায় ছল ছল ফিস ফিস করিয়া হীরাসাগর ডাকে, "বিনু আয়, আয়, আমার গভীরে আয়।" অরণ্যও সস্নেহে আহ্বান করে, "আয় আয়, আমার গহনে আয়।"

বিনুকে বিমনা দেখিয়া পেমো প্রস্তাব করে, "তোমাগো খেলনের ঘরডা ভাঙ্গিচুরি খান খান হইচে ঠাকুজ্জি। আমি ঘরডা নেপিপুঁছি টলটলে করি থুইগা। চল তুমি রাঁধন-বাড়ন খ্যালা করিবা?"

বিনু পেয়ারা চিবাইতে চিবাইতে পেমোকে ধমক দেয়, "ধ্যেৎ, এখন মাটির হাঁড়ি-কুড়ি নিয়ে খেলা করবে কে? আমি যে বড় হয়ে গেছি।"

পেমো চোরা কটাক্ষ বারেক বিন্নুর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া ভয়ে ভয়ে ফের বলে, "তা হলি তোমাগো পুতলা গুলান বার করি আন গা, কতদিন পুতলা খ্যালন কর না। ভরা দুকুরে করিবা কি ?"

"আমি কি তোর মত, আমার কি লেখাপড়া নেই ? পুতুল খেলার বয়েস উঠছে ? মূর্খ হয়ে থাকার চেয়ে দুঃখ আর জগতে নেই। লেখাপড়া শিখলে পৃথিবীর কত কি জানা যায়, কত আনন্দ পাওয়া যায়। এবার তোকেও আমি বই পড়তে শেখাব পেমো।"

বিন্নুর মুখে নূতন স্থর শুনিয়া পেমো আশ্চর্য্য হইল। সে জানিত না বিন্নু তাহার স্বামীর বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতেছে। বিন্নু যাহাই করুক না কেন, পেমো খেলা হইবে না জানিয়া দুঃখিত হইল। হায়, এত শিগ্‌গীর মানুষের খেলার নেশা ভাঙ্গিয়া যায় ! বিন্নু বড় হইয়াছে, বড হইলে দুমদাম শব্দ করিয়া হাঁটে কেন ? খিল্ খিল্ করিয়া হাসে কেন ? একবার গরুর গলা জড়াইয়া ধরে, পাখীর বাসা খুঁজিয়া বেড়ায়। পেমো দাসী-কন্যা, জমিদার-বৌ তাহার সহিত আর খেলাধূলা করিবে না, এই হইল আসল ব্যাপার। বড় না বড় ছাইয়ের বড় হইয়াছে।

পেমো নীরবে পেয়ারা খাইতে লাগিল।

বিন্নু একটা শেষ করিয়া আর একটা কামড় দিয়া বলিল, "তোকে লেখাপড়া শেখাব শুনে চুপ করে রইলি কেন ? আমার শেষ-করা প্রথম ভাগ রয়েছে। কাল থেকেই তোকে অ আ শেখাব।"

"চাঁড়ালের ম্যায়া ন্যাকাপড়া করিবে তা হ'লে বাসন মাজিবি কে ? ধান ভানিবে কে ?"

পেমোর কণ্ঠে হতাশের স্থর। সেটা বিন্নুর হৃদয়ে স্পর্শ করিল। বিন্নু তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল, "চাঁড়াল কি মানুষ নয় ? কাজ করলে কি পড়াশোনা হয় না, আমিও না কত কাজ করে পড়াশোনা করছি। ওদিকে ওটা কি পাখী ডাকছে রে ? তোর সেই নন্দন পাখীটা ত আসে নি ? চল দেখি গে।"

"ও ত কানাকুয়া পক্ষী ডাকিতে নাগিছে ঠাকুরুণ। বাগিচায় কলা না পাকিলে নন্দন আসিবে কিসের গন্ধে।" বলিয়া পেমো অগ্রসর হইল। বিন্নু তাহার পেছনে।

এ বাড়ীতে মণ্ডবের পশ্চাৎভাগে একটা ডোবা আছে। ডোবার চারিপাশ

দিয়া বৃক্ষের পরে বৃক্ষের সারি। কতক পুরাতন ফলবান গাছ, কতক আগাছা। আম-জাম। বাড়ীর কেহ বিনা প্রয়োজনে এদিকটায় আসে না। সেই নিবিড় বনখণ্ডে শিকড় বাহির করা এক বৃদ্ধ তেঁতুলগাছের ছায়ায় বিনু বসিল।

দেবীর পদতলে বরপ্রার্থিণী সেবিকারূপে আসন লইল পেমো। সামনেই শৈবালে আচ্ছন্ন ডোবা। বর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল, এখন প্রায় জলশূন্য। সাদা বকের সারি ডোবায় বিচরণ করিতেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাছের আশায়। ডোবার গায়ে ঘন জঙ্গলে ফুটিয়াছে তুপুরে চণ্ডীর লাল লাল ফুল, ভাঁটি ফুল, ঘাসের ফুল। বিনু অনিমেষে তাকায় সেই ফুলের দিকে। তেঁতুলগাছের সুউচ্চ শাখায় কোকিল ডাকিতেছে। বিলাসী কোকিল শীতের সময় চলিয়া যায় ভিন্ন দেশে আবার ফিরিয়া আসে বসন্ত সমাগমে। গোবরা-শালিক মাটি ঠোকরাইয়া গোবরে পোকা খাইতেছে।

গাছের পাতা দুই-একটা করিয়া ঝরিতেছে টুপটুপ। এখনও ঝরাপাতার বিলাপ-তানে বনস্থল ভরিয়া যায় নাই।

বিনু মুগ্ধ বিস্ময়ে দিকে দিকে নেত্রপাত করিয়া এই রূপ রস স্পর্শ গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে শুষিয়া লইতে চায়। বিনুর গৌরবের পরিবর্তে ভয় হইতেছিল সে যেন বড় হইয়া যাইতেছে। তাই পুতুলের বাক্স বাহির করিতে ইচ্ছা হইল না। খেলাঘরে ঘরকন্না সাজাইতে মন চাহিল না। বড় হওয়া মন যদি প্রকৃতির এ অনবদ্য রূপসাগরে নিমগ্ন হইতে না চায়, তাহার আঁখিপল্লব হইতে যদি মায়াকজ্জল মুছিয়া যায় তাহা হইলে বিনু বড় হইতে চাহে না। দূর দিগন্ত হইতে আসিতেছে বাসন্তীশ্রীতে বিভূষিত হইয়া মনোহর মত্তমুখর নব যৌবন। কে তাহাকে সাদরে বরণ করিয়া লইবে, সে ভুলাইয়া দেয় বিনুর সোনার কিশোরের স্বপ্ন, তাহাকে দিয়া বিনুর প্রয়োজন নাই।

"হই ঠাকুজ্জি, ঠাকুজ্জি হ।"

পেমোর দাদা গরুর রাখাল শ্যামাচরণ যেন হারানো গরু খুঁজিতে বাহির হইয়াছে।

বিনু চমকিত হইয়া সারা দেয়, "আমরা এখানে শ্যাম, কেন ডাকছিস?"

শ্যাম কাছে আসিয়া তড়বড় করে, "তোমাগো সারা বাড়ী তল্লাস করি হয়রাণি হইচি ঠাকুজ্জি। কলা বাগিচায় গেইচি, আম বাগিচায় গিইচি, লেচু—"

বিনু বাধা দেয়, "কত বাগানে খুঁজেছিস তা দিয়ে কি দরকার? কেন ডাকছিস আমাকে?"

"জগাই গাছির বৌ তোমাগো নাগি পাটারি গুড় নয়া বসি রইচে। গোয়ালপাড়ার বিন্দি দিতি আইছে খেতর চাঁছি। মাঠান ডাকিছে।"

"চল যাই, দুপুর বেলা সকলে হাজির হয়েছে।"

পেমো এতক্ষণে মৌনব্রত ভঙ্গ করে, "দুকুর কনে ঠাকুজ্জি, বেলা যে পড়ি আইছে। তুমি চায়ে চায়ে গাছ-গাছালি দেখিছিলা। আমি গাছের গায়ে মাথা রাখি এক ঘোম দিয়া লইছি।"

"বেশ করেছিস, বসলেই ঘুম, শুলেই ঘুম, খালি ঘুম।" বলিতে বলিতে বিনু অনিচ্ছার সহিত বনভূমি পরিত্যাগ করিল।

রায়বাড়ীতে যেমন উঠোন ঝাঁট দেওয়া, লেপিয়া দেওয়ার ও ধানের 'জাত' করিবার মালীবৌ, এ বাড়ীতেও তেমনি কাজ করে বিধবা মালী-মেয়ে টগর।

প্রভাতে টগর গোবর গুলিয়া গোটা বাড়ীতে ছড়া দিতেছিল। দুর্গাসুন্দরী টগরকে ডাকিয়া কহিলেন, "শোন টগর, আজ আমাদের লালমণির গোরক্ষ ধার শোধ, তুই বিকেলে এসে গোবর দিয়ে ভাল করে উঠোনটা নিকিয়ে দিয়ে যাস।"

টগর হাসিমুখে বলে, "ওমা, ইয়ার মধ্যিই নালমণির একুশ দিন হইয়া গেল। আমি সাঁজ বেলার আগে-ভাগেই উইঠান নেপি দবদবে করি দিব মাঠান। আমাগো গোক্ষুর নাড়ু দিবা না?"

"দেব না কেন লো, তোদের জন্যেই ত আজকের ক্ষীরের নাড়ু। কাল নারায়ণের ভোগে নাড়ু দিয়ে তবে না বাড়ীর সকলে প্রসাদ পাবে।"

দুর্গাসুন্দরী আদেশ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। আজ তাঁহাদের অনেক কাজ। লালমণির সমস্ত দুধ দিয়া ক্ষীরের নাড়ু করিতে হইবে। মূলাষষ্ঠী আসিতেছে, তাহারও আয়োজন আছে।

২১

কবীর জোলা আসিয়াছে লালমণির দুধ দুইতে। লালমণির কি সোজা বিক্রম! কবীর ভিন্ন আর কাহারও সাধ্য নাই তাহার বাঁটে হাত দেয়। কবীর লালমণিকে ডাকে 'লাল বিটি।' লাল বিটি যেন সাক্ষাৎ কপিলা।

অফুরন্ত তাহার দুধের ভাণ্ডার। লাল টুকটুকে মাটির দোনা (চ্যাপটা মাটির হাঁড়ি) আনা হইয়াছে লালমণির নবপ্রসূত বৎসের কল্যাণে।

কবীর বসিয়াছে দুধ-দোহনে, পাশে পিতলের বালতি লইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন দুর্গাসুন্দরী। লালমণি যদি শান্ত হইয়া দুধ দেয়, তাহা হইলে দোনা ভরিয়া বালতিও ভরিয়া যায় তাহার দুগ্ধে।

হ্যাঁ, লালমণি আজ শান্ত হইয়াই দুধ দিয়াছে। গাভীরা যে দেবী ভগবতী অন্তর্যামিনী, গোক্ষুর ধারশোধে প্রচুর ক্ষীরের নাড়ু হইলে সকলে পরিতোষপূর্ব্বক ভক্ষণ করিবে বুঝিয়া লালমণি দুধ দিয়াছে দোনা ও বালতি ভরিয়া।

কবীর হাসিয়া বলে "মাঠান, দেখ বিটির কাণ্ড, টানি দোয়ালে আর এক বালতি তোমাগো ভরি যায়।"

গৃহিণী মাথা নাড়েন, "না শেখের ব্যাটা, আর দোয়াবেন না। খাক বাছুর মায়ের দুধ প্রাণ ভরে। এই দুধেই অনেক নাড়ু হবে। সন্ধ্যেবেলা আপনি আসবেন ছেলেদের নিয়ে।"

কবীর সানন্দে মাথা হেলায়, "মাঠানের কওন লাগিবে ক্যানে, আমাগো বিটির পরব, আমি না আইলে কেডা করিবে গোক্ষুর ধারশোধ।"

কবীর শেখ সম্পন্ন গৃহস্থ, তাহার বড় ছেলে মৌলভী, আর দুই ছেলে বাপের তাঁতে-বোনা গামছা লুঙ্গি ধুতি ইত্যাদি লইয়া হাটে বেচাকেনা করে। জমির তদ্বির করে। মজুর খাটায়। কবীর লালমণিকে দোহন করে, অভাবে নয়, স্বভাবে। সে ইহার জন্য কর্ত্তার নিকটে পারিশ্রমিক লয় না। পূজায় সম্মানের ধুতি-চাদর পায়, শীতের কম্বল। পাল-পার্ব্বণে খায়-দায়, বাড়ীর লোকের মত আসা-যাওয়া করে। রোগে-ভোগে বিনামূল্যে ঔষধ খায় সমগ্র পরিবার।

বিনুর মা গতকাল মেয়েকে কথা দিয়েছিলেন তাহাকে লইয়া আজ নদীতে স্নান করিতে যাইবেন।

কথা রাখিতে মা অনবরত বিনুকে তাড়া দিতে লাগিলেন চুল খুলিয়া তেল মাখিতে। আজ ভোগশালায় রায়বাড়ীর পুনরাবৃত্তি হইবে। লালমণির সমস্ত দুধের নাড়ু তৈরি, একটুখানি কথা নয়। মেয়ে একবার জলে নামিলে সহজে উঠিতে চাহিবে না, কিন্তু মায়ের আজ বিলম্ব করিবার অবকাশ হইবে না।

বিনুর চুলে তেল মাখাইতে মাখাইতে মা মেয়েকে সাবধান করিতে

লাগিলেন। বিনু গম্ভীর হইয়া মাকে আশ্বাস দিল, "আজ আমি নাইতে নেমে একটুও দেরি করব না মা, কাজ থাকলে কেউ কি দেরি করতে পারে? আমি কি বুঝি না। এত সকালে কার দায় পড়েছে শীতকালে নাইতে আসার। ঘাটে লোক না থাকলে দেরি হবে কিসে? নেয়ে এসে আজ আমিও তোমাদের সঙ্গে ভোগের ঘরে কাজ করব। দেখ তুমি, কি সুন্দর করে আমি ক্ষীরের নাড়ু বানিয়ে দেব। আমি কত শিখেছি, এখন বড় হয়ে গেছি।"

আনন্দে মা'র চোখে জল আসিল। তাঁহার অশান্ত অবুঝ বিনুর সুবুদ্ধি হইতেছে, সে বড় হইতেছে।

সন্ধ্যাসমাগমে গোক্ষুরের ধারশোধের সূচনা হইল। লালমণিকে মঙ্গলা বাছুর সমেত বাঁধিয়া রাখা হইল আঙ্গিনার এককোণে। পাড়ার গরুর রাখাল-শ্রেণীর বালকরা উপস্থিত হইল। কবীর জোলা আসিল তাহার ছেলে রূপাকে লইয়া। লেপাপোছা উঠানে ধূপ দীপ জ্বালিয়া একখানা কলার মাইজ পাতা ধুইয়া পাতা হইল। পাতার উপরে মুড়ির মোয়ার আকৃতি রাখা হইল একটি ক্ষীরের প্রকাণ্ড নাড়ু। কাণা-উঁচু একখানা পিতলের কাঁসিবোঝাই করিয়া রাখা হইল নাড়ুর আকার বাকী নাড়ুগুলি।

লালমণির প্রকৃত রাখাল শ্যামচরণ। শ্যাম স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে শুষ্ক গামছা গায়ে জড়াইয়া বসিল সকলের মাঝখানে। গোক্ষুর ধারের মন্ত্র হইল গ্রাম্য-গান—মূল গাওক হইল কবীর, বাকী সকলে দোহার। কবীর মেঠো সুরে গান ধরিল—

"আপনার মা'র দুধে আপনি হইলাম চোর,
গলায় বান্দিয়া দিল পাট-সোলার ডোর
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।
খাইতে দেয় না দুধ দোনা ভরি দোয়ায়
ক্ষিদের তাড়নে মোর প্যাটটা শুকায়,
হাঁচ্চো হাঁচ্চো হাঁচ্চো।

জয় বাবা, গোক্ষুরনাথ, গোপালক গোরক্ষক।" সমস্বরে জিগীর দিয়া সকলে ভূমিতে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

শ্যাম চিৎ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া ক্ষীরের ঢেলাটা মুখে তুলিয়া লইল। হইয়া গেল গোক্ষুর ধার শোধ করা।

দুর্গাসুন্দরী বিনুর উপরে ভার দিলেন কলার পাতায় করিয়া সকলকে

চারিটা করিয়া নাড়ু বিতরণের। গরুর রাখাল গোক্ষুর নাড়ুটা খাইলেও তাহাকে আরও চারিটা নাড়ু দিতে হইল।

টগর ঢেঁকিশালার আড়াল হইতে কহিল, "মাঠান, আমি আইচি গোক্ষুর বাবার পরসাদ নইতে।"

মাঠান এক থাবা নাড়ু কলার পাতায় মুড়িয়া তাহার আঁচলে ফেলিয়া দিলেন। আর এক থাবা দিলেন কবীরকে।

এদিনের নাড়ু বাড়ীর কেহ না খাইলেও দুর্গাসুন্দরী অন্য গরুর দুগ্ধে আরও নাড়ু করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি কম পড়িয়া যায় ওইগুলি দিয়া চালাইয়া দিবেন। তা ছাড়া দাস-দাসীরা আছে। কর্ত্তার ছাত্রের সংখ্যাও কম নহে। সকলেই যে আশা করিয়া থাকে।

২২

হেমন্তের বেলা পাখীর মতন পাখা মেলিয়া যেন উড়িয়া যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেও সে ধরা দেয় না।

সেদিন অপরাহ্ণে এ গ্রামের ছোট বড় বৌ ঝি সকলের গ্রামপ্রসিদ্ধ মৈত্রবাড়ীর ঠাকুরকন্যা বিনুকে দেখিতে আসিলেন।

তখনকার কালে পল্লীগ্রামে বড় ননদিনীকে ছোট ভ্রাতৃজায়ারা 'ঠাকুরকন্যা' বলিয়া ডাকিত। ছোটরা ঠাকুজ্জি, শ্বশুর ঠাকুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা বটঠাকুর বা বড় ঠাকুর। দেবররা ছোট ঠাকুর, শাশুড়ী ঠাকুরাণী। বর্ত্তমান যুগের মত ঠাকুর নামধারী পাচক সে-যুগের রন্ধনশালার অধিশ্বর হইতে পারে নাই। সাধারণ গৃহস্থ গৃহে অজ্ঞাত-কুলশীল পাচকের রন্ধন অন্ন কেহ গ্রহণ করিত না। ধনী সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা অবশ্য স্বতন্ত্র।

ঠাকুরকন্যার প্রকৃত নাম হইল শশিকলা। সে নামে ডাকিবার মানুষ এ গ্রামে আর একটিও অবশিষ্ট নাই। সে নাম বহু পূর্ব্বেই পৃথিবী হইতে মুছিয়া গিয়াছে। যাঁহারা একদা ইঁহাকে ঠাকুরকন্যা সম্বোধন করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা ত গিয়াছেনই, তাঁহাদের ছেলে-মেয়েরাও পাড়ি দিয়াছে ভবনদীতে। এখন নাতীদের পালা চলিতেছে। 'ঠাকুরকন্যা' কিন্তু বিরল পত্র বটগাছের মত এখনও দিব্য খাড়া রহিয়াছেন। কেহ বলে, "বুড়ীর বয়েস একশো দশ" কেহ বলে, "একশো পাঁচ"। যাহার যাহা খুসী বলিলেও তিনি বেশ আছেন। মাথার চুল এখনও কাঁচার ভাগ বেশি। দাঁত একেবারে

নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই, ফাঁকে ফাঁকে দুই-একটা হাসিলে ঝিলিক দেয়। সুঠাম মেদশূন্য দেহ, অতসী ফুলের অনুরূপ গায়ের বর্ণ, এখনও উজ্জ্বল, অম্লান।'

কে জানে সে কত যুগ পূর্ব্বের কথা—শশিকলা অপূর্ব্ব রূপের জোরে এক সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীর রাজ অন্তঃপুর আলো করিয়া বৌরাণী নামে বরণীয়া হইয়াছিলেন। দীন দরিদ্রের কন্যার রাজ্যভোগ বেশি দিন হয় নাই। ফিরিতে হইয়াছিল সীমন্তের সিঁদুর মুছিয়া। শশিকলার সিঁদুর মুছিয়া গেলেও সে ফিরিল প্রচুর বিত্তশালিনী হইয়া। পিতার ভাঙ্গা গৃহ মনোরম অট্টালিকায় পরিণত হইল। জলাশয় খনন হইয়া স্বচ্ছ জলে টলমল করিতে লাগিল। ঘরে বসিয়া পেট পূজা করিবার বিঘা বিঘা ধান জমি হইল। কন্যার আনীত সম্পদের সুব্যবস্থা হইবার পরে বাপ ভাই লড়িলেন যাবজ্জীবনব্যাপী মাসোহারারও জন্যে। মোটা দাগে মাসোহারা ধার্য্য হইয়া গেল।

পুরাণে বর্ণিত আছে নাগকুলে দেবী মনসা যেমন পূজিতা হইয়াছিলেন তেমনি পূজিত হইয়াছেন ঠাকুরকন্যা। পিতামাতা, ভাই ও বধূরা ঠাকুরকন্যাকে আরাধনা করিয়া বিদায় লইয়াছে। এখনও তাঁহাদের নাতি ও বধূরা সযত্নে ঠাকুরকন্যার পূজার থালি সাজাইয়া রাখিয়াছে। দেবী অপ্রসন্না হইলে বিষম বিপাক। সংসার বৃহৎ হইয়াছে, ব্যয় মাত্রা ছাড়াইয়া যাইতেছে। গোষ্ঠীসমেত সকলে চাহিয়া আছে ওই মাসোহারার দিকে। ঠাকুরকন্যার পায়ে কাঁটা ফুটিলে পরিবারের সকলে বুক পাতিয়া দেয়। হাঁচিলে-কাশিলে উদ্বেগের অন্ত থাকে না। কাজেই ঠাকুরকন্যা আছেন পরম সমাদরে পরম যত্নে।

ঠাকুরকন্যা আঙ্গিনায় পা দিয়া হাঁক দিলেন, "ওলো ঈশানের ঈশানী বড়বৌ, কোথায় তোরা? নাতনী এসেছে একদিন ত দেখাতেও নিয়ে গেলি না? সকলের জন্যেই পরাণটা আমার আকুলি-ব্যাকুলি করে। তাই নিজেই দেখতে এলাম।"

দুর্গাসুন্দরী বারান্দায় কুশাসন পাতিয়া দিয়া ঠাকুরকন্যাকে প্রণাম করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন "আসুন ঠাকুরকন্যা, বসুন। কালকেই আপনাকে প্রণাম করাতে বিনুকে নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। শীতের বেলা, সংসার ফেলে বেরোন হয়ে ওঠে না। ও বৌমা, বিনু, ঠাকুরকন্যা এসেছেন, প্রণাম করে যাও।"

ঠাকুরকন্যা কুশাসন অধিকার করিলে মা ও মেয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, মা সরিয়া গেল। বিনু বসিল সেখানে।

ঠাকুরকন্যা সস্নেহে বিন্নুর চিবুক ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন, "কতদিন পরে তোর সোনামুখ দেখলাম বিন্নু, তুই এখনও তেমনি ছোটখাটো রোগা রয়েছিস ? শরীরের বাড়বাড়ন্ত বড় কম। এখন ত শীতকালটা থাকবি এখানে ? নতুন বৌকে বিয়ের প্রথম বছরে সকলেই বাপের বাড়ীতে রেখে দেয়।"

বিন্নু কহিল, "আমাকে এই মাসেই নিয়ে যাবে।"

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, "না ঠাকুরকন্যা, ওরা মেয়েটাকে থাকতে দেয় না এখানে। এই ত মাত্তর পনের দিনের কড়ারে আসতে দিয়েছে। পনের দিনের কেটে গেল কটা দিন।"

ঠাকুরকন্যা গালে হাত দিলেন, "ছটাকি জমিদারদের এ আবার কেমনধারা রীতি-প্রকৃতি ? এদিক নেই, সেদিক আছে। বিষের নামে খোঁজ নেই কুলোপনা চক্কর। হঁ্যা, সাবেক কালে রাজা-রাজড়াদের ঘরে বৌ আটকে রাখার নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু তারা ছটাকি ছিল না, ছিল সেরকি। দেখ বড় বৌ, শশিঠাকরুণের সকলের ঘরের খবর নখদর্পণে। যত রাজা-রাজড়া জমিদার তাদের অধিকাংশ বারেন্দ্র সমাজের এই দেমাকে বারেন্দ্র বামুনরা আটখানা। কচি মেয়েটাকে ভরা শীতে আটক করিস কোন্ আক্কেলে ? যত সব নাপতে কালাইয়ের কাণ্ডকারখানা।"

শ্বশুরকুলের কি কুচ্ছা ঠাকুরকন্যা ব্যক্ত করিবেন ভাবিয়া বিন্নু ক্ষুণ্ণ হইয়া নত নেত্রে বসিয়া রহিল। দুর্গাসুন্দরীরও প্রসন্ন হইলেন না। সকলেই জানে ঠাকুরকন্যার মুখ আলগা। তিনি একদা নামকরা ঘরের বৌরাণী হইয়া গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। এখনও জড়িত হইয়া রহিয়াছেন সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত জমিদার বংশের সহিত। কিছুকাল পূর্ব্বের শ্বশুরকুলের বিবাহ পৈতা ও অন্নপ্রাশন সকল অনুষ্ঠানেই তাঁহাকে যোগ দিতে হইত। অধুনা তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই।

দুর্গাসুন্দরী সভয়ে প্রশ্ন করিলেন, "বিন্নুর শ্বশুরদের কি আপনি আগে থেকেই চিনতেন ঠাকুরকন্যা ?"

চারিণী যেন অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, "কি বলিস বড়বৌ, রাজা দেবীদাসের বংশধরদের শশিঠাকরুণ চিনবে না ? বঙ্গদেশে কে আবার ওদের না চেনে। আত্তাই নদীর তীরে ছাতকে ছিল রাজা দেবীদাসের 'রাজধানী'। নবাবের সঙ্গে বিবাদ করে রাজা দেবীদাস বিপদে পড়েছিলেন। নবাব হুকুম

দেয় রাজার বংশ বিনাশ করতে। রাজার একমাত্র ছেলে তখন ছেলেমানুষ, অনেক দিনের পুরাণো বিশ্বাসী চাকর ছিল রাজার, তার নাম ভীমকালী নাপিত। রাজভবন যখন আক্রমণ হয় তখন ভীম নিজের ছেলেকে রাজপুত্রের পোষাকে সাজিয়ে শুইয়ে রেখেছিল বিছানায়। রাজার ছেলেকে সুড়ঙ্গপথে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেয় কাবারীখোলা গাঁয়ে।

পরে নবাবের সঙ্গে দেবীদাসের অনেক যুদ্ধ হয়, দুই পক্ষই ক্ষমতাশালী বলবান। শেষে নবাব সন্ধি করে। কিন্তু রাজপুত্র নামে যে ভীমের ছেলেকে বধ করা হয়েছিল সে আর ফিরে আসে না। তারপর থেকে রায়বংশধরেরা নিজেদের পদবীর সঙ্গে ভীমকালী জোড়া দিয়ে নিজেদের মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে আসছে। দেবীদাসের রাজত্ব ক্রমে ভাগ বখরায় খণ্ডবিখণ্ড হয়ে ছটাকি জমিদারি হয়েছে।"

বিন্দু মোহিত হইয়া ঠাকুরকন্যার অতীত কাহিনী শুনিতেছিল। সে অল্পদিন পূর্ব্বে 'রাজস্থান' পড়িয়াছিল, রাজপুতের আদিজননী ধাত্রীপান্না তাহার হৃদয়ে গাঁথা হইয়া রহিয়াছে। ইতিহাস পান্নাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। বরেন্দ্র ভূমির ভীমকে কে স্মরণ করিয়া রাখিবে? বিস্মৃতির অন্তরালে কত ভীম-অর্জ্জুন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পরে দুর্গাসুন্দরী ঠাকুরকন্যার প্রোজ্জ্বল মুখের প্রতি চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা ঠাকুরকন্যা, এঁরাও নাকি রাজা গণেশের শুনতে পাই? কিন্তু এঁদের ত কোথায়ও একছিটে জমিদারীর নামগন্ধও নেই।"

ঠাকুরকন্যা সগর্জ্জনে আবার সুরু করিলেন "থাকবে কি করে? এরা যে হারে-নারে বত্রিশ পাঁজরে হা-ভাতে বারেন্দ্র বামুনের ঝাড়। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলে দিয়েছে! রাজা গণেশের বংশধরেরা বৈরাগী ঝুলি কাঁধে নিয়ে বিলিয়ে দিয়েছিল সর্ব্বস্ব। রাজা গণেশের ছেলে বাদশাজাদির প্রেমে পড়ে মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে বিয়ে করেছিল বাদশাজাদিকে। যদুর আগের বিয়ে করা বৌ যদুকে পত্তর লিখেছিল, তোর মনে নেই বড় বৌ—

যবনের লাগি যার জাতি দেয় পতি,
কি পাঠ লিখিব তারে, কহ গৌড়পতি?"

দুর্গাসুন্দরী সবিস্ময়ে কহিলেন, "আপনার এতও মনে থাকে ঠাকুরকন্যা, কতকালের কথা মনে করে রেখেছেন? আমরা আজ যা শুনি কাল ভুলে যাই।"

"তোরা যে ঘোর সংসারী বড়বৌ, স্বামী পুত্র বৌ নাতনী শত জনের ভাবনা ভাবতে হয়। আমার জীবন হয়েছে বাউলের গানের মতন। 'আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না।' এ জীবনের মত ভগবান্ সকল দরজা বন্ধ করে রেখে দিলেন। তাই যা শুনেছি সহজে ভুলি না। সেদিন ঈশেনকে তাই বলছিলাম "নাড়িটেপা ব্যবসা করছ, এত অহঙ্কার ভাল নয় ঈশেন। রাজা রাজরার বাড়ীতে তোমার রোগী দেখার ডাক আসে, তুমি তাদের মুখের ওপরে চোপা নেড়ে চলে আস যা-তা ব'লে। নিজের 'আখের' ভুলে যাও। লক্ষ্মীর ঘট উল্টে দাও লাথি মেরে। রাজা গণেশের বংশধর হয়ে গণেশ উলটিয়েই ত রয়েছে।'

আমার কথায় ঈশেন হেসে কুটিকুটি, বলে, "ঠাকুরকন্যা, যা বলেছেন, ইচ্ছা করলে আমি টাকার গদি পেতে শুতে পারতাম, কিন্তু অসত্যকে সইতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করুন সত্য পথে আমি যেন জন্ম-জন্মান্তর গরীব হয়েই থাকি। দারিদ্র্যই আমার গৌরব।" বলিয়া ঠাকুরকন্যা চুপ করিলেন।

বেলা ডুবুডুবু, বনতলে গোধূলির ম্লান আলোর সহিত শীতের কুয়াশা ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হইতেছিল।

ঠাকুরকন্যা সচকিত হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। ভোগের ঘরের বারান্দায় দুইটা পাকা চালকুমড়া বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া ছিল। ঠাকুরকন্যা সেই দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "পাকা কুমড়া দেখছি, বড়ি দিবি নাকি বড়বৌ? পাকা কুমড়ার তিতকুমড়ি রাঁধবি কি? তোর রান্না তিতকুমড়ি একদিন খেয়েছিলাম, এখনও মুখে লেগে রয়েছে। কি চমৎকার রান্না!"

"বেশ ত ঠাকুরকন্যা মূলোষষ্ঠী এসে গেল। সেদিন আমাদের নিরামিষ খাওয়া, আপনার সঙ্গে সকলেই একসাথে বসে শ্রীধরের প্রসাদ খাব। তিতকুমড়ি রান্না করব।"

"ষষ্ঠীর দিন কি তেতো খায় বড়বৌ, খেতে নেই। তিতকুমড়ি রাঁধবি কি লো? তোর ত নিত্যি তিরিশ দিন ঠাকুরভোগ রান্না রয়েছে, যেদিন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যাব। এখন থাকুক।"

"থাকবে কেন ঠাকুরকন্যা। তিতকুমড়ি না হয় টককুমড়ি করে দেব। বৌরা ঠিকমত আপনাকে নিরামিষ রান্না রেঁধে দিতে পারে ত?"

"হ্যাঁ, তা পারে, ভাইদের নাতবৌয়েরা আমার রান্না নিয়ে এ ওর ওপরে

টেক্কা দিয়ে ভাল করতে চায়। ভক্তিতে করে না, ভয়ে করে। 'গোবর পোড়ে ঘুঁটে হাসে।' আমিও হাসি—"সম্পদের বার ভাই বিপদের কেউ নাই।' মাসে মাসে একমুঠো করে টাকা আসে সংসারে, তার জন্যেই আমার সেবাযত্নর অবধি নেই। আমি খাই দাই পুরাণ পাঠ শুনে দিন কাটাই। ভগবান্ অমর করে দিয়েছেন রয়েছি। যাই না ব'লে আক্ষেপ করি না, থাকছি বলেও দুঃখ নেই। আমার এখানেও কোন প্রত্যাশা নাই, সেখানে কারও জন্যে কোন আশা নাই। জন্মঋণ শোধ করে যাচ্ছি এইমাত্র। আমি এবার চলি বড়বৌ, দেরি হলে ওরা আবার ছেলেমেয়ে পাঠিয়ে দেবে আমাকে ধরে নিতে। 'তোর পায়ে পড়ি না তোর গুণের পায়ে পড়ি।' আমার হয়েছে সেই দশা।"

ঠাকুরকন্যা আঙ্গিনায় নামিয়া অনুচ্চস্বরে দুর্গাসুন্দরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যাদবের মেয়েদের যে বিয়ে। আকাশির বিয়ে শুনেছিস বড়বৌ? তুই মেয়ের বিয়ে ঠেকে থাকে ব'লে যাদব আকাশির কুমারী নাম ঘুচিয়ে এক চণ্ডালের সাথে মালা বদল করাচ্ছে।"

"চণ্ডাল! শুনেছি সে নাকি সৎব্রাহ্মণ নাম দয়াময়।"

"হ্যাঁ, দয়ার অবতার, কিসের বামুন, সে চণ্ডাল। যাদবকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে—মন্তর পড়ার পরে তার সাথে আকাশির কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেও জীবনে কখনও ওকে স্ত্রী বলে স্বীকার করবে না। ওকেও করতে দেবে না। তার টাকার দরকার, টাকা না হ'লে নতুন বৌ নিয়ে বাসর সাজাবার ঘর পাবে না। ওকে তুই বামুন বলিস বড়বৌ, ও মানুষ নামের অযোগ্য। যাদবের যেমন কপাল, আকাশিরও তেমনি—আহা, পদ্মফুলের মত মেয়ে, একখানা হাতের দোষ, এই অপরাধ। আমি দিন-রাত ঈশ্বরকে বলি 'ঠাকুর নারীজন্ম তুমি আর দিও না।'

ঠাকুরকন্যা বাড়ীর পথ ধরিলেন। দুর্গাসুন্দরীর পরদুঃখে কাতর হৃদয় আশ্বস্ত হইল। যাদব পণ্ডিতের ভিটেমাটি বাঁচিয়া যাইবে। মেয়েরা উদ্ধার পাইবে। তাহাদের দিকে ঠাকুরকন্যার দৃষ্টি পড়িয়াছে। এ গ্রামের যে-কোন জাতি যে-কোন সম্প্রদায়ের কন্যাদের বিবাহে ঠাকুরকন্যা গোপনে অজস্র দান করিয়া থাকেন। তিনি গোপনে দান করিলেও ফুলের সৌরভের মত তাহা গোপন থাকে না। তিনি পিতৃসম্পর্কীয় জন্মের ঋণ শুধু পরিশোধ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন না, গ্রামের কুমারীদেরও জন্মঋণ পরিশোধ করেন।

২৩

মঙ্গলরূপিণী ষষ্ঠীদেবী যথাসময়ে আবির্ভূত হইলেন। "যাট যাট ষষ্ঠীর ধন"। বিন্নু উপস্থিত, এই আনন্দে দুর্গাসুন্দরী দিশাহারা।

মাইজ পাতায় পিঠালির গরু বাছুর তৈরি করিয়া জোড়ায় জোড়ায় মুলা কলা দিয়া ডালা সাজাইয়া ষষ্ঠীর আরাধনা করা হইল। বিন্নু রায়বাড়ীর উদ্দেশ্যে ভেংচি কাটিয়া মনে মনে বলিল, "কেমন জব্দ, এ অনুষ্ঠানে আমাকে তোমরা ধরিতে পারিলে না। দুধের কড়ার সামনে বসিয়া নিজেরা হটর হটর কর।"

বিন্নু সেই দিনই বৈকালে বাবার চিঠি পাইল। বিন্নু সংস্কৃত শিখিবে জানিয়া বাবা কত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নফর কুণ্ডুর সহিত বিন্নুর জন্যে জামা-কাপড় আরও অন্যান্য জিনিষপত্র ও সংস্কৃত প্রথম পাঠ পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিন্নু যেন তাহার ঠাকুমার নিকট হইতে অক্ষর পরিচয় ও অক্ষর লেখা শিখিয়া লয়। ইহার পরে সুবিধামত বাবা বাড়ী আসিয়া বিন্নুকে শ্বশুরালয় হইতে আনাইয়া সংস্কৃত দ্বিতীয় পাঠ ধরাইয়া দিতে পারিবেন।

বিন্নু বাবার চিঠি পড়িয়া আনন্দে ও উৎসাহে অভিভূত। তাহার ত্বরা সহে না। তখনই শ্যাম ছুটিল বন্দরে নফর কুণ্ডুর কাছে।

বিন্নুর বাবা বিন্নুর জন্যে অনেক জিনিষ পাঠাইয়াছেন। কন্যা পিত্রালয়ে আসিলে তাহাকে নববস্ত্র প্রসাধন দ্রব্য দিতে হয়। বিন্নুর জন্যে আসিয়াছে চারিখানা শাড়ী, চারিটা সেমিজ জামা, একখানা ফুলকাটা তোয়ালে, এক বোতল চামেলী ফুলের তেল, অডিকলোন, চিরুণী, বেলকুঁড়ি কাঁটা, ফিতা, একপাতা টিপ, এক শিশি তরল আলতা আর সংস্কৃত প্রথম ভাগ।

দুর্গাসুন্দরী সমস্ত জিনিষ সযত্নে তুলিয়া রাখিলেন। বিন্নু তখনই তাঁহাকে চাপিয়া ধরিল সংস্কৃত অক্ষর পরিচয় করাইয়া দিতে। ঠাকুমা জানিতেন নাতনীর প্রকৃতি, সে যখন যেটা ধরিবে সেটা না হওয়া অবধি তাহার শান্তি নাই।

সন্ধ্যা হইতে রাত দশটা পর্য্যন্ত চলিল অক্ষর পরিচয়। বিন্নু অক্ষরের গোলমাল করিয়া ফেলে, সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া তিনি আর কতক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারেন।

শেষকালে বিন্নুরই পরিত্যক্ত ভাঙ্গা শ্লেট পেনসিল বাহির হইল। তাহাতে অক্ষর দাগিয়া দাগিয়া কয়েকটা অক্ষরের সহিত বিন্নুর পরিচয় হইল।

পরের দিন দিবসের আলো ভালরূপে ফুটিতে-না-ফুটিতে বিনুর বিদ্যারম্ভ সুরু হইয়া গেল। পেমো মলিন মুখে চাহিয়া চাহিয়া সরিয়া যায়। মা ফ্যানা-ভাত বাড়িয়া ডাকিয়া সাড়া পান না। ঠাকুমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। স্নানের সময় আজ আর হীরাসাগর আকর্ষণ করিতে পারিল না। পুকুরেই স্নানপর্ব্ব সমাধা হইল।

চিরদিনের মূর্খ বিনু এক বেলায় মূর্ত্তিমতী সরস্বতী হইতে চায়। সে শুনিয়াছিল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ হয়।

বিনু সাধনা করিতে লাগিল। গোটা দিন চলিল তাহার সাধনা। সাধনায় যেমন সিদ্ধি আছে, তেমনি বিঘ্নও কম নহে।

মা ডাকেন চুল বাঁধিয়া দিতে। ঠাকুমা লালমণির দুধে প্রস্তুত কাঁচাগোল্লা চটের মতন পুরু সর চিনি মুখের সামনে ধরেন। বিনু খাইতে বসিবে না ভাঙ্গা শ্লেটে মক্স করিবে আদি ভাষার আদি অক্ষর?

ইহারই মধ্যে বিনুর উৎসাহের শিখা স্তিমিত হইয়া আসিল। মনে পড়িতে লাগিল নঠাকুরদার রামপ্রসাদী গীত—

"আমি কারে দোষ দিব শ্যামা, স্বখাত সলিলে ডুবে মরি মা।"

এমন সময় শ্যাম আনিয়া দিল প্রসাদের চিঠি। এখানে ষ্টীমারে ডাক আসে, একবার মাত্র চিঠি বিলি হয় বৈকালে।

ঠাকুমা সহাস্যে পরিহাস করিলেন, "এই নে বিদ্যাবতী, তোর সাত রাজার ধন মাণিক এসেছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আজ প্রায় সন্ধ্যা হয় অসাধ্য সাধন করলি, এখন বই-শ্লেট তুলে রেখে জিরিয়ে নে। ও কি এক দিনের জিনিষ, দিনে দিনে শিখতে হয়।"

ঠাকুমার সামনে স্বামীর চিঠি আসাতে বিনু ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "আমার অক্ষর চেনা হয়ে গেছে ঠাকুমা, এখন আকার-ইকারগুলো ঠিক করে নিতে পারলেই হয়ে যাবে।"

ঠাকুমা মুখ টিপিয়া হাসিলেন, "হয়ে যাবে, আহা, কি মগজ তোর বিনু, অক্ষর চিনলেই তুই সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে যাবি?"

বিনুর ঠাকুমার তামাসায় কান দিবার সময় ছিল না। সে অন্তরালে সরিয়া গেল প্রসাদের চিঠি লইয়া। সে এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসে নাই। আসিয়াও লেখা হয় নাই। প্রসাদ রাগে বিশ্বম্ভর হইয়া চিঠি লিখিয়াছে।

"বিন্নুর এ কিরূপ নীতি, অন্যের পত্রে জানিতে হয় স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছে। শ্বশুরালয় যেন কাজ-কর্ম্মের হিসাব দাখিল করিতে হয়। বাপের বাড়ীর অজুহাত কি? এখন ত অখণ্ড অবকাশ, লেখাপড়া কতদূর অগ্রসর হইল। নম্বর দেওয়া খাতার কোন্ নম্বরে হাত দেওয়া হইয়াছে" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিন্নু টুলের উপরে হ্যারিকেন রাখিয়া পত্র পাঠ স্বামীকে পত্র লিখিতে বসিয়া গেল।

এখানে আসিবার পূর্ব্বে স্বামীকে চিঠি লিখিয়া আসিবার কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল। এখানে আসিয়াও তাহাকে স্মরণ হয় নাই। নম্বরী খাতা বিন্নু সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই আনে নাই।

স্বর্গে আসিয়া ধান ভানিতে তাহারও ইচ্ছা ছিল না। যেখানকার খাতা-বই সেইখানেই পড়িয়া আছে।

বিপন্ন বিন্নু এখন কি উত্তর দিবে? বিশ্বম্ভরের নিকটে বিশ্বেশ্বরী হইলে এক্ষেত্রে চলিবে না। ক্ষণকাল ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিন্নু চিঠি লিখিল, বৌ মানুষ নিজের আসিবার কথা কি লিখিবে? যাঁদের কাছ থেকে এসেছি তাঁরা জানাবেন এই জন্যে আমি জানাই নি।

এখানে এসেও গোলমালের ভেতরে রয়েছি। সারাদিন ঠাকুমা-মা কাছে থাকেন তাঁদের সামনে স্বামীকে চিঠি লেখা চলে না। তা ছাড়া দিন-রাত লোক আসছে আমাকে দেখতে। ঠাকুমার সঙ্গে মাঝে মাঝে বুড়ো-বুড়ীদের সঙ্গে দেখা করতে এ পাড়ায় ও পাড়ায় যেতে হয়। না গেলে তাঁরা রাগ করেন।

এখানে নানা উৎসব লেগে রয়েছে। আমাদের লালমণির খুব সুন্দর একটা বাছুর হয়েছে তার নাম মঙ্গলা। সেদিন গোক্ষুর ধার শোধ হ'ল। পাড়ার রাখালরা সবাই এসেছিল। তার পরেই গেল মূলোষষ্ঠী। আমি এখন বড় হচ্ছি, মা-ঠাকুমার কাছ থেকে কাজ শিখতে হয়, তাই চিঠি লেখবার সময় পাই নি।

আগের লেখাপড়া এখন আমার বন্ধ। বাবা সংস্কৃত প্রথম ভাগ পাঠিয়েছেন। আমি ঠাকুমার কাছে সংস্কৃত পড়ছি। অক্ষর চেনা হয়ে গেছে, লিখতেও পারি বেশ। আমাদের সেই সুন্দর মেয়ে আকাশির বিয়ে, এই মাসেই হবে। বর ব্রাহ্মণ হলেও সে চণ্ডাল। তার নতুন গয়না দেখে এসেছি। সংস্কৃত শিখছি বলে আমি চিঠি লিখতে পারি নি, তাতে রাগ ক'রো না।"

প্রসাদ বড় চিঠি লিখিতে বলে কিন্তু কি কথা দিয়া বিন্নু বড় চিঠি

লিখিবে খুঁজিয়া পায় না। তবু অষ্টকার চিঠি তাহার ছোট হইল না এই আত্মপ্রসাদে বিনু পুলকিত হইল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া বিনু চলিল মায়ের সন্ধানে, মা রান্না চড়াইয়াছেন। ঠাকুমা মণ্ডপে জপ করিতেছেন। পেমো মা'র সহিত রাতের ভাত খাওয়া সারিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাল প্রভাতে আসিবে কাজে। ঠাকুরদাও বাড়ী নাই, বাহির হইয়াছেন বন্দরে রোগী দেখিতে।

ব্রজেশ্বরী এক গামলা কলাইয়ের ডাল বাঁটিতে বসিয়াছে বিরস মুখে।

বিনু ডাল বাঁটার কাছে বসিয়া বলে, "কাল বুঝি বড়ি দেওয়া হবে বেজদিদি? এক রকম ডালের, না ছু'রকম ডালের।"

ব্রজ বিরক্তির সহিত জবাব দেয়, "মটর, কাঁচা মুগ, ঠাকৃরী (কাল কড়াই) ডালের কুমড়া বড়ি ওনারা ভোগের নেঙ্গে দিয়া রাখিছে। মুসুরী মাষকলাইএর কুমড়া বড়ি আমি দিয়া রাখিছি মাছের ঘরের লেগে। এ বড়ি হইবে বিনা কুমড়ায় তোমাগো দেওনের নেগে।"

বিনু এলোচুলে বসিয়াছিল, মা পিছন দিক্ হইতে তাহার চুল আঁচড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "কতবার ডাকলাম চুল বাঁধতে, তোর সময় হ'ল না। রাতে কি এমনি এলোকেশী হয়ে থাকে? সিধে হয়ে একটু বোস চুলটা বেঁধে দেই।" এমাসের প্রথমে শুক্লপক্ষে আমাদের প্রথম বড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আর দিনক্ষণ দেখতে হয় না। মা বলছিলেন, "তুই বড়ি দিতে খুব ভালবাসিস। তাই ডাল ভেজান হয়েছে। কাল বিনে কুমড়ায় তুই বড়ি দিস।"

বিনু চুলের গোড়া-বাঁধা ফিতা ধরিয়া বলিল, "বিনা কুমড়ায় কেন মা? আমি ত চিরকাল কুমড়া দিয়েই বড়ি বসিয়েছি।"

"এতকাল যা করেছিস এখন কি তা করা চলে মা? তোর শ্বশুরবাড়ীতে কুমড়ার বড়ি দিতে নেই। তাদের নিয়ম এখন থেকে মেনে চলতে হবে।"

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া ভিজা গামছা দিয়া মুখ মুছাইয়া দিলেন। সিঁদুরের কৌটা আনিতে মা'র ভুল হইয়াছিল। বিনু যে এখন সীমন্তে সিঁদুর পরিবার অধিকারিণী হইয়াছে, সেটা মা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

তিনি চুল বাঁধিবার হাত একচিমটি সাজি মাটি দিয়া ধুইতে ধুইতে বলিলেন "ঘরে গিয়ে সিঁদুর পর গে। বিনু, রাতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, আন্দাজে যদি সিঁথেয় সিঁদুর না দিতে পারিস তা হ'লে কৌটাটা আমার কাছে নিয়ে আয়।"

২৪

প্রভাতে বিন্নুর ঘুম ভাঙ্গে না। ঠাকুমা আসিয়া তাড়া দেন, "ও বিন্নু, বড়ি দিবি কখন? রোদ্দুরে যে বারান্দা ভরে গেল। রোদ লাগলে তোর মাথা ধরবে। উঠে মুখ ধুয়ে বাসি কাপড় ছেড়ে আগে বড়ি ক'টা বসিয়ে দে। তুই বড়ি দিতে ভালবাসিস বলেই ডাল ভেজানো।"

বিন্নু খুপরি পিঁড়িতে বসিয়া কলাইয়ের ডালের বড়ি দিতেছে। ব্রজ কাঁসি ভরিয়া ডাল ফেনাইয়া দিতেছে। আর মনে মনে রাগে ফুলিতেছে—"হাঁড়ি হাঁড়ি রকমারি বড়ি ঘরে থাকতে আবার বড়ির পাট। বাবা, কি আহ্লাদি মেয়ে। বড়ি দিতে ভালবাসে, ভেজাও ডাল। বেঁটে-ঘষে ফেনাও, তবে না খুকুমণি কাপড়ের টুকরোয় বড়ি বসাবেন। এত দিন যে মেয়ে আকাশের চাঁদ চেয়ে বসে নি, এই আশ্চর্য্য। এমন সোহাগের মেয়েকে পরের ঘরে পাঠায়? সেখানে দিচ্ছে ছেঁচে-কুটে।"

ঠাকুমা এগিয়ে আসেন, "এককাঠা ডালের বড়ি যে তুই এক দণ্ডেই বসিয়ে দিলি বিন্নু, হাত নয় ত কল যেন। আজ নাকি তুই ফ্যানাভাত খেতে চাস নি, পেমোর মা তোর জন্যে গরম চালভাজা, কাঁঠালের বীচিভাজা ক'রছে। হাত ধুয়ে গরম গরম খেয়ে নে।"

বিন্নু তেল-নুন মাখা কাঁঠালের বীচি ও চালভাজার বাটি নিয়ে পৈঠায় পা ছড়িয়ে খেতে বসে। তাহার পদতলে পেমো, তাহাকেও খাইতে দেওয়া হইয়াছে।

রৌদ্রে ঝলমল সকাল বেলাটা বিন্নুর বড় মিঠে লাগে। তরুপত্রের দুর্ব্বাদলের শিশির এখনও শুখায় নাই। মনে হয় কাহার যেন মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

কয়েক দিন হইল বাহিরের আঙ্গিনায় ধান মাড়াই হইতেছে। ভিতরের আঙ্গিনায় রৌদ্রে শুখাইতে দেওয়া হইতেছে ধামা ধামা ধান। পায়রারা ঝাঁক ধরিয়া নামিয়া পড়িয়াছে ধান খাইতে। গৃহে প্রচুর পাইলে বাহিরে যাইবে কেন খাদ্যানুসন্ধানে।

গোক্ষুরধারের দিন মঙ্গলা বাছুরটা অন্দরে আসা-যাওয়ার পরে তাহার এদিকটা চেনা হইয়াছে। মঙ্গলা পেট ভরিয়া মায়ের দুগ্ধ পান করিয়া রৌদ্রে শয়ন করিয়া অঘোরে ঘুমাইয়া লয়। তাহার পরে লেজ উর্দ্ধে তুলিয়া দৌড়াইতে থাকে ভিতরের আঙ্গিনায়। ধানের উপর দিয়া দৌড়াইয়া ধান ছিটাইয়া দেয়

চারিদিকে। দাসী বিরক্ত হইলেও মুখে তাহা প্রকাশ করিতে পারে না গৃহিণীর ভয়ে। গৃহিণীর নাতনী যে বাছুরের ছুটাছুটি দেখিতে ভালবাসে, গলা জড়াইয়া ধরিতে ভালবাসে। সারাদিন তাহাদের ছড়ান-ছিটান ধান ঝাড় দিয়া জাত করিতে হয়। বিনুর হৃদয় হইতে সেই অভিমানের ক্ষীণ মেঘরেখা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। প্রাপ্তির আনন্দে গৌরবে সে হইয়াছে উচ্ছ্বসিত। অদর্শনে যাহারা দূরে সরিয়া গিয়াছিল, অনুক্ষণ দর্শনে তাহারা আবার হৃদয়ের প্রান্তে নিবিড় হইয়া সরিয়া আসিয়াছে।

দুর্গাসুন্দরী ভাবিয়াছিলেন জলযোগের পরেই তাঁহাকে লইয়া বিনু বোধহয় বিদ্যাচর্চ্চায় বসিয়া যাইবে। তাঁহার যে শত অজস্র কাজ, বিনুকে বিমুখ করিবেন কিরূপে? কিন্তু সে-পথে সে গেল না লক্ষ্য করিয়া তিনি আরামের নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বিনু পেমোকে সঙ্গী করিয়া চলিল বনবিতানে। মা বাধা দিলেন, "কোথায় চললি? বই-সেলেট নিয়ে একটুখানি বোস্ গে। ফেলে রাখলে কি কিছু শেখা হয়? কাল অত উৎসাহ দেখলাম, আজ বই ছুঁচ্চিস না কেন?"

বিনু গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "একটা দিন মাটি করেছি ব'লে রোজ কি মাটি করব মা? আমার কি আর কাজ নেই? এসে অবধি এপর্য্যন্ত বাগানের চারদিকটা ভাল করে দেখাই হয় নি। পেয়ারা বাগানে কাল পেমো দুটো পাকা পেয়ারা দেখেছে উঁচু ডালে আমি এখন পেয়ারা পাড়তে যাচ্ছি। সমস্ত পাকা কলা কে তোমাদের কাটতে বলেছিল? এককাঁদি গাছে রাখলে ত নন্দন পাখীটা চলে যেত না?"

"নন্দন পাখী, সে কি?"

পেমো বলে, "হ, বৌমা, আইছিল নন্দন পক্ষী কলা পাকনের কালে। তার এত বড় ল্যাজ, এত বড় মাথায় ঝুঁটি দুধবরণ।" মা হাসেন। মেয়ে প্রবেশ করে গভীর অরণ্যে।

আহারাদি মিটিয়া গেলে ঠাকুমা নিরালা অবকাশে বিনুকে ধরিলেন, "বাবা তোর জন্যে কত সুন্দর জিনিস পাঠিয়েছে, তুই তার কিছুই ত ভাল করে দেখলি না? আয়, এখানে একটু থির হয়ে বসে সব দেখ।"

সত্যই বিনু কাপড়-জামা প্রসাধন দ্রব্য ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিবার অবসর পায় নাই। সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম উপাদান পাইয়া সে আনন্দে মত্ত

হইয়াছিল। সে উদ্দীপনা যেমন জোয়ারের জলের মত সবেগে আসিয়াছিল, তেমনি সবেগে চলিয়া গিয়াছে। সে যে রসের রসিক নহে, তাহার নিকটে রসের ভাণ্ডারের মূল্য কি ?

বিনু পিতার অসীম স্নেহের উপহার পাইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে কহিল, "আমার কত জামা-কাপড় পরে রয়েছে আলমারিতে ; বাবা ফের এত জামা-কাপড় পাঠিয়েছেন। এত দিয়ে আমি কি করব ঠাকুমা ? এই ঢাকাই শাড়ীটা, একটা সেমিজ জামা আমার আকাশিকে দিতে ইচ্ছে করছে। ওর বাবা ত কলকাতায় থাকেন না, বাহারে শাড়ীও দেখেন না ; ওর কিছু নেই। চণ্ডালের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে।

"চণ্ডাল কথাটা তুই বুঝি ঠাকুরকন্যার কাছ থেকে শিখেছিস্। কলকাতা থাকলেই বাহারে শাড়ী কেনা যায় না। কিনতে পয়সা লাগে। আকাশির বিয়েতে শাড়ী মিষ্টি ত আমাদের দিতেই হবে। আমি কিনে দেব। তার জন্যে তুই কেন দিতে যাবি তোর ঢাকাই শাড়ী ?"

"আমার যে আরও অনেক রয়েছে ঠাকুমা, ওর একটাও নেই। তুমি যদি দাও তা হ'লে ওর দুটো হবে। নেমন্তন্ন বাড়ীতে পড়ে যেতে পারবে।

ঠাকুমা জানিতেন বিনুর প্রকৃতি ছেলেবেলা হইতে তাহার নিজস্ব যাহা তাহা সে একাকী ভোগ করিতে পারে না। নিজের ভোগের জিনিস অপরকে ভাগ না দিলে তাহার শান্তি হয় না। ইহাতে তাঁহারা ভ্রমেও তাহাকে বাধা দেন নাই। বাধা দিলে আত্মসুখপরায়ণ লোভসর্ব্বস্ব হইবে বলিয়া।

ঠাকুমা বলেন, "তোর যখন এত ইচ্ছে হয়েছে বিনু তা হ'লে তুই নিজে হাতে করে আকাশিকে দিয়ে আসিস।"

বিনু মাথা দোলায়, "না ঠাকুমা গিন্নীপনা করে আকাশিকে দিতে আমার লজ্জা করবে। বিয়ের দিন তুমিই তাকে দিয়ে দিও। আমার অনেক হয়েছে ওরও কিছু হোক।"

বিনুর ত্যাগের সংকল্পে ঠাকুমা মনে মনে প্রীত হন। তাঁহাদের মধ্যবিত্ত সংসার ভোগের নয়, ত্যাগের।

তরুর অনেক অনেক দিন একপক্ষ কাল দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া আসিল।

সেদিন প্রভাতে রায়কর্ত্তার নিকট হইতে পত্রবাহক উপস্থিত হইল এবাড়ীর

কর্ত্তার কাছে। "আগামী সোমবারে শ্রীমতী বধুমাতাকে আনিতে গাড়ি যাইবে। তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবেন।"

"মাটি নড়ে ত রায়বাড়ীর কথা নড়ে না", সকলেরই মন ভারী হইল, বিন্নুর ত কথাই নাই। কিন্তু বিন্নুর উপরে আরও কিছু ছিল "মড়ার ওপরে খাঁড়ার ঘা।" বৈকালে প্রসাদের চিঠি আসিল। বিন্নু সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছে সে ইহাতে মহা পুলকিত। সে লিখিয়াছে, "যে-কোন ভাষাই হোক না কেন তাহা শিক্ষা করা গৌরবের বিষয়। তোমাদের বাড়ীতে সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। বংশের সম্মান বজায় রাখিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বেই তোমার সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করা উচিত ছিল। সে যাহা হোক এখন যে শিক্ষার প্রতি তোমার মন হইয়াছে ইহাতে আমি আনন্দিত।

মার চিঠিতে জানিলাম আগামী সোমবারে তুমি আমাদের বাড়ীতে যাইতেছ। সেখানে গিয়া ভাল হইয়া থাকিবে। পড়াশোনায় মনোযোগী হইবে। আমার চিঠির জবাব এখান হইতেই দিয়া যাইবে। তুমি সংস্কৃত কেমন লিখিতে শিখিয়াছ তাহা সংস্কৃত অক্ষরে আমাকে লিখিবে।"

বিন্নুর তাসের ঘর বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই যে সংস্কৃত অক্ষর কয়েকটা চিনিয়া বইখানা সে ফেলিয়া রাখিয়াছে আর তাহা খোলার অবকাশ পায় নাই।

মা মেয়ের চুল বাঁধিয়া দিতে আসিয়া দেখিলেন মেয়ে স্বামীর চিঠি লইয়া অধোবদনে বসিয়া রহিয়াছে।

মাকে দেখিয়া চিঠিখানা লুকাইতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেকালের স্বামীর চিঠি গুরুজনদের সম্মুখ হইতে গোপনে রাখিতে হইত। এতদিন বিন্নুও তাহাই রাখিয়াছে আজ প্রথম তার ব্যাতিক্রম।

মা ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'একি বিন্নু, তুই চিঠি নিয়ে এমন ভাবে বসে রয়েছিস্ কেন? প্রসাদ ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, আমাকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখেছে। মা, তোমরা আমাকে এমন মূর্খ করে রেখেছিলে কেন? এখন আমি কি করি?" বলিতে বলিতে বিন্নু কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মা'র কোলে মুখ লুকাইল।

মা তাহার মস্তকে স্নেহ হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। তাঁহার মনোনেত্রে ভাসিয়া আসিল একটি কচি কোমল সুমিষ্ট মুখচ্ছবি। তাহাকে অকালে হারাইয়া ইহার প্রতি তাঁহারা এতটুকু চাপ দিতে সাহস করেন নাই। যাহা

লইয়া এ থাকিতে চায় থাকুক। হাত ধরাধরি করিয়া যেমন দুই ভাই-বোন এখানে আসিয়াছিল, অনাদরে উৎপীড়নে আবার যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়া যায়। —এই আতঙ্কে বিন্নুকে লেখাপড়ার জন্য শাসন করা হয় নাই; তাডন করা হয় নাই।

মা নিজেকে সংযত করিয়া শান্ত মুখে বলিলেন, "এরই জন্যে কান্না, ছিঃ ছিঃ তুই কি বোকা। তোর মতন বয়েসের মেয়ের যা শেখা দরকার তা তুই বেশ শিখেছিস মা। গাঁয়ে মেয়েদের স্কুল নেই, তোর ঠাকুরদা-ঠাকুমাকে খালি বাড়িতে ফেলে আমি তোর বাবার কাছে সহরে থেকে তোকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি। এখান থেকে যা সম্ভব তা তোর হয়েছে। আমি বুঝতে পারছি—তুই প্রসাদকে লিখেছিলি 'সংস্কৃত শিখেছি।' তা না হলে সে ত কাঁচা ছেলে নয় যে তোকে সংস্কৃতে পত্রের উত্তর দিতে লিখবে?"

বিন্নু কথাও বলে না, মুখও তোলে না, তেমনি অঝোরে কাঁদিতে থাকে। সকাল বেলা রায়বাড়ী হইতে তাহার আমন্ত্রণ লিপি আসিবার পর হইতে বিন্নুর হৃদয়ে ঘনঘোর কালো মেঘরেখার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই মেঘ ঝরি-ঝরি করিয়াও এতক্ষণ ঝরিয়া পড়ে নাই। প্রসাদের চিঠি বর্ষণের উপলক্ষ্য মাত্র।

মা কোল হইতে বিন্নুর মুখ তুলিলেন, অঞ্চলে অশ্রুজল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "তুই চুল বেঁধে গা মুছে তারপরে ধীরে-সুস্থে তাকে লিখে দিস, 'আমি এখনও চিঠি লেখার মত সংস্কৃত শিখি নাই। শিখিলে লিখিব'।"

মা কত সহজে বিন্নুর এত বড় সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। বিন্নুর মেঘম্লান হৃদয়-আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল।

২৫

আবার সেই পথ। সেই ছায়া-ঢাকা পাখী-ডাকা মাঠ। সেদিন ছিল রৌদ্রকিরণোজ্জ্বল মধ্যাহ্ন। আজ অপরাহ্ন।

বিন্নু ফিরিয়া চলিয়াছে রায়বাড়ীতে। সেই জুড়ান গাড়োয়ান। নবীন ও কামিনীর মা সঙ্গী। সেদিন কত আশা-আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। আজ বিষাদ ও অশ্রুজল।

বিন্নু পর্দ্দা-ঢাকা গাড়ির ছইয়ের ভিতরে শয়ন করিয়া চোখের জলে ভাসিতেছিল। পথ বা পথের পাশের কোন দৃশ্যাবলী আজ তাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না। বাহ্যদৃষ্টির সম্মুখ হইতে তাহার যাহা কিছু শোভাময়

সরিয়া গিয়াছে। হৃদয়ের পটভূমিকায় জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে কত মনোহর চিত্র, সুমধুর স্মৃতি।

কামিনীর মা বলে, "বৌমা, তুমি মুখ গুঁজে এমনি ধারা পড়ি রইলে ক্যানে? ছ্যাশের গাছ-গাছালি, ছ্যাশের মাটি চাইয়া ছ্যাখ। মধ্যিখানে একটা মাঠ—দুই দিকে দুই গেরাম তার নেগে কেডা এত কাঁদন কাঁদে? নতুন ত যাইচ না, এইলো তোমাগো যাওন সইয়া যাইচে না ক্যানে। কত চ্যাংড়া ম্যায়ারা শ্বশুরঘর করিছে, তোমাগো নাগাল এত অবুঝ আর দেহি না। উঠি মাঠে-ঘাঠে তাকাইয়া মনেরে সুস্থির কর। ম্যায়া জনম হইলেই পরের ঘরে যাইতে হয়। তার নেগে এত কাঁদে না কেউ।"

বিনু উঠিয়া বসেও না, কথাও বলে না। ঘরমুখো বলদ ছুটিয়া চলিয়াছে।

সাঁঝের প্রদীপ জ্বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ি আসিয়া থামিল সিংহদরজায়। আবার বাড়ীর সকলে আগাইয়া আসিলেন বধূকে নামাইয়া লইতে।

সুমন্ত অধরে হাসির লহর ছুটাইয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল 'বইদি' বলিয়া।

শ্বশুর-শাশুড়ীদিগকে প্রণাম করিয়া বিনু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল তরুর সহিত। ঠাকুমা ও ছোটঠাকুমা হারাণী পসারীরা প্রাচীর দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের ভিড়ে সরস্বতী অনুপস্থিত।

ঠাকুমা প্রণত বিনুর গায়ে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া কহিলেন, "আমার শূন্য পুরী আলো করি' এলি মণিবালা? ক'টা দিন তোর চাঁদমুখ না দেখে পরাণ আমার অস্থির করেছে।"

মনোরমা বলেন, "বৌমা, তুমি ঘরে যাও। কাপড় ছেড়ে হাত-পা ধুয়ে জল খেয়ে নাও।"

বিনুর সহিত ঠাকুমা কয়েক হাঁড়ি মিষ্টি দিয়াছেন। সন্দেশ, কাঁচাগোল্লা, পাটালি গুড় আর স্বহস্তে প্রস্তুত পাকা কুমড়ার মোরব্বা, লালমণির দুধের বড় বড় ক্ষীরের নাড়ু।

বিনু নিজের গৃহে প্রবেশ করা মাত্র তরু তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, "ও বৌদি, তুমি ত এখানকার কাণ্ড-কারখানা জান না। আমার ফুলমণি আর নেই, পুড়ে মরেচে।"

বিনু সচমকে জিজ্ঞাসা করে, "ফুলমণি পুড়ে মরেছে কেমন করে? কই কামিনীর মা ত কিছু বলেনি?"

"আমিই তাকে বলতে মানা করে দিয়েছিলাম। তুমি শুভক্ষণে যাত্রা করে

এখানে আসবে, তখন কি মড়া-টড়ার খবর দিতে হয়। পসারী ঢেঁকিশালায় সেদিন মুড়ি ভেজে উনুনে ঢাকা না দিয়ে চলে গিয়েছিল। ফুলমণি ইঁদুর ধরতে গিয়ে রাতে উনুনে পড়ে গিয়েছিল, আর উঠতে পারে নি। সকাল বেলা সবাই দেখলে সে আর নেই।" ব'লে তরু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিনুর চোখও শুষ্ক রহিল না। মনে পড়িল তাহাকে নিভৃতে বসিতে দেখিলে ফুলমণি লেজ ফুলাইয়া গরর গরর শব্দ করিয়া কোলে বসিতে উদ্যত হইত। বিনু বিরক্তি ভরে তাহাকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিত। সেই ফুলমণি আর কাহারও কোল অধিকার করিতে ফিরিয়া আসিবে না। লেজ ফুলাইয়া ডাকিবে না মিউ মিউ।

এ জগতে মানব হোক জীবজন্তু হোক কাহাকেও অবহেলা করিতে নাই। যাহাদের জীবন ক্ষণভঙ্গুর তাহাদের সকলের সহিত সদয় কোমল ব্যবহার করিতে হয়।

বিনু নিজের চোখ মুছিয়া গভীর স্নেহে তরুর অশ্রুমলিন মুখ মার্জ্জনা করিয়া প্রশ্ন করে, "ফুলমণির না দুটো বাচ্চা ছিল, তারাও কি মরে গেছে?"

তরু সবেগে ঘাড় দোলায়—"ওকি কথা বৌদি, ছিঃ। ষাট্, তারা দুই ভাইবোন বেঁচে রয়েছে। আমাদের কালজি যে কি কাণ্ড করেছে তা ত তুমি জান না,—উনুন থেকে সকাল বেলায় আধপোড়া ফুলমণিকে যখন তোলা হ'ল তখন লালজি-কালজির কি কান্না। আমি পচা পুকুরের পাড়ে তার মাথায় একটা তুলসী গাছ দিয়ে পুঁতে রাখতে বললাম হরিকে। ওদিকে কোদাল হাতে ফুলমণিকে নিয়ে হরি চলে গেল। এদিকে ছানারা ক্ষিধের জ্বালায় চিৎকার করে প্রাণ দেয় আর কি। চুমুক দিয়ে দুধ খেতে ত শেখেনি, করি কি? ঠাকুমা বলেন, 'ধরে ঝিণুকে করে দুধ খাইয়ে দে।'

"যেমন বাচ্চা দুটোকে উঠোনে এনেছি দুধ খাইয়ে দিতে তেমনি কালজি ছুটে এসে তাদের গা চেটে দিতে লাগল। তার পরে শুয়ে পড়ল। বাচ্চারা হাতড়ে হাতড়ে দুধ খেতে সুরু করলে কালজির। সকলে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল বেড়ালের বাচ্চার কুকুরের দুধ খাওয়া। পাড়ার লোক ছুটে এল দেখতে। তারপরে মা কুকুরের ছানা দুটোকে ভেতরে এনে ওদের থাকবার জায়গা করে দিয়েছেন কাঠের ঘরের কোণে। এখন ওরা সবাই সেইখানে থাকে। লালজি পাহারা দেয় বাইরে, কালজি ভেতরে।"

বিনু আশ্চর্য্য হইয়া যায়। "মাগো কি কাণ্ড, শুনিনি কোথায়ও। বেড়াল নাকি কুকুরের দুধ খায়?"

তরু কি যেন বলিতে গিয়া ক্ষিতিকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ক্ষিতির সঙ্গে সুমন্ত।

ক্ষিতি বিনুকে হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া বলে, "বৌঠান, অনেক দিন থেকে এলেন বাপের বাড়ী। কেমন ছিলেন?"

বিনু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট বাঁকায় "অনেক দিন আবার কোথায়? মাত্তর পনেরটা দিন। তুমি ত বাড়ার পাশ দিয়েই স্কুলে যাওয়া-আসা করেছ, একদিনও ত আমার সাথে দেখা করতে যাও নি?"

"যাব কি করে, সঙ্গে যে একগাদা ছেলে থাকত বৌঠান, তাদের নিয়ে কি যাওয়া যায়? তাই যেতে পারি নি। তুমি ত কতদিন বাদে ফিরলে, আমার জন্যে কি এনেছ বৌঠান?"

বিনু সহসা অপ্রতিভ হয়, লজ্জিত হয়। সে ত জানে না এক গাঁ হইতে আর এক গ্রামে গেলে ছোটদের জন্য কিছু আনিতে হয়। ঠাকুমা যে হাঁড়ি হাঁড়ি খাবার দিয়াছেন সকলের জন্যে সেটা উল্লেখ করিতে সে ভুলিয়া গেল।

ইতিপূর্ব্বে বিনু ক্ষিতিকে টাকাটা-সিকিটা দিয়া খুসী রাখিয়াছে। এক্ষেত্রেও সর্ব্বাগ্রে তাহার তাহাই স্মরণ হইল। ঠাকুমা তাহার খরচপত্রের জন্য কয়েকটা টাকা দিয়াছেন। বিনু আঁচলের চাবি দিয়া বাক্স খুলিতেই তাহার চোখে পড়িল মা বাক্স গোছাইয়া দিবার সময় অডিকলোনের বোতলটা ফুলকাটা তোয়ালে দিয়া জড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কায় বাক্সের কোণে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। মুহূর্ত্তে বিনু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইল।

অডিকলোনের বোতলটা ক্ষিতির দিকে ধরিয়া বলিল, 'এই নাও, তোমার জন্যে এনেছি। সুমু এই তোয়ালে তোমার নাও। তরু, এই খেজুরছড়ি শাড়িখানা তুমি পরগে। কলকাতায় নতুন উঠেছে। বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

তিন ভাই-বোন অভাবিত প্রাপ্তিতে পুলকিত। জিনিস সামান্য হইলেও পল্লীগ্রামে তাহার মূল্য আছে।

ক্ষিতি-সুমু ছুটিল অডিকলোন ও তোয়ালে মাকে দেখাইতে।

তরু গম্ভীর হইয়া বলে, "বৌদি, তোমার বাবা তোমাকে যা দিয়েছেন তুমি নিজে না রেখে সকলকে কেন বিলিয়ে দিচ্ছ?"

"বাবা অনেক পাঠিয়েছিলেন। চারটে শাড়ি সেমিজ জামা, আমি কি করব

অত দিয়ে? ঢাকাই শাড়ীটা দিয়ে এসেছি আকাশিকে। ওই যে হাত-বাঁকা সুন্দর মেয়ের গল্প করেছিলাম তোমার কাছে—সেই আকাশির বিয়ে। একটা তোমাকে দিলাম আরও দু'খানা শাড়ী আমার রইল। তরু, তুমি শাড়ীখানা এক্ষুনি পরে নাও, তোমার রং ফর্সা, তোমাকে খেজুরছড়ি শাড়ী পরলে খুব মানাবে।"

"কাল পরব বৌদি, আজ না সোমবার, নতুন কাপড় পরতে নেই। লোকে বলে, 'সোমের কাপড় ডোমে পায়।' তুমি নতুন নীলাম্বরী প'রে এলে কোন আক্কেলে?"

বিনু হাসে "না তরু আমার ঠাকুমার কোনটায় ভুল হয় না রবিবারেই কোমরে ছুঁইয়ে রেখেছিলেন শাড়ী। আচ্ছা কাল না তোমাদের পাটাই ব্রত; ভাল দিনেই নতুন কাপড় প'রো। তোমার পাটাই ত মিটে গেছে এক-বছরের মত?"

"হ্যাঁ বৌদি, কাল পাটাই পূজো করে ভরা তুললাম। তুমি ছিলে না, আমার ভারি দুঃখ লাগছিল। কাল পাটাই পূজো ক'রো তোমরা। এখন পথের কাপড় ছেড়ে পা ধুয়ে জল খাও গে। বাক্স বন্ধ করে রেখে দাও, খেয়ে-দেয়ে কাপড়-চোপড় আলমারিতে তুললেই হবে। এক্ষুনি কামিনীর মা আসবে সর্দ্দারি করে ডাকতে। জল খাওয়া হলে তোমাকে দেখিয়ে আনব বাচ্চাগুলো। ভেতর-বাড়ীতে রয়েছে, দেখাশোনার খুব সুবিধা।"

তরু আলো ধরিয়া বিনুকে লইয়া গেল কাঠের ঘরে। ভোগের ঘরের পাশে রায়বাড়ীর কাঠ রাখিবার টিনের ঘর। টিনের বেড়া দেওয়া, মেঝে পাকা। পল্লীগ্রামে কাঠের চেলা করিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। কয়লার প্রচলন নাই।

ক্ষুদ্র কাঠের ঘরে একদিকে তক্তার মাচায় স্তূপীকৃত চেরা কাঠ চাল-সমান করিয়া রাখা হইয়াছে। কাঠের আড়ায় রাশিকৃত করিয়া রাখা হইয়াছে উনুন ধরাইবার উপকরণ পাটকাঠি। অন্য পাশে খড়ের উপর চট বিছাইয়া কালজির শয্যা রচনা হইয়াছে।

তরু লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল। বিনু হাসিয়া অস্থির। কালজি টান হইয়া শুইয়া আছে—চারিটা শাবক চুক্ চুক্ শব্দে তাহার স্তন পান করিতেছে। বিনু সকৌতুকে তাকাইয়া বলে, "ছানা ক'টা কি মোটা-সোটা হয়েছে রে তরু। মোটার ঠ্যালায় কুকুর-বেড়াল চিনে নিতে হয়। ওরা—হাঁটা শিখেছে ত?"

"হ্যাঁ গুড়, গুড় করে ঘরময় হেঁটে বেড়ায়। পৈঠা পার হয়ে এখনও নামতে পারে না। দুটো ডাকে ভেউ ভেউ, দুটো বলে মিউ মিউ। শুনতে মজা লাগে। মোটা কি সাধে হয়েছে—মা একবাটি করে দুধ খেতে দেন কালজিকে, আমি চায়ের ঘরের দুধের কড়া থেকে আরও দু'বাটি দুধ লুকিয়ে খেতে দিই কালজিকে। মা-মরা বাচ্ছারা দুধ না পেলে বাঁচবে কি করে?"

"সে ঠিক কথা তরু, বাচ্চাদের নাম রেখেছ কি?"

"ফুলমণির বাচ্চাদের নাম রেখেছি, সাহেব ও বিবি। কালজির বাচ্চাদের নাম, বাদশা, বেগম।"

নাম শুনে বিনু হাসে খিল খিল করিয়া, তরুও যোগ দেয় সেই হাসিতে। কে বলিবে ক্ষণকাল পূর্ব্বেই ইহারা কত কান্না কাঁদিয়াছিল। কৈশোরের হৃদয়াকাশে মাধুরী-মাখা যেন শরৎকাল—এই মেঘ, এই রৌদ্র, এই অশ্রু, এই হাসি।

ঠাকুমা হাতীর মাথায় সমাসীনা হইয়া নাতনীদের লক্ষ্য করিতেছিলেন। সপেটা ও কাগজি লেবুর ঝোপের মধ্যে কাঠের ঘর। সেখানে ছেলেমানুষ বৌ-ঝির এত হাসি-মস্করা রাতে ভাল নয়। যদিও এটা সাপের সময় নয়, কিন্তু বাহির হইলে ঠেকায় কে?

ঠাকুমা তারস্বরে চিৎকার করেন, "ও তন্বি, মণিবালা, তোরা বেরিয়ে আয় লো, রাত-বেরাতে কি কাঠবোঝাই ঘরে ঢোকে কেউ, 'ছোবল দেয় গর্ত্তে থাকি, উড়ে যায় পরাণ পাখী।' আয় বেরিয়ে আয়, সকালে দেখিস্ বাচ্চা-কাচ্চা।"

বিনুরা বাহির হইয়া আসে। তরু বলে, "চল বৌদি, তোমার জিনিসপত্র আলমারিতে গুছিয়ে দিয়ে আসি।"

মনের মতন বাহারে শাড়ী পাইয়া তরু বিনুর প্রতি অতিশয় প্রসন্ন। শুধু শাড়ীর জন্যে নয়, বিনু যে তাহার ফুলমণির জন্যে চোখের জল ফেলিয়াছে তাহার কি দাম নাই?

নবীন গৃহে সেজ জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। উজ্জ্বল আলোকে সুসজ্জিত ঘর হাসিতেছে। ছোটঠাকুমা তখনও শয়ন করিতে আসেন নাই।

বিনু বাক্সের কাপড়-জামা তুলিয়া দিতেছে তরুর হাতে। তরু আলমারির তাকে সাজাইয়া রাখিতেছে।

এমন সময় মেনীকে লইয়া লবঙ্গ আসিল বিনুর সহিত দেখা করিতে।

নিয়মের গৃহের সংলগ্ন প্রাচীরের দরজা খুলিলেই দুই বাড়ী এক হইয়া যায়।

লবঙ্গ পূজার পরে মামার বাড়ী গিয়াছিল। আসিয়াছে অল্প দিন হইল। মামাদের গ্রামে তাহার বিবাহ স্থির হইয়াছে। বিবাহ হইবে বৈশাখ মাসে। ঘর বর ভাল, ভাবী বর উপার্জ্জনক্ষম, পশ্চিমে চাকরি করে। বিবাহের পরে লবঙ্গ স্বামীর নিকটে থাকিবে। একে লবঙ্গ লাবণ্যময়ী হাস্যলাস্যময়ী তাহার উপরে বাঞ্ছিত বর পাইতেছে। সেই উল্লাসে সে উল্লসিত।

বিনু পিসশাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলে, "পিসিমা, মজার খবর পেলাম। আপনার মামাদের গাঁয়ের নাম কি? আমাদের পিসেমশায়ের সাথে আপনার কি দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল?"

"দেখা হবে কি করে? ও যে পশ্চিমে থাকে, ওর ছোট বোনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। তার কাছে শুনেছি 'বঁধূর বরণ কালো।' কলস গ্রামে আমার মামাদের দেশ। শোননি বৌ 'গাঁয়ের মধ্যে কলস বিলের মধ্যে চলন' বিশ্ববিখ্যাত।"

লবঙ্গ বিনুর কানের কাছে মুখ লইয়া ফিস ফিস করিয়া কথাগুলি বলিতে বলিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

তরু ও মেনী ছোটঠাকুমার খাটে বসিয়া গুজগুজ ফুসফুস আরম্ভ করিতেছিল।

বিনু লবঙ্গকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করে, "আপনার বন্ধু তার দাদার কথা কি বলেছে, বলবেন না আমাকে?

বলার মত কি আছে বৌ?"

"হাম যে অবলা হৃদয় অখলা ভাল মন্দ নাহি জানি,
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া বিশাখা দেখাল আনি।"

বিনু বাক্সের জিনিসপত্র আলমারি-জাত করিতে করিতে ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে, "আপনার বন্ধুর নাম বুঝি বিশাখা? সে কি পট আঁকতে পারে?"

লবঙ্গ হাসিয়া অস্থির, "মাগো, কি বোকা বৌ তুমি, আমি বোষ্টম পদাবলী তোমাকে একটা শুনিয়ে দিলাম; তুমি সেটা বুঝতেই পারলে না? ও বোতল বের করলে কিসের বৌ? ফুলেল তেলের? তোমার বাবা পাঠিয়েছেন? তোমার গোছা চুলে ফুলেল তেল মাখবার দরকারই হয় না। আমার পাতলা চুল ঘন করতে ফুলেল তেলের দরকার। কিন্তু দেবে কে?"

বিন্নু বলে "এটা আপনি নিয়ে যান পিসিমা, মাথায় মেখে চুল ঘন করবেন। এমনি আমার চুল শুকোয় না, এ তেল মাখলে, আরও ঘন হ'লে আর জন্মেও শুকোবে না।"

পিসিমা প্রীতি হইয়া ফের জিজ্ঞাসা করেন, "ওটা কি কাপড় তুলে রাখলে বৌ? বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী! আহা, কি সুন্দর! ওসব কলকাতার আমদানী, আমরা চোখেও দেখতে পাই না। বৃন্দাবনী ছাপা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। পরলে কুৎসিতকেও সুন্দর দেখায়। এবার তুমি আগের চেয়ে দেখতে ভাল হয়েছ বৌ।"

বিন্নু বিগলিত হইয়া উত্তর দেয়, "আপনিও দেখতে খুব ভাল হয়েছেন পিসিমা। এ শাড়ীখানা আপনিই পরবেন। আমি আপনাকে প্রণামী দিলাম।"

পিসিমা প্রসন্ন হইয়া ভদ্রতা প্রকাশ করেন, "ভাল বলেছি ব'লে আমাকে কি নিতে হবে বৌ? তরুকে একখানা দিয়েছ, আমাকে দিচ্ছ, তোমার থাকল কি? তুমি বোকা-সোকা হ'লে কি হবে, তোমার মনটা খুব পরিষ্কার, আমার বৌদিদের এমন নয়। আজ যাই, রাত হয়ে গেছে। কাল দুপুরে তোমার কাছে এসে অনেক কথা বলব। বলিয়া লবঙ্গ বৃন্দাবনী ছাপানো শাড়ীতে ফুলেল তেলের বোতলটা সযত্নে জড়াইয়া অঞ্চলের নিচে রাখিল।

তরু আড়চোখে সেদিকে চাহিয়া 'আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে' বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

ছোটঠাকুমা শয়ন করিতে আসিলেন।

মেয়েরা শ্বশুরালয়ে প্রস্থানের পরে মনোরমা বধূকে লইয়া আহারে বসিতেন। তরু অনেক রাত জাগিতে পারে না। সন্ধ্যার পরে যাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

পাশাপাশি দুইজনা খাইতে বসিয়া মনোরমা শান্ত-গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন, "শোন বউমা, তোমাকে একটা কথা ব'লে সাবধান করে দিচ্ছি,— বৌমানুষের অত গিন্নীপনা ভাল নয়। কেউ যদি কোন জিনিস ভাল বলে তখুনি কি তাকে সেটা দিতে হয়? তরু তোমার আপনার জন, তাকে ভালবেসে যদি কিছু দাও তার সঙ্গে পাড়া-পড়শীর সমান হওয়া চলে না। তোমার বাবা সেই মুল্লুক থেকে তোমাকে যা পাঠান তুমি কোন্ সাহসে তা অন্যেকে দিতে যাও। এর পরে যাকে যা দিতে চাও আমাকে বলে দিও। তোমার দিদিমা কাশী থেকে তোমাকে অত বড় একটা পিতলের বাক্স এনে

দিয়েছিলেন সেটাও তুমি দান-খয়রাৎ করে বসেছিলে ; তখন আমি কিছু বলি নি। আর একটা কথা, তোমার কাছে যে ছোটখাটো গয়নাগুলো রয়েছে কালকেই সেগুলো তুমি আমার কাছে এনে রেখ। আমি বুঝতে পেরিছি এর পরে সে-সব পগার পার হবে।"

বিনু অধোবদনে মাছের কাঁটা বাছিতে লাগিল। সে জীবনে কাহাকেও কিছু দিতে গিয়া বাধা পায় নাই। খেয়ালমত নিজস্ব যাহা অপরকে দান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তাহার কাছে পাত্রপাত্রীর বিচার ছিল না। ভালমন্দের তারতম্যবোধ ছিল না। কিন্তু আজ শাশুড়ীর উত্তাপহীন কোমল কণ্ঠস্বরে সে লজ্জিত না হইয়া পারিল না। বড়রা শুধু শাসনই করেন না তাঁদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী।

২৬

"কুতুর কুতুর ময়না, কাল দেব গয়না, আজ দিলাম বায়না।"

তরু প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিয়া কাঠের ঘরের পৈঠায় বসিয়া কুকুর বিড়ালের বাচ্ছাদের আদর করিতেছিল। তাহারা এখন দিব্যি বড় হইয়া উঠিতেছে। মানুষের আদর সোহাগ বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারে। পারে না নামিতে পৈঠার নীচে। চারিটা বাচ্চা তরুর সম্মুখীন হইয়া হাত চাটিয়া দিতেছে লেজ নাড়িতেছে ভেউ ডাকিতে মিউ তাহাদের বিচিত্র কলরবে সচকিত হইয়া কালজী একবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছে শাবক কয়টিকে।

বিনু তরুর কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া ছানাগুলিকে আদর করিতে লাগিল।

তরু বিনুর হাত সরাইয়া দিয়া চাপা স্বরে ধমক দিল 'এদের ছুঁয়ো না বৌদি। ছুঁলেই তোমার জাত যাবে। নেয়ে শুদ্ধ না হওয়া অবধি তুমি নিয়মের ঘরের বারান্দায় উঠতে পারবে না। তরকারীর ডালা ছুঁতে পারবে না। আমার নাকি জাত গেছে। আমিও যাই না ওদের ত্রিসীমানায় মাড়াতে ; আমার দরকার কিসের ? ওঁরা সারাদিন যা খট খট করে তৈরী করেন আমার খাবার ইচ্ছা হ'লে মা'র কাছে চাইলেই পাই। এখন ত তুমি এসেছ আজ থেকে তোমার হাতেও সরাকাঠি পড়বে, তুমিই আমাকে দিও বাপু এটুকু-সেটুকু খেতে।

বিনু বলিল, "আমি এখন কি কাজ করব তাই ভাবছি, কয়েকদিনের পরে আমার যেন কেমন নতুন নতুন লাগছে।" কামিনীর মা অনবরত ঠেলিয়া

ঠেলিয়া রায়বাড়ীর গণ্ডির ভিতরে তাহাকে অনেকটা প্রবেশ করাইয়াছিল, কয়েকদিনের অনুপস্থিতিতে সে গণ্ডির দ্বার যেন বন্ধ বন্ধ লাগিতেছ। তাই বিনু তরুর শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে।

তরু বলে, "বৌদি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? মা চায়ের ঘরে গেছেন, তুমি সেখানে চলে যাও। আজ না তোমাদের পাটাই পুজো। তোমাদের কাজের ঘটাপটা রয়েছে। দেখ গে ঠাকুমা ঢাক বাজাচ্ছেন পচা মালীর বৌকে নিয়ে।"

বিনু নীরবে পা বাড়াইতেই তরু তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "শোন বৌদি, আর একটা কথা - তুমি তোমার সমস্ত জিনিস আমাদের বিলিয়ে দিয়েছ দেখে মা রাগ করছেন। বললেন, 'ওর বাবা ওকে ভালবেসে যা দিয়েছেন তাতে তোরা ভাগীদার হ'লি কেন ? আমিও শুনিয়ে দিয়েছি, বৌদি ভালবেসে দিয়েছে আমরা নিয়েছি। আমরা ত পর নয়। পরে নেয় কেন ? আমাদের জিনিস হ'লে আমরাও বৌদিকে দেব। তুমি কিন্তু রাগ ক'রো না, তোমার বৃন্দাবনী শাড়ীর কথা, ফুলেল তেলের কথা আমিই মাকে বলে দিয়েছি।"

বিনু সে-কথার জবাব না দিয়া চলিয়া গেল চায়ের ঘরে।

ঠাকুমা তখন হাতীর মাথায় বসিয়া গালবাদ্য বাজাইতে ছিলেন, "ও পচার বৌ, শোন লো, পচার ত মনে আছে—আজ পাষাণ চতুর্দ্দশী পুজো। কুশ দিয়ে পাঠাই ঠাকরুণ যে তাকে গ'ড়ে দিতে হবে ? নাটাইয়ের কনার ঢাওর-এর কুশ, দেখতে এক রকমই। যে ব্রতী, তাকে উপোষ করে থাকতে হয়। বিকেলে পূজো করে ভোগ দিয়ে কথা শুনে তবে জল খাওয়া। পুরোহিত মন্তর পড়ান বটে কিন্তু যার নামের পূজো তাকেই বসে করবার নিয়ম। ভোগ একটা সাধারণ, মাছ ভাত ডাল তরকারি ভাজা অম্বল। আসল কথা হ'ল পাষাণাকৃতি পিঠে পায়েস ভোগে দিতে হবে।"

মালীবৌ সায় দেয়, "আপনাগো বাড়ীতে পিঠে পায়েস বাদ যায় কবে মাঠান। শীত ক্যাবলি আসিতেছে, শীতভোর নাগাই থাকিবে পিঠা খাওন। আমি ঝাড়-ছড়া দিবার লেগে আইবার কালে ছাখা আইছি, বাড়ীওয়ালা কুশ নয়া পাঠাই বানাইতে বসিছে। হইয়া গিলেই দিয়া যাইবে। আপনাগো পূজ্যা ত সেই সাঁজের খনে ?"

ঠাকুমা অকস্মাৎ মালীবৌয়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুই কি কইছিস বৌ, তোর যে 'এক মাঘেই শীত পালায়।' চিরটা কাল করছিস

কর্ম্মাছিস, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, তবু ভুল করিস কেনে ? রায়বাড়ীতে সাঁঝে আবার পাঠাই হ'য়ে থাকে ? দুপুর গড়াস্তে আমাদের পূজো। পাটাই আছে দুই রকম দুপুরে আর রাতে। আমাদের রাতের পূজোই হ'ত। আমার দিদিশাশুড়ী লোভে পরে বিকেলে করে গেছেন।"

মালীবৌ উঠোন ঝাড় দিতে দিতে চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ, তেঁনার বুঝি সখ হইছেল বেলাবেলি সারন-তাড়ন করিতে ?"

"সখ না সখ, নেমন্তন্নের লোভ। সেবার ভূঁইয়া বাড়ীর বড় ছেলের বিয়ের খুব ধুমধাম হয়েছিল। গাঁসুদ্ধ ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীদের নেমন্তন্ন হ'য়েছিল বৌভাতে। সেদিন ছিল পাষাণ চতুর্দ্দশী ব্রত। শহরের মতন এদেশে ত রাত-বেরাতে ভোজ হয় না। যা হয় দিনে-দুপুরে। আমার দিদিশাশুড়ী নেমন্তন্নে যাবেন বলে বিকেলেই বর্ত্ত সেরে রাখলেন। সেই থেকে দুপুরের পরে আমাদের পূজো হয়।"

মালীবৌ হাসে, "এমনি কতা শুনি নি মাঠান, আগেভাগে পূজ্যা সারি বিয়াবাড়ী যাওন। নেমন্তন্নের খাওনের কি সখ ?"

"সেকি খাওয়ার জন্যে, তা নয়। বাড়ীতে কি কম খেত তারা ? সকল বাড়ীর বৌ-ঝি এক জায়গায় হবে, কার কি নতুন গয়না হয়েছে, কে কেমন ভাল শাড়ী পেয়েছে তারই সন্ধান দিতে গাঁ ঝেঁটিয়ে একখানে হওয়া। একজনার দেখলেই আর একজন এসে কর্ত্তাদের কাছে বায়না ধরত—'অমুকের তমুক আছে, আমার নেই'।"

মালীবৌয়ের এ-দিকটা ঝাড় হইয়াছিল। সে উত্তর না দিয়া সরিয়া গেল অন্যদিকে।

ঠাকুমা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ছোট হোক, বড় হোক একটা অনুষ্ঠান আছে, নাকে সরিষার তৈল দিয়া তিনি ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে কেন ? সকলের পিছনে গরু না তাড়াইলে ইহাদের কোন কাজ সিদ্ধ হয় ? দাঁত থাকিতে কেউ দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না। ঠাকুমা দাঁতের মর্য্যাদা বুঝাইতে গেলেন ওই দিকে।

এদিকে বিনুও কাজের নির্দ্দেশ পাইয়া বর্ত্তিয়া গেল।

মনোরমা বধূর পিত্রালয়ের আনীত মেঠাই সকলকে ভাগে ভাগে সাজাইয়া চায়ের সঙ্গে খাইতে দিলেন। ভোজনের সময় তরু কোনকালে পিছাইয়া থাকে না। প্রসাদ বাঁটার সময় ঠিক হাজির।

মা দুইখানা রেকাবিতে তরু ও বিনুকে খাবার দিয়া বলিলেন, "বৌমা, তুমি খেয়ে হাত ধুয়ে তরকারি নিয়ে ব'সো গে। কোটাকাটি হয়ে গেলে পূজোর সাজ-নৈবিদ্য ফল কেটে জলপানি সাজিয়ে রাখতে হবে। কামিনীর মাকে বলেছি বড়ভোগের ঘর ধুয়ে-মুছে মাটি দিয়ে পুকুর তৈরি করে বেদী গেঁথে রাখতে। ঐখানেই পূজো হবে, ঐখানে ভোগ রেঁধে দেব।

তরু বলে, "তোমাদের পাটাই বর্ত্ত ঠিক আমার নাটাই বর্ত্তের মত, না মা? তফাৎ, কলার ডাঁটার বদলে কুশের প্রতিমা। ভোগে তারও পিঠে, এর আবার পিঠে, পায়েসের সাথে ভাত-মাছের ভোগ। আমার পূজোয় পুরুত লাগে না, তোমাদের পুরুত এসে মন্তর পড়ায়। তুমি ভোগ কি রান্না করবে মা?"

"যা সাধারণ তাই, তবে পায়েস পিঠে লাগবে। ভাবছি, এক্ষুনি নেয়ে ছোটভোগের ঘরে গিয়ে ভোগ চড়িয়ে দেইগে। এক রান্না দুই জায়গায় করে কি হবে? রান্না করে নারায়ণের ভোগ, পাটাইয়ের ভোগ দুই বাসনে ঢেলে রাখব। পিঠে পায়েস ও-ঘরে হ'লে ওরাও ভোগের পরে মুখে দেবে। ভোগ সেরে এদিকে এসে মাছ আর আতপ চালের এক হাঁড়ি ভাত হলেই এদিকের ভোগ হয়ে যাবে'খন।"

বিনু তরুর কানে কানে কি যেন বলিল।

তরু কহিল, "বৌদি, পাটাই পূজোর মাছ-ভাত রাঁধতে চাচ্ছে মা।"

মায়ের মুখে আনন্দের দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "উপোস করে যে ভোগ রাঁধতে হয় বৌমা, পরে সারাজীবন ভরে কত ভোগ-রাগ রান্না করতে হবে। আজ তুমি জল খেয়েছ, না খেলেও গোটা বেলা উপোসী থেকে পারতে না, কষ্ট হ'ত। তুমি পাঁচমিশালী একটা তরকারি কোটগে। ছোলা ভেজানো আছে, ছোলা দিয়ে রান্না হবে। পরে আর যা কুটতে হবে আমি বলে দেব। পসারীকে মটরের শাক তুলতে বলেছি, বড়ি দিয়ে শাক-পিঠালি হবে। চালতের অম্বল। পাঁচ পদের ভাজা।"

মনোরমা চায়ের পর্ব্ব মিটাইয়া দিয়া অন্য কাজে চলিয়া গেলেন।

তখনও তরু-বিনুর খাওয়া শেষ হয় নাই। তরু বলে, "বৌদি, তুমি যে মা'র কাছে পাটাইয়ের ভোগ রান্না করতে চাইলে মা যদি স্বীকার হ'তেন তা হ'লে কি করতে? তুমি যে কিচ্ছু রান্না জান না?"

"তোমার কাছ থেকে শিখে নিতাম তরু, তুমি আমার চেয়ে ভাল জান।"

তরু প্রসন্ন হইল। উনুনের উপরে কড়ায় চায়ের জন্য খানিকটা দুধ বসান রহিয়াছে। তরু হাত ধুইয়া সেই দুধ হইতে কয়েক হাতা দুধ পিতলের মগে লইয়া বাহির হইয়া গেল কালজিকে দিতে। কালজিকে প্রচুর দুধ না দিলে তরুর আদরের মাতৃহীনা শিশু দুইটি স্তনদুগ্ধ-বিনে মরিয়া যাইবে।

কামিনীর মা ঘর পরিষ্কার করিতে আসিয়া আহ্লাদে আটখানা। "বৌমা, তুমি নাকি পাটাই পূজ্যার ভোগ রাঁধিতে চাইছিলা, তোমাগো শাউরী খুসী হইয়া কইল আমারে। পরের ঘরে বুদ্ধি খাটায়ে থাকন লাগে মা, এই ত তোমাগো রাঁধন করিতে হইল না, একডা মুকের কতায় কত তুষ্টু হইলেন। তোমার 'নাঠিও ভাঙ্গিল না ; সাপও মরিল না।' এমতি বুদ্ধি খাটাইবা পায়ে পায়ে। আচ্ছা বৌমা, সাহস করি যে কইছিলা—যদি সত্যি রাঁধিতে হইত তবে কি করিতা ?"

"কি আবার করতাম, তোমাকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতাম মাসী।"

"হ, পূজ্যার ভোগে আমাগো যাইতে দিইত কি না ঘরে।"

"ঘরে না যেতে জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাইরে।"

কামিনীর মা হাসে, "সাবাস বুদ্ধি ম্যায়ার, এবারে বুদ্ধি খুলিচে। এহন বড় হইতেছ, সগল দিকে মাথা খাটাইবা। 'করিলে পরের ঘর, ঘাম দিয়া ছাড়ে জ্বর'।"

দুর্গোৎসবের বড়ভোগের গৃহের মাঝখানে পটাই পূজার জলাশয় তৈরী হইয়াছে মাটি দিয়া, বেদীও মাটির। মণিরাম ভোগের জল তুলিয়া চাল ধুইয়া ভোগের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। বিনু নিয়মের পূজার সাজ-নৈবিদ্য-জলপানি গোছাইয়া রাখিয়া তরুর সহিত ক্ষুদ্র পুকুরের পাড়ে ও বেদীর ওপরে আলপনা দিতেছিল।

বিনু তরুকে শিখাইতে ছিল তরুলতা ও কলমিলতা আঁকা। বিনু স্নানান্তে খেজুরছড়ি শাড়ীখানা পরিধান করিয়াছে, তাহাকে মানাইয়াছে চমৎকার।

ছোটভোগের ঘরে তুমুল সমারোহ তখন শেষ হয় নাই।

এমন সময় লবঙ্গ একটা বোনা হস্তে উপস্থিত হইল বিনুদের নিকটে। লবঙ্গ বোনা-সেলাইয়ের ওস্তাদ। লোকে তাহার শিল্পকলা দেখিয়া ধন্য ধন্য করে। লবঙ্গ মেনীর গায়ের একটা উলের জামা আরম্ভ করিয়াছে। প্যাটার্ণ যুঁই ফুলের ঝাড়।

বিনু একখানা খুবড়ি পিঁড়ি পাতিয়া আহ্বান করিল, "আসুন পিসিমা, বসুন, কি সুন্দর আপনার বোনা হচ্ছে।"

তরু লোলুপ দৃষ্টিতে বারেক বোনার দিকে তাকাইয়া বলে, "বৌদির আলপনা দেখেছেন পিসিমা? কি সুন্দর কলমিলতা তরুলতা দিয়েছে। তরুলতা আমাকেও শিখিয়ে দিয়েছে। এই ধারের লতাটা আমি দিয়েছি; কিন্তু বৌদির মত সোজা হয় নি।"

"ক্রমেই হবে। প্রথমে সকলের হাতে বাঁকা-চোরা হয়। তুই নিজেই তরুবতী, তোর আবার তরুলতা আলপনা! মেনীর জন্যে শীতের জামাটা বুনতে নিয়েছি। মনে হচ্ছে কাঠ-গোলাপ রংএর উল যা আমার আছে তাতে কুলোবে না। বৌয়ের বাক্সে দেখেছিলাম বাণ্ডিল বাণ্ডিল উল। ও ত বুনতে জানে না, শুধু শুধু নষ্ট হবে। চল না বৌ, চট করে তোমার উলের সঙ্গে আমারটা মিলিয়ে দেখিগে।"

বিনুর আলপনা শেষ হইয়াছিল, সে উঠিয়া লবঙ্গর সহিত যাইতে উদ্যত হইল।

তরু বাধা দিল, "বৌদি, তুমি এখন শোবার ঘরের আলমারি বাক্স খুললে সেজদি তোমাকে পুজোর কাজে হাত দিতে দেবে না। আমি নতুন কাপড় জলে না ধুয়ে পরেছি বলে আমাকে কিছু ছুঁতে দিচ্ছে না। মা বলেছেন আলপনায় দোষ নেই, তাই আলপনা ছুঁচ্ছি। কাঠগোলাপী উল বেড়ার বন্দরে নাকালিকায় বন্দরে ঢের পাওয়া যায়, সেজদি কার্পেট বুনছে, কত রং-বেরংএর উল আনিয়ে নেয়।"

লবঙ্গ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "তা হ'লে এখন আমি চলি। বিকেল বেলা ত তোমাদের পূজো-অর্চ্চনা। রাতে আবার রং ঠাওর করা যায় না। কাল দুপুরে আসব।"

লবঙ্গ চলিয়া গেলে তরু বিজ্ঞের মত গম্ভীর মুখে বলিল, "বৌদি, তুমি বড় বোকা। তোমার উল নেবার ফিকিরে আসা হয়েছিল। সেজদি ত তোমার জিনিস নেবে না। ওর ভারী হিংসুটে স্বভাব। সেজদি এলে তাকে দিয়ে বুনিয়ে নিলেই হবে। আচ্ছা বৌদি, তুমি, বোনা শেখো নি, তবু তোমার বিয়ের সময় বোনার বাক্স দিয়েছিলেন কেন? তুমি যদি জামা বুনতে জানতে তা হলে মেনীর মত আমারও হ'ত।"

বিনু ধীরে বলে, "জামা আমিও জানি তরু, কিন্তু যুঁই ফুল জানি না। কফিপাতা, ঝিনুক বরফি এই সব।"

তরুর দীঘল চোখ আনন্দে জল জল করিতে লাগিল, "তুমি যদি এত সব জান বৌদি, তবে বোন না কেন? তাই ত বলি, বোনা না জানলে ওঁরা বেতের বোনার বাক্স ভরে কাঁটা হাড়ের কাঁটা ক্রুশ কাঠি স্থচ স্থতো কাঁচি রাজ্যের পশম দেবেন কি কারণে? তুমি আমাকে কফিপাতা জামা করে দিও। কতদিন লাগবে তোমার? মেনীর জামা হবার আগে পারবে ত?"

"খুব পারব, বুনলে আবার ক'দিন? তুমি কি রং ভালবাস সেটা আজ ঠিক করে দিও, আমি আজ থেকেই স্থরু করে দেব।"

"তোমার চাবি কোথায় বৌদি, আমি আলমারি খুলে উলের রং ঠিক করিগে। বিছানার নীচে চাবি রেখে দাও কেন? ওটা ভারি খারাপ। যার ইচ্ছে সেই ত হাতিয়ে বের করে নিতে পারে সব। বৌ-মানুষের আঁচলে চাবি রাখলে ঘোমটার কাপড় সরে যায় না। আমি আঁচলে চাবি রাখতে খুব ভালবাসি। সেই জন্যে মা আমাকে এক গোছা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছেন।"

"আমার দাদামশাই আমাকেও রূপোর রিংএর বারটা রূপোর চাবি গড়িয়ে দিয়েছিলেন আমি তা আকাশিকে দিয়েছি। একখানা হাত ওর অবশ বলে কাপড় এলোমেলো হয়ে যায়। ওর মা কোমরে এঁটে কাপড় পরিয়ে পিঠে চাবি ঝুলিয়ে দেন, এখন কাপড় ঠিক থাকে।"

"তুমি বড় উড়নচণ্ডী বৌদি, বারো বারোটা রূপোর চাবি একজনাকে দিয়ে দিলে? কেউ ভালবেসে কিছু দিলে সমস্তই কি ধরে দিতে হয় অন্যকে? তোমার এ স্বভাব ভাল না বাপু?"

বিন্নুর আর জবাব দেওয়া হইল না। মনোরমা ওদিকের কাজ সারিয়া এদিকে আসিলেন।

সপ্রশংস নেত্রে আলপনা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "বৌমা বুঝি আলপনা দিয়েছে, দিব্যি হয়েছে। তুই ওর কাছ থেকে শিখিস তরু?"

তরু সোৎসাহে বলে, "তাই শিখছি মা, বৌদির দেখে এদিকের তরুলতা আমি দিয়েছি। দেখ মা, একটা কথা, কেউ আমার নাম জিজ্ঞেস করলে এখন থেকে তুমি কখনো বলতে পারবে না "তরুবতী"। বতী শুনে আমার ঘেন্না করে, এখন থেকে আমি তরুলতা হ'লাম।"

মা হাসিতে হাসিতে ভোগ চড়াইয়া দিলেন।

বিন্নুকে বলিলেন, "পূজোর সব এখানে সাজিয়ে এনে রাখ বৌমা। রেখে যাও ছোটভোগের ঘরে, ওঁরা এখন খেতে বসবেন।"

২৭

রাত হয়েছে। আজ খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে তাড়াতাড়ি।

যথাসময় পুরোহিত আসিয়া পাষাণ চতুর্দ্দশীর পূজা করাইয়া গিয়াছেন মনোরমাকে দিয়া। এ পূজায় ঢাক ঢোল বাজে না। শঙ্খ-ঘণ্টা ও উলুধ্বনিতেই পার্ব্বণ সমাধা হয়। সারাদিন উপবাসের পরে মনোরমা সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই ছেলে মেয়ে বৌকে লইয়া প্রসাদ খাইয়া উঠিয়াছেন।

কর্ত্তা রাত্রে ভাত খান না। প্রচুর গাওয়া ঘৃতে ময়ান দেওয়া আটার রুটি, ক্ষীর ও দুই-একটা মিষ্টি খাইয়া থাকেন।

আজ তাঁহার খাবার শয়নগৃহে ঢাকা পড়িয়াছে। নিয়মের ঘরে দুধেরও তেমন হাঙ্গামা ছিল না। পনের আনা দুধের পায়েস পিঠা হইয়াছে। বাকী দুধ বিনু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

ঠাকুমা এখন বচন ঝাড়িতেছেন বিনুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া। ছেলের ভয়ে সন্ধ্যার পরে হাতীর সিংহাসনে আসন পাড়িতে পারিতেছেন না। অগ্রহায়ণ মাস যায়, উত্তুরে বাতাসে শীতের আমেজ দিতেছে। খোলা বারান্দায় রাতে মাকে বসিয়া থাকিতে মহেশবাবু নিষেধ করিয়াছেন। সে নিষেধ ঠাকুমা সম্পূর্ণ পালন না করিলেও কিছু কিছু মানিতে হয়। তিনি বিলক্ষণরূপে জানেন তাঁহার পুত্রের অন্তঃপুরে গতিবিধির সময়।

ছোট ঠাকুমা মালা জপিতে বসিয়াছেন তাঁহার ছোটভোগের ঘরে। সরস্বতী পাতলা একটা পশমের গায়ের কাপড় গায়ে জড়াইয়া গড়াইতেছে নিয়মের বারান্দার বেঞ্চিতে। সুমন্তকে লইয়া মনোরমা শয্যা লইয়াছেন।

রন্ধনশালায় পাচকরা দাসদাসীদের হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত রান্না করিতেছে। মালীবৌ তাহাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর পাওনা এক গামলা প্রসাদ লইয়া গিয়াছে। প্রসাদ আছে প্রচুর, শুধু ভাত হইলেই দাসদাসীরা রাতের আহার মিটাইতে পারে।

কামিনীর মা ঠাকুমার অনতিদূরে প্রদীপের সলতে পাকাইতে নিমগ্ন। নিয়মের দিকে শূদ্রাণী দাসীর সলতে অচল। চলের সলতেও কম নয়। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হলঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে। তাহার পরে তেলের সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাইতে হয় প্রতি ঘরে। মণ্ডপের ও তুলসীতলায় বেলতলায় প্রদীপ দিতে হয় রায়রঙ্গিণীদের।

বিনু-তরু ঘরের নিভৃতে আলোর সামনে ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়াছে।

ঠাকুমা আক্ষেপ করিতেছেন, "শোন রাজেশ্বরী, আজ আমার পেসাদের জন্মতিথি। চতুর্দ্দশী ছেড়ে যেমনি পূর্ণিমা লাগল, তখুনি শাঁখ বেজে উঠল সূতিকা-ঘরে। কর্ত্তার কাছে খবর গেল পূর্ণিমায় তাঁর বংশের প্রথম 'পূর্ণচন্দ্র' উদয় হয়েছে।

কর্ত্তার গায়ে ছিল দামী শাল, যে খবর দিয়েছিল তখনই তিনি তাকে শাল খুলে দিলেন, হাতের আংটি খুলে দিলেন। তার পরে ঝি-চাকরদের কি দেওয়া-থোওয়া। টাকার বৃষ্টি করে ফেলেন। কলসী থালা ঘটি উজার করে দিলেন। সেই দণ্ডে লোক ছুটলো বন্দরে বন্দরে। গামলা গামলা রসগোল্লা সন্দেশের ছড়াছড়ি। পাড়ায় পাড়ায় থালা থালা মিষ্টি বিতরণ। খবর পেয়ে ঢোলওয়ালারা ছুটে এসে ঢোল-কাঁসিতে ঘা দিলে। বস্তা বস্তা কাপড় পেল সকলে। আমার সেই পেসাদ।"

ঠাকুমা ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিলেন।

কামিনীর মা পায়ের হাঁটুতে সলতের পাক দিতে দিতে বলে, "মাঠান, নাতি আপনাগো কি ভাগ্যমানী, এমতি দিনে জন্ম হয় যার সে হয় লক্ষ্মীমন্ত। রায়বাড়ীতে জন্মতিথির পূজ্যা-পাল নাই, কিন্তুক দাদাবাবুর জন্মদিনে এমতি পূজ্যা হইয়া যায়। পুরুত ঠাকুর আসেন, খাওন-দাওনের ঘটা হয়। পরাণ ভরে সগলে পিঠা পায়েস খায়। এডা কম কতা নাকি ?"

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ স্বরে বলেন, "সবই ত হয় রাজেশ্বরী, কিন্তু আমার সোনার চাঁদের মুখে যে এর এতটুকুও যায় না। এই দুঃখে আমার মন অস্থির করে। সে যে জায়গায় রইছে সে-দেশে নাকি এমন খাবার দেব্যজাত মেলে না। কলের জল দিয়ে পেট ভরাতে হয় ? তার ঘরে জিনিসের হেলাফেলা, সে আমার কিছু পায় না।

'ছাড়িয়া অযোধ্যাপুরী রাম করে বনবাস,
চোদ্দ বছর পরে হবে ফের তার পরকাশ'।"

কামিনীর মা রাগ করে, "ছিঃ মাঠান, কি কইচো ? এই ত পূজ্যার কালে দাবাবু আইসি থাকি গ্যাল এক মাস, ফের ছুটি পাইলেই আসিবে। তুমি যত না ভাবন কর আসলে কলকেতা ত্যামতি নয়। বন্দরের কুণ্ডুরা ত আমাগো জাতভাই, তারা বেবসা করি খায়। মাসের মধ্যে সাড়ে সতেরবার যায় কলকেতায় মাল আনতে। সে হ্যাশের খাজাগজা বাণ্ডিল ভরি ভরি আনে, ছাওয়াল ম্যায়ার লাগি। খাইতে খুব সোন্দর। দাবাবু ত দিবারাত তাই

খাইচে। না খাইয়া থাকনের বান্দা রায়বাড়ীর ছাওয়াল লয়। যে হ্যাশের যে দেব্য। তার নেগে দুখু ক্যানে?"

দুঃখ যে কেন, ঠাকুমা সেটা কামিনীর মাকে বুঝাইতে পারিলেন না। গলা বাড়াইয়া তাকাইলেন ঘরের ভিতরে।

আলোর সামনে বসিয়া তাঁহার আদরের মণিবালা কি করিতেছে। লম্বা সাদা দুইটা কাঠি, কোলের উপরে এক গোছা নীল রংএর পশম। নিকটে তরু, পুলকে যেন কদম কেশর।

আজ তরুর ঘুম নাই চোখে। লোকে যে বলে 'গরজ বড় বালাই'। তরুর গরজ বেশি, মেনীর আগে সে পশমের জামা গায়ে দিয়া সকলকে তাক লাগাইয়া দিতে চায়। মেনীকে সে ভালবাসিলেও রেষারেষি ভীষণ। সেই রেষারেষির ফলে বিনুর অনেক কাজ তরু করিয়া দিয়া বিনুকে বুনিবার সুযোগ দিয়াছে।

ঠাকুমা বলিতেন, "বিনুর আমার কলের হাত। কাজ হাতে লইলে নিমেষে সারা হয়।"

এ নিমেষে শেষ হইবার কাজ নয়। তবু ফাঁকে ফাঁকে বুনিয়া বিনু তরুর জামা অনেকটা করিয়া ফেলিয়াছে। কফিপাতা প্যাটার্ণ হাড়ের কাঠির বুনানি, অল্পেই বাড়িয়া যায়। তরু নীল রং পছন্দ করিয়া সেই বাণ্ডিলটা রাখিয়া অন্য পশমগুলি কোথায় যেন সন্তর্পণে সরাইয়া রাখিয়াছে। যাহাতে লবঙ্গ তাহার সন্ধান না পায়। তরুর উপস্থিত বুদ্ধিতে বিনু কৌতুক বোধ করে। এইটুকু মেয়ের কি বুদ্ধি, যেন ধানী লঙ্কা! ইহাদের মাথায় এতও আসে। রায়বাড়ীর মেয়ে—অ-রায়বাড়ীর মত ভোঁতা মাল নয়। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তরু ঘুমাইতে গেল। ধীরে ধীরে সারা বাড়ী নিঝুম হইল। ছোট ঠাকুমা লেপ মুড়ি দিয়া নাক ডাকাইতে লাগিলেন।

বিনু তখনও শয্যা লইতে পারিল না। তাহার যে 'দুই নৌকায় পা'। এক নৌকা সামাল দিলে অন্য নৌকা সরিয়া গেলেই সলিলে পতন। প্রসাদকে চিঠি লিখিতে হইবে।

বিনু আলো আড়াল করিয়া জাগিয়া স্বামীকে চিঠি লিখিতে লাগিল। তাহার সহিত জাগিয়া রহিল পূর্ণিমার চন্দ্র। শুধু জাগিয়া রহিল না, বাতায়ন-পথে শুভ্র কিরণ-রেখার অঞ্জলি ঢালিয়া দিতে লাগিল বিনুর সর্ব্বাঙ্গে।

পুণ্য পৌষ মাস। সকলে বলে লক্ষ্মীমাস। এ বাড়ীতে বারমেসে লক্ষ্মীপুজো নাই। পৌষ মাসের চারিটা বৃহস্পতিবারে নতুন ধানের বাইল ও ক্ষীরের নাড়ু দিয়া

লক্ষ্মীর ঝাঁপির নিকটে বসিয়া লক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতে হয়। উলু দিয়া ঝাঁপি নামাইতে হয়, তুলিয়া রাখিতে হয়। লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে এদেশে লক্ষ্মীর কাঠা বলে। ছোট একটা বেতের ধামার সারা গায়ে সিঁদুরের ফোঁটা। তাহার ভিতরে থাকে আয়না চিরুণী শাঁখা সিঁদুর শঙ্খ পাতা আলতা, আর সিঁদুরমাখা রাশি রাশি ছোট-বড় কড়ি, সমুদ্রের ঝিনুক। পট্টবস্ত্রের টুক্‌রা দিয়া ধামার মুখ ঢাকা থাকে। ইনিই হইলেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। লক্ষ্মীপূজায় চিত্রিত লক্ষ্মীর আসনে আগে লক্ষ্মীর ঝাঁপি স্থাপন করিয়া ঘটে-পটে পূজা হয়।

বিনুর শয়নগৃহের বারান্দা গোবরজল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া রাখা হইয়াছে। নবীন ধানের তুইটা বাইল আনিয়া রাখিয়াছে।

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা সেইখানে নামান মাত্র ঠাকুমা উলু দিতে লাগিলেন। তাহার পরে ক্ষীরের নাড়ু দিয়া অনুচ্চস্বরে লক্ষ্মীর কথা বলা হইল। এ ঘটার কিছু নহে। কেহ লক্ষ্মীর কথা শুনিতে আগাইল না। ঠাকুমা পুত্রবধূকে সচেতন করিতে আপনার মনেই আরম্ভ করিলেন, "পৌষ মাসের চারটা বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীর কাঠাকে চারটে কথা শোনাতে হয়, কুকুর পিঠে, তিলের ফুল, বামুন-বামুনী, পুকুর কাটা—এই চারটে কথা। এ মাসে আমাদের পাটাইয়ের কোলের করা আছে। ছয় লোটন দিয়ে কথা শুনে ছয় আনাজের ঝোল দিয়ে একবেলা নিরামিষ খাওয়া। বারমেসে ষষ্ঠী নেই আমাদের, আর সেই জষ্টি মাসে আমষষ্ঠী। পৌষ পার্বণের আগে সকলে জিরিয়ে সাধিয়ে নিক। মাঘ মাসে আবার নানান খানা।"

ঠাকুমার অজস্র বকুনির মধ্যে তরু সগর্বে উপস্থিত হইল। তাহার চোখে-মুখে পুলক যেন উছলিয়া পড়িতেছে। তরুর গায়ে ঘন নীলবর্ণের সদ্য-বোনা হাফ কোট। কোটের হাতে গলায় ঝুলে কাঠগোলাপী পশমে ছোট ছোট ঘুণ্টি বসানো। যে কাঠগোলাপ পশমে বোনার সূত্রপাত হইয়াছিল নীলের গায়ে তাহার কত বাহার খুলিয়াছে।

তরু উজ্জ্বল মুখে বলে, "ঠাকুমা, ভাল করে চেয়ে দেখ আমাকে কেমন দেখা যাচ্ছে? বৌদি বুনে দিয়েছে। কত প্যাটার্ণ জানে। চুপ করে ঘোমটা দিয়ে থাকে বলে সকলে পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়ায়, 'বৌ কিছু জানে না, গবা'।" তরু নিয়মের ঘরের দিকে তাকাইল। যেখানে সরস্বতী কি যেন কাজ করিতেছিল।

ঠাকুমা হাত বাড়াইয়া তরুর জামার ঘণ্টিগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে

কহিলেন, "বাঃ, দিব্যি হয়েছে। আহা, আমার মণিমালার কত যোগ্যতা। আমি কি এমনি ওর মণিমালা নাম থুইচি। তোরে জামাজোড়া গায়ে দিয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে তন্নি, তুই নীরদবরণ সেজেছিস?"

মনোরমা লক্ষ্মীর কাঠা যথাস্থানে তুলিয়া রাখিয়া মেয়ের গায়ের জামা দেখিয়া পুলকিত হইলেন।

এমন সময় সুমু আসিয়া বিনুকে জড়াইয়া ধরিল, "বইদি, আমাকে দিলে না নতুন জামা, লাল টুকটুকে?"

বিনু তাহাকে আদর করিয়া কানে কানে বলিল, "এবার তোমাকে দেব সুমু। তুমি লক্ষ্মী ছেলে, তোমাকে সুন্দর জামা করে দেব।"

তরু ছুটিয়া গেল সকলকে জামা দেখাইতে। মেনীর জামা এখনও শেষ হয় নাই। মেনীর আগে তরুর অঙ্গে নূতন জামা উঠিয়াছে এ গৌরব যে সীমাহীন।

কামিনীর মা পাথরকুচি গ্রামের মেয়ের অপটুতায় এতদিন ম্লান হইয়াছিল। এখন তাহারও বলার সময় আসিতেছে। বরাবরই সে স্নেহের সহিত, সহানুভূতির সহিত বিনুর দোষ-ত্রুটি ঢাকিয়া রাখিতে ব্যগ্র। সে সামান্য দাসী হইলেও তাহার হৃদয় আছে। এবার বিনুকে আনিতে গিয়া সেই স্নেহ-নদীতে জোয়ার লাগিয়াছে।

বিনুর মা তাহার হাত ধরিয়া মাথার দিব্য দিয়া বলিয়াছে বিনুর তত্ত্বাবধান করিতে। ঠাকুমা তাহাকে একজোড়া ধুতি, পাঁচটি টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। সেখানে সামান্য দাসী হইয়া সে যে আদর-যত্ন পাইয়া আসিয়াছে, রায়বাড়ীতে সেটা দুর্লভ। কামিনীর মা অকৃতজ্ঞ নয়।

সে ঠাকুমার কথায় সায় দিল, "যা কইলে মাঠান, বৌ তোমাগো দিব্য হইচে। আহ্লাদি ম্যায়া মাসের মধ্যে সাতবার করি কলকেতায় থাকিছে, গাঁয়ের কাজকামে যুত করিতে পারে নাই। এহন ছ্যাখন-শুননে শিখা লইবে সব। হাতে পায়ে কাজ ষ্যান নাগেনা। এই ধরিছে, এই সারিছে। বড় খর কর্ম্মা ম্যায়া।"

খরকর্ম্মা মেয়ে লজ্জায় সেস্থান হইতে পলায়ন করিল নিজের নিভৃত গৃহে। এখানে আসিয়া এ পর্য্যন্ত বোনা লইয়া একদিনও সে হাতের লেখা লিখিতে পারে নাই। এবার যে সংকল্প করিল সকল কাজের ভিতরে এবার সে খাতার পাতা ভরাইয়া রাখিবে।

খেয়ালী বিন্নুর সময়ের জ্ঞান কম, তখনই সে বসিয়া গেল হাতের লেখা লিখিতে। সংস্কৃত প্রথমভাগ খানা সে মাথায় ঠেকাইয়া সযত্নে তুলিয়া রাখিল তাহার পাঠ্যপুস্তকের সহিত। বাবা দিয়াছেন, বাবার হাতের লেখা জলজল করিতেছে শ্রীমতী বনলতা দেবী।

বাবার হস্তাক্ষর নিরীক্ষণ করিয়া বিন্নুর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। একে একে মনে পড়িতে লাগিল তাহার পনের দিনের জীবনযাত্রার ইতিহাস। ভুলিয়া থাকিতে চাহিলেই কি ভোলা যায়? জীবনের সহিত যাহারা জড়িত হইয়া আছে তাহাদিগকে হৃদয় হইতে কিরূপে মুছিবে বিনু? অদর্শনে তাহারা ক্ষীণপ্রভ তারকার মত হৃদয়াকাশে অস্পষ্ট হইয়া অন্তরাল রচনা করে থাকে, কিন্তু অন্তর্হিত হয় না।

তরু গায়ের জামা দেখাইতে পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল। এই অসময়ে বিনুকে খাতায় হাতের লেখা লিখিতে দেখিয়া তরুর বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

তরু প্রশ্ন করিল, "বৌদি, এখনও তুমি নাইতে যাও নি? বাড়ীর সবাই নেয়েছে শুধু আমি বাকী।"

বিন্নু অম্লান বদনে বলিল, "আমি তোমার সঙ্গে নাইব বলে বসে রয়েছি। এখন ত কাজকর্ম্ম পাতলা হয়ে গেছে। হবিষ্যি ঘরে করবারই বা কি আছে?"

"কি যে বলো বৌদি, তোমাদের এ বাড়ীতে মেজদি নতুন কাজের পত্তন করে চেল্লাতে থাকে। ক'দিন তুমি আমার জামা বোনাতে একটু ঢিল দিয়েছিলে সেই আক্রোশে দাপিয়ে মরচে। যেমন আমার মেজদি তেমনি হয়েছে তার সঙ্গী সাথীরা। আমার গায়ের জামা দেখে লবঙ্গ পিসীর মুখ চুণ। উনি ছাড়া আর যদি কেউ কিছু করে দেখাতে পারে না। উল না পেয়ে রাগে ফুলছে।"

"তুমি কোথায় উল লুকিয়ে রেখেছ তরু, তার থেকে আমাকে লাল টুকটুকে দেখে এক বাণ্ডিল বের করে দাও। আমি আজ দুপুর থেকেই সুমুর জামা সুরু করে দেব।"

তরু খুসী হয়, "সুমু ছোট্ট, তাকে ত আমার আগেই করে দিতে হত বৌদি। দেখ, একটা ভাল কাজ করলে হয়, তুমি বসে বসে সুমুর জামা বোন, আমি নেয়ে-ধুয়ে তসরের শাড়ী পরে নিয়মের কাজ করে দেই।"

"তুমি ত আমার অনেক কিছু করে দিচ্ছ তরু, তুমি ছোট, তোমার সাধ্যি নেই ক্ষীর ছানা সন্দেশ করতে। সুমুর হাতকাটা সোয়েটারে বেশি সময়

লাগবে না। চল, আমরা নেয়ে আসি। তরু গায়ের কোট খুলিয়া চুল খুলিতে বসিল। এই জামা উপলক্ষে তরুর সহিত বিনুর একটা হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। মুখরা তরু বিনুকে বসাইয়া রাখিতে চাহে, নিয়মের কাজের মধ্য হইতে ছলছুতায় বাহিরে টানিতে চাহে। কিন্তু টানিবে কাহাকে? সে গোলকধাঁধায় একবার প্রবেশ করিলে কাহার সাধ্য পথ খুঁজিয়া বাহির করে।

সম্প্রতি তরু হইয়াছে রায়বাড়ীতে অপাংক্তেয়, অস্পৃশ্য। কুকুর-বিড়ালের শাবক চারটি ইহার কারণ। তাহারা এখন কাঠের ঘরের পৈঠা ডিঙ্গাইয়া আনাচে-কানাচে অঙ্গনে খেলিয়া বেড়ায়। খুঁটিয়া খাইতে শিখিয়াছে। তরু হাট হইতে পেতলের ঘুঙুর আনাইয়া বাঁধিয়া দিয়াছে তাহাদের গলায়। তাহারা নড়িলে-চড়িলে ঝুম ঝুম শব্দে বাজে।

এখন আর কালজিকে বাটি বাটি দুধ খাওয়াইতে হয় না। বাচ্চা কয়েকটা দুধের বাটি ধরিয়া দিলে নিজেরাই চুক চুক করিয়া খায়।

দুধ অপরিষ্যাপ্ত, কে তাহার হিসাব রাখে। বাড়ীর গাভীরা কলসী কলসী দুধ দিতেছে, বাজারে দুধ তিন পয়সা চারি পয়সার উর্দ্ধে দাম ওঠে না। তখনকার সময় লোকে অনায়াসে দুধে স্নান করিতে পারিত।

তরুর পোষ্যরা দুধে স্নান না করিলেও প্রচুর দুধ খাইতে পায়। দুধে-মাছে এক একটা হইয়াছে নধরকান্তি। কিন্তু 'স্বভাব যায় না মলে', সাহেব বিবির লক্ষ্য রন্ধনশালায়, কেহ আহারে বসিলে সেইখানে উপস্থিত হইয়া লেজ ফুলাইয়া ঘুর ঘুর করিবে, মিউ মিউ ডাকিবে। বাদশা বেগম সাথীদের অনুকরণ করিতে গিয়া অবিরত তাড়া খায় "দূর দূর ছাই ছাই।" তাহাদের আস্তানা আস্তাকুঁড়ে।

চিরকাল ইহাদের বিড়ালরা শুচি আখ্যা পাইয়া নিয়মের ঘর ও ভোগশালা বাদে গোটা বাড়ী বিচরণ করিয়া বেড়াইত। কিন্তু এখন তাহাতে নিষ্ঠাবতী সরস্বতীর মহা আপত্তি। কুকুরের দুধ খাইয়া যে বিড়াল জীবনধারণ করিয়াছে, তাহার বিড়ালত্ব কোথায়! সে কুকুর হইয়া গিয়াছে।

তরুর মহা মুশ্‌কিল, ওই বিছানা ছুঁইয়া দিল, রান্নাঘরে ঢুকিল। নিয়ম-কক্ষের সিঁড়িতে বসিয়া আছে। তারা বাহির মহলে চালান করিয়াছে, দূর দূর ছাই ছাই।"

পোড়ারমুখো কুকুর-বিড়াল শাবক কিছুতেই বাহিরে যাইয়া থাকিতে চায়

না। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই অন্দরমহলে। সেইজন্য তরু বৌদির প্রতি সদয় হইলেও কাজে সহায়তা করিতে পারে না।

২৮

সেদিন সে বিন্নুকে বলিয়াছিল, "কাজ এখন পাতলা হইয়াছে।" অল্প কাজের প্রতি বোধ হয় বিন্নুর চোখ লাগিয়াছিল। পল্লীগ্রামে মানুষের 'চোখলাগা' সোজা নয়।

কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার ফলস্বরূপ পাচক মণিরাম-ফণিরামের বৃদ্ধা মাতার মৃত্যু সংবাদ আসিল সুদূর উড়িষ্যা হইতে। মণিরামের স্বজনরা বুদ্ধি করিয়া তারেই সংবাদ দিয়াছিল। তার আসিল সাত দিন পরে।

দুই ভাইকেই রওনা হইতে হইল মায়ের শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবার জন্য। কোন কারণবশতঃ একজনা অনুপস্থিত থাকিলে কাহারও অসুখ হইলে অপরে কাজ চালাইবার সুবিধার জন্যই জোড়া ধরিয়া তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা অপর কেহ নহে, এক মা'র সন্তান।

কর্তা মণিরাম-ফণিরামকে যাতায়াতের খরচ দিয়া মায়ের শ্রাদ্ধের যাবতীয় টাকা দিয়া সাত দিন পরে ফিরিবার নির্দ্দেশে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা নিয়মের চালের গুঁড়া কুটিতে এমনিই ঢেঁকিতে পা দেয় না; নিয়মের ডালের বড়ির জন্যে এমনিই গামলা গামলা ডাল বাঁটে না। কায়িক পরিশ্রম করিয়া দুই ভাই মিলিয়া একটা জমিদারি কিনিয়া রাখিয়াছে।

যাঁহারা বাকী খাজনার জন্য ভেকু সেখকে কয়েদ করিবার হুকুম দেন, তাঁহারাই আবার ধান উঠিলে বস্তা বস্তা ধান পাঠান তাহার গৃহে। পূজার সময় ভেকু-পরিবারের নূতন কাপড়, শীতের দোলাই কম্বল বিতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব, ভীষণে মধুর, কোমলে কঠোর।

মণি-ফণি তেপান্তরে পাড়ি ধরিলে রায়বাড়ীতে সকলের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পল্লীগ্রামে রসুয়া ব্রাহ্মণের নিতান্ত অভাব। সাধারণতঃ গ্রামবাসী ব্রাহ্মণরা অজ্ঞাতকুলশীল রসুয়া ব্রাহ্মণের হাতে খায় না। সেই কারণে পাচক সম্প্রদায়দের অত্যন্ত অভাব। পাবনা শহরে কখনও দোবে বা ওঝা দুই-একটা চেষ্টা করিলে কালে-ভদ্রে জুটিয়া যায়। রাজসাহী পাবনা বারেন্দ্রভূমি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরা প্রাণান্তেও পাচক বৃত্তি অবলম্বন করে না।

অগোত্যা মনোরমা ঢুকিলেন রন্ধনশালায়। তাঁহার মতন পাকা রাঁধুনী

সেকালেও বেশি ছিল না। রান্না করিতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন। সেকালের মেয়েদের বাহিরের জগৎ বলিয়া কিছু ছিল না। লেখাপড়ার বালাই ছিল না। রান্না ভিন্ন তাঁহারা করিবেনই বা কি ?

কামিনীর মা বিনুকে তালিম দিয়া ঠেলিয়া দিল শাশুড়ীর পিছনে। নিয়মের কাজে হাহাকার পড়িয়া গেল। সরস্বতী মুখে বাড়াইয়া দিবার ওস্তাদ, কিন্তু কিন্তু হাতে-কলমে করিতে নারাজ।

বিনু কিন্তু পুলকিত, দুধের সেবার অপেক্ষা রন্ধন তাহার ভাল লাগে। রান্না চড়াইয়া সে বুনিতে পারে সুমুর সোয়েটার। তরুর সহিত গল্পসল্পও দিব্যি চলে। শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে পোড়াকাঠের কয়লা দিয়া হিজিবিজি কাটিলেও কেহ দেখিতে আসে না।

কয়েকদিন মনোরমার সহযোগিতায় বিনু রন্ধনে অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গেল। এখন তাহার ভয় করে না। সাহস হইয়াছে।

সেদিন বিনু একাকী রান্না করিতেছে। মাছ আসিয়াছে তিন জাতের। কামিনীর মা কাছে নাই ; তাহাদের নূতন ধানের চিড়া কোটার ধূম পড়িয়া গিয়াছে।

রন্ধনশালার পিছনে পুকুরে যাইবার রাস্তা। কামরাঙ্গা গাছের পাশ দিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

বিনুর বাতায়ন-পথে তাকাইয়া সহসা চমকিত হইল। পুকুরের পাড় দিয়া কে আসে অন্দরে। গায়ে ওভারকোট, মাথায় কানঢাকা টুপি, মুখ ভাল দেখা যাইতেছে না, কেমন যেন ভালুকের মতন আকৃতি। দূর হইতে মূর্ত্তিটি জুতার মস মস শব্দ করিয়া বাতায়নের নীচে আসিল। বিনু সরিয়া গেল না, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। অজ্ঞাতসারে কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

বেলা বারটা বাজিয়া গিয়াছে। সকলে ব্যস্তসমস্ত। ঝিয়েরা সকলেই প্রায় উপস্থিত ঢেঁকিশালায়। ছোট ঠাকুমার ভোগ রান্না হইয়া গিয়াছে। তিনি পূজারীকে ডাকিতেছেন ভোগ সরাইতে।

মনোরমা বসিয়াছেন নিয়মের কর্ম্মশালায় দুধের কড়া লইয়া। ঠাকুমা হাতীর মাথায় বসিয়া অনিমেষে লক্ষ্য করিতেছেন কতক্ষণে ভোগ সরিবে।

তরু বিবিকে কোলে লইয়া বিড়ার চাপড়ার সন্ধানে অগ্রসর হইতে গিয়া আনন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি এসেছ ? কি কাণ্ড, আসবে খবর

দাও নি, বাইরে দিয়ে না এসে চোরের মতন পেছনে? ও ঠাকুমা, মা, দেখ দাদা এসেছে যে। ফুলদা কই, সুমু কোথায়? শিগগির এস সবাই, দাদা এসেছে।"

প্রসাদ ভিতরের উঠানে পা দেবামাত্র চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল ছুটিয়া বাহির হইল।

মা বলিলেন, "প্রসাদ এলি, আগে জানাস নি? ষ্টেশনে গাড়ি পাঠান হয় নি। এতটা পথ হেঁটে এলি নাকি? তোর জিনিসপত্র কই?"

"কাল কলেজ হয়ে আমাদের বড়দিনের বন্ধ হ'ল মা, তাই রাতেই রওনা হ'লাম। মাত্র দশদিনের ছুটি, ভেবেছিলাম আসব না। তাই তোমাদের চিঠি লিখি নি। ভারি ত এতটুকু রাস্তা, তার জন্যে আবার গাড়ি। শীতকালে হাঁটতে ভালই লাগে। ক'দিনই বা থাকা, সামান্য জিনিস একটা ব্যাগে এনেছি। সেটা আনছে গণি মোল্লা।"

বলিতে বলিতে প্রসাদ মা'র পদধূলি লইয়া ঠাকুমার কাছে গেল।

ঠাকুমা তাঁহার অশেষ স্নেহের পাত্রকে কাছে পাইয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিলেন, "পেসাদ, এলি ভাই, তুই আসবি বলেই সকালে আমার বাঁ চোখ নেচেছিল। কি পরে এসেছিস—সায়েবের মত, খুলে ফেল। গায়ে রোদ-বাতাস লাগুক। আমি পরাণ ভ'রে তোরে দেখি।"

প্রসাদ বলে, "শীতের জামা বোঝা না করে গায়ে চাপিয়েই এসেছি। বাবার সঙ্গে দেখা করে এক্ষুণি খুলে রাখছি, তুমি আমাকে পরাণ ভ'রে কত দেখতে চাও দেখ ঠাকুমা? হঠাৎ কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে না?"

"আনন্দ হবে না? গোকুলে যে আমার গোবিন্দের আগমন 'ব্রেহ্মা নাচে, বিষ্ণু নাচে, আর নাচে ইন্দ্র গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ'।"

প্রসাদ হাসে হা হা, "কি উপমা দিলে ঠাকুমা, চমৎকার, গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোবিন্দ। তোমার নাচা পরে শোনা যাবে, বাবার কাছে যাই।"

প্রসাদ হলঘরের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল পিতার গৃহে।

ঠাকুমা মনের উল্লাসে হাঁক-ডাক সুরু করিলেন, "আলো ও মণিমালা, ভাগ্যে আজ অন্নপূর্ণা হয়েছিলি, তোর অন্ন ভিক্ষে নিতে শিব এসে উপস্থিত হ'ল। কি রান্না করেছিস? তখন যে কুটতে দেখলাম তিন রকম মাছ? একবার পাকঘর থেকে বের হয়ে চাঁদ মুখখানা দেখিয়ে যা না লো।

'আসিছে তোর চিকণ কালা, বনফুলে গাঁথ লো মালা'।"

দিদি শাশুড়ীর সাদর আহ্বানে পরিহাসে বিনু বাহির হইতে পারিল না। কি এক সঙ্কোচে তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দূর হইতে নিজের স্বামীকে সে চিনিতে পারে নাই, এই লজ্জা তাহার মর্ম্মস্থলে কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। ভাগ্যে কেহ কাছে ছিল না, থাকিলে তাহার ভীতিসূচক অস্ফুটধ্বনি শুনিলে কি ভাবিত? খিড়কির দরজা দিয়া ঢোকার মানে সকলকে চমকিত করা। ভরা দ্বিপ্রহরে কে আবার অমন বিজাতীয় পোষাকে মুখের অর্দ্ধেকটা টুপিতে ঢাকিয়া ঘরে ফেরে? এই রঙ্গ করিতেই বুঝি চিঠি লেখা বন্ধ হইয়াছিল। এতও জানে। এবার বোধহয় উনি আসিলেন বিনুর পড়া ধরিতে খাতা পরীক্ষা করিতে। এদিকে যে কত কাণ্ড সে-জ্ঞান নাই।

অশুভ ক্ষণে লবঙ্গ বোনা হতে কাঠগোলাপ রংএর উল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল। তাহার পরে আরম্ভ হইয়া গেল কর্ম্মনাশা ব্যাপার। তরু-সুমু নূতন জামা গায়ে দিয়া ওদিকে বুক ফুলাইতে লাগিল, এদিকে বিনু পড়িল আর এক ফ্যাসাদে। ক্ষিতি অভিমানে মুখ ফুলাইয়া বলিল, "বৌঠান, ওদের ত দিব্যি জামা বানিয়ে দিয়েছেন, আমি কি দোষ করেছি—আমাকে দেবেন না?"

বিনু অভদ্র নয়, বলিতে হইল, "ওরা ছোট, ওদের আগে দিলাম। এবার তোমাকে দেব, তুমি কি চাও?"

"এক জোড়া ফুল মোজা চাই, কালো পশমে করে দেবেন।"

বিনু স্বীকার হইয়া সুরু করিয়াছে ফুল মোজা। এদিকে মণিরাম-ফণিরামের মাতৃবিয়োগ। বুড়ীর যেন আর মরিবার সময় ছিল না? সে কি দশভুজা, তাহার কি বিদ্যাশিক্ষা নাই? চিরকাল মূর্খ হইয়া থাকিলে তাহার কিরূপে চলিবে?

বিনুর হৃদয়ে ভয়-ভাবনা দোলা দিলেও এক অজানা পুলক-মিশ্রিত অনুভূতি জাগ্রত হইতে লাগিল।

ঠাকুমার মরা গাঙে জোয়ার আসিয়াছে। শুষ্ক তটভূমি প্লাবিত করিয়া উচ্ছসিত আনন্দ বারি কলকল ছলছল করিতেছে। তিনি তাহাকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া পঞ্চমুখ হইলেন, "ওলো রাজেশ্বরী, তোর আক্কেল দেখে বাঁচি না। কত কাল পরে আমার ঘরের নিধি ঘরে ফিরল, তাতেও তোরা

ধুম ধুম টেঁকুস টেঁকুস থামাচ্ছিস না। এত বেলায় হাড়ভাঙ্গা শীতে আমার পেসাদের পুকুরের শীতলকুণ্ডে নেয়ে কাজ নেই। তার নাইবার গরমজল বসা। জল গরম হ'লে হরিকে ডেকে পাঠিয়ে দে স্নানের ঘরে। ছেলেমানুষ বৌটা কি রান্না-বাড়া করেছে কে জানে। তুই গিন্নীবান্নি মানুষ, সেদিকেও ত নজর দিচ্ছিস না? আজকের দিনেই যেন তোদের 'নাও কাজ বিয়ে কাজ' লেগে উঠেছে। 'কাজের মুখে আগুন দেই, পিছের কাজ আগে নেই'।"

কামিনীর মা বিরক্ত হইল "কি কইচেন মাঠান, দুই দিনের নটর-পটর, একদিনে সারি থুইছি, তাইতে আমার কিসের দোষ হইচে? 'যার লেগে করি চুরি সেই কয় চোর।' এই হইয়া গ্যাল। তুলি-পাড়ি ঘরে তুল্লেই আমি খালাস। নব্‌নেডাও ত দাবাবুর স্নানের লেগে এতক্ষণ আখা ধরায়ে একহাঁড়ি জল বসাইয়া দিতি পারিত। খালি আগডুম-বাগডুম গালগল্প।"

ঠাকুমা নরম গলায় বলিলেন, "তোরে ভিন্ন আমি কারে কিছু কই না রাজেশ্বরী, কইলে কেউ কান দেয় না। বেশি কইলে ব্যাজার হয়ে বকর বকর করে। আমার হইচে 'ছোটলোকের কথা না সয় গায়, মশার কামড় না সয় পায়।' তোর হইয়া গেল সারা, বাঁচলাম। এখন আগে রাঁধার ঘরে ঠাঁই পিঁড়ির যোগাড় কর। গরম জল তুলে দে। তুই যে আমার একে একশো। তুই না হ'লে রায়বাড়ীর কিছুতে সিদ্ধি নাই।"

কামিনীর মা মানুষ ভাল, ঠাকুমার তোয়াজে গলিয়া জল হইয়া গেল।

তিন ছেলেকে লইয়া কর্ত্তা আহারে বসিয়াছেন। ক্ষিতির বড়দিনে স্কুল বন্ধ। গৃহিণী ভোজন স্থলে উপস্থিত, তরু দরজার পাশে বসিয়া, তাহার সাহেব-বিবি দরজার আড়ালে লুকাইয়া তির্য্যক দৃষ্টিতে সকলের খাওয়া লক্ষ্য করিতেছে। বিনু পরিবেশন করিতেছে।

এই প্রথম বিনু স্বামীর সামনে অন্ন ব্যঞ্জন ধরিয়া দিবার সুযোগ পাইয়াছে। এ পর্য্যন্ত বিনু খাবার এতটুকু জিনিষও প্রসাদকে হাতে করিয়া দেয় নাই। প্রসাদই বরং একদিন তাহাকে নাসপাতি খাইতে দিয়াছিল। বৌভাতের দিন বিনু বসিয়াছিল আলপনা-চিত্রিত এক বিরাট্ পিঁড়ায়, মাতৃ আদেশে প্রসাদ তাহার প্রসারিত দুই হস্তে বিবিধ খাদ্যপূর্ণ রূপার থালা অসংখ্য রূপার বাটিতে ব্যঞ্জন, রেকাবি ভরা মিঠাই-মণ্ডা, শ্বেত পাথরের বাটিতে দই-ক্ষীর কত কি, স্মায় জলপূর্ণ রূপার গেলাসটা দিতেও ভুল করে নাই। একখানা রূপার আধারে ছিল প্রসাধন দ্রব্য—বেনারসী শাড়ী জামা সেমিজ ইত্যাদি। সমস্ত

জিনিষ বিন্নুকে অর্পণ করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল স্ত্রীর সারা জীবনের ভরণপোষণের। সেদিন মঙ্গল প্রদীপ জ্বলিয়াছিল, উলুধ্বনি হইয়াছিল। স্বামী ত দিয়াই রাখিয়াছে, স্ত্রীর এই প্রথম।

জলপিঁড়ির অন্তরালে লুকাইয়া বিন্নু ভাবিতেছিল, না জানি সে আজ আপনার মনে কি অপূর্ব রান্না রাঁধিয়া রাখিয়াছে। কামিনীর মা পর্য্যন্ত কাছে ছিল না। তরুকে দিয়া রান্নাদ্রব্য একবার চাখাইবার কথা তাহার স্মরণ হয় নাই। আর তরু কোথায়? সে দাদাকে পাইয়া তাহার প্রদত্ত ছবি বই উপহার পাইয়া সুমু ক্ষিতির সহিত একত্রে নাচিয়া বেড়াইতেছে। লোকটি সত্যই লেখাপড়া ভালবাসে। ভাইবোনদের জন্য রঙ্গীন ছবিভরা কি সুন্দর বই আনিয়াছে। বিন্নুর জন্য নিশ্চয় আনিয়াছে নীরস পড়ার বই, খাতার গাদা। সেই খাতাই যে বিন্নুর শেষ হয় নাই, বোনা না ধরিলে শেষ করিতে পারিত।

বোনার কথায় মনে পড়িল তাহার বাবার সংস্কৃত ছাত্রী রাশিয়ার কুমারী আরশোলাকে। সে বাবার নিকটে পড়িতে আসিত, তখন বিন্নুরা কলিকাতায় ছিল। সেই শিখাইয়াছিল বোনা। শুধু বোনা শিক্ষা দিয়া সে ক্ষান্ত হয় নাই। চমৎকার একখানা বোনার বই তাহাকে উপহার দিয়াছিল। সে বইখানা সে শাড়ীর বাক্সে সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছে। লুকাইয়া রাখিবার মানে কেহ যদি বোনা শিখিতে লইয়া তাহার ভালবাসার বইখানা ছিঁড়িয়া দেয়। সে বোনা জানে বলিয়াই তাহার সঙ্গে বোনার সরঞ্জাম অভিভাবিকারা দিয়াছিলেন।

না, বিন্নুর ভয় কাটিয়া গেল। মনোরমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমা আজ কেমন রান্না করেছে? নিজেই রেঁধেছে, আমি এদিকে আসতে পারি নি।"

মহেশবাবু সহাস্যে উত্তর দিলেন, "বেশ হয়েছে রান্না। তোমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে, মণিরামরা বোধ হয় কাল-পরশুর ভেতরে এসে যাবে।"

মনোরমা বলিলেন, "সংসারে থাকতে গেলে সময়ে সমস্তই করতে হয়, কষ্ট আর কি?"

২৯

শীতের রাত্রি, আটটা বাজিতে-না-বাজিতেই খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেল। এবেলাও বিন্নু রান্না করিয়াছে।

কাপড় ছাড়িয়া লাল টুকটুকে একখানা আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া বিন্নু প্রবেশ করিল তাহার শয়নগৃহে। আজ তাহার ঘরের দশবাতির ঝাড়টা তরু

নবীনকে দিয়া জ্বালাইয়া দিয়াছে। এখানে ইতিপূর্ব্বে ঝাড় জ্বলে নাই। আজ হইয়াছে তরুর খেয়াল, "যদি কোন দিনই নাই জ্বলবে তবে শুধু শুধু ঝাড় ঝোলানো কেন বাপু? বাতাসে ঠুং ঠুং শব্দ হয়, দোলে, তাই দেখেই সকলের আনন্দ। দাদা আজ বাড়ী এসেছে, ঝাড় জ্বালাতেই হবে।" শুধু ঝাড় জ্বলিতেছে না, মোটা একখানা আঙ্গুরলতা আঁকা কার্পেট মেঝেয় পাতা হইয়াছে। দুই খাটে দুইটি শুভ্র বিছানা, সাটিনের লেপ, মলমলের ওয়াড়ে আবৃত হইয়া পইখানে অপেক্ষা করিতেছে। শিথানে দুইজোড়া বালিশের পাশে কুন্দফুলের বাটি। ঝাড়ের আলোকে গৃহ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর।

দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া প্রসাদ টেবিলে বই রাখিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছে। গায়ে তাহার বাসন্তী রং-এর কাশ্মিরী শাল।

বিন্নু প্রসাধন-টেবিলের বৃহৎ স্বচ্ছ আয়নার দিকে বারেক তাকাইল— তাহার ললাটের কাঁচপোকার টিপটি আলোক পরশে ঝকমক করিতে লাগিল। ধুনোর আঠা দিয়া বিন্নুর মা স্বহস্তে তৈরি কাঁচপোকার টিপ তাহার কপালে পরাইয়া দিয়াছিলেন। এতদিনেও টিপ পরিয়া যায় নাই। ধুনোর আঠায় লাগিয়া রহিয়াছে। তাহাদের ওখানে খুব কাঁচপোকা। মা কাপড় দিয়া ধরিয়া কাঁচপোকার হুল ভাঙ্গিয়া পোকা উড়াইয়া দেন। পোকা মরে না ফের হুল গজায় তাহার। মা'র এক বাতিক কাঁচি দিয়া সুন্দর টিপ কাটিয়া কৌটা ভরিয়া তুলিয়া রাখেন। বিন্নুকে দিয়াছেন এক কৌটা টিপ, এক কৌটা ধুনোর আঠা।

বিন্নু তরুকেও পরাইয়া দিয়াছে একখানা টিপ।

—তা বিন্নুর সাজটা কিছু মন্দ হয় নাই। তরু আজ বৈকালে তাহার চুল বাঁধিয়া দিয়াছিল। তরু এখন তাহার অতিশয় অন্তরঙ্গ, বাধ্য। ছোট হইলে কি হইবে মেয়েটা তরতরে, খরখরে।

পরিধানের শাড়ীটাও বিন্নুর ফেলনা নয়, ধূপছায়া রং-এর মিহি সূতার শাড়ী।

বিন্নু ধীরে দরজা বন্ধ করিল। প্রসাদ ঘাড় ফিরাইয়া ডাকিল, "এই এসেছ, এস, বস চেয়ারে। তোমার মিটে গেল? তুমি ত বেশ রান্না করেছিলে, কার কাছে শিখলে?"

বিন্নু চেয়ারে বসিল আড়ষ্ট হইয়া। ঝাড়ের আলো যেন কোথায়ও আড়াল-আবডাল রাখে নাই। এত আঁলোয় কেমন যেন লজ্জাবোধ হয়।

বিন্নু চোখ নামাইয়া তাচ্ছিল্য ভরে বলে, "ভারি ত রান্না, শিখব কার কাছে? মা'দের রান্না দেখতে দেখতেই শিখেছি।"

"দেখেই শিখেছ, খুব ওস্তাদ ত? আমরা তিন ভাই, আর দুটি ভাই থাকলে তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

বিন্নুর মহাভারত পড়া ছিল, দ্রৌপদীর উল্লেখে লজ্জায় তাহার মুখ আনত হইল। কিন্তু সেই লজ্জার মধ্যে কত আনন্দ গৌরব। যাহাকে সে এ পর্য্যন্ত কিছুই দেয় নাই, সেই তাহার সামান্য রান্না খাইয়া এত পুলকিত।

বিন্নু নীরব, প্রসাদ বধূর লজ্জা ভাঙ্গাইতে নানা বিষয়ের অবতারণা আরম্ভ করিল, "তুমি ত দিব্যি বোনা জান, তরুস্নুর গায়ের জামা দেখলাম। শুনলাম, ক্ষিতির মোজা হচ্ছে। ওরা ভাগ্যবান, তাই পায়। আমি অভাগা কেউ কিছুই দেয় না। 'অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুখায়ে যায়'।"

প্রসাদ ইচ্ছা করিয়া গলার স্বর করুণ করিয়াছিল, বিন্নু তাহা বুঝিতে না পারিয়া বিগলিত হইল। বিনা বাক্যব্যয়ে সে আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল তাহার কাপড়ের আলমারির নিকটে।

আঁচলের চাবি দিয়া আলমারি খুলিয়া তখনই সে ফিরিয়া আসিল প্রসাদের কাছে। কাগজের ঠোঙ্গায় জড়ানো একটা জিনিস প্রসাদের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিল, "এই নাও, তোমার জন্যে বানিয়ে রেখেছি। ক্ষিতির মোজা হয়ে গেলেই তোমাকে মোজা, সোয়েটার, মাফলার বুনে দেব।"

প্রসাদ কাগজের ভিতর হইতে বাহির করিল গাঢ় গোলাপি পশমে বোনা মস্ত একটা গোলাপ ফুল। থরে-বিথরে পাঁপড়ি মেলিয়াছে। গোলাপের নিম্নে পকেট-ঘড়ি লুকাইয়া রাখিবার একটি পকেট।

পুলকিত প্রসাদ পকেট হইতে বাহির করিল আতরে সিক্ত একটু তুলা। আতর সুবাসে ভরিয়া গেল কক্ষ।

তখন মেয়েদের কঙ্কণসদৃশ ছেলেদের হাত ঘড়ির প্রচলন হয় নাই। বিন্নুর বিবাহে বিন্নুর বাবা জামাতাকে সোনার পকেট-ঘড়ি, চেন যৌতুক দিয়াছিলেন। বিন্নু গোপনে প্রসাদের জন্য এটা বুনিয়া রাখিয়াছিল। এটা তাহাকে শিখাইয়াছিল সেই বাবার ছাত্রী আরশুলা।

প্রসাদ পত্নীর প্রথম উপহার নাকের কাছে ধরিয়া মুখে বুলাইয়া আনন্দে মুখর হইল—"বাঃ, কি সুন্দর গোলাপ করেছ বিন্নু, মনে হচ্ছে সত্যি ফুল। বুদ্ধি করে আতর মেখে রেখেছ, এতেই এর মূল্য আরও বেড়ে গেছে। তুমি

আমাকে উপহার দিলে, আমিও তোমার জন্তে উপহার এনেছি এই দেখ কত বই।"

বই শুনিয়াই বিন্নুর মন দমিয়া গেল। বই সম্বন্ধে প্রসাদ তাহার মনে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে। কি নিরস, গম্ভীর পাঠ্য-পুস্তক। সে কি উপহারের বস্তু! তবু বিন্নু সাগ্রহে হাত বাড়াইল স্বামীর উপহার লইতে।

নূতন বাঁধাই ঝকঝকে একগাদা বই। 'কড়ি ও কোমল', সদ্য প্রকাশিত 'নৌকাডুবি' ও 'চোখের বালি', রমেশচন্দ্র দত্তের গ্রন্থাবলী, মেঘনাদ বধ কাব্য। ইহার মধ্যে বিন্নুর পাঠ্যপুস্তক একটিও নাই। বিন্নু স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিয়া আনন্দিত হৃদয়ে একটির পরে একটি বই চোখের সামনে খুলিতে লাগিল।

সে কত দিতেছে তাহার মনোতুষ্টির জন্য, বিন্নু ভদ্রতা করিয়া কহিল, "কি সুন্দর বইগুলি, এর একটাও আমি পড়িনি। এত বই আমার, কি মজা। এবার বুঝি আমার পড়ার বই আন নি? পড়ার বই ক'খানা আমার পড়া শেষ হয়েছে। অনেক জায়গা মুখস্থ করে রেখেছি।"

"লক্ষ্মী মেয়ের কথা, কাল আমি সে-সব দেখব। তুমি গল্পের বই পড়তে ভালবাস, এখন বইগুলো প'ড় পরে আরও এনে দেব। পড়ার বই থাকুক এখন। কেউ বুঝিয়ে না দিলে যে কিছু জানে না তার পক্ষে পড়া মুস্কিল। আমার পরীক্ষা হয়ে গেলে আমি যখন বাড়ী আসব তখন আনব তোমার পাঠ্য বই। দুই-তিন মাস বাড়ী থাকব, তার ভেতরে তোমাকে মোটামুটি শিক্ষা দিতে পারব। তুমি যত ইচ্ছা বই পড়, হাতের লেখাটা বন্ধ ক'রো না।"

বিন্নু প্রশান্ত চিত্তে প্রশ্ন করে, "দোলের সময় ত তুমি আর একবার আসবে?"

"না, তখন আমার পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে যাবে। পড়াশোনার সময় এখন না এলেই ভাল হ'ত, তবু এলাম সাত দিনের জন্যে।"

"সাত দিন কেন? বড় দিনের না দশ দিন ছুটি?"

"হ্যাঁ দশ দিন কলেজ বন্ধ। কিন্তু কত দূরে থাকি তার কি হিসাব নেই? যাওয়া-আসায় কত সময় নষ্ট হয়। ও কি বিন্নু, তোমার কি ঘুম পেয়েছে? চোখ বুজে রয়েছ কেন?"

বিন্নু সচকিত হইয়া মুখ তুলিল, "ঘুম পাবে কেন? অত আলোয় কি কারও ঘুম পায়? নবীন যে ঝাড় নিবিয়ে দিয়ে গেল না, সব মোমবাতি পুড়ে যাচ্ছে?"

"মোমবাতি হয়েছে পোড়ার জন্তেই। যে আলো এতদিন জ্বলে নি, আজ সে জ্বলুক। এক মোমবাতি পুড়ে যাবে আরও মোমবাতি আছে। ঝাড় নিবিয়ে দিতে নবীনের দরকার হবে না, সময় হ'লে আমিই নিবিয়ে দেব। তোমাকে এ অবধি আমি কোন ভাল বই পড়িয়ে শোনাই নাই। এই মেঘনাদ বধখানা এবার তোমাকে পড়ে শোনাব। অনেক বড় বড় কঠিন শব্দ রয়েছে, যা তোমাকে বুঝিয়ে না দিলে তুমি বুঝতে পারবে না। না বুঝলে লেখার রস পাওয়া যায় না। এই বইখানা বুঝতে পারলেই তোমার বাংলা শেখা এগিয়ে যাবে। এর পরে আমি ফিরে এসে মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত রঘুবংশ কুমারসম্ভব; বানভট্টের কাদম্বরী পড়ে শোনালে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে তোমার পরিচয় হবে। তার পরে ইংরাজী।"

ইংরাজী শব্দ শুনিয়া বিন্থ সভয়ে কম্পিত হইয়া বলে, "কি যে বল তুমি, আমি কি অত শিখতে পারব? আমার যে মোটা মাথা? তা হ'লে অন্য বইগুলি আমি তুলে রেখে আসি। একখানা করে বের করব আর পড়া হবে। বাইরে রাখলে সকলে চেয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলবে। মেঘনাদ বধ বাইরে থাকুক, তুমি পড়বে।"

বিন্থ উঠিয়া সবগুলি বই সস্নেহে বুকে চাপিয়া আলমারিতে তুলিয়া রাখিয়া আসিল।

কি জানি কি ভাবিয়া পানের কর্ত্রী কামিনীর মা তাহার শিয়রের রূপার ত্রিপদির উপরে রূপার ডিবায় কয়েক খিলি পান ও মশলা রাখিয়া গিয়াছিল। বিন্থ পান খাইতে ভালবাসে, ডিবা খুলিয়া দুই খিলি পান মুখে পুরিয়া মশলা আগাইয়া দিল প্রসাদকে। সে পান খায় না।

প্রখর আলোয় বিন্থর অস্বস্তি লাগিতেছিল, তরুর প্রতি রাগ হইতেছিল। সখের বলিহারি! রাতকে দিন করিলেই কি সে দিবা হইয়া যায়? রাত্রি মানুষের আরামের, শান্তির। শীতের শীতল রাত লেপের তলায় না যাইয়া উনি এখন ঝাড়ের নীচে কাব্য আলোচনা করিতে বসিবেন। আশ্চর্য্য, অদ্ভুত রায়বাড়ীর বড়ছেলে। শয়নের নাম নাই, ঘুমের কথা নাই।

বিন্থ স্বামীর দিকে মেঘনাদ বধ বইখানা ঠেলিয়া দিয়া বলে, "তুমি এখন পড়া সুরু করে দাও, আমি বসে শুনি। এখন থেকে সুরু না করলে বই শেষ হবার আগেই তোমাকে চলে যেতে হবে। রাত বেশী হয়ে গেলে শীতে হাড় কাঁপবে, তখন চেয়ারে বসে থাকতে পারবে না।"

প্রসাদ সহাস্যে বলে, "তোমার হাড়ে শীতের কাঁপন লাগলে তুমি লেপের নীচে যেয়ো। আমার কাঁপন লাগে না। আজ আমি পড়ব না, কাল থেকে হবে। তোমার ভয় নেই বিন্নু, বই শেষ অবধি তোমাকে না শুনিয়ে আমি যাব না।"

৩০

ঠাকুমা একবুলি মুখে আজ শয্যাত্যাগ করেছেন, "ও রাজেশ্বরী, মায়ের ওখানে কয়েকটা ট্যাপের মোয়া বের ক'রে দিয়ে আয়। পেসাদ আমার ট্যাপ বড় ভালবাসে। লুচি ত কলকাতায় পায়, ট্যাপের মোয়া কে তারে দেবে? 'যার লেগে যার পরাণ কাঁদে, অন্য লোকে লাঠি ফাঁদে।' তোরা ধান নিয়েই মত্ত, ট্যাপের দিকে নজর দিলি না। ধানের খই-এর চেয়ে ট্যাপের খই যে কত উপকারী রোগে-ভোগে, তা ত জানিস নে? এক বছরের ট্যাপ আরও চারটে জোগাড় ক'রে রাখতে হ'ত।"

কামিনীর মা ঘর ঝাড় দিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, "এক জালা ভরি ট্যাপ জাত করি তুলি থুইছি। আর কত নাগবে তোমাগো। যখন চাকররা নাও নিইয়া খালে-বিলে সাঁফলার ফল তুলিতে গেইছিল, তহন আরও কাঁড়িখানিক তোলাইয়া রাখিলা না ক্যানে? যা আনি দিইছেল, তা ঝাড়ি-বাছি রোদ্দুরে ভাজা ভাজা করি গোলাঘরে তুলি থুইচি। কত শত দেব্য বলে জয়ের থনে গড়াগড়ি যাইচে তা থুইয়া দা বাবু দাঁতে কাটিবে ট্যাপের মোয়া? আপনি কইলা আমি কয়েকডা বার করি দিইয়া আসি।"

তরু চোখ মুছিতে মুছিতে মায়ের ঘরে যাইতেছিল, তাহার কোলে সাহেব। ঠাকুমা তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন, "শোনছিস তন্বি, পুকুরের চালার জামগাছে কুটুম পাখী ডাকছে, ঐ শোন 'কুটুম আয় কুটুম আয়' ডাকছে। কুটুম আর কে আসবে, মণিরামরা আজ যদি আসে।"

"মণিরাম ঠাকুররা তোমাদের চাকর নফর, তারা আবার কুটুম হ'ল কিসের? কাল তোমার বাঁ চোখ নেচেছিল দাদা এল, তা যেন বুঝলাম। মণিরাম-ফণিরাম আমাদের কুটুম, ছিঃ।"

তরু আর দাঁড়াইল না।

ঠাকুমা এবার বিন্নুকে কাছে পাইলেন। বিন্নু মুখ ধুইয়া বাসি কাপড় ছাড়িয়া যাইতেছে শাশুড়ীর কাছে।

ঠাকুমা হাত তুলিয়া ইশারা করিয়া তাহাকে নিকটস্থ হইবার ইঙ্গিত করিলেন। বিনু আগাইয়া আসিতেই চুপে চুপে কহিলেন, "পেসাদ কখন উঠে বার মহলে গেল লো? আমি তারে যেতে দেখলাম না; ভেবেছিলাম, 'প্রভাতে উঠিয়া যে মুখ দেখিব দিন যাবে ভাল ভাল'।" বিনু একথার কি উত্তর দিবে, শুধু একটুখানি হাসিল।

বধূর সুমিষ্ট হাসিতে ঠাকুমা প্রীত হইয়া তেমনি নিম্নস্বরে বলিতে লাগিলেন, "কাল তোদের ঘরে ঝাড়ের বাতি বুঝি সারারাত জ্বলেছিল? আমি শেষরাত্তে জানালা খুলে দেখলাম উঠোনে আলোর ফটিক ফুটেছে। নবনে যে তোর সিঁড়ির দুই দিকে সার দিয়া গাঁদা ফুলের গাছ লাগিয়ে দিয়েছে, কি ফুলটাই ফুটেছে। সেই ফুলের ওপরে পড়েছিল বাতির আলো। তোরা দেখেছিলি ত?"

বিনু নীরব।

ঠাকুমা সে নীরবতার ধার না ধরিয়া আপনার আনন্দে আপনি অধীর— "দেখ মণিমালা, এবারের যাত্রাগান তুই শুনেছিলি ত? ঐ যে কিসের পালা যেন, সখীরা নেচে নেচে গান গেয়েছিল, তোর মনে নেই? তোরা একালের মেয়ে, ঐ সব শিখে রাখতে হয়। পেসাদ আমার সোনার ছেলে কিন্তু বয়েসটা ডবকা। থাকে বিদেশে, তাকে কাছে পেলে তন্তর-মন্তর দিয়ে বশ করে নিতে হয়। কাল তোকে শিখিয়ে দিতে পারি নি, এখন শিখিয়ে দিচ্ছি সখীদের সেই গান—রাতে ঝাড় জ্বালিয়ে সাজগোজ করে পেসাদকে বলিস—

'রহিয়া রহিয়া কেন এই মুখ মনে পড়ে,
এ চাঁদের সুধা বিনা চকোর যে প্রাণে মরে'।"

বিনু আর হিতোপদেশ শুনিতে পারিল না, ত্বরিত পদে পলায়ন করিল।

মনোরমা ব্যাকুল হইলেন ছেলেকে পিঠা খাওয়াইতে। পৌষপার্ব্বণে সে থাকিবে না, দোলে সে আসিতে পারিবে না, তাহাকে এখনই পিঠা-পায়েস তৈরি করিয়া দিতে হইবে।

প্রসাদ চালের গুঁড়ার ঢিপি ঢিপি পিঠা ভালবাসে না। তাহার পছন্দ ক্ষীর-সর-ছানা।

মনোরমা স্নানান্তে বিনুর উপরে মাছের ঘরের ভার দিয়া ছোট ভোগশালায় ঢুকিলেন।

মাছ কম আসে নাই। বিনু পুলকিত হৃদয়ে মাছ রন্ধন করিতেছে, তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে "তোমাকে দ্রৌপদী বলে ডাকতাম।"

কামিনীর মা হাজির, "বৌমা, কইমৌরি রাঁধতে পারবে? চিতল মাছের কোড়মা হবে। পাবদা মাছের হলুদ চচ্চড়ি, আমি কি দেখিয়ে দেব?"

বিনুর কানের পিপুল পাতা দোলে, "না মাসী, আমি নিজেই পারব, শিখে নিয়েছি। তুমি আমাকে মিহি ক'রে মৌরি বেঁটে দাও। কাঁচা লঙ্কা কুচিয়ে দাও।"

দেবতার ভোগের মতন অখণ্ড মনোযোগে বিনু থালায় থালায় রান্না করিয়া নামায়।

ভোগশালায় ভোগ প্রস্তুত। এখন সকলে ভোজনে বসিলেই হয়।

এমন সময় মণিরাম ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। ফণিরাম এখন কিছুকাল দেশে থাকিবে। তাহার পরিবর্ত্তে মণিরাম তাহাদের মাতুল কচিরামকে আনিয়াছে। আধ বুড়া একটা ষণ্ডা-গুণ্ডা লোকের কচিরাম নাম শুনিয়া দাস-দাসীর মহলে হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল। মণিরাম পুরাতন লোক, কাণে জল ঢুকিলে সে জল বাহির করিবার রীতি জল দিয়া। মণিরাম অজস্র পায়, "দেয়ও কিছু কিঞ্চিৎ না করে বঞ্চিত" এ নীতি বাক্য উড়িয়ার ছেলের অবিদিত নাই। মণিরাম বড় দুই দাদাবাবুর নিমিত্ত ঝিনুকের ধূপদানি আনিয়াছে। তরু-সুমুর ঝিনুকের কাকাতুয়া পাখী। আর সকলের কাঠির গায়ে কারুকার্য্য-করা পাখা। বেতের বাক্স ভরা মহাপ্রসাদ, বোতল ভরা চুয়া। একরাশি ঝিনুক।

মণিরামের আগমনে রায়বাড়ীতে নিশ্চিন্ততার বাতাস বহিয়া গেল। সকলেই খুসী, কিন্তু বিনু তেমন খুসী হইতে পারিল না। সে নূতন ব্রতী হইয়াছে, তাহার উৎসাহ অপরিমিত। সে আশা করিয়াছিল, প্রসাদ যে কয়দিন থাকিবে সেই রান্না করিয়া পতিভোজনের অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিবে। সাধে কি বিনু আশা করে তাহার হৃদয়বীণায় রহিয়া রহিয়া বাজে "দ্রৌপদী ব'লে ডাকতাম।"

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। মণিরাম কচিরাম রন্ধনশালার ভার লইয়াছে। বিনু ফিরিয়া আসিয়াছে যথাস্থানে, বিরাট্ দুধের কড়ার সামনে।

ঠাকুমাকে লইয়া প্রসাদ বসিয়াছে তাহার শয়নগৃহের ঢাকা বারান্দায়। কনকনে শীতের রাত্রে খোলা হাতীর মাথায় ঠাকুমাকে দেখিলে সকলে রাগ করে।

সিঁড়ির দুই পাশে সারি সারি গাঁদা গাছে ফুল ফুটিয়া অঙ্গন আলো হইয়াছে। এ ফুল সরস্বতী পূজায় দিতে দেয় না। কুকুর-বিড়াল ছুঁইয়া দিতেছে, মালীবৌ গাছের গোড়ায় ঝাঁটা বুলাইতেছে।

ফুলের অপচয় হয় না দেখিয়া বিনু বড় আনন্দিত। যে বিশ্বশিল্পীর এমন অপূর্ব্ব রচনা, তাঁহার উদ্দেশ্যে তাঁহার রূপের ভাণ্ডার উজাড় করিতে বিনু ভালবাসে না। সে সময় সময় সন্তর্পণে ফুলগুলিকে স্পর্শ করিয়া আদর করে। নিশির শিশির-মণ্ডিত ফুলে ফুলে সে মুক্তা নিরীক্ষণ করিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে।

নাতিকে লইয়া ঠাকুমা সুখ-দুঃখের কাহিনী সবে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এমন সময় একদল কৃষক বালক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জিগির দিতে লাগিল, 'জয় সোনা রায়ের জয়।' তাহাদের কাহারও হাতে ধামা, মাটির হাঁড়ি, তেলের বোতল, একজনার হস্তে বড় একটা টিনের কুপি মাটির সরায় বসানো, দপ দপ করিয়া জ্বলিতেছে।

প্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, "তোরা কোন্ পাড়া থেকে এসেছিস ?"

"এঁজ্ঞে দাবাবু, মালদা পাড়ায় থাকি, সোনা রায়ের ভিক মাগিতে আইছি।"

পৌষপার্ব্বণের পূর্ব্ব হইতে এ-পাড়া সে-পাড়া হইতে চাষী বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় চাল ও গুড় সংগ্রহ করিয়া থাকে। পৌষপার্ব্বণে বিলের কিংবা নদীর ধারে গাছের ছায়ায় নূতন মাটির পাত্রে পায়েস রাঁধিয়া তাহাদের বনের দেবতা সোনা রায়কে ভোগ দিয়া নিজেরা সারি সারি কলার পাতা পাতিয়া প্রসাদ খায়। বৎসরান্তে চাষী রাখালদের এই পৌষপরব।

ঠাকুমা বলিলেন, "ভিক মাগতে এসে গান গাইছিস না যে ?"

ছেলের দল ধামা হাঁড়ি প্রদীপ নামাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হাততালি দিতে দিতে গান ধরিল—

'আইলাম রে অরণে সোনা রায়ের চরণে।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর।
সোনার ঠাকুর বিয়া কর্যা ব্যাভার পালে কি ?
থাল পাছি ঝারি পাছি, আর পামু কি ?
আটপৌরা ধুতি একখান ব্যাভ্যার পায়াছি।

যায়রে যায় সোনার ঠাকুর শ্বশুরবাড়ী যায়,
তাঁলের ছাতি মাথায় দিয়া সোনার নূপুর পায়।
হলদে বরণ চাদর সোনার ধুতির বরণ নীল,
বগলা ঘোড়ায় পাড়ি দেয় সিরণি গাঁয়ের বিল।

পাখ পাখালি সাথে চলে গায়ান গায় কোঁ,
ছামাদ পায়্যা শাউরী নাচে ডঙ্কা বাজায় ভোঁ।
সোনার ঠাকুর দিল বর ধান চালে ঘর ভর ।।'

গীত শেষ করিয়া রাখাল বালকেরা হাঁকিল, 'মাঠান, সোনা রায়ের খাওন দ্যাও।"

রাখালদের মেঠো স্বরে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষিতি তরু সুমুরা দাস-দাসীর সহিত আঙ্গিনায় ছুটিয়া আসিয়াছিল। বিনুর দুধ-পর্ব্ব মিটিয়া গিয়াছিল, সেও আশ্রয় লইয়াছিল দ্বার-প্রান্তে। কোঁর সহিত ভোঁর মিলে সকলে হাসিয়া অস্থির।

মনোরমা কাঠা ভরিয়া চাল ধামায় ঢালিয়া দিলেন, বাটি ভরিয়া খেজুর গুড়।

ছেলেরা বলে, "ত্যাল দিলা না মাঠান, চ্যারাগের ত্যাল?"

মাঠান ছোট্ট মাটির ভাঁড়ের খানিকটা তেল ঢালিয়া দিলেন বোতলে।

বালকের দল সোনা রায়ের গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল অন্য বাড়ীতে।

প্রসাদ ঠাকুমার শীর্ণ বাহু ধরিয়া তাগিদ দেয়, "চল ঠাকুমা, তোমাকে তোমার ঘরে শুইয়ে লেপ চাপা দেইগে। বড় ঠাণ্ডা পড়েছে, বাইরে গরম কাপড় ছাড়া বসে থাকলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।"

ঠাকুমা শীতে গরম কাপড় গায়ে দিতে পারেন না, তাঁহার গা কুট কুট করে। ছেলের বকুনিতে মোটা একটা বিছানার চাদর গায়ে জড়াইয়াছেন।

ঠাকুমা হাসেন মিটিমিটি, "'মরণ যাবে ডভয়, জারে তারে এড়ায়।' আমার আবার শীত, আমার আবার ঠাণ্ডা। দেখ পেসাদ, তোর লেখন-পড়ন শেষ হ'তে আর কত দেরি রে? তাড়াতাড়ি সেরে-তেরে বাড়ীতে এসে বস, বৌ যে দিনে দিনে সেয়ানা হচ্ছে। তুই কাছে থাকিস না জন্যে মনমরা হয়ে থাকে।"

"খুব সুখবর দিলে ঠাকুমা, আমি ত কোন লক্ষণ দেখছি না? তুমি আমার

জন্যে এত ভেব না। এবার পরীক্ষা হয়ে গেলেই আমি তোমার আঁচলের নীচে এসে বসে থাকব। কোথায়ও যাব না, কিছু করব না, শুধু খাওয়া আর বসা। তা হ'লে ত খুসী হবে তুমি?"

ঠাকুমা নাতির কথায় গেলেন না। বিগলিত হইলন মণিমালাকে লইয়া—"দেখ পেসাদ, তোরে চুপে চুপে কই—মণিমালা বড় ভাল মেয়ে। তোদের রায়গোষ্ঠীর রক্ত গরম, চঞ্চল; তুই ওরে হেনেস্তা করিস নে কখনও, আমারে কথা দে। বাইরের রূপ দেখে পাগল হোস না, মনে রাখিস, ঘরে রইছে তোর অমৃত ভাণ্ড।"

প্রসাদের অমৃত ভাণ্ড মধু ভাণ্ড লইয়া আলোচনা করিবার সময় হইল না।

রান্না প্রস্তুত, খাবার ডাক আসিল।

প্রসাদ উঠিয়া কহিল, "চল ঠাকুমা, তোমাকে ঘরে রেখে আমি খেতে যাই। শীতের রাতে বসে থাকতে লোকজনদের খুব কষ্ট হয়।"

ঠাকুমা নাতির হাত ধরিয়া চলিলেন শয়ন করিতে। যাইবার সময় হুল ফুটাইয়া গেলেন, "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ।"

৩১

"সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চূড়ামণি"
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, "কহ, হে দেবি অমৃত ভাষিণি
কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি
রাঘবারি?"

নিস্তব্ধ গভীর রজনী। চরাচর মহাসুপ্তিতে মগ্ন। কূজনহীন কানন ভূমিতে হিমেল হাওয়া শন্ শন্ শব্দে পত্রহারা তরুর বিলাপধ্বনির মতন বহিয়া যাইতেছে। কুয়াশার ঘন আবরণে আকাশ ও ধরিত্রী আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

পালঙ্কের পাশের বাতায়ন রুদ্ধ, গৃহের অপর গবাক্ষ উন্মুক্ত। সেই পথে ঝাড়ের আলোর রশ্মি পিছনের বন-বনান্তরে সামনের গাঁদাফুলের স্তবকে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

রজনীর প্রথম যামে বিনুর পাঠ্যপুস্তক ও খাতার লেখার পরীক্ষা-নিরীক্ষা লইয়া খানিকটা সময় অতিবাহিত হইয়াছে।

বিন্নু তাহার হাতের লেখার খাতায় শুধু স্বরচিত ছড়া পাঁচালি দিয়াই ভরাইয়া রাখে নাই। মাঝে মাঝে তাহার চিত্র-বিষ্যারও পরিচয় দিয়াছে। কোন পাতায় হাঁস, কোথায়ও বক-টিয়া পাখী ইত্যাকার। প্রসাদ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, "তোমার কি ছবি আঁকতে ইচ্ছা করে? তা হ'লে ছবি আঁকার সরঞ্জাম এনে দিতে পারি।"

শোন কথা, "গোদা পায়ে বিষ ফোঁড়া" যেন, এক বিষ্যাশিক্ষায় বিন্নুর অন্তরাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাকিতেছে, ইহার উপরে আবার চিত্র বিষ্যা! মেয়েদের মেয়েলী ব্রত অনুষ্ঠান আলপনার সহিত যে পুরুষ-প্রবরের পরিচয় নাই তাহাকে নিরস্ত করিতে বিন্নুর বেগ পাইতে হইল না। সে কানের ঝুমকা দোলাইয়া কপালের কাঁচপোকার টিপে ঝিলিক দিয়া স্বামীকে বুঝাইল, "এর নাম ছবি নয়। এটা প্রত্যেক ভারত মহিলার করণীয় ব্যাপার। সুবচনী পূজোয় হাঁস না আঁকলে যে পূজো হয় না। লক্ষ্মীর আরাধনায় ধানের শীষ, লক্ষ্মীর পা, পেঁচা চাই। নাগপঞ্চমীতে সারি সারি নাগ। আসন্ন পৌষপার্ব্বণে উঠোন-জোড়া হাতীর শুভাগমনে হাতীর শুঁড়ের সম্মুখে আলপনায় অঙ্কিত করতে হবে বিশাল জলাশয়। জলে বিরাজ করবে জলচর জীব মাছ শঙ্খ ঝিনুক কুমীর কচ্ছপ মকর পোকা মাকড়। জলাশয়ের পাড়ে কলাগাছ লতা-পাতা, তার ফাঁকে ফাঁকে বক। যদি পৌষপার্ব্বণে কেউ বিন্নুকে আলপনা দিতে বলে সেই কারণে সে খাতায় বলাকাশ্রেণী অঙ্কন অভ্যাস করিয়াছে।"

ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা—'রমণীর চাতুরিতে রমাপতি হারে।'

চেয়ারে পা ঝুলাইয়া হিমবর্ষী নিশীতে বিন্নু কাব্য শ্রবণ করিতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। কাজেই বাধ্য হইয়া প্রসাদকে বিছানায় আসন লইতে হইয়াছে।

প্রসাদের গায়ে গরম জামার উপরে শাল, পতিপরায়ণা সতী স্বামীর কোমর অবধি ঢাকিয়া দিয়াছে সাটিনের লেপে।

নিজের বিছানায় শয়ন করিয়া গলা পর্য্যন্ত লেপে আবৃত করিয়া কাব্য শুনিতেছে। প্রসাদের আশঙ্কা ছিল, আরামে শয্যাসীনা হইয়া তাহার শ্রোতা বোধহয় নিদ্রিতা হইবে। না, প্রসাদ নিরর্থক 'বেনাবনে মুক্ত ছড়াইতেছে' না। বিন্নু শুনিতেছে উৎকর্ণ হইয়া।

প্রসাদের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শঙ্খের মত দিকপ্রসারী, অথচ কোমল মধুর।

প্রসাদ এক এক অংশ অধ্যয়ন করিয়া তাহার ভাবার্থ সরল ভাবায় স্ত্রীকে

বুঝাইয়া দিতেছিল। কিন্তু স্ত্রী যে তখন তাহাতে নাই। "কনক আসনে বসি, দশানন বলি"—সেইখানে চলিয়া গিয়াছে, সেই মণি-মুক্তা-প্রবালের রাজ্যে।

"এই, তুমি যে ঘুমিয়ে পড়লে? আমি রেখে দিলাম বই।"

বিনু লেপের তলা হইতে হাত বাড়াইয়া স্বামীর বাহু চাপিয়া ধরে—"না না, রেখে দিও না। আমি ঘুমুই নি শুনছি, এত আলোতে কখনও আমার ঘুম আসে না। তোমার মত ত আমার অতবড় চোখ নয়, হাতীর মত কুতকুতে চোখ, নিচের দিকে তাকালে বোজা লাগে।"

"তা হ'লে আমাকে পদ্মপলাশ লোচন বলতে চাও?"

"তা পদ্মপলাশ বলা যায়, আবার পটোলচেরাও বলা যায়। থাকুক চোখের কথা, তুমি পড়। প্রমীলা সাজ করে চলেছে, তারপরে কি হ'ল?"

"তার পরের কথা কাল শুন, ঢের রাত হয়ে গেছে, এখন রেখে দেই।"

"রাত আবার কোথায়, মোটে দুটো, আরও খানিকটা পড়ে রাখ। কি সুন্দর, খালি শুনতে ইচ্ছা করছে।"

শুনিতে ইচ্ছা করিবে না কেন? কে কবে জ্ঞানহীনা মূর্খ বিনুকে 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য পড়িয়া শোনাইয়াছিল। কে তাহার ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিল। অপার অনন্ত রসের সমুদ্র উপকূলে বিনু জীবনে উপনীত হইবার সুযোগ পায় নাই।

স্বামীর প্রতি এই প্রথম বিনুর সুকুমার চিত্ত অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। বিশ্বের ভাণ্ডারে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, অমৃত রসের প্রস্রবণ বহিয়া যাইতেছে। কেহ যদি তাহার আস্বাদন বিনুকে দিতে উদ্যত হয় তাহাতে তাহার এত বিরাগ কেন?

প্রথম কাব্য শোনাইয়া প্রসাদও উপলব্ধি করিতে পারিল শিক্ষার চলতি পথে তাহার চপলমতি স্ত্রী অগ্রসর হইতে পারিবে না। তাহাকে উন্নীত করিতে হইবে কাব্যে কবিতায় গল্পে উপন্যাসে।

সুউচ্চ বৃক্ষশিরে শীতের সুমিষ্ট রৌদ্র সবে আবীর মাখাইতে সুরু করিয়াছে। তরু রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিয়া ডাকিল, "দাদা ও দাদা, বৌদি, শিগ্‌গির উঠে খেজুরের জিরেনকাটা রস খেয়ে যাও। ভজা গাছি ভাঁড় ভরে নিয়ে এসেছে।"

প্রসাদ জাগিয়া বিনুকে জাগাইয়া তুলিয়া দিল। প্রসাদের চিরকালের অভ্যাসের আজ ব্যতিক্রম হইয়াছে। সে যত রাত্রেই শয়ন করুক না কেন

ভোর পাঁচটায় জাগিবে কি জাগিবে। আজ ছয়টা বাজিয়াছে। রাত তিনটার পরে তাহাদের ঝাড় নিবিয়াছিল। বিনুর অনুরোধে সে বই বন্ধ করিতে পারে নাই।

প্রসাদ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া তরুর সহিত বাহির হইয়া গেল।

বিনু তাহার পিঠে ভাঙ্গিয়া-পড়া শিথিল কবরী বাঁধিয়া বারান্দার বালতি হইতে অঞ্জলি অঞ্জলি জলে জাগরণ-ক্লিষ্ট মুখ ধুইয়া রন্ধনশালার পেছনের পথ ধরিয়া চলিয়া গেল শাশুড়ীর কাছে। এত বেলায় সামনের উঠানে কাহারও সম্মুখীন হইবার ভয়ে বিনু সদরে পদক্ষেপ করিল না।

শীতের প্রভাতের উপভোগ্য পানীয় সদ্য-কাটা খেজুরের।

কাঁচের গেলাসে সফেন টাটকা রস লইয়া ক্ষিতি তরু সুমু কলরব করিতেছে। প্রসাদের রসের গেলাস হরি লইয়া গিয়াছে গোল বারান্দায়।

রূপার থালায় নানাবিধ মিষ্টান্ন ও গরম চা গৃহিণী গোছাইয়া দিতেছেন।

তরু ঠাণ্ডা রসে চুমুক দিয়া গায়ে শিহরণ তুলিয়া বলে, "বৌদি, তুমি এক্ষুণি এক গেলাস খেয়ে নাও। ফেনা মরে গেলে স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়।" বিনু চুপে চুপে বলে, "আমি খেজুরের রস খেতে পারি না। আমার গন্ধ লাগে।"

সকলে হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে, "মাগো, একি কাণ্ড! এমন ভাল জিনিষে তোমার গন্ধ লাগে? তুমি কি?"

মনোরমা বলেন, "আপন রুচিতে খাওয়া পরের রুচিতে পরা।' তা নিয়ে তোদের হাসির কি হ'ল রে? বৌমা, তুমি যখন রস খেলে না, তখন এক বাটি চা খেয়ে নাও। শীতকালে চা খেলে শরীর ঝরঝরে হয়।"

বিনু চা খাইয়া তরুকে দিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করে, "কি আজ রান্না হইবে? কি তরকারী কুটিবে সে?"

"আমার এদিকে মিটে গেল, চল আমিও যাই। দেখি কি কোটা-কাটা। আজ একাদশী, বিধবাদের খাওয়া নেই। নারায়ণের ভোগের সামান্য কিছু রেঁধে দিলেই হবে।"

তরু বলে, "মা, বৌদি বলছে সে আজ ঠাকুরভোগ রাঁধবে।"

মনোরমা প্রীত হইলেন, "গৃহ প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ, তাঁর সেবা ত করতেই হয়। বিধবা তোমার হাতে খায় না, আজ তাদের খাওয়া নেই, বেশ ত তুমিই ভোগ রান্না ক'রো। বড়ি ভাজা, একটা তরকারি করো, আর যা হয়। ভোগে তিন পদ রান্না দিতে হয়।"

মনোরমা চলিয়া গেলেন নিয়মের ঘরের দিকে। বিনু তাঁহার পিছনে। হাতীর সিঁড়িতে ঠাকুমা একগলা ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছেন। বিনু তাঁহার পাশে গিয়া অনুচ্চ স্বরে বলে, "ঠাকুমা, আজ একাদশীর উপবাস, রাতে আমার খেয়াল হয় নি। আপনি শোবার আগে জল খেলেন না কেন। ওঁরা ত ত দুধ-মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন তা ফেরৎ দিলেন।"

"পেটে যে সয় না মণিমালা, খেতে ভয় লাগে। তাই খাই না। তবু আমার খাওয়া হইচে। তুই যে আমারে তোর বাপের বাড়ীর পাকা কুমড়ার মেঠাই শিলে ছেঁচে তুলো তুলো করে কৌটায় ভরে দিইছিলি শেষ রাতে তোদের ঘরের যখন ঝাড়ের বাতি নিবলো তখন তার এক খাবলা বাতাসা দিয়ে খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়েছি পরাণ ভরে ঢক ঢক করে। ওতেই আমার হয়েছে ক্ষিধে তেষ্টার কাজ।"

বিনু তরকারির ডালা লইয়া বসিল। গৃহিণী কি দিয়া কি হইবে নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন।

কামিনীর মা চিড়ার মোয়ার গুড় চড়াইয়াছে। খেজুর গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী ম ম করিতেছে। দাসদাসীদের মধ্যে আবার ব্যস্ততা পড়িয়া গিয়াছে। পৌষ-পার্ব্বণের বেশি দেরি নাই। এতবড় বাড়ীর প্রত্যেক ঘর ঝাড়িতে হইবে, মুছিতে হইবে। কোথাও ধূলা বালি আবর্জ্জনা থাকা চলিবে না। পূর্ব্ব হইতে সুরু না করিলে কাজ সমাধা করা সম্ভব নহে।

সকলের গৃহেই পৌষপার্ব্বণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। দীনতম দরিদ্র যে তাহারাও মাটির ভাঙ্গা ডোয়া বাঁধিতেছে, মাটির দেওয়াল লেপিয়া তকতকে করিতেছে। ছেঁড়া কাঁথা ন্যাতা ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া কাচিতেছে। আস্তাকুঁড় পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছে।

নিরন্তর হিন্দুর সম্পর্কে আসিয়া মুসলমান সমাজের স্ত্রীলোকেরা পৌষপার্ব্বণ পালন করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের গৃহেও নূতন চাল কোটার ধূম পড়িয়া গিয়াছে। তাহারা ব্যয়সাপেক্ষ রকমারি পিঠা করিতে জানে না। জানিলেও সাধ্যে কুলায় না। তাহারা করে ধামা ধামা সরাপিঠে। রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া পুলি পিঠার মধ্যে পুর দিয়া গুড় সংযোগে সিদ্ধ করিয়া খায়। তাহারা গরীব, নারিকেল কিনিবার পয়সা নাই। তবু তাহারাও পিঠা করে। ঘরদোর পরিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড় সাজিমাটি দিয়া পরিষ্কার করে। লক্ষীমাস, মা লক্ষী সকল জাতিরই দেবতা। তিনি বিমুখ হইলে অনাহারে প্রাণ দিতে

হইবে। ভক্তিতে না হোক ভয় সকলেরই আছে। ভয়ের জন্মেই সকলে পৌষপার্ব্বণ না মানিয়া থাকিতে পারে না।

বিন্নুর তরকারি কোটা হইয়াছে। রান্নাঘরের তরকারি হারাণী রন্ধনশালার বারান্দায় কুটিয়া স্তূপ করিতেছে।

বিন্নু এবার স্নান করিয়া নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে যাইবে ছোট ভোগশালায়।

সরস্বতী হল হইতে বাহির হইয়া মা'র প্রতি ঝাল ঝাড়িতে লাগিল, "শোন মা, কি কাণ্ড। বাবা আমাকে ডেকে বললেন, 'কচিরাম ঠাকুরকে তোমরা নিয়মের কাজে লাগিয়ে দাও। তোমাদের নারকেলের কাজ, দুধের খাবার তৈরি করতে বড় পরিশ্রম হয়। লোকটা কাজে-কর্ম্মে ভাল, ওকে শিখিয়ে নাও'।"

মা মেয়ের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মেয়ে ইঙ্গিতে বিন্নুকে দেখাইয়া পুনরপি বলিতে লাগিল, "বাবার কথার মানে ত বুঝলে মা? আমাদের কারোর জন্মে নয়। কচি খুকীর নড়তে হচ্ছে তাতেই বাবা অস্থির হয়েছেন। কোথাকার কে কচিরাম বামুন কি শুদ্দূর সেই ঢুকবে নিয়মের কাজে। বুড়ো একটা মদ্দ, সেই আমাদের গায়ে গায়ে বসে হাতে হাতে কাজ করবে। ঘেন্নায় যে আমি মরে যাব মা। তোমাদের ইচ্ছা হ'লে তোমরা করাও, আমি এর মধ্যে নেই। ছোট ভোগের ঘরে আমাকে বাধ্য হয়ে আস্তানা গাড়তে হবে। এতকাল যা হয় নি তাই হবে অবশেষে। 'এতকাল দেখি নি পিসী মাসী, সম্পদ কালে জোটে আসি।' তোমাদের আর কি, যত মরণ আমার।"

সরস্বতীর চোখ জলে ভরিয়া গেল।

মা বলিলেন, "উনি আমাদের সুবিধার জন্মেই বলেছেন, কাজ করানো না করানো আমাদের হাতে। তোকে ছোট ভোগের ঘরে আস্তানা নিতে হবে কেন? আমাদের যেমন কাজ চলছে তেমনি চলবে।"

বিন্নু তেল মাখিতে চলিল তাহার শয়ন-গৃহে।

নবীন বিছানা ঝাড়িয়া বৃন্দাবনী চাদরে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। ঘরের মেঝে হইতে যাবতীয় আসবাব ঝাড়িয়া-মুছিয়া ঝক-ঝকে করিয়া রাখিয়াছে। সাজান পরিচ্ছন্ন গৃহ বিন্নুর বড় ভাল লাগে।

টেবিলের একপাশে রহিয়াছে মেঘনাদ বধ কাব্যখানা। বিন্নু তৃষাতুর নয়নে তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ইচ্ছা হইতেছিল খানিকটা পড়ে। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল এখন তাহার আর পড়িবার সময় নাই। আজ যে তাহাকে নারায়ণের ভোগ রাঁধিতে হইবে। তাহা ভিন্ন কাব্যের মাধুর্য্য নষ্ট করিতে তাহার মন সরিল না। মনে পড়িতে লাগিল স্বামীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর। শঙ্খের মত গম্ভীর অথচ মধুর। সংস্কৃত ভাষার বিশুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ। প্রতি শব্দ সহজ-সরল করিয়া বুঝাইবার কত প্রয়াস। বিনুর হৃদয়-তন্ত্রীতে এখনও যেন বাজিয়া বাজিয়া উঠিতেছে সেই ধ্বনি, বাঁশরী ঝঙ্কার। ইহার পরে শত-সহস্রবার এই বই পাঠ করিলেও ইহার সবটা সে প্রসাদের নিকটেই শুনিবে। নীরব নিশীথের প্রতীক্ষায় বিনু কাজে মগ্ন হইয়া থাকিবে। কাটিয়া যাইবে সুদীর্ঘ দিবা, হিম-সিক্ত সন্ধ্যা। তাহার পরে—

৩২

অদ্য রাত্রি আড়াইটায় ঝাড়ের বাতি নির্ব্বাপিত হইল। লঙ্কার পঙ্কজ রবি অস্তাচলে গমন করিয়াছে।

বিনুর চোখ অশ্রুসিক্ত।

প্রসাদ বই রাখিয়া বলে, "এই, বই শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? তোমার ভয় হয়েছিল সাত রাতেও আমি বই শেষ করতে পারব না। এখন ত সাঙ্গ হ'ল? এবার ঘোমানোর পালা। কথা বলছ না কেন?"

বিনুর কণ্ঠস্বর অশ্রুজলে বাষ্পারুদ্ধ, সে ধরা গলায় ধীরে জবাব দেয়, "বড় কষ্ট লাগছে আমার, মেঘনাদের জন্যে। ওকে না মেরে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখলে ভাল হ'ত।"

"সেটা যে অসম্ভব। বড় বড় বীররা না মরলে ত সীতাদেবী উদ্ধার হয়ে রামের কাছে আসতে পারেন না। তুমি সীতার দুঃখে দুঃখিত, অথচ কারোর মরণ সইতে পার না। সে হয় না। এক পক্ষকে আর এক পক্ষ না মারলে উপায় নেই। এখন ভাল করে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে থাক। আর রাত জাগলে তোমার অসুখ করবে।"

"না, অসুখ ক'রবে কেন? তোমারও ত অসুখ হ'তে পারে? তুমিও ঘুমিয়ে থাক। কাল আবার কি বই পড়বে?"

"কাল তুমি পড়বে আমি শুনব। না ঘুমুলে আমার অসুখ করে না। আমি বুড়ো, তুমি ছেলেমানুষ, ঘুম তোমাদেরই দরকার। আজ ঘুমিয়ে নাও কাল রবীন্দ্র কবিতা শুনিয়ো।"

বিন্নু কথা বলে না।

ক্ষণকাল পরে প্রসাদ টের পায় বিন্নু না ঘুমাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

এ-আবার কি? গভীর রজনীতে প্রসাদ ইহা প্রত্যাশা করে নাই। সে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সস্নেহে স্ত্রীর মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কান্নার কি হ'ল বিন্নু? আমি ত তোমাকে এমন কিছু বলি নি, যার জন্যে তুমি কান্না স্বরু করলে? কি হ'ল বল?"

তবু বিন্নু কথা বলে না। বাহিরে শীতের বাতাস শন্ শন্ রবে বহিয়া যায়। গৃহের পশ্চাৎ ভাগের উপবন হইতে শাখাচ্যুত স্খলিত পত্র ঝরিয়া পড়ে ঝর ঝর করিয়া।

দেওয়ালের ঘড়ি টিক টিক শব্দ করিতে করিতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজে।

প্রসাদ বলে, "এই, কি হ'ল তোমার? আজও তিনটে বেজে গেল, তুমি যদি এমনি করতে থাক; তা হ'লে তোমার কাছে ছোট ঠাকুমাকে ডেকে দিয়ে আমি বাইরে গিয়ে শুইগে।"

বিন্নু সভয়ে বলিল "না, আমার দুঃখ হ'ল আমি লেখাপড়া জানি না বলে, তুমি আমাকে কাল বই পড়ে শোনাতে বললে কেন? যে যা জানে না, তাকে তাই নিয়ে ঠাট্টা করতে কষ্ট হয় না?"

প্রসাদ কৌতুকের হাসি হাসে, "ও হরি, এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। তুমি লেখাপড়া কম জান বলে আমি তোমাকে ছোট ভাবি না। সুযোগ হয় নি, শিখতে পার নি, তাতে কি হয়েছে? এর পরে শিখে নেবে। বার-তের বছরের মেয়ে আর কত শিখবে? তুমি আমার স্ত্রী রত্ন। কি সুন্দর আমাকে রান্না করে খেতে দিয়েছ। আজও চমৎকার ঠাকুরভোগ রান্না করেছিলে, কি সুন্দর আমাকে পশমের গোলাপ বুনে দিয়েছ। তার ভেতরে তুলোয় করে আতর দিতেও ভোল নি। কাল তুমি যে বই পড়তে বলবে আমি পড়ে শোনাব। পরের বারে তোমার পড়া রইল তোলা, হ'ল ত?"

বিন্নু শান্ত হইল।

ভোর হইতে-না-হইতে দাসী মহলে কিসের যেন একটা চাপা জটলা চলিতেছিল।

বিন্নু মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়ার পরে ক্রমে শুনিল, মথুর দত্তের দ্বিতীয়া পত্নী ললিতা বৌ সন্ধ্যায় পলায়ন করিয়াছে। বন্দরে এক খেমটার দল গান গাহিতে আসিয়াছিল তাহাদের সহিত। তাহারা দুইদিন গান গাহিয়াছিল। ললিতা

দুই দিনই তাহার ননদ ও ভাগ্নেদের সহিত গান শুনিতে গিয়াছিল। বন্দরে মথুর দত্তের ঘর আছে, বেনেতি মশলার দোকান আছে। লোকে মানে, চেনে, মান্য করে।

সন্ধ্যাবেলা খেমটার নৌকা নদীতে ভাসার পরে যাহারা ললিতাকে যাইতে দেখিয়াছিল তাহারা আসিয়া মথুর দত্তকে খবর দেয়।

তাহার পরে চলে তুমুল কোলাহল। দুই-তিন খানা জেলে নৌকা সারারাত নদীর জল আলোড়িত করিয়া খেমটাওয়ালার নৌকার সন্ধান পায় না। 'চোর পালাইলে বুদ্ধি বাড়ে।' কাহারও খেয়াল ছিল না সেই খেমটার দল কোথা হইতে আসিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

বন্দরবাসীরা সকলেই খেমটার সখীদের নাচে-গানে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিল। "তারা আপনি নাচে আপনি গায়, আপনি করে হায় হায়।" গলির ওপারে দত্তবাড়ীতে কান্নার রোল উঠিয়াছে। বৃদ্ধ মথুর দত্ত শোকে দুঃখে লজ্জায় শয্যা লইয়াছে। মা বুড়ী ইনাইয়া-বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে—"ও জাতনাশী কুলনাশী, তোর মনে এই ছিল লো? তুই আমাগো বংশের মুখে চুণকালি দিইয়া কনে গেলি লো?"

পসারীর সহিত বিনু একবার পুকুরে গিয়া বৃদ্ধার কান্না শুনিয়া আসিল। পশ্চিমের ছোট বাঁধানো ঘাটের দিকে তাকাইয়া ললিতার জন্যে তাহার চোখ জলে ভরিয়া গেল। ঐ ঘাটে ললিতা আর নাহিতে আসিবে না। তিতপোল্লার খোসায় সাবান মাখিয়া শরীর মাজিবে না। ছোট কলসীতে জল ভরিয়া সোপানে ভেজা পায়ের পদচিহ্ন আঁকিয়া মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে নামিয়া যাইবে না গলির পথে। বার বার বিনুর হৃদয়ে প্রশ্ন জাগিতেছিল, কিসের দুঃখে ললিতা চিরদিনের জন্য চলিয়া গেল। মথুর দত্ত বিত্তবান্, তরুণী ভার্য্যার সর্ব্বাঙ্গ সোনার গহনায় মুড়িয়া দিয়াছিল। কত চটকদার শাড়ী তাহাকে পরিতে দিত। স্বামীর ভয়ে বড় বৌ কখনও সতীনকে সংসারের কুটোটা ভাঙ্গিতে বলে নাই। শাশুড়ী মনের আক্রোশে মনে মনে ফুলিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ করিতে পারিত না। এত সুখভোগ ফেলিয়া ললিতা কেন যে চলিয়া গেল বিনু তাহা ভাবিয়া পায় না। তাহার সুকুমার হৃদয়ে অতি সহজে রেখাপাত করে। কোথাকার কে ললিতা পুকুর ঘাটে ক'দিনই বা তাহার সহিত সাক্ষাৎ, তাহার চলিয়া যাওয়ার সহিত বিনুর কিসের সম্পর্ক, তবু বিনুকে বিষণ্ণ করিয়া তুলিল।

বাড়ীতে পৌষপার্ব্বণের আয়োজন চলিতেছে। গোলাঘর হইতে এক ঝাঁকা নারিকেল চাকর বাহিরে লইয়া গেল ছাড়াইতে। তাহা দেখিয়াও বিন্নু আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল না। সে শুনিয়াছিল ছানা ক্ষীর নারিকেলের সহিত সংযোগ হইবে। যাহা হইবার হোক, তাহাতে তাহার কি?

দুই স্বামী-স্ত্রী মিলিত হইল রাত্রে। ঝাড় লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দিবাভ্রম হয়। প্রসাদের হস্তে 'কড়ি ও কোমল'। বিন্নু সারা দিনের পরে প্রথমেই স্বামী সম্ভাষণ করিল, "শুনেছ, এক কাণ্ড হয়েছে। ললিতা খেমটা দলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছে।"

প্রসাদ সবিস্ময়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়, "ললিতা, ললিতা কে?"

"ঐ যে গলির ওপরে তোমাদের প্রজা মথুর দত্ত, তার ছোট বৌ, যাকে সকলে ললিতা সখী বলে ডাকে, সেই।"

"হ্যাঁ, মথুর দত্তকে জানি, সেই বুড়োর আবার ছোট বৌ ছিল নাকি? বুড়োর ছোট বৌ থাকলে সে পালিয়েই যায়, তাতে তোমারই বা কি? আমারই বা কি?"

বিন্নু অপ্রতিভ হইয়া বলে, "না, এমনিই বলছিলাম। ঘাটে নাইতে আসত রোজ, তাই দেখেছিলাম। তুমি ত জান না, এবার কার্ত্তিক পূজোর দিনে কারা যেন দুষ্টমি ক'রে ওদের বাড়ীতে জোড়া কার্ত্তিক ঠাকুর রেখে গিয়েছিল, যাতে দুই বৌয়ের ছেলে হয়। খুব ঘটা হয়েছিল পূজোয়। এ বাড়ীতে ঘরভরা মিঠাই মোণ্ডা পাঠিয়েছিল।"

"তা হ'লে তোমাদের লাভ মন্দ হয় নি? এখন শুনবে নাকি কড়ি ও কোমল? আজ কিন্তু রাত বারটার বেশি তোমার ঝাড়ের আলো জ্বলবে না।"

"কেন?"

"মোম পুড়ে শেষ হ'ল প্রায়। আর দু'রাতের জন্যে বাতি বসবে না ঝাড়ে। আর যা বই তা তুমি নিজেই পড়ে বুঝতে চেষ্টা ক'রো। আমার পরীক্ষার পরে যখন এসে অনেক দিন থাকব তখন আবার ঝাড় লণ্ঠন জ্বলবে। পড়া হবে অনেক বই।"

বিন্নু ক্ষুণ্ণস্বরে বলে, "তুমি রটন্তী পূজোয় না এস, কিন্তু দোলের সময় না এলে ঠাকুমা অনর্থ করবেন। নাতি নাতি ক'রে উনি দিনরাত সারা হয়ে যান। সকলের ওপরে ওঁর বড় নাতি।"

প্রসাদ হাসিল, "টাকার চেয়ে যে সুদের মমতা বেশি তা কি জান না?

তোমার যখন নাতি হবে তখন ঠাকুমার অবস্থা বুঝতে পারবে ? ও কি, মুখ ফিরিয়ে বসলে কেন ? লজ্জা হ'ল বুঝি ? মানুষের জীবনের পরিণতির কথায় লজ্জা কিসের ? ঠাকুমাকে আনন্দ দিতে পরীক্ষা ফেলে কি দোল খেলা চলে ? তোমরা দোলে খুব হুল্লোড় করে আবীর খেল। আমাদের বাড়ীতে এই তোমার প্রথম দোল। বন্ধু-বান্ধবীদের জন্যে তোমার খুব মন খারাপ লাগবে। এখানে রং আবীর পিচকারি নিয়ে মাতামাতি করবে কার সঙ্গে ?"

"সেখানেও ঠাকুমা আমাকে ওসব করতে দেন নি। আমরা বড়দের পায়ে আবীর দিয়ে প্রণাম করেছি। তাঁরা আমাদের কপালে আবীরের টিপ পরিয়ে দিয়েছেন। কেউ কেউ মুখে-মাথায় আবীর দিয়ে রাঙ্গা ক'রে দিতেন। হুল্লোড় করত পাড়ার ছেলেরা মিলে। বাবা, সে কি কাণ্ড! বালতি বালতি রং গুলে পিচকারি নিয়ে সবাই ভূত সাজত। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি চলত তাদের হোলি খেলা। পরের দিন মেঠে হোলির সং সেজে সকলে কি কাণ্ড করত !"

"তুমি যেতে না তাদের দলে ?"

"মাগো, বলে কি ? পুরুষ মানুষের সঙ্গে মেয়েরা হোলি খেলবে নাকি ? আমার ঠাকুমা ওসব পছন্দ করেন না। ছেলেদের দেখাদেখি যদি ইচ্ছা হয় মেয়েয় মেয়েয় খেলবে। পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের রং খেলা লজ্জার।"

"ভাগ্যে আমার পরীক্ষা দোলের সময়, নইলে আমি তোমাকে আবীর দিলে সেটা হ'ত তোমার লজ্জার ?"

বিনু এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। স্বামী যে স্ত্রীর নিকটে অপর পুরুষের পর্য্যায়ে পড়ে না এ খেয়াল তাহার হইল না।

পৌষপার্ব্বণের ধুমাধুমির মধ্যে প্রসাদের বিদায় লগ্ন উপস্থিত হইল। সেই রান্নার তাড়া, স্নানের তাড়া। ঠাকুমার মধুর বচন। গোযানের সাজন। লালজি-কালজির অগ্রগামী হওয়া। সেই ষ্টীমারের ভোঃ ভোঃ, বিদায় জ্ঞাপন।

৩৩

মকর সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন পাবনা জেলায় 'গোবর আলপনা' নামে খ্যাত। কয়েক দিন হইতেই নিত্য আঙ্গিনা ও আনাচ কানাচ লেপিয়া রাখা হইতেছে। শেষ রাতে সেই লেপার উপরে মালীবৌ আর একবার পালিশ লেপা দিয়া গিয়াছে।

স্নানান্তে সংক্ষেপে জপ-তপ সারিয়া সরস্বতী বড় একটা কাঁসার জামবাটিতে চালবাটা গুলিয়া উঠানে হাতী দিতে বসিয়াছে। শুভক্ষণ করিয়া হাতী প্রথম বেলাতেই আঁকিতে হইবে। আজ আবার শনিবার, প্রথম বেলায় হাতীর আকার দিয়া তাহার কপালে সিঁদুর, ধান-দুর্ব্বা ও সরিষার ফুল দিতে হইবে। নহিলে বারবেলা পড়িবে।

এ বিষয়ে ঠাকুমা সচেতন হইয়া মুখে তুবড়ি ছুটাইতেছেন। গোবর আলপনায় সরস্বতী বরাবর আলপনা দিয়া থাকে। তাহার আলপনার হাত চমৎকার। কত লোক তাহার হাতী দেখিতে আসিবে। প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইবে।

পৌষপার্ব্বণে পল্লীর অঙ্গনে অঙ্গনে হাতীর শুভাগমন অনিবার্য্য। অনেকে চালের গোলায় পুঁইডাঁটার রস মিশাইয়া সূতাকার রেখায় হাতীর পত্তন করিয়া থাকেন। রায়বাড়ীতে পুঁইডাঁটার রস ব্যবহার হয় না।

রৌদ্রে আঙ্গিনা ভরিয়া গিয়াছে। সরস্বতী ছাতা মাথায় দিয়া আলপনা দিতেছে।

হাতীর মুখের দিকের অংশটা আগে সমাপ্ত করিতে হইবে। কারণ, সেইখানেই প্রথম শুভক্ষণ।

হাতীর মস্তকের ভাগ দেখিতে দেখিতে হইয়া গেল। ললাটে চন্দ্র-সূর্য্য বিরাজ করিতে লাগিল। চন্দ্র-সূর্য্যের মাঝখানে দেওয়া হইল বৃহৎ একটা সিন্দুরের কৌটা ও ধান দুর্ব্বা সরষের ফুল একমুঠি। ঠাকুমা নিশ্চিন্ত হইয়া উলু দিলেন। না, সময় মতই হইয়াছে। শনিবারের বারবেলার এখনও অনেক দেরি।

বিনুর গৃহের সিঁড়িতে বসিয়া ঠাকুমা নাতনীকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন, "ও সরি, দিব্যি হয়েছে তোর হাতী, এবার হাতীর পিঠে হাওদায় রাজা দে। গলায় ঘণ্টা দিয়ে পোষ-পোষানী আঁক, তাদের কপালে সিঁদুর ধান দুর্ব্বো সরষে ফুল দিয়ে শুভক্ষণ কর। হাতীর সারা গায়ে লতা-পাতা, পিঠে টাকা-মোহর দিয়ে এখন ভরতে দে না তন্বি আর মণিমালাকে। আসল যা তা, তোর হাত দিয়েই বেরিয়েছে। এখন নকল আঁকি-বুঁকি দিয়ে ভরে দিক ওরা। নইলে আলপনা শেষ করতে তোর যে রাত দুপুর বেজে যাবে।"

সরস্বতী ঠাকুমাকে প্রচণ্ডবেগে ধমক দেয়, "তুমি থাম বাপু, যে ঘোড়া কেনে তার চাবুক জুটে যায়। আমার এত পরিশ্রমের জিনিষ আনাড়ির হাতে দিয়ে

নষ্ট করতে পারব না। রাত দুপুর হয় হবে, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না তোমাকে।”

ঠাকুমা ক্ষুণ্ণ মনে উঠিয়া যান ছোট ভোগের ঘরের দিকে। সেখানে আজ ছোট ঠাকুমা একলা নাই। মনোরমা বসিয়া গিয়াছে উনুনের পাড়ে। আজ হইতে পৌষপার্ব্বণের সূচনা।

গোবর আলপনার দিন নূতন মাটির সরায় সরাপিঠা করিতে হয়। তাহাকে সরা পোড়ানো বলে। যত পিঠাই হোক না কেন, সকলের আদি অকৃত্রিম হইল সরাপিঠা।

সন্ধ্যায় সরা পোড়ানোর নিয়ম হইলেও দ্বিপ্রহরেই সরাপিঠা করিতে হয় নারায়ণের ভোগ ও বিধবাদের জন্য। পিঠা-পায়েস অন্ন-তুল্য। অন্নের সহিত গ্রহণ করিতে হয়, দিনে বা রাত্রে একবার মাত্র।

রাত্রে গামলা গামলা পিঠাপুলি রান্নাঘরে করিয়া রাখিতে হইবে নহিলে আগামীকালের পিঠার সমারোহ নির্ব্বাহ দেওয়া কঠিন।

কাল পৌষপার্ব্বণে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে। তাহা ভিন্ন কামার কুমার ছুতার ভূমিমালী ইত্যাদির আদি-অন্ত থাকিবে না। পৌষপার্ব্বণের পরের দিন গ্রামের কৃষকের ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট ধামা কাঁখে প্রভাতে পিঠা ভিক্ষা করিতে আসিবে। কাজেই তৈরী করিতে হইবে পিষ্টকের পাহাড়।

ঠাকুমার সহিত মনোরমার বাক্যালাপ বন্ধ। অথচ প্রাণের কথা ব্যক্ত না করিলে বুক ফাটিয়া যায়।

ঠাকুমা বার দুই কাশিয়া হাঁক দিলেন, “ও ছোট বৌ, তোরা সরা পুড়িয়ে এখুনি রাখছিস? তা প্রথম পিঠাখানা ঝাঁটার কাঠি বিঁধিয়ে উনুনের মুখে রেখেছিস ত? আর চারখানা পিঠা পাতায় ক'রে শেয়ালদের জন্যে রাখতে হবে। সন্ধ্যার পরে পুকুরের চাতালে দিয়ে এলেই শেয়ালরা এসে খাবে। মা ভগবতী শিবা রূপে ভোগ নিয়েছিলেন। সেই জন্যে শুভকর্ম্মে শিবাভোগ দেওয়া ভাল।”

ছোট ঠাকুমা পুলিপিঠা গড়িতে গড়িতে বলেন, “সব ঠিক মতন হচ্ছে দিদি, তুমি ব্যস্ত না হয়ে ছায়ায় গিয়ে বসে থাক গে। কড়া রোদ উঠেছে, রোদে ঘুরলে তোমার আবার ঘুরণী উঠে পড়বে।”

ঠাকুমা সেখান হইতে ছায়া খুঁজিতে খুঁজিতে উপনীত হইলেন পুকুর পাড়ের পশ্চিমের ছোট ঘাটে বাতাবী লেবু গাছের সুশীতল ছায়ায়।

ঘাটে নাইতে নামিয়াছে এ বাড়ীর ভূতপূর্ব্বা ধান-ভাহুনী সোনা মিয়ার মা ও তাহার নাতনী খাতুন। সোনা মিয়ার মা এখন স্থবিরা বুড়ি, নাতনী হাত ধরিয়া জলে নামাইয়াছে।

ঠাকুমা বলেন, "সোনার মা, ভাল আছিস ত? নাতনী তোর বুড়া কালে স্থাবা-থ্যাবা করে নাকি। সোনার দিব্যি মেয়ে হয়েছে, এবার সাদী দিবি না?"

"হ মাঠান, সাদীর কতা হইচে। ম্যায়াডা ভাল হইচে, আমাগো কত করন করি থ্যায়। ওই ত হাতে ধরি নয়া আইসে নাওনের নাগি। এহন নড়ন-চড়নের আর সাধ্যি নাই মাঠান।"

"কতকাল আর সাধ্যি থাকে মানুষের? যে দুঃখ ধান্দায় সোনারে মানুষ করেছিলি তা আমরা জানি। দিনরাত তোর কেটে গিয়েছিল ঢেঁকির ওপরে। চিরকাল কি লোকের সমান যায়—'কখনও বনে বনে কখনও সিংহাসনে।' ছেলে নাতিরা লায়েক হয়েছে—নাতনী স্থাবা করছে, এখন দিন কতক সুখ ভোগ কর। নাতনী তোর ভাত রান্না শিখেছে ত?"

"হ মাঠান, ভাত রাঁধন, শাগ ভাজন শিখিছে। আমাগো ভাত-জল খাতুনই দেয়।"

খাতুন ফিক ফিক করিয়া হাসে। হাসিতে হাসিতে সোনার মা বুড়ীর কানে কানে বলে, "নানী, মুই যে খাটা রাঁধন শিখিচি তা কইলি না?"

"হ, মাঠান, নাতিন খাটা রাঁধিতে জানে। ভাত শাগ খাটা বেবাক দেব্য।" কহিতে কহিতে বুড়ি স্নানান্তে খাতুনের বাহু ধারণ করিয়া সোপান বাহিয়া প্রস্থান করে।

ঠাকুমা উদাস নয়নে তাকাইয়া থাকেন মথুর দত্তের বাড়ীর দিকে। গলির দিকে মুখ করিয়া টিনের নূতন চালা বাঁধা হইয়াছিল কার্ত্তিক পূজার জন্য। পূজার পরেও যুগল কার্ত্তিক বিরাজিত ছিল নূতন চৌকির ওপরে। মথুরের বড় বৌ প্রত্যহ নাইয়া-ধুইয়া শুচিবাসে গুটিকত বাতাসা জল ও ফুল নিবেদন করিয়া দিত যুগ্ম দেবতাকে। আবার সন্ধ্যায় ধূপ দীপ জ্বালাইয়া প্রণাম করিত।

ললিতা বৌ-এর পলায়নের পরে মথুর দত্ত জোড়া কার্ত্তিক বিসর্জ্জন দিয়াছে দুর্গাদহে। ঝাঁপ-মুক্ত চালা, শূন্য চৌকি খাঁ খাঁ করিতেছে। অপমানে লজ্জায় মথুরবাবু শয্যাগত। বড় বৌ ও মা'র মুখে রা নাই। গৃহে নিদারুণ নিরাশার স্তব্ধ নীরবতা নামিয়া আসিয়াছে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল্য

নাই। তাহারা তিলে তিলে যাহা গঠন করে অলক্ষ্য হইতে বিধাতা নিমেষে তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া দেন। তবু মোহগ্রস্ত মানব আশার জাল বুনিতে বিরত হয় না।

ভোর হইবার সূচনায় আবার রায়বাড়ী কলকোলাহলে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। রাত জাগিয়া প্রদীপ লইয়া সরস্বতী তাহার আলপনা শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। সে কি আলপনা—না-শুভ্র বর্ণের একখানা অপূর্ব্ব গালিচা প্রাঙ্গণে বিছান হইয়াছে। পাড়ার লোক দলে দলে সরস্বতীর শিল্পকলা নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছিল। এই আনন্দটুকুই ভাগ্যবিড়ম্বিতা সরস্বতীর সম্বল। যে কাজটা লইয়া মেয়েটা ভুলিয়া থাকিতে চায়, সে কারুকার্য্যই হোক, আচার-নিষ্ঠা রেষারেষিই হোক মা তাহাকে সহজে বাধা দেন না। যেরূপেই হোক উহার সময় কাটিয়া যাইলেই হইল।

মকর সংক্রান্তিতে খাল খন্দ নালা সূর্যোদয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাসাগরে পরিণত হইয়া যায়, এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া গোটা রায়বাড়ী ভোরের শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পুকুরে স্নান সারিয়া অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে।

ছোট ঠাকুমাকে ও মনোরমাকে প্রচণ্ড শীতে তেমন কাহিল করিতে পারে নাই, কারণ তাঁহারা উভয়ে বসিয়া গিয়াছেন দুই উনুন জ্বালাইয়া রকমারি রসের পিঠা প্রস্তুত করিতে।

রুচিরাম পাণ্ডা এতকাল ভোজনবিলাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সূপকার হইয়া তাঁহার বাহান্ন বার ভোগের কত উপকরণ বানাইয়া দিয়াছে। পিঠাপুলি গজা দইবড়া লাড্ডু তাহার হস্তে চমৎকার উতরায়। সে বসিয়াছে রন্ধনশালার বারান্দার উনুনে পিঠাপর্ব্বে। মণিরাম ভোজের রান্না করিতেছে।

বিনু ফরমাইস খাটিতে মহা ব্যস্ত। ছুটাছুটিতে তাহার শীত সভয়ে পলায়ন করিয়াছে। সরস্বতী গায়ে পশমের মোটা আলোয়ান জড়াইয়া বিগ্রহের পূজার আয়োজন করিতেছিল। বিশেষ দিনে নারায়ণের বিশেষ পূজা ভোগের অনুষ্ঠান করা হয়। আজ মকর সংক্রান্তি, নারায়ণ স্নান করিবেন। দধি দুগ্ধে ঘৃতে মধুতে। জলপানি খাইবেন ক্ষীর সর ছানা মাখন মিছরি, ফলমূল ইত্যাদি। তাহার পরে ভোগ হইবে সারি সারি পাত্রে পিঠা-পায়েস দিয়া।

ঠাকুমার মহা অশান্তি, দুই দণ্ড স্থির হইয়া রৌদ্রে বসিয়া রোদ পোহাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার মন পড়িয়া রহিয়াছে বাহির মহলের গোশালায়। আজ গরু-বাছুরদের উত্তম রূপে স্নান করাইয়া তাহাদের পায়ের চারি ক্ষুরে ও শিংএ সরিষার তেল মাখাইয়া এক গামলা চালের গুঁড়া ঘন করিয়া গোলাইয়া মাটির নূতন কলিকায় গরু-বাছুরের সারা গায়ে ছাপ দিয়া তাহাদিগকে সযত্নে কলার পাতায় সরা-পিঠা খাইতে দিতে হইবে। কপালে সিঁদুর দিতে হইবে।

ঠাকুমার কি কম সমস্যা তা শত্তুরের মুখে ছাই দিয়া ষাটের গরু-বাছুরের সংখ্যা রায়বাড়ীতে কম নহে। এক গোয়াল-ভরা গরু-বাছুর, ভৃত্য সম্প্রদায় ঠিক মতন নিয়মরক্ষা করিতে যদি না পারে সেই আশঙ্কায় ঠাকুমা চঞ্চল হইয়াছেন।

উদ্বেগে উৎকণ্ঠায় রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হয় নাই।

প্রথম রাতের শিবাভোজন তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, পাচক মণিরাম কলার পাতায় খানকতক পিঠা পুকুরের চাতালে রাখিয়া আসিয়াছিল। কতক্ষণ পরে ঠাকুমা অনুভব করিলেন, একপাল শৃগাল নিঃশব্দে পিঠা খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু খাওয়া তাহাদের শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রখর শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন লালজি কালজি গোঁ গোঁ করিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঠাকুমা বিলক্ষণ রূপে অবগত আছেন শিবারা খাদ্য ফেলিয়া পলাইবার পাত্র নহে। তাহারা চাতালে বসিয়া পিঠা না খাইলেও বাঁশবনে লইয়া খাইয়াছে। ঠাকুমার অতি সাধের শিবাভোগ হইয়াছে।

এদিকে ঠাকুমার যেমন অস্থিরতা ওদিকে তেমনি তরুর। সকলের অলক্ষ্যে বিনু যোগ দিয়াছে তরুর সঙ্গে।

রাতেই সকল তরকারি কুটিয়া রাখা হইয়াছিল। রসের পিঠার রস তৈরি করিয়া রাখা হইয়াছিল। নিয়মের ঘরের কাজ ছিল অনেকটা হালকা।

গরু-বাছুরের গায়ে কলিকার ছাপ দিয়া পিঠা আঁকা হইবে। অথচ তরুর দুগ্ধপোষ্যগুলি কি এমনি সকলের লাথি-ঝাঁটা খাইয়া আস্তাকুঁড়ে পড়িয়া থাকিবে? তাহারা কি বানের জলে ভাসিয়া আসিয়াছে? তাহাদের কল্যাণ নাই, শুভক্ষণ নাই?

হারাণীকে দিয়া তরু এক বালতি জল গরম করাইয়া লইয়া গিয়াছে কাঠের ঘরের পিছনে। একদিকে ঘরের আড়াল আর একদিকে প্রাচীর, স্থানটা ভারী ঝিরিঝিরি, কাহারও চোখে পড়ে না।

মায়ের আস্ত একখানা চন্দন সাবান গরম জল সংযোগে শাবক চারটির গায়ে মাখাইয়া ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। বিনু কাজের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া তরুর সহযোগিতা করিতেছে। অবাধ্য অবোধ জীবগুলিকে কিছুতেই শাসনে রাখা যাইতেছিল না। বিনুই বুদ্ধি করিয়া চায়ের দুধ হইতে একঘটি দুধ অঞ্চলের আড়ালে আনিয়া চারিটা বাটিতে তাহাদের মুখের সামনে ধরিয়া দিয়াছে। বিনু আরও সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে প্রসাধনের নানা সামগ্রী। চালের গুঁড়া গোলা জলে নূতন কলিকা। একবাটি চুন হলুদ, আলপনার মাটির খুরিতে গোলা তেল সিন্দুর।

গত রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিয়া তরুর চোখ কড় কড় করিয়াছিল। বিনুই তাহাকে মনসা পাতার কাজল করিয়া দিয়াছিল চোখে দিতে। সেই কাজলের দলিত পাতা কয়েকটাও সে আনিয়া রাখিয়াছে। এক টুক্‌রা শাড়ীর পাড় আনিতেও বিনুর ভুল-হয় নাই।

চালের উপর দিয়া তেরছা হইয়া রৌদ্র আসিয়া পড়িল বাচ্চাদের গায়ে। গা শুকাইতে বিলম্ব হইল না।

কুকুর-বিড়ালের সর্বাঙ্গে ছাপ দেওয়া হইল কলিকার। শাড়ীর মোটা পাড়ে হলুদ-চুনে ডোরাকাটা হইল লেজে, চোখে মনসা পাতার কাজল, কপালে তেল সিন্দুরের বৃহৎ টিপে বাচ্চাগুলা সাজিল অভিনব বেশে।

তরু তাহাদিগকে আদর করিয়া বুঝাইতে লাগিল, "চল, এখন তোদের বাইরে নিয়ে রেখে আসি। গরু-বাছুরের গায়ে পিঠে দেওয়া হচ্ছে দেখ গে। খবরদার—উঠোনের আলপনায় পা ছোঁয়াবি না। তা হ'লে বছরকার দিনে শুনতে হবে মধুর বচন 'আপদ' 'বালাই' 'দূর দূর ছাই ছাই'।"

তরু পাকা গিন্নী, বাচ্চাদিগকে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বিনুকে বলে, "বৌদি, তুমি এবার হাত-পা ধুয়ে কাপড়-সেমিজ বদলে তোমার যজ্ঞশালায় যাও। তোমাকে না দেখলে ওদিকে আবার বকুনি শুরু হবে। কচিরাম বলে, 'মুই পাতকী হমু না।' কি জানি কুকুর-ছোঁয়া কাপড়ে আমাদের কি পাতক হবে কে জানে। তাই কাপড় ছাড়তে বলছি।"

তরু তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গ লইয়া বাহির মহলে চলিয়া গেল।

৩৪

যথাসময়ে নারায়ণের ভোগ সরিল। ব্রাহ্মণ ভোজন হইল। বড় আঙিনা

আলপনায় চিত্রিত। ছোট ছোট আঙ্গিনায় কামার-কুমারের দল বসিয়া গেল আহারে। যেমন তাহাদের পিঠা-পায়েস খাইবার বহর, তেমনি পায়েস বাড়িয়া লইবার আগ্রহ।

শুভ্র জ্যোৎস্না অবারিত হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে শুভ্র আলিপনায়। চারিদিকে হাসিতেছে প্রফুল্ল চন্দ্রকিরণে।

জেলে পাড়ায় খোল-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন হইতেছে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়,
হরিনামের বানে
হরিনামের গানে
কে আছিস পাপী তাপী, আয় ছুটে আয়।"

সারাদিন পৌষপার্ব্বণের উৎসবে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার পরে সকলে শয়ন করিয়াছে। বিনু গৃহে খিল আঁটিয়া আলোর সামনে বসিয়াছে বোনা লইয়া। কাজের ফাঁকে এবং রাত জাগিয়া সে ক্ষিতির মোজা বুনিয়া দিয়াছে। ক্ষিতি মোজা পায়ে দিয়া বন্ধু মহলে দেখাইয়া বেড়াইতেছে। বিনু ভাবিয়া পায় না ইহারা এত অল্পে খুসী হয় কিরূপে? ইহাদের চরিত্রের এদিকটা উদার বলিতে হইবে। এদিকে একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন বিনুর আসল দিকের ব্যাপার বাকী রহিয়াছে। বিনু আঙ্গুলে মাপিয়া স্বামীর পায়ের মাপ রাখিয়াছে। প্রথমেই "দেহি পদপল্লব মুদারম।" বিনু স্বামীর পায়ের মোজা বোনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এবার শীতে স্ত্রীর স্বহস্তে রচিত মোজার আস্বাদ প্রসাদ পাইবে না। কিন্তু না পাক 'এক মাঘেই ত শীত পালায় না।' স্বামীর জন্য কিছু করিতে বিনুর হৃদয়-মন উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। সে এ-অবধি তাহাকে কিছুই দিতে পারে নাই। কেবলই গ্রহণ করিয়াছে তাহার অজস্র দান দুই করপুট ভরিয়া।

গৃহে সারারাত্রি কেরোসিনের আলো জ্বলে বলিয়া খাটের অপর অংশের দুইটি জানালা খোলা রাখা হয়। সেই মুক্ত বাতায়ন-পথে হিমবর্ষী বাতাস আসিয়া ঝাড়ে দোলা দিতেছিল, কাঁচের বাঁশী বাজিতেছিল ঠুং ঠাং। বিনু সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল বিগত রজনীর কথা।

সুদূর দেশ হইতে আবার কবে মধুর যামিনী ফিরিয়া আসিবে তাহার

জীবনে ? প্রসাদ উদাত্ত মধুর স্বরে আবার তাহাকে কাব্য পড়িয়া শোনাইবে ? সে আশা দিয়া গিয়াছে ফিরিয়া আসিয়া মেঘদূত পড়িয়া শোনাইবে। মেঘদূতের বিষয় বিনু যে একটু-আধটু না জানে তাহা নহে। তাহার পিত্রালয়ের সকলে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। তাঁহাদের পাঠ-পঠন আলোচনার মধ্য দিয়া বিনুর হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছে মেঘদূতের অঙ্কুর। সেই বিরহী যক্ষ যাহার আকুল বিলাপ বিশ্বে ব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে, বিনু এবার শ্রবণ করিবে সেই করুণ কোমল আমূল কাহিনী। তখন ত শীত থাকিবে না, কিন্তু বসন্তও কি চলিয়া যাইবে ? বিনুর বারান্দার নীচের গাঁদার ঝাড় শুখাইয়া যাইবে। গাঁদা শুখাইলে কুরচি ফুলে ভরিয়া যাইবে তাহার বাতায়ন-তল। তরু বলিয়াছে গাঁদার পালা শেষ হইলে সে এখানে রোপণ করাইবে বেল ও রজনীগন্ধার ঝাড়।

বিনু বুনিতে বুনিতে মানস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল বেল ও রজনীগন্ধার কুঁড়ি। তাহারা ফোটো ফোটো হইয়াছে কিন্তু সম্পূর্ণ ফুটিতে পারিতেছে না। আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর পুনরাবৃত্তি না হইলে ফুল ফুটিবে না, কোকিল গাহিবে না। পবন কুরচিবাস বিতরণ করিতে বিরত থাকিবে।

ছোট ঠাকুমা একঘুমের পরে জাগিয়া চমকিত হইলেন, "ও কি বৌ, এই দুরন্ত শীতে এখনও তুমি বাতির সামনে বসে রয়েছে। একালের কি ঢং হয়েছে সোয়ামীর কাছে পত্তর লেখন। এদিকে ঘুমে ঢলে পড়ে, ওদিকে ঘুম যায় কোথা ?"

বিনু ঘড়ির দিকে চোখ তুলিল, রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। আজ সকলে শয়ন করিয়াছিল নয়টায়। তখনও জেলে পাড়ার কীর্ত্তন থামে নাই। পুণ্যদিনে প্রাণ ভরিয়া সবাই ভগবানের নাম করিতেছে।

বিনু বোনাটা টেবিলের টানার মধ্যে সযত্নে রাখিয়া দিল। লণ্ঠনের শিখা কমাইয়া রাখিয়া আসিল আলমারির পেছনে খোলা জানালার পাশে। ছোট ঠাকুমা আলো সহিতে পারেন না।

বিনু লেপের নীচে শয়ন করিয়া কহিল, "আমি ত আজ চিঠি লিখতে বসি নি ছোট ঠাকুমা ? একটু বুনতে নিয়েছিলাম।"

"আবার কিসের বোনা ? জনা-জাত ত বুনি-টুনি জামা জোড়া, মুজা-টুজা দিলি। আবার কার লেগে তোর হাত সুর সুর করছে ? আজ দিনমান খাটা খাঁটা গেচে, আজ রাত জাগতে হয় না, শুয়ে ঘুম দিতে হয়। দেখ বৌ, পেসাদ

এবার এসে তোকে রাত জাগা শিখিয়ে গেচে। চিরকাল আমি তোকে নিয়ে শুচ্চি তোর ঘুমের বহর আমার অজানা নাই। আজ দুপুরে ভোগের রঁাধা-বাড়া কেমন খেয়েছিলি ?”

ছোট ঠাকুমা যেমন রঁাধিতে ভালবাসেন, ততোধিক ভালবাসেন নিজের রান্নার সুখ্যাতি শুনিতে। সারা দিনের পিঠা-পর্ব্বে কাহারও মুখে সেটা শোনা হয় নাই। এখন বড় আশায় বিনুকে জিজ্ঞসা করিলেন।

বিনু বলে, “খুব সুন্দর রান্না হয়েছিল ছোট ঠাকুমা, মণিরাম-রুচিরামের সাধ্যি নাই আপনার মতন নিরামিষ তরকারি রঁাধে।”

“চাপুড় ঘণ্ট, মটর শাকের তিল-পিটালি, পটোলের ঝাল, ছানার ডালনা— এর ভেতরে কোনটা তোর বেশি ভাল লেগেছিল বৌ ?”

বৌ নীরব, তাহার আঁখি-পল্লবে নিদ্‌পরী সোনার কাঠির পরশ দিয়াছে। ছোট ঠাকুমার ভুল ধারণা প্রসাদ বধূকে নিশি জাগরণ শিক্ষা দিতে পারে নাই।

পরের দিন এত বেলাতেও রৌদ্রের দেখা নাই। নিবিড় কুহেলিকায় ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বনতল কুয়াশার চাদরে আবৃত।

ঠাকুমা সিদ্ধান্ত করেন এবার আম্র পল্লবে পল্লবে আমের মুকুল ভরিয়া যাইবার কুজ্ঝটিকা, এ তাহারই পূর্ব্বাভাস।

ক্রমে বেলা হয়, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায় কুয়াশার আবরণ। কৃষক বালক, বালিকারা আসে কলাইকরা সানকী থালা ও ছোট ছোট বেতের ধামা লইয়া পিঠা ভিক্ষা করিতে।

গৃহিণী বধুকে আদেশ দিলেন সবাইকে সমভাবে পিঠা বিতরণ করিতে। পাত্রে পাত্রে পড়িয়া আছে অপরিষাপ্ত সিদ্ধপুলি, সরা-পিঠা ও পাটিসাপটা। এগুলি কাল রুচিরাম সারাদিনব্যাপী প্রস্তুত করিয়াছিল। ভাল ভাল রসের পিঠা প্রায় নিঃশেষ।

বিনু লোককে দিতে বড় ভালবাসে। সেখানে পৌষপার্ব্বণের পরের দিন ঠাকুমা তাহাকে ডাকিয়া বলিতেন, ‘রাই, আমি যা চাই,’ যা বিনু পিঠে বিলি করগে। সমান ভাগে দিস, একজনা বেশী পেল, আর-জনারা পেল না, সেটা দেখিস।”

সেখানকার সেই বিনু আজ রায়বাড়ীর পিঠা বিতরণের ভারপ্রাপ্ত হইয়া মহা পুলকিত।

কেহ বলে, "বৌমা,আমাগো ছোট ভাইডার নাগি দুইডা পিঠা দেও। সে ম্যালেরি জ্বরে ক্যাতা মুড়ি দিইয়া কাঁদন করিচে। মাতা তুলিতে পারিল না। একটু পরে জ্বর ছাড়ি যাইবে, তহন পিঠা খাইবে।"

কেহ অনুনয় করে, "ও বৌমা, মায়ের নাগি ভাঙ্গাচেরা একডা পিঠা দেও। মা গিইছেল মিরগী বিলে কাদা হাতায়ে মাছ ধরিতে, জিয়াল মাছে পায়ে কাঁটা বিঁধাইয়া দিইচে। পা ফুলি ঢোল, নড়িতে পারে না।"

জনে জনের নানারূপ অনুযোগ-অভিযোগ শুনিয়া বিনু পিঠা দেয়। পাত্র প্রায় শূন্য হইয়া আসিতেছে। প্রার্থীর সংখ্যাও বিরল হইতেছে।

আজ বিনু এদিকে আবদ্ধ। গৃহিণী কচিরামের উপরে ভার অর্পণ করিয়াছেন তরকারি কোটার। সে বসিয়া গিয়াছে যজ্ঞশালার বারান্দায় বঁটি পাতিয়া। মেয়েলী কাজে কচিরাম ওস্তাদ। তাহার কর্ম্মকুশলতায় সরস্বতীও সদয় হইয়াছে।

পিঠার ঘরে দরজায় শিকল দিয়া বিনু গিয়া তাহার বিছানার উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। হাতে তাহার "চোখের বালি"। ইতিপূর্ব্বেই তাহার স্বামী প্রদত্ত সমস্ত গ্রন্থের গল্পাংশ পাঠ করা হইয়াছে। তাহাকে পাঠ বলা চলে না, গোগ্রাসে গেলা। বিনু এবার স্বামীর ব্যবহারে তাহার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীত। সে খাতায় লেখার জোর দেয় নাই, অখাদ্য অপাঠ্য কতকগুলো বই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহা মুখস্থ করিতে হুকুম করে নাই। শুধু আদেশ দিয়াছে একখানা পুস্তকের গল্প একবার পড়িয়া সে যেন তাহা রাখিয়া না দেয়। বার বার পড়িয়া সে যেন প্রতি শব্দের অর্থ বোধ করিতে চেষ্টা করে। সেই কারণে দুইবার পড়া চোখের বালি বিনুর হস্তে। বিনু প্রতি লাইনে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ভাবে, আশার সহিত তাহার যেন কোথায় সাদৃশ্য রহিয়াছে। ভাগ্যে এখানে বিনোদিনীর আবির্ভাব ঘটে নাই, তাহা হইলে বিনু কি করিত? এমন সময় আঁচলের তলায় হাত লুকাইয়া তরু গৃহে প্রবেশ করিয়া ডাকে, "বৌদি, শুয়ে রয়েছ কেন? অসুখ করল নাকি?"

বিনু বই রাখিয়া উঠিয়া বসে, "না না, অসুখ করবে কেন? এমনি একটু গড়িয়ে নিলাম। এখন নাইতে যাব, বেলা দুপুর হ'ল; বড় হবিষ্যা ঘরে মুল্লুকের কাজ পড়ে আছে। আর দেরি করলে ওঁরা রাগ করবেন।"

"রেখে দাও ওঁদের রাগ। তুমি কি এতক্ষণ ব'সে ছিলে, কাঁড়ি কাঁড়ি পিঠের বিলি-ব্যবস্থা সেটা কি কাজ নয়? তোমার ভয় নেই, মা কচিরামকে

ঢুকিয়েছেন মেজদির তাঁবে। ও তোমার চেয়ে ভাল কাজ করছে দেখে মেজদি খুসীতে ডগমগ। এই দেখ কি এনেছি, পিঠে খেতে খেতে মুখ বিচ্ছিরি হয়ে গেছে, নাও, মুখে দাও।" বলিতে বলিতে তরু আঁচলের তলা হইতে বাহির করিল একটা পাথরের বাটি। বাটিতে রাঙ্গা রাঙ্গা এক বস্তু শালুপ পাতায় মাখা।

বিনু সাগ্রহে প্রশ্ন করে, "এ আবার কি মেখে এনেছ? এত লাল কেন?"

"চুকারী কি লাল না হয়ে সাদা হবে? গোয়ালের পেছনে আমাদের যে চুকারী গাছ আছে, তুমি ত তা দেখ নি, বৌমানুষ বাইরে গোয়ালের পেছনে যাবে কি? চুকারী শিলে ছেঁচে শালুপ পাতা দিয়ে মেখেছি। শীতের ঠ্যালায় একটা কামরাঙ্গাও পাকে নি। গাছভরা কুল, কষা। আমের মুকুল কত খুঁজলাম, সবে পাতার ভেতর থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।"

বিনু হাত বাড়াইয়া সেই পরম উপাদেয় সামগ্রী মুখে দিল। মুখে চুক চুক শব্দ করিয়া প্রশংসায় মুখর হইল, "কি সুন্দর মেখেছিস তরু, খেতে চমৎকার হয়েছে। কখনও এমন খাই নি। পিঠে খেতে খেতে আমার মুখটাও যেন কেমন হয়ে রয়েছে। তোর চুকারী খেয়ে বাঁচলাম। আর ক'দিন পরেই কুল হবে, আমের মুকুলে ভরে যাবে গাছ। কুল আমের মুকুল দিয়ে মাখলে কি সুন্দর হয়?"

তরুর সহিত নিবিড় সখ্যতায় বিনুর 'তোমার' পরিবর্তে 'তুই' যে কখন হইয়াছে বিনু তাহা টের পায় নাই।

ঠাকুমা পাকা সন্ধানী, এতক্ষণ সন্ধানে সন্ধানেই ঘুরিতেছিলেন। বিনুর গৃহে ঢুকিয়া গালে হাত দিলেন, "ওমা, তোরা এখানে, আমি কই, গেল কনে ওরা? কি খাচ্চিস লো, ঘর-ভরা পিঠে-পায়েস থুয়ে তোরা কি খেতে বসেছিস? চুকারী কি কাঁচা খাওয়া যায়?"

তরু বলে, "আমরা যে এঁটো ক'রে ফেলেছি, নইলে তোমায় একটু চেখে দেখতে দিতাম কাঁচা খাওয়া যায় কি না? তোমার বাড়ীতে মিষ্টি খেতে খেতে জিবের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল লাগে না।"

"অমর্ত্তে অরুচি হইছে তোদের। তা এমাস ভরা চলবে এমনি ধারা খাওয়া-দাওয়া। আজ মাঘ মাস পড়ল। পরশু তোদের বাস্তু পুজো। বাস্তু পুজোর দিন রায়বাড়ীতে আবার পাঁঠা দিয়ে বাজারের জয়দুর্গার পুজো দিতে হবে। পাঁঠা বলি দিয়ে বাড়ীতে আনে। পুরোহিত খায় দুইজনা, বাস্তু

পূজোর একজনা, জয়দুর্গা পূজোর একজনা। আমার মহেশের রাজার সংসার, দুইজনা কইলেই কি দুইজনা হয়। কত লোক আসবে যাবে খাবে নেবে তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এত খাবার দেব্যজাত দেখে আমার পরাণটা কেঁদে ককিয়ে মরে পেসাদের জন্যে। ব্রজভূমি করি আঁধার কোথায় গেছে গোপাল আমার'।"

ঠাকুমার গোপাল উল্লেখে তরু খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রিয়বিচ্ছেদকাতরা বৃদ্ধার খেদোক্তিতে বিনু আর তরু হাসিতে যোগ দিতে পারিল না।

বাস্তু পূজা হইতেছে উঠানে। গোবর-জলে লেপা জায়গায় আলপনা দেওয়া হইয়াছে। বাস্তু পূজার জলপানি সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে ছোট ছোট কলার পাতায়। দেবতা কি কম, ইন্দ্রাদি পঞ্চ দেবতা ছাড়া অগ্নির দাহন হইতে গৃহকে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নি দেবতা। ঝটিকা হইতে রক্ষার নিমিত্ত পবন। জলপ্লাবনের দেবতা বরুণ। মেঘ-বৃষ্টির কর্ত্তা মেঘবাহন। লক্ষ্মীনারায়ণ শিবদুর্গা। সর্ব্বসিদ্ধি গণেশ সূর্য্য দেবতা-সর্ব্বোপরি মা বসুমতী, তিনিই যে সাক্ষাৎ বাস্তু দেবী।

ছোট ঠাকুমা পরমান্ন চড়াইয়া দিয়াছেন। পায়েস দিয়া সর্ব্ব দেবতার ভোগ দিতে হইবে।

প্রভাতে ছেলে-বুড়া স্নান সারিয়া লইয়াছে। পূজার স্থানে গোল হইয়া বসিয়াছে গৃহবাসীরা। গৃহকর্ত্তা পুরোহিতের পাশে কুশাসনে সমাসীন। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসার ঝাঁজ বাজা মাত্র ঠাকুমা উলু দিলেন। ধূপ-দীপ জ্বলিল। ঘণ্টা দুই ধরিয়া চলিল বাস্তু পূজা।

ইহার পরে ভোগ দিবার সময় আসিল। ফের ধোয়া-মোছা কলার পাতা সাজান হইল আঙ্গিনায়। প্রত্যেক কলার পাতায় দেওয়া হইল পানের খিলি দই মিষ্টি।

মনোরমা মস্ত একটা পিতলের কড়ার দুই কান ধরিয়া উঠানে আনিয়া নামাইলেন। কড়া ভরা পায়েস, দেবতার প্রীতির জন্য তাহাতে মিলিত করা হইয়াছে ঘৃত মধু কর্পূর।

হাতা কাটিয়া কাটিয়া কলার পাতায় পায়েস দেওয়া হইল। দিনটা মেঘম্লান হইলেও মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তেজ মন্দ ছিল না। বাহির হইতে আসিল

অনেকগুলি ছাতা। রুচিরাম ব্রাহ্মণ, এসব কাজে তাহার অধিকার আছে। সে ছাতা মেলিয়া ধরিল পুরোহিত ও কর্ত্তার মাথায়।

অন্য সকলে ছাতা মুড়ি দিয়া বসিয়া বসিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে প্রসাদের দিকে তাকাইতে লাগিল।

অবশেষে ভোগ হইয়া গেল। পুরোহিত কুশের ডাঁটায় শান্তিজল সকলের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।

সকলে বসিয়া গেল প্রসাদের পাতা লইয়া। বাস্তু পূজার প্রসাদ উঠানে বসিয়াই খাইতে হয়।

কর্ত্তা বসুমতীর প্রসাদের পাতা লইয়া চলিলেন বাড়ীর প্রধান গৃহের ঈশান কোণে পুঁতিতে।

পুরোহিত পায়েস প্রসাদ বাদে জলযোগ সারিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। পায়েস অন্নতুল্য। এক সূর্য্যে একবারের বেশি দিনে ব্রাহ্মণরা অন্ন গ্রহণ করতেন না।

সারি সারি পাতা লইয়া সরকাররা ও দাসদাসীর দল খানিকটা দূরে বসিয়া গেল। ঠাকুমা প্রসাদ প্রণাম করিয়া মুখে দিলেন।

তরু তারস্বরে চিৎকার করে, "ও বৌদি, এস না বাপু, তোমার প্রসাদে এর পরে ধুলো-বালি উড়ে পড়বে। এত লোকের ভেতরে খাবে কেমন করে? এই যে আমি ছাতার আড়াল করে দিয়েছি। ছোট ঠাকুমা মা প্রসাদ মুখে দিয়ে গেছেন, ওঁরাও পায়েস খাবেন না। মেজদির উঠোনের প্রসাদ অচল। উনি যে ঠাকুর দেবতার ওপরে বড় দেবতা।"

মনোরমা বলিলেন "যাও বৌমা, তুমি ছাতার আড়ালে ব'সে প্রসাদ মুখে দিয়ে এস। এক্ষুনি জয়দুর্গার বলির পাঁঠা এসে যাবে। মাংস রান্না হ'লে তবে না সকলের খাওয়া। খেতে খেতে দুপুর গড়িয়ে যাবে। তুমি দু'খানা পায়েসের পাতা নিও।"

বিনু ছাতার আড়ালে তরুর পাশে প্রসাদ লইয়া বসিল। ইতিমধ্যে তরু চারখানা পায়েসের পাতা সরাইয়া রাখিয়াছে এক পাশে। বিনু সেদিকে চোখ মেলিতেই তরু চুপে চুপে কহিল, "ওদের জন্যে সরিয়ে রেখেছি বৌদি। উঠোনে পূজো, ওরা ছুঁয়ে দেবার ভয়ে আমি কাঠের ঘরে শেকল দিয়ে রেখেছি। তোমার খাওয়া হ'লে চল ওদের খাইয়ে-দাইয়ে ছেড়ে দেইগে।"

বিনু ও তরু নিজেরা প্রসাদ খাইয়া সকলের অগোচরে চলিয়া গেল কুকুর-বিড়াল বাচ্চাদের ভোগ সরাইতে।

জয়দুর্গার বাড়ীতে বলি হইয়া আসিল পূজার ফলমূল মিষ্টান্ন প্রসাদ ও বলির শিংওয়ালা প্রকাণ্ড একটা পাঁঠা। জয়দুর্গা বারোয়ারী পূজার মতন। তাঁহার অন্নভোগ নাই। বাজারের দোকানদারদের অনুরোধে ও পাড়ার নিম্নশ্রেণী লোকদের আগ্রহে রায়কর্ত্তা নিজের এলাকায় নিজে যাবতীয় ব্যয় বহন করিয়া জয়দুর্গার আটচালা টিনের মণ্ডপ করিয়া দিয়াছিলেন। মণ্ডপের দেয়াল ও মেঝে পাকা। বৈশাখী অমাবস্যায় জয়দুর্গার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। সেই কারণে একবছর কাল দেবী-প্রতিমা মণ্ডপে বিরাজিত থাকেন। ফের বৈশাখে পুরাতন প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়া নূতন প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হয়। ইতর সাধারণরা বারমাস ভক্তিভরে প্রভাতে তাঁহার গৃহ মার্জ্জনা করিয়া ফুল দেয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ ও ধূপ প্রজ্জ্বলিত করে। রোগে-ভোগে মানত করে, রোগমুক্ত হইলে পুরোহিত ডাকাইয়া পূজা দেয়, বলি দিয়া মহানন্দে বলির মাংস ভোজন করে।

পল্লীগ্রামে কসাইখানা নাই। অনেক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বৃথা মাংস স্পর্শ করেন না। মায়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করিলেই তাহা মহাপ্রসাদে পরিণত হইয়া থাকে। সেই জন্য জয়দুর্গার অঙ্গনে বলির অভাব হয় না।

দুই পুরোহিত ঠাকুর মহাশয় পাচকের হাতে খাইবেন না। তাঁহাদের নিমিত্ত মনোরমা পৃথক মাছ রান্না করিয়া মাংস চড়াইয়া দিলেন। ডাল তরকারি ভাজা অম্বল ভোগশালাতেই হইয়াছে।

রায়বাড়ীর ভূরিভোজন মিটিতে অপরাহ্ণ গড়াইয়া গেল। সকলে পরিতৃপ্ত হইল বাস্তু পূজার সমাপ্তিতে। সূতায় গাঁথা হইয়া যেন রহিয়াছে—এক একটি পর্ব্ব। সূতা হইতে ফুলের মালার মত এক একটা খসিয়া গেলে কাজের লোকেরা আরাম বোধ করে।

ঠাকুমা আজ বড় উৎকন্ঠিত, কামিনীর মা'র জন্য। কামিনীর মা গিয়াছে আজ তিন দিন হইল নাকালিয়ার বন্দরে তাহার অসুস্থ কাকাকে দেখিতে। বেচারার স্বজন বলিতে বিশেষ কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে ব্রজেশ্বরী ভগিনী আর কাকা ও কাকিমা।

রায়বাড়ীর বৃাহ ভেদ করিয়া কামিনীর মা সচরাচর বাহির হইতে পারে না। বালিকা বয়সে সে তিন মাসের কন্যা কামিনীকে লইয়া বিধবা হইয়াছিল। সে কামিনীও এক বছরের বেশি জীবিত ছিল না। কিন্তু নামটুকু রাখিয়া

গিয়াছে। তাহার পরে ঠাকুরদার আমলে ভরা যৌবনে কামিনীর মা এখানে আসে। সর্ব্ব বিষয়ে সুনামের সহিত জীবন প্রায় কাটাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুমা এতদিন যে তরুণীটিকে স্নেহে করুণায় সৎপথে পরিচালিত করিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন সে এখন আর দাসী পর্য্যায়ে পড়ে না। রায়-পরিবারের একজনা হইয়া গিয়াছে।

কথা ছিল আজ ভোরে কামিনীর মা আসিয়া পৌছিবে। তাহার ব্যতিক্রমে ঠাকুমা পথের পানে চাহিয়া আছেন। বিনুকে শতবার প্রশ্ন করিয়াছেন, "দেখ লো মণিমালা, রাজেশ্বরীর জন্যে বাস্তু পূজোর পেসাদ রেখে দিয়েছিস ত? সে কথার নড়-চড় করবার লোক নয়। কাহিল কাতরের বাড়ী, ঠেকে পড়ে বের হ'তে পারে নি।"

বিনু বলে, "ভোগের দুই পাতা পায়েস আর সব জিনিষ তার জন্যে ঢাকা দিয়া রাখা হয়েছে ঠাকুমা; ওবেলা আসতে পারেনি, এবেলা নিশ্চয় আসবে।"

বিনুর আশ্বাসে ঠাকুমা আশ্বস্ত হন। "তাই কি মণিমালা, তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। রাজেশ্বরী না থাকলে একবেলায় রায়বাড়ী অচল। একটা না মিটতেই আর একটা এসে উপস্থিত হয়। বাস্তু পূজো হ'ল, আসছে রটন্তী পূজো। সে হেলা-ফেলার দেবতা নয়, কাঁচা খেকো কালী। এখন থেকেই তার সাটর সুরু হবে। রাজেশ্বরী না হ'লে কারও সাধ্যি নেই তালে তাল দেওয়া।"

ঠাকুমার আকুলতায় দাসী মহলে পরস্পর পরস্পরের গায়ে ঠেলা দিয়া মুখ টিপিয়া হাসে বিদ্রূপের হাসি।

৩৫

সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিতে-না-জ্বলিতে ঝি-রা রঙ্গ করিয়া উলু দিয়া জিগীর দিল "ও দিদি, আইচিস, আয় আয়। তোর নেগে মাঠান হেদিয়া খুন খুন হইচে। তুই বাঁচিবি লো অনেকদিন, তর কতা কইতে কইতেই আসি হাজির হইলি?"

"হ, যা কইচিস, দুঃখি কাঙ্গালগরে যমে চোকে ছাখে না।" কহিতে কহিতে কামিনীর মা অগ্রসর হইয়া ঠাকুমাকে প্রণাম করিল। ঠাকুমা বিনুর গৃহের সোপানে বসিয়াছিলেন।

সিঁড়ির এক ধাপ নীচে কামিনীর মাকে ইঙ্গিতে বসিতে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "আয় রাজেশ্বরী, বোস এইখানে। এতটা পথ হেঁটে এসেছিস,

জিরিয়ে নে। ওবেলা তোকে না দেখে ভাবনা হয়েছিল, কাকা কেমন আছে?"

"একটু ভাল মাঠান, বৌমার ঠাকুর্দা ওষুধ দিয়া চাঙ্গা করি তুলিছে। কবরাজ নয়ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী। বিহানে মেলা দিব, এমুনি সময় হইল একডা কাণ্ড। কাকী গেইছেল মাঠাইলে (ডোবায়) মুখ ধুইতি, কাদার মধ্যে কাকীর পায়ের তলে পড়িল এই বড় একটা শোল মাছ। দুই হাতে সাপটি আঁচলে বাঁধি নয়া কাকী আইল। কাকা কয় 'ম্যায়া বাড়ীতে আইলে খাওন-দাওন না কর‍্যা যাওন চলে না। মাচায় নাউ ফলিচে, নাউ দিইয়া শোল মাছের ঝোল রাঁধি দেও। কাঁটা-ছাল দিইয়া পেঁইজের চচ্চরি করি ম্যায়াডারে খাইতে দেও। বাবুগো ঘরে রাজু কত খায় কত পরে, তবু সেডা পরের ঘর। আপন জনার কাছে কবে বা রইল, কবে বা খাইল?' আমি কইলাম, 'বাস্তু পূজ্যা হইবে আজ, আমি এহনি যাই।' কাকা কইল 'তোর এত ধুম কিসের বিটি, তুই কি মনিব বাড়ীর পূজ্যার পরমান্নি রাঁধিবি? না নবিদ্যি বানাইবি? এ বেলা থাকি খাওন-দাওন কর। ও বেলায় ছুটি পাইবি।' তাই রইয়া আইলাম মাঠান, কিন্তুক মনডা আমার ভাল নাই।"

বিনু দরজার পাশে আলোর সামনে বুনিতে বসিয়াছিল, তাহার নিকটে তরু।

তরু জিজ্ঞাসা করিল, "লাউ দিয়া অতবড় শোল মাছ খেয়ে তোমার মন খারাপ হ'ল কেন? তোমার খাবার মা ঢাকা দিয়ে রেখেছেন, এখন খেয়ে মন ভাল করোগে।"

"আর মন ভালো, হাজু কলু মইর‍্যা মনডা মন্দ করি দিইচে।"

বিনু সচমকে দ্বারে মুখ বাড়াইয়া বলে, "কোন্ হাজু কলু মরেছে?"

"নাকালে বন্দরে হাজু কলু আবার কয়ডা আছে বৌমা? আমাগো ডাকাত হাজু কলু মরি গিইচে। আপন হাতের নোয়ার হাতকড়ি বুকে মারি পরাণ দিইচে।"

ঠাকুমা হাহাকার করিয়া উঠিলেন, "আহা হাজু নাই। ডাকাত হ'লে কি হবে, লোকটা ছিল গরীব কাঙ্গালের বন্ধু। ধনীর ধন লুট করে গরীবকে বিলিয়ে দিয়েছে। ছোট-বড় সকল মেয়েমানুষকে মা কালীর অংশ জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করেছে। শেষকালে সেও আত্মঘাতী হ'ল?"

বিনুর হাত হইতে বোনা খসিয়া পড়িল। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হাজু কলুকে সে কতবার দেখিয়াছে, তাহার বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়াছে। সেই অজর অমর হাজু নাই। শুনিয়া বিশ্বাস হয় না।

তরু হাজুর আমূল ইতিহাস জানে না। তাহার ভীষণ অত্যাচার ও পরোপকারের বৃত্তান্ত ভাষা ভাষা শুনিয়াছে মাত্র। বিনু বিশদভাবে শুনিয়াছে ঠাকুমায়ের কাছে।

সাধারণ কলুর গৃহে তাহার জন্ম। বাপের জীবিকা ছিল প্রতিবেশীদের শস্য তিল ভাঙ্গাইয়া নিজের ও মাতৃ-হারা একমাত্র সন্তান হাজুর উদর পূরণ।

পুত্রকে সংসারী করিয়া পিতা মহাপ্রস্থান করিলে হাজু পিতার বৃত্তি অবলম্বন করে। কিন্তু তাহাতে সংসার প্রায় অচল হইয়া আসে। পূর্ব্বে সংসারে পিতা-পুত্র মাত্র দুইজনা ছিল। এখন চারিজনায় দাঁড়াইয়াছে। হাজুর দুই পুত্র-কন্যা জন্মিয়াছে, নিজেরা দুই স্বামী স্ত্রী। দুঃখে-কষ্টে দিন কাটিয়া যাইতেছিল, এমন সময় হাজুর ভাগ্যবিধাতা তাহার চিরন্তন জীবনযাত্রার ধারা পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

সেবার পল্লীগ্রামে কলেরা মহামারী আকার ধারণ করায় এক দিনেই হাজুর স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা বিনা চিকিৎসায় পাড়ি ধরিল পরপারে। তখন হাজুর এমন একটা পয়সা ছিল না, যাহা দিয়া চিকিৎসক ডাকে, ঔষধ কেনে।

স্ত্রী পুত্র কন্যার মৃত্যুর পরেও হাজুকে হাত পাতিতে হইয়াছিল অন্ত্যেষ্টি ব্যাপারে প্রতিবেশীদের কাছে।

এই সূত্র ধরিয়াই অল্পদিনের মধ্যে হাজু হইয়া উঠিল ডাকাত। হাজু দলপতি হইয়া ডাকাতের দল গঠন করিল। তাহাদের ধর্ম্ম হইল ধনীর অর্থ অপহরণ করিয়া দরিদ্রকে বিতরণ করা। মা কালী হাজুর আরাধ্য দেবী, সুতরাং মাতৃজাতির কেশাগ্রও হাজু-সম্প্রদায়ের স্পর্শ করা নিষিদ্ধ।

সেবার নরহত্যার দায়ে হাজুর দল ধরা পড়ে। তাহাদিগকে পাবনার জেলে রাখা হইয়াছিল। জেলে থাকার সময় হাজু একটা দেয়ালের একটি স্থানে প্রত্যহ রাতে দুইবার লাথি মারিত। তাহার সঙ্গীদের প্রতি নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল একই স্থানে দুইটি করিয়া লাথি মারা।

কয়েক মাস পরে সেই দেয়াল ভাঙ্গিয়া হাজুর দল পলায়ন করে জেলখানা হইতে। তখন বর্ষাকাল, কারারক্ষকরা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে, সকলের লক্ষ্য হাজুর প্রতি। দলের অন্য লোকেরা অন্ধকার গভীর রাত্রে এদিকে-সেদিকে বনপথে আত্মগোপন করিবার সুযোগ পাইলেও হাজু তাহা পাইল না।

আত্মরক্ষার জন্য বর্ষার ভরা পদ্মায় তাহাকে ঝাঁপ দিতে হইয়াছিল।

তাহার পরে বছরখানেক পুলিশ হাজুর সন্ধান পায় নাই। পুলিশের বিশ্বাস হাজু কুমীরের খাদ্য হইয়াছে। কিন্তু মরিয়াও হাজু মরিল না। বছরখানেক পরে হাজুর কীর্ত্তি ঘোষিত হইতে লাগিল দেশ-দেশান্তরে।

ফের পুলিশের চলিল হাজু অভিযান। এবারের অভিযান ব্যর্থ হয় নাই। হাজু ধরা পড়িয়াছিল।

কামিনীর মা শুনিয়া আসিয়াছে বিচারের জন্যে হাজুকে হাতে মোটা হাতকড়ি লাগাইয়া বাহিরে আনা হইয়াছিল। হাজু বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়ে —বলে, "পুলিশের কর্ত্তা আমার কাছে আসিয়া হুকুম না দিলে আমি এখানে শুইয়া থাকিব। তাহার হুকুম পাইলে যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব।"

জেলখানা যেন তাহার "মামার বাড়ী", আবদারের সীমা নাই। লালমুখো পুলিসকর্ত্তা কৌতূহলের বশীভূত হইয়া উপস্থিত হইলে হাজু উঠিয়া বসিয়া বলিল, "সালাম কুত্তার বাচ্চা, চোরের জাত, নিজেরা চুরি করিয়া, ডাকাতি করিয়া আমার বিচার-কর্ত্তা সাজিতে আসিয়াছে। আমার বিচার খোদাতাল্লা করিবে। আমি আরও কিছুকাল দুনিয়ায় থাকিতে পারিলে ধলামানুষের লাল রক্তে পৃথিবী ভাসাইয়া দিয়া যাইতে পারিতাম। এখন ইহাই দিয়া যাইতেছি—" বলিতে বলিতে হাজু চোখের নিমেষে সজোরে পুলিশ সাহেবকে পদাঘাত করিয়া নিজের বুকে হাতকড়ির আঘাত হানিয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাই হইল হাজু কলুর শেষ ইতিহাস।

বিনুর চক্ষু অশ্রুসজল হইল, মনে পড়িতে লাগিল হাজুকে। খর্ব্বাকৃতি বলিষ্ঠ গঠন, সদা-প্রফুল্ল প্রৌঢ় হাজুকে। পথে-ঘাটে হঠাৎ সাক্ষাৎ হইলে সেই সস্নেহ সম্বোধন, "ছোট মা, কনে যাইচো, ক্যামন আছো?" তাহাকে আর কখনও দেখা যাইবে না। পথের ধূলায় তাহার পদচিহ্ন চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। দরিদ্রের পর্ণকুটিরে কেহ সঙ্গোপনে রাখিয়া আসিবে না অজস্র দান। পল্লীর পথে-ঘাটে-মাঠে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারিবে না স্ত্রীলোক, দস্যু হাজু কলুর প্রবল প্রতাপে। হাজুর যুগ অবসান।

ঝম ঝম ঝর ঝর টিপ টিপ। রক্তসন্ধ্যা কোদালে-কোটালে মেঘের নিরসন করিয়া রাত-শেষ হইতে ঝিরি ঝিরি বাদল ঝরিতেছে। মাঘের প্রথমে

বারিবর্ষণে ঠাকুমা অত্যন্ত ব্যাজার। মাঘের শেষ দিক হইলে বলিতে পারিতেন—"যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ"। তাহা নয় আসন্ন রটন্তী পূজায় হাড়-কাঁপানো শীতের এটা পূর্ব্বাভাষ। ঝুরু ঝুরু বাদল ধারাকে পল্লীবাসিনীরা বলে ফুলবৃষ্টি। দেবতারা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে পুষ্প বরিষণ করেন। ইহাতে দেশের মঙ্গল হয়। শস্যসম্ভারে বসুন্ধরা ভরিয়া যায়।

সেকালে পল্লীগ্রামের সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের ছত্রধারণ ছিল হাস্যকর। মেয়েদের জন্য বেদিনীরা তালপাতার টেকো বা মাথাইল তৈরি করিয়া পাড়ায় পাড়ায় বিক্রি করিত। শুধু স্ত্রীজাতি নয়, গরীব কৃষকদের বর্ষা কাটিত মাথাইল মাথায় দিয়া। একটা মাথাইলের দাম চার পয়সা, ছয় পয়সার বেশী ছিল না।

তরু মাথাইল মাথায় দিয়া মেনীর সহিত সখীসম্মিলন সারিয়া গৃহে ফিরিল।

বর্ত্তমানে ঠাকুমার দুইটি বসিবার প্রধান স্থান। এক হাতী সিংহাসন, নয় বিনুর ঘরের সোপান।

বিনু গিয়াছে নিয়মের বারান্দায়। ঠাকুমা একাকিনী অকাল জলোৎসবের উদ্দেশ্যে গজরাইতেছেন। তরু তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া কহিল, "তুমি আপনার মনে বিড় বিড় করছো কেন ঠাকুমা? বৃষ্টি কি কারোর হুকুমে নামে? আবার মাঘের শেষে নেমে তোমার 'ধন্য রাজার পুণ্য দেশ' করবে। ভারী ত তোমার এক রাতের রটন্তী পূজো, তার আবার সাটর। তোমাদের ভোগের চাল তৈরি, মশলার গুঁড়ো কোটা শেষ, আরও কত কি হয়ে রয়েছে, তবু বৃষ্টি দেখে তোমার ভাবনা?"

"ভাবনা কি সাধে করি লো তন্বি, বৃষ্টির পরে শীত পড়বে নতুন করে, সকলকে জমিয়ে দেবে এক রাতেই। মাঘের শীতে বনের বাঘ যে সেও কাঁপে।"

"মাঘের শীত ত দাঁতভাঙ্গা ঠাকুমা, সরস্বতী পূজোর সময় তার চিহ্নও থাকবে না, সেই শীতের তোমার ভয়। রটন্তী পূজোর রাতে আমাদের সারা বাড়ীতে কাঠের গুঁড়ির আগুন জ্বালিয়ে গরম করে রাখা হয়।"

"হ্যাঁ, আমার মহেশের বিলি-ব্যবস্থার কমতি নেই। সকল দিকে তার কড়া নজর। তোদের শরীরে নতুন রক্ত, তাই শীতকে গেরাহ্যি করিস নে। শুনিস নি, এক গরীব বামুন গোটা শীত কাটিয়ে চত্তির মাসের শীত সইতে না পেরে হালের গরু বেচে গায়ের গরম কাপড় কিনেছিল।"

তরু হাসে খিল খিল করিয়া, "কি যে বাজে কথা তুমি বলো ঠাকুমা, চত্তির মাসের শীতে কেউ নাকি শীতের কাপড় কেনে?"

"ঠ্যালার নাম কোষ্টা-কাটা। ঠ্যালায় পড়লে বাঘে-বলদে এক ঘাটে জল খায়। ঠ্যালায় পড়েই বামুন শীতের বস্তর কিনেছিল।"

ঠাকুমা ক্ষণেক মৌন থাকিয়া এবার কাজের কথায় অগ্রসর হইলেন।

তরু রায়বাড়ীর বার্ত্তাবহ। ঠাকুমা তরুর নিকট হইতে কিছুর ইঙ্গিত পাইলে তাহাতে রং প্রলেপ করিয়া থাকেন।

ঠাকুমা বারেক চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যালো তন্বি, রটন্তীতে তোর দিদিরা আসবে না? চিরকাল ত রটন্তীতে এসে দোল সেরে যায়। এবার কার্ত্তিকে গেছে অঘ্রান পোষ দুই মাস গেল, শ্বশুর বাড়ীর ভাত হজম করছে কি করে?"

তরু ঠাকুমার প্রচ্ছন্ন পরিহাসটুকু হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সরলভাবেই উত্তর করিল, "দুই দিদিকেই বাবা আসতে লিখেছিলেন, বড়দির ছোট ননদের বিয়ে ফাগুন মাসে, সে আসতে পারবে না লিখেছে। মেজদি আসবে শিগ্‌গীর, ওর নাকি শরীর খারাপ। আচ্ছা ঠাকুমা, তোমার মেয়ের আসার কথা ত একবারও জিজ্ঞেস কর না? একটা মাঠের এপার-ওপারে পিসীমা থাকেন, বাবা কতবার আনতে চান তবু আসেন না কেন? তুমি পিসেমশায়কে খবর পাঠালেই পার?

"তুই আর হদ্দ করিস না লো তন্বি; 'যম জামাই ভাগ্‌না, তিন নয় আপনা।' যে মেয়ের মা'র 'পরে দরদ নাই, পরের ছেলে জামাই, সে করবে শাশুড়ীর দরদ। আমার হয়েছে—

"আপন ধন পরকে দিয়ে হইছি আমি পাগলপারা,
পরাণ খালি খুঁজে মরে, কোথায় আমার নয়নতারা'।"

"বাবা, শুনে বাঁচি না, পিসীমা তোমার নয়নতারা? আমি ভেবেছিলাম দাদাকেই তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস, এখন বুঝলাম নিজের মেয়ের ওপরে কেউ নয়।" বলিতে বলিতে অভিমানে তরুর চোখ ছল ছল করিতে লাগিল।

ঠাকুমা আড়চোখে নাতনীর মুখের প্রতি তাকাইয়া ফিক্ করিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "তোর দাদা যে আমার কি, তা তুই জানবি কি করে তন্বি। তার কাছে তোর পিসী! এ বিশ্বভুবনে তার মতন আমার আর কে আছে? সে

"শীতের উড়নী পিয়া, গিরিষের বা,
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না'।"

ঠাকুমার বৈষ্ণব কবিতা বেশীদূর গড়াইতে পারিল না। ঝুরুঝুরু বৃষ্টির ভিতরে বিনু আসিয়া উপস্থিত হইল সেইখানে।

তরু বিরক্তির সহিত কহিল, "তুমি ভিজে এলে বৌদি কোন আক্কেলে, দেয়ালের গায়ে ছাতা রয়েছে, বারান্দায় মাথাল রয়েছে, তার একটা মাথায় দিয়ে আসতে পারলে না?"

বিনু বলিল, "ভারী ত বৃষ্টি, তার আবার ছাতা, মাথাল, মাথায় কাপড় রয়েছে। এখন আমি নাইতে যাব।"

ঠাকুমা বলিলেন, "এত সকালে বর্ষাবাদলে নাইবি কি লো মণিমালা, তোর সর্দ্দি লাগবে, মাথা ধরবে। আজ নেয়ে-ধুয়ে কাজ নেই। কাপড় ছেড়ে লেপ গায়ে দিয়ে খানিকক্ষণ শুয়ে থাক বিছানায়, শরীর গরম হোক।"

বিনু হাসে, "বেলা দশটার সময় শুয়ে থাকব কি ঠাকুমা? শরীর আমার ঠাণ্ডা হয় নি। আপনিই বসে শীতে জমে যাচ্ছেন। চলুন, আপনাকে শুইয়ে দিয়ে আসি। ভোগ হ'লে ডেকে দেব। নিজের ঘরে যদি না যেতে চান, তা হ'লে আমার বিছানায় শোবেন চলুন, আমি লেপ গায়ে দিয়ে দিচ্ছি। আজ না আপনার রটন্তী পুজোর মোয়া-মুড়কি করতে হবে, আমাকে শুইয়ে রাখলে তার পর"—

ঠাকুমা সচকিত হইলেন। বাদলের সমারোহে এতক্ষণ তাঁহার মনে উদয় হয় নি পুজোর আয়োজনের কথা। একটা উপলক্ষ্য লইয়া রায়বাড়ীর 'তোড়-পাড়' ব্যাপার তিনি সম্পূর্ণ ভুলিয়া বসিয়া আছেন।

ঠাকুমা ইষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "আজ তোদের মোয়া-মুড়কির দিন, সেটা আমার খেয়াল ছিল না লো মণিমালা। আমি কোন্ দুঃখে ঠিক দুপুরে শুয়ে রইব? লোকে কইবে, 'রোগ-ভোগ নাই, বুড়ীটা বিছানায় গড়াচ্ছে।' আজ মোয়া-মুড়কি-তিলের নাড়ু করবি কবে? তার পরে নারকেলের কাজ আছে, চাকররা কয় কুড়ি নারকেল ছাড়াতে নিয়েছে, শুনেছিস তা?"

"না ঠাকুমা, আমি তা জানি না। বাস্তু পুজোর সময় তিলের নাড়ু করে এক হাঁড়ি সরিয়ে রাখা হয়েছিল রটন্তীর জন্যে। এবার বোধ হয় তিলের নাড়ু হবে না।

তরু তাতিয়া ওঠে, "হবে না কেন, খুব হোক, রাতদিন তোমরা খটর খটর করতে থাকগে ঐ ঘরের ভেতর। ফণিরাম ঠাকুর চিঠি দিয়েছে, সেও আসছে।

বাবা মাকে বলেছেন রুচিরামকে দিয়েই তোমরা নিয়মের কাজ, দুধের সেবা করিয়ে নিও। ও জগন্নাথদেবের ভোগ-রাঁধুনী ছিল, ভাল বামুন। মা তাতে রাজী হয়েছেন। ঐ করুক গে সব, তোমার তাড়াহুড়ো করে নাইবার কি দরকার? আমিও তোমার সঙ্গে নাইতে যাচ্ছি। একবার খবর নিয়ে আসি বাদশা বেগম সাহেব বিবি জলে ভিজচে কোথায় বসে।"

তরু মাথাল মাথায় দিয়া উঠিয়া গেল তাহার পোষ্যদের সন্ধানে। বিনু দাঁড়াইল পেছনের বাতায়নে।

বিনুর গৃহের পশ্চাতে ছোট-খাট এক ফলের বাগান, ফল-বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে ফুলের গাছও আছে, কত ফুল ফোটে। বাছা বাছা কয়েকটা কলমের আমগাছ মনোরমা লাগাইয়াছেন অন্দরের সীমায়। দূরে-নিকটে কত ফলের বাগান রহিয়াছে রায়বাড়ীর। কিন্তু সেদিকে ঘেঁষিতে পারে না অন্তঃপুরীকারা। অথচ ঝড়ের সময় আম কুড়াইবার সুপ্ত বাসনা সকলের হৃদয়ে জাগরিত হইয়া থাকে।

বিনু ধারাস্নাত ফলবতী বৃক্ষগুলির দিকে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল। শীতে ক্লিষ্ট ধূলায় ধূসরিত তরুশ্রেণী বারিধৌত হইয়া সজীব হইয়া উঠিয়াছে। আমের মুকুলে ভরিয়া গিয়াছে আম্রশাখা। প্রতি ফুলগাছে কলিকার সমাবেশ হইয়াছে। বসন্ত যে জাগ্রত দ্বারে এ বারতা কাননে কুঞ্জে ঘোষিত হইয়াছে। ডালিম গাছের ফাঁকে ও আবার কাহাকে দেখা যাইতেছে? বসন্তের দূত পিকরাজ কখন আসিয়া উপস্থিত? এখনও শীত বিদায় লয় নাই, মাঘ মাস নিঃশেষ হয় নাই, কিন্তু দিকে দিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ঋতুরাজের আসন্ন আগমনগীতি। গীত কোথায়, কোকিল ত নীরব, উহার প্রিয় সঙ্গীটি নিকটে না আসিলে কোকিল কণ্ঠের সুধার উৎস খুলিয়া যাইবে না। সে এখনও আসিতেছে না কেন? বুলবুলি ঘুঘু শালিক টুনি পাখীরা বাদলধারা উপেক্ষা করিয়া সকলে সমবেত হইয়া জটলা করিতেছে। একজনা যখন আসিয়াছে তখন তাহার সঙ্গী-সাথীদের আসিবার আর বিলম্ব নাই।

বিনুর এত কাছে থাকিয়া কোকিল ডাকিবে কুহু কুহু তানে, ভাবিতে পুলকে তাহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। উদাস মন উধাও হইয়া গেল নিজের অজ্ঞাতসারে কানন-ঘেরা এক পল্লী কুটিরে। ঠাকুরদার স্নেহ প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল, ঠাকুমার মমতা-মাখা প্রসন্ন মুখচ্ছবি, মা'র প্রফুল্ল পঙ্কজ-তুল্য করুণার

প্রতিমূর্ত্তি। তটিনীর কলকল্লোলিত তটভূমি। বাদল ঝরিয়া পড়িতেছে হীরাসাগরের জলে টুপ টুপ করিয়া। বিন্নু কোমরজলে দাঁড়াইয়া ঝাঁপরি খেলিতেছে সখী-পরিবেষ্টিতা হইয়া।

চঞ্চল চিত্ত এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। তাহার গতি বিভিন্ন দিকে।

কোলাহলে মুখরিত নগর, সেজ ঠাকুরদা তানপুরা-সংযোগে মেঘমল্লার গাহিতেছেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু চন্দ্র দাদু (উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়) সস্নেহে ডাকিতেছেন, "বিন্নু দিদিমণি, এই দিকে একটু এসো না ভাই, তোমাকে সেতার বাজনা শিখিয়ে দেই ?"

বিন্নু পলায়ন করিয়া আসিল বাবার কাছে।

জ্ঞানে মহিমায় উজ্জ্বল নেত্র আনত করিয়া বাবা পুস্তকের রাজ্যে বিচরণ করিতেছেন। বিন্নুর পদশব্দে চোখ তুলিয়া বাবা বলেন, "কি বিন্নু, আয় কিছু বলবি ?"

"না বাবা।" উত্তর দিয়া বিন্নু ছোটে দিদিদের মহলে। সেখানে আলাপ-আলোচনার খরস্রোত প্রবাহিত। দিদিরা বিন্নুদের লইয়া আজ যাইবেন থিয়েটারে। জনার টিকিট কেনা হইয়াছে। জনা তারাসুন্দরী, গিরিশ ঘোষ প্রবীর।

বিন্নুর চিরপরিচিত স্বজনদের মধ্যে ও আবার কে উঁকি-ঝুঁকি দেয়— যাহার কোঁকড়া চুল পদ্মদলের মতন আঁখি-পল্লব, বলিষ্ঠ গঠন।

৩৬

"বৌমা, আইজ তোমাগো হইচে কি ? বাগিচায় তাকাইয়া সাপ দেখিচো, না ব্যাঙ দেখিচো ? নাওন-ধোওন নাই ? ব্যালা না দুকুর হইয়া গেইচে ? নিয়মের কাজ নাই ?"

বিন্নু সচমকে আকাশ হইতে যেন মাটিতে ধপ করিয়া পড়িল। সত্যি ত সে এখানে দাঁড়াইয়া দিবা-স্বপ্নে বিভোর হইয়া রহিয়াছে কেন ? তাহার এ স্বভাব যাইয়াও যায় না। কল্পনার নীলাকাশে মেঘের তরণী বাহিয়া কত বছর কাটিয়া গেল তাহার আকাশ কুসুম চয়নে। না হইল লেখাপড়া শিক্ষা, না হইল গৃহকর্ম্মের নিপুণতা।

বিন্নু ত্রস্তে ঘাড় ফিরাইয়া অপরাধীর মত বিনয়ে বলিল, "তরু নাইতে যাবে

বলেছিল, আমি তরুর জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তা ছাড়া কচিরাম ঠাকুর গুড় জ্বাল দিয়ে দেবে শুনেছিলাম, তাই দেরি করছি।"

"হ, রায়বাড়ীর ঠাকরোনরা 'যত পায় তত চায়', পাঁচডা কচিরামকে জড়ো করিলেও তোমাগো 'সরগে যাইয়া ধান ভানিতে' হইবে। আইস বৌমা, আমাগো সনে বইসো, তোমারে ত্যাল মাথায়ে দিইচি। তরুর আশা ছাড়ি দাও। একডা বিলাই ছায়ের গলার ঘুমুর ছিড়্যা গেইছে তাই গাঁথিতে নাগিছে।"

বিনু নিঃশব্দে তেলের বাটি লইয়া বসিল কামিনীর মা'র কোলের কাছে। আজকাল অধিকাংশ দিন কামিনীর মা বিনুর স্নানের পূর্ব্বে মাথায় তেল দিয়া দেয়, বৈকালে চুল বাঁধিয়া দেয়। তরুও সখ করিয়া এক একদিন বিনুর চুল বাঁধে। পাড়ায় কাহারও নূতন ঢংএর খোঁপা বাঁধা দেখিয়া আসিলে তাহার প্রচেষ্টা করে বিনুর কবরী রচনায়। ফলে বিনুর উলু খড়ের অরণ্যে আর জট পাকাইবার অবকাশ পায় না।

গত সন্ধ্যায় তরুর বহু যত্নে বহু আয়াসে রচিত সাতগুছির বিনুনি খুলিতে খুলিতে কামিনীর মা বলে, "বৌমা, আইজ এতক্ষণেও তুমি পুঁথি নইয়া বইস নাই যে? সারা দিন এত পুঁথি পড়ি তোমাগো কোন্ সুখ হয়? ওয়ার মধ্যে কি রসের সমুদ্দুর তুমি পাইয়াছ? উয়া তোমাগো রামায়ণ-মহাভারত নয়, তা আমি চিনি, সে হইলগে মোটা মোটা। রামায়ণ-মহাভারত কত শুনিচি, কিন্তুক তোমাগো এত পুঁথি-পত্তর একদিনও শুনি নাই। পইড়া আমারে শুনাইবা বৌমা? কত রাম-সীতা রাধকেষ্ট রইচে তোমাগো পুঁথির মধ্যি। ফুলদা কর্ত্তার ঘর থাকি এই বই আনিচে, এই লইছে। কি রইচে ওয়াতে, তোমাগো নেশা ধরাইয়া দিইচে। এবার আমারে একটু শুনাইয়া দিবা?"

কামিনীর মা মিছা বলে নাই, সত্যই বিনুর বই পড়িবার নিদারুণ নেশা ধরিয়াছে। ভাল হোক মন্দ হোক যে পুস্তকের মধ্যে বিনু গল্পাংশের গন্ধ পায় সেই বই গোগ্রাসে গিলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ক্ষিতি পিতার গ্রন্থাগার হইতে নিত্য নূতন পুস্তকের যোগান দিতেছে।

বিনু সংসারের কাজের ফাঁকে বই পড়ে, উল বোনে। হাতের লেখার নম্বরী খাতাগুলো হিজিবিজি লেখায় ভরিয়া গিয়াছে। বোনাও অগ্রসর হইয়াছে অনেকটা। স্বামীর জন্য বিনু মোজা শেষ করিয়া মাফলার ধরিয়াছে। ইহার পরে সোয়েটার। কিন্তু সোয়েটার শেষ হইয়া গেলে তখন কি করিবে? যাহার চিত্তবিনোদনের আশায় এত আয়োজন, তখনও কি সে আসিবে না?

বসন্তের কি অবসান হইয়া যাইবে? ফুল ফোটা ও পাখী ডাকার মধুরতা কি আর মিশিয়া থাকিবে না ভুবনে? থাকিবে বইকি—সে যখনই ফিরিবে তখনই বসন্ত জাগিবে বিনুর হৃদয়ে। বিশ্বের বিহগকুল একত্রিত হইয়া অবিরাম স্বরের ধারায় জগৎ প্লাবিত করিয়া দিবে। কানন কুন্তলা বনশ্রী ভরিয়া যাইবে কুসুম ভূষণে। পুষ্পপরিমল গায়ে মাখিয়া বিনুর চিত্তের জ্বালা জুড়াইয়া দিবে দক্ষিণা সমীরণ।

বিনুর তেল মাখা হইয়া গিয়াছিল, অনেকক্ষণ পর আনমনা বিনু মুখ তুলিয়া কহিল, "আমি যে বই পড়ি, তা শুনতে কি তোমার ভাল লাগবে মাসী? তাতে তোমার ঠাকুর-দেবতার নাম-গন্ধও নেই। তবু যদি শুনতে চাও, আমি শোনাব তোমাকে।"

কচিরাম মোয়া-মুড়কির গুড় জ্বাল দিতেছিল, গুড়ের গন্ধে ভরিয়া গিয়াছিল চারিদিক। কর্ত্তব্যপরায়ণা কামিনীর মা ফুটন্ত গুড়ের ঘ্রাণে সচকিত হইয়া তাড়া দিল, "পুঁথি-পত্তরের কতা পরে কইবা বৌমা, ওদিকে গুড় হওনের গন্ধ পাইচি। চলো, তোমারে চট করি পুকুর থেইকা চুবায়ে আনি ঢুকাইয়া দেই গুড়ের কাছে। দেরি হইলে ফের পাঁচকতা শুনিতে হইবে। ছুতা পাইলে তোমাগো মাজান ননদ ছাড়ি কতা কইবে না।"

বিনু স্নান করিতে গেল, বাদলধারা তখন মন্দীভূত।

ঠাকুমার অনুমান মিথ্যা নয়। দুই দিন ধারাবর্ষণ করিয়া আকাশ রৌদ্রকিরণে হাসিতে লাগিল। কিন্তু শেষ বিদায় লইবার সময় শীত মরণ কামড় দিতে ভুল করিল না, কি প্রচণ্ড শীত। উত্তরে বাতাসের সহিত আসন্ন বসন্তের উতলা বাতাস মিতালি করিয়া বনবনান্তরে গুঞ্জন তুলিল, ঝরঝর খরখর ফিসফাস। ধূলি-বিদূরিত তরুপল্লব শ্যামল চিকন শোভায় মণ্ডিত হইয়া ঘন ঘন শির সঞ্চালন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে শিহরণ তুলিতেছিল। কোকিল ডালিম বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, আশ্রয় লইয়াছে রায়বাড়ীর পুকুর-পাড়ের বিশাল বকুল শাখায়। তাহার সঙ্গী-সাথীরা আসিয়া জুটিয়াছে, তাই পঞ্চম স্বরের লহরী বহিতেছে ভুবনে কুহু কুহু কুউ কুউ।

ধীর মন্থর গতিতে রায়বাড়ীর রটন্তী চতুর্দ্দশী আগত। দেউরিরা কালী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। বরাভয়-দায়িনী দক্ষিণা কালী আসনে স্থাপিত হইয়া বিশ্বে অভয় বিতরণ করিয়া প্রসন্ন হাসি হাসিতেছেন।

এক রাতের কালীপূজা, তাহা লইয়া ঠাকুমাকে তেমন মাথা ঘামাইতে হইতেছে না। কারণ কয়েকমাস পূর্ব্বেই দীপান্বিতা হইয়া গিয়াছে। এ তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সেই ননদ-ভাজের গ্রাম্য রহস্যালাপ যেন "সবই তোর দাদার মত, ঘণ্টা বাজান বেশীর ভাগ।"

তবু কিছু প্রভেদ আছে, দীপান্বিতা পূজা হয় ঘরে ঘরে। এ গ্রামে রটন্তী এই একখানি মাত্র। গাঁয়ের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহা ভিন্ন যাহাদের বরাদ্দ তাহারা ত আছেই। রটন্তীতে জোড়া পাঁঠা বলি, পাঁঠার লোভে গ্রাম ঝাঁটাইয়া ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যরাত্রে প্রসাদ ভক্ষণ করিতে আসিয়া উপস্থিত হন। জোড়া পাঁঠার অতিরিক্ত আর একজোড়া বলি দিবার প্রথা থাকিলে রায়কর্ত্তা তাহাতে বিরত থাকিতেন না। কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নিয়মভঙ্গ করিতে কে সাহসী হইবে। সেইজন্য রটন্তীর পাঁঠা আনা হয় বৃহৎ, বড় বড় শিংওয়ালা চাপ দাড়ি-সম্বলিত।

পাঁঠার দিকে চাহিয়া ঠাকুমার গায়ে কাঁটা দেয়। এ কি পাঁঠা, না মহিষের বাচ্চা। প্রৌঢ় বয়স্ক ঠাকুমার পুত্রকে কুলপ্রথা বজায় রাখিয়া, বলি দিতে হইবে। তাঁহার আদরের নাতির ওপরে তিনি না রাগিয়া থাকিতে পারেন না। রায় বংশের ঐতিহ্য কুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া উনি হইয়াছেন বড় পড়ুয়া। এক রাতের জন্যও বাড়ী আসিয়া বলির খাঁড়া হাতে লইতে পারিলেন না। লোক দেখাইয়া ডন বৈঠক দেয়, মুগুর ভাঁজে, 'কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা' যত সব কলির ছেলে। মুখে মধুর বুলি 'ঠাকুমা, ঠাকুমা।' কথায় 'চিড়া ভিজানর ওস্তাদ।'

ঠাকুমা শুধু পাঁঠার প্রতি তাকাইয়া অপ্রসন্ন হন না। আকাশ যেন তাঁহার সহিত বাদ সাধিতেছে। ফুটফুটে রোদের মধ্যে হালকা মেঘ সময় সময় ভাসিয়া বেড়ায়। আবার যদি বাদল নামে তাহা হইলে ঘুটঘুটে অন্ধকার চতুর্দ্দশীর গভীর নিশীথে তাঁহার মহেশ জোড়া পাঁঠার শিরচ্ছেদন করিবে কিরূপে? বৃষ্টির জলে আঙ্গিনায় পোঁতা হাড়িকাঠের গোড়া আলগা হইতে পারে। এ যে ছোটখাটো পাঁঠা নয় মোষের বাচ্চা।

ঠাকুমা ছেলেমানুষের মত উর্দ্ধে চাহিয়া আপন মনে বিড় বিড় করেন, "কচুর পাতা করমজা মেঘখান উড়ে যা"।

মেঘ উড়িয়া যায়, নীল নভোনীলে দিবাকর প্রখর কিরণ বিকীরণ করিয়া বৃদ্ধার চিন্তাজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।

রটন্তী পূজার দিন মধ্যাহ্নে মধুমতী আসিল শ্বশুরালয় হইতে। সে সর্ব্বসিদ্ধ ত্রয়োদশীতে শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিল।

নাতনীদের পছন্দ না করিলেও ঠাকুমা মধুমতীর প্রতি সদয় ছিলেন। তাঁহার নাতনীদের মধ্যে এইটিই মধুরভাষিণী।

ঠাকুমা বারেক মধুমতীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "একেই ধলির ধলা গা, তাতে ধলি পুতের মা'। তোর শরীর ভাল না, শুনেই আমার বোঝা হয়েছিল মাস্থি, তোর ঠেঙ্গে সোনার চাঁদ এসেছে। বেশি লাফ-ঝাঁপ ধিঙ্গিপনা করিস নে, কাঁচা পোয়াতিকে সাবধানে চলা-ফেরা করতে হয়। তোর এত লজ্জার কি হয়েছে মাস্থি? মেয়েমানুষের মা হওয়া গরবের কথা। ভালি আমার মাথা কুটে মরেচে, তবু মা-ষষ্ঠী তার দিকে মুখ তুলে চাইছেন না।"

ঠাকুমার বিশদ আলোচনার মধ্য হইতে মধুমতী লজ্জায় সরিয়া গেল।

আবার রায়বাড়ী কর্ম্মের নাগরদোলায় দুলিতেছে। "একে মনসা তায় ধোঁয়ার গন্ধ"। মনোরমা উপবাসী থাকিয়া ভোগ চড়াইয়া দিয়াছেন। বিনু জল না খাইয়া শাশুড়ীকে রান্নার সাহায্য করিতেছে। বিনু রাশিকৃত কচুর শাক সেদ্ধ করিয়া নামাইয়াছে। দুই বৃহৎ ডেকচিতে দুই জাতের ডাল তুলিয়া দিয়াছে। পিতলের প্রকাণ্ড কড়াতে পায়সের দুধ বসাইয়া দিয়া ঘন ঘন হাতা চালাইতেছে।

মনোরমা সস্নেহে তাড়া দিতেছেন, "তুমি এখন বেরিয়ে যাও বৌমা, জল খাওগে। তুমি আমার ঢের রান্না এগিয়ে দিয়েছ, গোকুল পিঠে, কলার বড়া করেছ। আটভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন ধীরে-সুস্থে রান্না করি। ভোগ সরবে রাত দুপুরে, শীতের দিনের ভোগ আগে-ভাগে রেঁধে রাখা যাবে। তুমি এবার বেরিয়ে যাও, আগে জল খেয়ে নিয়ে ওদিকের খবর নাওগে। আজ মাধু এল, আমি এদিকে আটকা। তার জল খাওয়া, নাওয়া হ'ল কিনা খবর নাওগে। মাধুর সন্তান সম্ভাবনা, এবার তুমি ওর সঙ্গে কথা কয়ো বৌমা। কখন ওর কি খেতে ইচ্ছে লজ্জায় আমাকে বলবে না, তোমাকে বলবে।"

বিনু গলা-সমান ঘোমটা দিয়া পায়েস নাড়িতেছিল, পায়েস প্রায় হইয়া আসিয়াছে। তাহার ইচ্ছা এটা শেষ করিয়া বাহির হইয়া যায়। জল মুখে দিলে আর ত ভোগ স্পর্শ করিতে পারিবে না। একথা সে কেমন করিয়া শাশুড়ীকে জানাইবে, কথা বলা যে বারণ।

এমন সময় মুস্কিলে আসান করিল তরু আসিয়া।

তরু বলে "ওমা, তোমার বৌকে কি আজ মেরে ফেলবে রটন্তী পূজোর ভোগ রাঁধিয়ে ? রান্নার খুরে খুরে দণ্ডবৎ ?" জল না খেয়ে গলা শুকিয়ে মানুষ মরে যাবে নাকি ? তুমি যখন বুড়ো হবে তখন তোমাদের নিত্যি নিত্যি উপোসী ভোগ রাঁধবে কে ?"

মা মাছের কাঁটা দিয়া লাউঘণ্টা রাঁধিতেছিলেন। বিরাট্ কড়ায় খুন্তি চালাইয়া বলিলেন, "তোর ভাবনা কেন রে তরু ? আমি যখন অশক্ত হব, তখন বৌমা ভোগ রান্না করবে !"

"তোমার বৌমা, অশক্ত হ'লে তখন কি হবে মা ?"

"ক্ষিতির বৌ ভার নেবে, ক্ষিতির পরে মুনু বড় হলে তারও বৌ আসবে। পূর্ব্বপুরুষের নিয়ম-নিষ্ঠা ওরাই বজায় রাখবে।"

"হ্যাঁ, কত রাখবে তাদের দায়ে পড়েছে। তারা ঠাকুর দিয়ে ভোগ রাঁধিয়ে দেবে প্রতিমার সামনে। যাদের হাতে তোমরা খাচ্ছ তাদের হাতে তোমাদের দেবতা খাবে না কেন ? তোমরা মানুষ, মণিরাম কচিরাম কি মানুষ নয় ? জগন্নাথ অতবড় দেবতা, তবে তিনি কেন খান ওদের হাতে ?"

মা উত্তর দিতে মুখ তুলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার উত্তর দেওয়া হইল না। পায়েস প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, মা তাহাতে ঘৃত মধু কর্পূর দিয়া নামাইলেন।

পাথরের কানাতোলা থালা খানাও খোরায় খোরায় ভাগে ভাগে পায়েস তোলা হইল হাতায় করিয়া।

কলার বড়া ও পিঠের থালার পাশে পায়েস সাজাইয়া রাখিয়া মনোরমা বলিলেন, "এবার তুমি জল খেতে যাও বৌমা, আর নয়, অনেক করেছ। দেখ তরু, আমি এদিকে, ওঁরা খেতে বসলে খাবার কাছে তুই কিন্তু থাকিস ? মাধু কোথায়, কি করছে ? ঠাকুর-ভোগ কি এখনও সরে নি ?"

"ভোগ সরাতে গেছে মা, রান্নাঘরেও খাবার জায়গা করা হচ্ছে। মেজদিদির সঙ্গে কচিরাম ওদিকের কাজ গুছিয়ে রাখছে। সেজদি নেয়ে জলখাবার খেয়ে পান গালে দিয়ে গল্প করছে বন্ধুর সাথে। আমি তোমার সব খবর নিয়ে এসেছি মা।"

"তুই লক্ষ্মী মেয়ে তরু ; মাধু কার সঙ্গে গল্প করছে ? কে তার বন্ধু ?"

"ওবাড়ীর লবঙ্গ পিসী গো, সেজদির খেলার সাথী, প্রাণের বন্ধু। চল বৌদি, তোমাকে খেতে দেইগে।"

বিনু এঁটো হাত ধুইয়া তরুর সহিত বাহির হইয়া আসিল।

৩৭

আবার ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া 'নাক্‌তা পাতার নাক্‌তা পাতার'। পাড়া প্রকম্পিত করিয়া "উলু উলু উলু।" ঠাকুমার মনমরা ঝিমান ভাব ঢাকের বাজনায় অন্তর্হিত হইয়াছে। তিনি মণ্ডপের পেছনের সোপানে আশ্রয় লইয়াছেন। পূজা আরতি বলি ভোগ ও বিসর্জ্জন না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। যতবার ঘণ্টাধ্বনি ততবার উলু। মাঘের শীতল সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি কে এ ভার বহন করিবে, কাহার দায়?

পুরোহিত পূজায় বসিলে বিনুকে লইয়া মধুমতী মাকালীকে প্রণাম করিতে আসিল।

ঠাকুমা ভীত শশঙ্কিত হইলেন, "একি মাধ্যি, তুই প্রতিমার সামনে? তোকে না পই পই ক'রে বারণ ক'রে দিয়েছি, সন্ধ্যের পরে ঘরের বার হবি না? খোঁপায় একটা কাঠি গুঁজে দিয়েছিস ত? কোল আঁচলে গেরো দেওয়া হয়েছে? আবার হাসি হচ্ছে, এসব করতে হয় লো। এটা তোর মেম-সাহেবের যুগ নয়। ইলিশ মাছের ডিমের ওপর যেমন তোদের লোভ থাকে, তেমনি লোভ থাকে মায়ের অনুচর ভূত প্রেতের মানুষের পেটের ডিমে। ছুতো পেলেই তারা হাত বাড়ায়। এ সময় সবাই সাবধানে থাকে, ধেই ধেই করে না। এসেছিস, মাকে দর্শন করলি, প্রণাম করিল এখন যা, বিছানায় শুয়ে থাক গে। ভোগ হ'লে মণিরামরা তোর শোবার ঘরে খাবার দিয়ে আসবে। ঘরের সাথে তোদের নাবার ঘর, জল স্থল সকল রয়েছে, তুই কোন দুঃখে বের হবি? মণিমালা, তুই টহল দেওয়া রেখে মাধ্যির কাছে থাকিস।"

লোকজনের ভিতরে ঠাকুমার হিতোপদেশে মধুমতী লজ্জায় লাল হইয়া তখনই বিনুর সহিত মণ্ডপ পরিত্যাগ করিল।

বিছানায় বসিয়া মধুমতী বিনুর হাত মুঠায় চাপিয়া কহিল, "বৌ, এতদিন তুমি আনকোড়া নতুন ছিলে, আমার সঙ্গে কথা বল নি, এখনও নতুনই আছ, কিন্তু তোমার গায়ে পুরোনোর গন্ধ লেগেছে। এবার তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। আমি পান খেতে কত ভালবাসতাম, এখন পানও যেন কেমন বিস্বাদ লাগে। ওখানে থাকতে খালি মনে হ'ত তোমার হাতের সাজা পান খেলেই বুঝি ভাল লাগবে।"

বিনু দ্বিধা-বিজড়িত স্বরে বলিল, "আমি এক্ষুনি আপনাকে পান সেজে দিচ্ছি ঠাকুরঝি।"

"দাও এক খিলি সেজে, খেয়ে দেখি। শোন বৌ, তোমাকে আর একটা কথা ব'লে রাখি,—আমাকে পান দিতে সুপারির বুকো বাদ দিয়ে সুপারি দিও পানে। সুপারির বুকোয় আমার মাথা ঘোরে।"

বিনু হতবাক্—সে তাহার বয়েসে সুপারির বুকোর নাম শোনে নাই। পাকা লাউ-কুমড়ার বুক বাদ দিয়া কাটিতে হয়, কিন্তু সুপারির—

বধূর হতভম্ব ভাব মধুমতী হৃদয়ঙ্গম করিয়া হাসিল, "তুমি বুঝতে পারলে না, সুপারির মাঝখানটাকে আমি বুকো বলছি। আমাকে পান দিতে মাঝ বাদ দিয়ে চারদিক থেকে চাকা কেটে নিও।"

মধুমতীর নির্দ্দেশে বিনু সুপারির গা কাটিয়া কয়েকটা পান সাজিয়া আনিল।

চারিদিকে পূজাবাড়ীর ব্যস্ত আনাগোনা। রহিয়া রহিয়া ঢাক ঢোল কাঁসী ঝাঁজ বাজিতেছে। তাহার সহিত উলুধ্বনি। ভিতরে-বাহিরে স্থানে স্থানে শীত নিবারণের জন্যে গাছের গুঁড়ির আগুন জলিতেছে দাউ দাউ।

সহসা শাশুড়ীর প্রতি বিনুর মমত্ববোধ জাগিল, অগ্নির উত্তাপে না জানি তাঁহার কত পিপাসা লাগিতেছে। কিন্তু একফোঁটা জল মুখে দিবার উপায় নাই। কতক্ষণে ভোগ সরিবে তবে তিনি জল মুখে ঢালিতে পারিবেন।

বিনু বলে, "ঠাকুরঝি আমি এখন মা'র কাছে যাই, ভোগের কত বাকী দেখে আসি?"

"আমি একটু আগেই দেখে এসেছি বৌ, মা'র সব রান্না হয়ে গেছে, বলি হ'লে মাংস বসবে দুই ডেকচিতে; ভোগের ভাত তখন হবে, আর লুচি। মা'র এখন বয়েস হয়ে যাচ্ছে, এত তাড়ন শরীরে সয় না। দিদি থাকলে এইসব কাজে মা'র অনেকটা সুবিধা হয়। এ বাড়ীতে ঢুকেই যে মা সেই সুরু করে দিয়েছেন তার বিরতি হ'ল না। মা'র বৌ, কালে এখানে ছিলেন বাবার দুই মাসী, পিসী, ছোট ঠাকুমা। তাঁদের কাছেই মা'র হাতেখড়ি, মাসী-পিসীরা মরে গেছে, থাকবার ভেতরে বুড়ী ছোট ঠাকুমা রয়েছেন। তা তিনি এ সংসারে এক দণ্ডও বসে থাকেন না। আমাদের বচন-বাগীশ ঠাকুমা চিরকাল ঐ এক ধরনের। এর পরে মা'র ভার তোমাকেই যে বইতে হবে বৌ, এখন থেকেই তোমাকে তালিম হ'তে হবে।"

"সেই জন্যেই ত আমি আজ মা'র সঙ্গে ভোগ রাঁধতে গিয়েছিলাম, মা

আমাকে বের ক'রে দিলেন। আমি যাই দেখি তিনি কি করছেন? ওদিকটায় কেউ নেই।" বলিয়া বিনু গমনোদ্যত হইল।

মধুমতীর একাকী থাকিতে ভাল লাগিতেছিল না। সে বলিল, "পূজোর সাজ নৈবিদ্য জলপানি সমস্তই ত মণ্ডপে চলে গেছে। সেজদি ঘর আগলে করছে কি?"

"মার ঘরে বসেও ত মালা জপ চলত। উনি হয়েছেন ভিন্ন জগতের লোক, 'একটা স্বরে গাই, পালে না পায় ঠাঁই।' ধরন, ধারন স্বাভাবিক নয়।"

নিমন্ত্রিতদের জন্ম বাহির মহলে পান সাজা হইতেছিল। কামিনীর মা আসিল কর্ত্তা-গৃহিণীর পান সাজিতে, তাহাকে মধুমতীর কাছে রাখিয়া বিনু বাহির হইল।

যথাসময় বলি হইল, এক জোড়া লম্বা দাড়িওয়ালা রামছাগলের বিনাশে ঠাকুমার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি নিশ্চিত হইয়া কারণে-অকারণে উলু দিতে লাগিলেন।

গভীর রজনীতে মহামায়ার মহা-প্রসাদের লোভে গ্রাম ঝাঁটাইয়া ব্রাহ্মণরা আসিলেন ভোজনে। ব্রাহ্মণদের পরে মণ্ডপের আঙ্গিনা ভরিয়া বসিয়া গেল সাধারণ ইতর শ্রেণীর দল। তাহাদের পরে বাড়ীর সকলে যখন আহারে বসিল তখন পূব আকাশ ফরসা হইয়া গিয়াছে, কাক ভূমে নামে নাই, তরুশাখে ডাকিতেছে কা কা। এক বছরের মতন ইতি হইল রটন্তী চতুর্দ্দশী পূজা।

৩৮

আম্রশাখা অজস্র মুকুলের ভারে নমিত হইয়া পড়িতেছে। সকলে আশা করিতেছে এবার আম হইবে প্রচুর। গত বছর আম ভাল ফলে নাই। আগের বছর কম হইলে পরের বছর ফলন হয় বেশি। বিশেষতঃ বৃষ্টির জল পাইয়া মুকুলের বোঁটা শক্ত হইয়াছে, সতেজ হইয়াছে। আমের মুকুলে মৌমাছিদের আনাগোনা বিরাম-বিহীন। সারাদিন গুনগুন গুনগুন।

কটু-কষায় শাক বর্ণের থোকা থোকা কুল পাতার আড়াল হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তরুর উৎসাহের অন্ত নাই। খাদ্যের প্রতি তাহার প্রচণ্ড লোভ, বিশেষ টকদ্রব্যে। ইহারই মধ্যে সে কাঁচা কুলের সহিত আমের মুকুল ছেঁচিয়া মুখরোচক চাটনি প্রস্তুত করিয়াছিল।

মধুমতীর বর্তমানে টকের উপরে আসক্তি মন্দ হয় নাই। তরুর অখাদ্যের সঙ্গিনী এতকাল একমাত্র বিনুই ছিল, এখন মধুমতী হইয়াছে। বাড়তি লবঙ্গও মধ্যে মধ্যে আসিয়া যোগ দিয়া থাকে। মধুমতীর সহিত লবঙ্গর অখণ্ড বন্ধুত্ব। তাহার বিবাহের দিন ধীরে ধীরে আগাইয়া আসিতেছে, লবঙ্গ সেই কারণে সখী-সম্মিলনে অবহেলা করে না। হাতে তাহার একটা-না-একটা সেলাই লাগিয়া থাকে। বিবাহের বালিসের ওয়াড়ে লবঙ্গ সূচী-শিল্পের নিদর্শন রাখিতেছে। মেয়েটা সেলাই ভাল জানে।

সেদিন মাঘের পড়ন্ত বেলায় মাদুর পাতিয়া সকলে বসিয়াছে। বিনু বুনিতেছে সোয়েটার, লবঙ্গ বিছানার চাদরের চারপাশে পাড় বুনিতেছে। মধুমতী নিষ্কর্ম্মা, শরীর জুত লাগে না। শুধু ঘুম পায়, আলস্য বোধ হয়।

পাথরের এক বাটি কুলমাখা আঁচলের তলায় লুকাইয়া তরু আসিয়া উপস্থিত।

লবঙ্গ আতঙ্কিত, "তরু একি করেছিস? সরস্বতী পূজোর আগে কুল যে খেতে নেই। আর ক'টা দিনই বা সরস্বতী পূজোর বাকী আছে, তোর যে স্বর সইল না?"

মধুমতী ক্লান্তির হাই তুলিয়া সায় দিল, "তাই ত, কোন্ আক্কেলে তুই সরস্বতী পূজোর আগে কুল মেখে এনেছিস? এমনি ত পাঁচ কলমের বিদ্যা হচ্ছে, তাতে আবার কুল খাওয়া।"

তরু বিনুর সামনে কুলের বাটি সরাইয়া দিয়া খর খর করিয়া ওঠে, "হ্যাঁ, সকলের বিদ্যাই আমার জানা আছে। তোমরা এতদিনে যা শিখেছ আমি এখনই তা শিখেছি। দেখ না ক'দিনেই আমি তোমাদের ছাড়িয়ে যাব। সরস্বতী পূজোয় পাকা কুল দিয়ে তবে কুল খেতে হয়। কাঁচা ফলের আবার বিচার। কাঁচা কুল বাদুরেও খায় না, পাখীতেও ঠোকরায় না, তা খাওয়াতে দোষ কি? "কত শত হদ্দ হ'ল জোনাকী জ্বালায় বাতি"। নাও বৌদি, হাত গুটিয়ে রইলে কেন, খাও? তোমার ত আগেই কুল খাওয়া হয়েছে। দুই বারে দোষ নাই।"

বিনু বোনা রাখিয়া হাত বাড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে আর দুইখানা হস্তও প্রসারিত হইল কুলের বাটিতে।

এমন সময় ঠাকুমা আসিলেন রণে ডঙ্কা দিতে দিতে, "ওলো তন্বি, একি ক্যাতার তোর? তুই জুড়ানকে দিয়ে কাঁচাকুল পাড়িয়ে এনে খাচ্ছিস সরস্বতী

পূজোর আগে? রায়বাড়ীর নিয়ম-কাউন রসাতলে গেল। ক’টা দিনই বা মধ্যে, তাই তোর সবুর সইল না। যা হবার নয়, হওয়া উচিত নয়, তোরা তাই করবি নাকি?”

তরু বলিল, “পাকা কুল খাচ্ছি না, কাঁচা কুলে দোষ নেই ঠাকুমা, তুমি কর্ত্রী থাকতে তোমার ‘রায়বাড়ী’ রসাতলে যাবার ভয় নেই।”

‘তুমি কর্ত্রী’ বড়ই সুমধুর কথা। ঠাকুমা মনে মনে খুসী হইয়া বসিলেন সেইখানে।

মধুমতী এক-থাবলা মাখা কুল মুখে দিয়া চুষিতে চুষিতে বলিল, “আমরা এঁটো করে ফেলেছি, নইলে তোমাকে দিতাম চাখতে। তরু কি সুন্দর মেখেছে। ছেলেমানুষ করে ফেলেছে, তা নিয়ে তুমি মন খারাপ ক’রো না। তুমি থাকতে কিছুই রসাতলে যাবে না। “নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছ তুমি, বাঁশী কেন ডাকে রাধা রাধা।”

লবঙ্গ খিল খিল শব্দে হাসে “আপনিই না সারাদিন বলেন “আঁতুড়ে নিয়ম নাস্তি” মধুর আঁতুড়ের অবস্থা, এখন সকলের সঙ্গে কুল খাওয়া আপনাকে মেনে নিতে হবে।”

ঠাকুমা লবঙ্গকে কোন কালেই পছন্দ করিতেন না, উহার সবজান্তা ভাব ও খল খল হাসির জন্য। “যে মেয়ের খল খল হাসি সে হয় সর্ব্বনাশী” কিন্তু আজ তিনি তাহার প্রতি প্রসন্ন হ’লেন ‘আপনাকে মেনে নিতে হবে’ শব্দটা মন্দ নয় শুনতে।

ঠাকুমা একগাল হাসিলেন, “আমার মানা কি তোরা আর মানবি লো লঙ্গ? তোরা যে সকলি ভেঙ্গে-চুরে তছনছ করে দিলি। কলি কাল ঘোর কলি, কলি না হ’লে তুই রায়গোষ্ঠীর মেয়ে হয়ে ইংরাজি বই পড়িস। নিজের বিয়ের সেলাই-ফোঁড়াই নিজে করিস, ভগবান কলির কল্কি অবতার হয়ে ক’য়ে গেছেন ‘কলিকালের মেয়ে মন্দ, পুরুষ হবে মেয়ের হন্দ।’ তার বাকী আর কয় দিন?”

লবঙ্গ লজ্জায় মাথা হেঁট করিল।

ঠাকুমার মুখে কিছুই বাধে না, এক্ষুনি হয়ত লবঙ্গকে কি বলিতে কি বলিয়া বসিবেন। সেই আশঙ্কায় মধুমতী এ প্রসঙ্গ এড়াইতে কহিল, “ঠাকুমা, তুমি কি শোন নি, তোমার ছোট নাতির যে সরস্বতী পূজোয় হাতেখড়ি হবে। কই, তার যোগাড়-যন্তরের কথা ত বলছ না?”

ঠাকুমা সহসা সচকিত হইলেন, সত্যই তিনি ইহার বিন্দু-বিসর্গ জানিতেন না। তাঁহার অজ্ঞাতসারে এত বড় কাণ্ডের অবতারণা হইতেছে। কিন্তু এখানে অরণ্যে রোদন করিয়া কোন লাভ হইবে না। যাহারা প্রকৃত কর্ম্মকর্ত্রী—মা ও মেজ মেয়ে রহিয়াছে যজ্ঞশালায়। কর্ত্তার হুকুমে তাহাদের লেজুর হইয়াছে কচিরাম।

ঘনায়মান সন্ধ্যা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুমা একটা ছুতা ধরিলেন, "মাস্তি, ভরা সন্ধ্যায় তুই এখানে খোলা জায়গায় থাকিস নে, যা উঠে যা, বড় ঘরে। সেখানে লঙ্কে নিয়ে গল্পগাছা করগে। মণিমালা, আজ বুঝি তোর ছানা-ক্ষীরের পাট নাই? বসে রয়েছিস নিশ্চিন্ত-মনে মধুর বাণী শোনবার আশায়? তরু, তোর মাষ্টার আসে না এখন? আমি যাই, ঠাকুর-দেবতার একটু নাম করিগে,—

'আমার—দিন ফুরাল সন্ধ্যা হ'ল যেতে হবে পর পারে
নৌকা বেয়ে এস নেয়ে, ডাকি তোমায় বারে বারে।'

ঠাকুমা উঠিয়া গেলেন সদরে হাতীর সিংহাসনে। সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

শীতের প্রচণ্ড প্রতাপ চলিয়া গিয়াছে। যাহা আছে তাহা যাত্রাদলের ভাঙ্গা আসরে ডুগডুগি বাজনার মতন। ঠাকুমার চিরন্তন আসন অধিকার করিতে এখন কেহ বাধা দেয় না।

ঠাকুমা উপবেশন করিয়াছেন যথাস্থানে। তাঁহার অনতিদূরে ছোট একটা বেতের ডালায় সুপারি লইয়া কামিনীর মা কাটিতেছে কচ কচ। নিকটে কাহাকে পাইলেই ঠাকুমা উৎফুল্ল, তাহার ওপরে রাজেশ্বরী যে, 'সোনায় সোহাগা'।

ঠাকুমা মাথার ঘোমটা কমাইয়া সুরু করিলেন, "হ্যালো রাজেশ্বরী, তোদের শ্রীপঞ্চমী যে আসা-আসা হ'ল, এখনও তার তোড়-জোড় দেখচি না কেন? রায়বাড়ীতে শ্রীপঞ্চমী হয় ঘটে-পটে, প্রতিমে নেই। সরস্বতী পূজোর সঙ্গে আবার লক্ষ্মীজনার্দ্দনের বসন্তযাত্রা আছে। আবীর দিতে হবে ঘটে-পটে, নারায়ণের গায়ে। খাগের কলম-দোয়াত, দোয়াতে কাঁচা দুধ দিতে হবে। পূজোর আসনে কুল দিতে হবে, পূজো হয়ে গেলে সকলে কুল খাবে। আগে খেলে মা সরস্বতী রাগ করেন, বিদ্যা হয় না।"

কামিনীর মা বলে, "এহন কেবা মানিচে ঐসব মাঠান, ঘোলে-অম্বলে এক হইয়া গিইচে। ছিপঞ্চমীর কাজে ত হইচে কাজের ঘরে। যেঁনাদের পূজা তেঁনাদের তাল আছে সেদিকে।"

"শুনছি সেদিন নাকি সুমুর হাতেখড়ি। শ্রীপঞ্চমীতে ওর দাদাদের হাতেখড়ি হয়েছে। হাতেখড়িতে মাটির এক জোড়া নতুন সরা খড়িমাটি লাগবে। নতুন শ্লেট-পেন্সিল, নতুন কাপড়-জামা। পুরোহিত মন্তর পড়িয়ে পূজোর জায়গায় বসে হাতেখড়ি দেবেন। সরস্বতী পূজোয় যত ধুমধাম ইস্কুলে ইস্কুলে। ছেলেরা আগে থেকেই নাচতে লেগেছে তাধিন তাধিন করে। ওরা কারুর গাছে ফল ফুল রাখতে দেবে না। নিজেদের বাড়ীর পূজোয় মন নেই, যত হুল্লোড় ইস্কুলে। দেবদারু গাছে, আমগাছে কি পাতা রাখতে দেবে হতচ্ছাড়ারা। পাতাবাহারের একটা গাছ আস্ত রাখবে না। ভক্তির নামে লবডঙ্কা, খালি হৈ চৈ।"

"বছরকার দিনে ছাওয়ালরা আমোদ-আহ্লাদ করিবে না ত করিবে কেডা? বছর ভরি পুঁথি-পত্তরের বোঝা মাথায় নয়া কাবু হইয়া রইবে। আহা রে, করুক সোরগোল।" বলিতে বলিতে কামিনীর মা কাটা সুপারি লইয়া রাত্রের পান সাজিতে চলিয়া গেল।

ঠাকুমা একাকী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কাহারও কাছে আসিয়া বসিবার নাম গন্ধ নাই। না থাকিলেও তাঁহার বক্তব্য যে এখনও শেষ হয় নাই। তিনি নিয়মের গৃহের দিকে মুখ তুলিয়া আপনার মনে বলিতে লাগিলেন—"শ্রীপঞ্চমীতে লক্ষ্মী নারায়ণ সরস্বতী তিনজনারই পূজো হয়, জলপানি নৈবিদ্য ভোগ সব তিন ভাগে লাগে। নিরামিষ ভোগ-খিচুড়ি ভাজা তরকারি লুচি পায়েস দই সন্দেশ যত খুসী দাও। কিন্তু অন্নভোগ দিতে নাই। দিনমানে নিজেদেরও ভাত-মাছ খেতে নাই। সরস্বতীর আসনে বই দিতে হয়, আর বাদ্যযন্ত্র। উনি লিখন-পড়ন গান-বাজনা খুব ভালবাসেন কি না। ভাল না বেসেই বা করেন কি? যাঁকে স্বামী করেছিলেন তিনি গেলেন লক্ষ্মী-ঠাকরুণের মুঠোয়। সেই দুঃখে উনি বই নিয়ে গানে বাজনায় মত্ত হ'লেন। সেই জন্যে ত লক্ষ্মীসরস্বতী এক জায়গায় বসতি করতে পারেন না। লক্ষ্মী যারে কৃপা করেন সরস্বতী হন তার ওপরে বিমুখ। তবু লোকে তিনজনাকে একসঙ্গে আরাধনা করে।"

রান্নাঘরে রান্না হইয়াছে খাইবার আয়োজন হইতেছিল। নিয়মের ঘরে আলো নির্ব্বাপিত, দ্বারে তালা দেওয়া হইয়াছে।

মধুমতী খাইতে যাইবার সময় বলিল, "একলা বসে আপন মনে বকবক করছ ঠাকুমা, তোমার মাথা যে গরম হয়ে গেল। যাও, শুয়ে পড়, শীত এখনও

যায় নি। এখনও ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেলে তোমার সরস্বতী পূজোয় করতাল বাজাবে কে ?"

ঠাকুমা উঠিলেন, সত্যিই ত বুড়া হাড়ে ঠাণ্ডা সহিতে চায় না। তাঁহার সর্দ্দি-কাশি হইয়া গলা ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীপঞ্চমীতে পাড়া কাঁপাইয়া উলু দিবে কে ?

সুমুকে খুব সুন্দর দেখাইতেছে। তাহার নূতন কল্কা-পাড় ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবী বিন্নু ও তরু শিউলি ফুলের বোঁটার রংএ ছোপাইয়া দিয়াছে। নিজেদেরও জামা-কাপড় ছোপিয়া লইয়াছে।

শরতের শিউলি ফুলে বোঁটা তরু রৌদ্রে শুখাইয়া সঞ্চিত করিয়া বড় বড় মোটা বোতল ভরিয়া তুলিয়া রাখে বাসন্তী পঞ্চমীর জন্য। বাজারের বাসন্তী রংএ কাপড় ছোপাইলে এমন স্নিগ্ধ কোমল মিষ্টি গন্ধ হয় না কাপড়-জামায়।

সুমুকে স্নান করাইয়া সাজাইয়া দিয়াছে বিন্নু। চোখের কোলে কাজল টানা-ললাটে সাদা চন্দনের টিপ। শিউলি বোঁটা রংএর জামা-কাপড়।

পূজান্তে পুরোহিত বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া সুমুর হাতেখড়ি দিলেন। ঠাকুমা আনন্দে গদগদ স্বরে উলু দিতে লাগিলেন। সুমু গর্ব্বিত মুখে গুরুজনদিগকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বাড়ীর সকলে ভক্তিভরে দেবী বাণীর উদ্দেশে ঘটে-পটে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া স্তব পাঠ করিতে লাগিল, "জয় জয় দেবী চরাচর সারে—" মধুমতী অঞ্জলি দিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া একপাশে সরিয়া রহিল। তাহার এই পঞ্চম মাস। সন্তান-সম্ভাবনা পঞ্চম মাস হইলে দেবার্চ্চনার অধিকার থাকে না।

সরস্বতী পূজার পরে রায়বাড়ীর জোড়া ইলিশ মাছ ঘরে লইবার প্রথা আছে। এক গাদা ইলিশ মাছের মধ্য হইতে কামিনীর মা দুইটি নিটোল ইলিশ মাছ বহিয়া আনিয়া রাখিল বিন্নুর নিকটে।

এ অনুষ্ঠান দাসীরা পালন করিতে পারে না। বাড়ীর লোকদেরই করিতে হয়।

কুলার উপরে দুইটি মাছ পাশাপাশি রাখিয়া বিন্নু তাহাদের মাথায় সিঁদুরের কৌটা ও ধান-দুর্ব্বা দিয়া লইয়া গেল রন্ধনশালায়। ঠাকুমা উলু দিলেন।

হারাণী আনিয়া রাখিয়া দিল মাছকোটা বঁটি, এক গামলা জল। বিন্নু রান্নাঘরের বারান্দায় বসিল মাছ কুটিতে। যে মাছ ঘরে নেয় মাছ কুটিয়া

লাউডগা দিয়া তাহাকেই মাছ রান্না করিতে হয়। পরিবেষনে কোন বাধা নাই। সকলেই করিতে পারে।

আহারের পরে মধুমতী বিন্নুকে বলে, "বৌ, কি চমৎকার মাছের ঝোল তুমি রান্না করেছিলে, বাবা খেয়ে মহাসুখী। আমি জানতাম তুমি ভাল রান্না শিখবে, যার হাতের সাজা পান মিঠে হয়, তার রান্না ভাল না হ'য়ে যায় না।"

বিন্নু পুলকিত, একদিন মধুমতীর দাদাও ভাল বলিয়াছিলেন।

৩৯

গাছে গাছে পাকাকুল ঝম ঝম করিতেছে। ছোট মটর কড়াইয়ের আকৃতি-বিশিষ্ট আমগুলি দিনে দিনে বড় হইতেছে। বসন্তের চঞ্চল বাতাস সস্নেহে দোলা দিয়া যায় অপরিণত ফলের থোকায়, নব-কিশলয়ে সজ্জিত তরু-পল্লবে, ফুটন্ত ফুলে ফুলে।

ফাল্গুন আসিয়াছে 'ফাল্গুনে গোবিন্দ দোল ফাগ ছড়াছড়ি।' বাংলা দেশে দুইটি প্রধান সমারোহ শরতে শক্তির উপাসনা। বসন্তে বোষ্টবের ভক্তি মহিমা। শরতে যেমন আকাশে-বাতাসে আশা-উদ্দীপনার সীমা থাকে না, বসন্তে তাহারই শিহরণ জাগে কানন-কান্তারে, পুষ্প-পরিমলে, মানব-হৃদয়ে।

তরু মহাব্যস্ত, কাহাকে রাখিয়া কাহাকে ধরিবে। এদিকে পাকা কুল ওদিকে ক্ষুদে ক্ষুদে আম। দুইটি বস্তুই অতিশয় লোভনীয়।

তরু প্রভাতের দিকে কুলের সেবা সারিয়া অপরাহ্নের জন্যে রাখিয়া দেয় আম্র সাধনা। তাহার প্রিয় বস্তুর অংশীদার মন্দ হয় নাই। বিন্নু, মধুমতী, লবঙ্গ, মেনী।

বসন্তে শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হয়—কবির প্রবাদ-বাণী। শুষ্ক কাষ্ঠ ঠাকুমাও এখন মঞ্জরিত হইয়া উঠিয়াছেন। নাতনীদের রসনাতৃপ্তিকর মুখরোচক খাদ্যের সামনে উপবিষ্ট হইয়া সময় সময় হাত বাড়াইয়া দেন। মানুষ বৃদ্ধ হইলে নাকি শিশুর পর্য্যায়ে যায়, ঠাকুমাও তাহার ব্যতিক্রম নন। তরু নানাবিধ চাটনি তৈরি করিয়া এখন হইতে একটু সরাইয়া রাখে ঠাকুমার জন্যে। হাজার হইলেও তিনি সকলের বড় রায়বাড়ির আদি জননী। তাঁহাকে এঁটো খাইতে দিয়া কে পাতকীর ভাগী হইবে।

ফাল্গুন মাস পড়ায় তরুর সকল কর্ম্মের বড় কর্ম্ম হইয়াছে ইটাকুমুড় পূজা। বিন্নুর পূবের বারান্দার নীচে শিউলি গাছের ছায়ায় ইটাকুমুড় ও কুমড়ী স্থাপন

করিয়াছে। দোল-বেদীর মতন তিন থাকে ছোট একটি মাটির বেদী, বড়টির বামভাগে অপেক্ষাকৃত আরও একটি বেদী, বড় বেদী ইটকুমড়, ছোট ইটা-কুমড়ী। তাহাদের মাথায় পোতা হইয়াছে কুলের ডাল। ইহারা বন দেব-দেবী। প্রভাতে তরু, বেদী নিজের হাতে লেপিয়া তকতকে করে, সাঁজে পূজা।

এ-পূজায় সরস্বতীর সাহায্য লইতে হয় না। ধূপ দীপ জ্বালাইয়া সামান্ত জল মিষ্টি উপকরণ লইয়া তরু পূজা করিতে বসে। এ দেবতার প্রিয় বনফুল, তাই দিন-ভোরে সংগ্রহ হইতে থাকে টকটকে লাল মাদার (শিমুল) ফুল, বাবলা, ভাঁটি পালটা মাদার ঘাসের ফুল।

শিমুলের পত্রবিরল গাছ রাঙ্গা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে। সারাদিন ঝরিয়া পরিতেছে টুপ টুপ করিয়া।

তরুর পূজার স্থানে ঠাকুমা উপস্থিত থাকেন পূজান্তে উলু দিতে। মধুমতী ও বিনু পূজা না হওয়া পর্য্যন্ত সরিয়া যায় না। তরু ভক্তিভরে পূজার মন্ত্র বলে—

'ইটাকুমুড়ের মালো, ভিটা বাঁধি দে
তোমার ছাওয়াল করবে বিয়া বাজনা আনি দে।
বাজনা আনিতে আনিতে পথে পড়ে খ্যায়া,
সেই খ্যায়া তুলি নিল হারেমপুরের ছ্যায়া।
হারেমপুরের ব্যাটাগরে লম্বা লম্বা কোঁচা
দুই গালে দুই ঠোকনা দিয়া বৌ করিল বোঁচা।'

রাশি রাশি ফুলে পূজা হইয়া গেল ? এক রেকাবি বাতাসা ও এক ঘটি জল নিবেদন হইল। এবার প্রণাম—

"এবার যাওরে ঠাকুর খাজ পাচড়া নিয়ে
আরবার আইস ঠাকুর শঙ্খ সিন্দুর নিয়া
এবার যাওরে ঠাকুর আখাল পাখাল নিয়া
আরবার আইস ঠাকুর ধান চাল নিয়া।"

ঠাকুমা উলু দিলেন। সকলে প্রসাদ পাইল। গোটা ফাল্গুন মাস সন্ধ্যায় এই পূজা প্রচলিত। ফাল্গুন সংক্রান্তিতে দ্বিপ্রহরে পায়েস পিঠা দিয়া ভোগ পূজা সমাধানের পরে দেবতার বিসর্জ্জন।

মধুমতী সোপানে হেলিয়া এক মুঠো বাতাসা মুখে পুরিয়া মুরমুর করিয়া

করিয়া চিবাইতেছিল। ঠাকুমা তাহাকে ধমক দিলেন, "ছাঁচতলায় বসেছিস, কেন মাগ্গি, এ-সময় ছাঁচতলায় বসতে নেই, সরে বোস।

'হ্যাদে গো, নন্দরাণি, তোর শ্যামকে কোলে দে,
শ্যামের অঙ্গ পরশ করি জ্বালা জুড়াই রে।"

"কি কথার চোট রে বাবা।" বলিতে বলিতে মধুমতী সেখান হইতে উঠিয়া বিনুকে আড়ালে ডাকিয়া কহিল "দেখ বৌ, তোমাদের সুপারির হাঁড়ি থেকে আমাকে পাঁচটা খাড়া সুপারি বেছে এনে দিতে পার? চ্যাপটা নয়, খাড়া খাড়া হ'বে।"

বিনু কহিল, "খাড়া সুপুরি দিয়ে কি করবেন ঠাকুরঝি, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি।"

"যা করি কাল সকালে দেখ, আমার কাল লাগবে, ধীরে সুখে দিলেই চলবে।"

বিনু চলিয়া গেল, এই অবকাশে প্রসাদকে চিঠি লিখিতে। আজ তাহার চিঠি আসিয়াছে। মধুমতীও বঞ্চিত হয় নাই। তাহাকেও তাহার স্বামী চিঠি দিয়াছে।

পরের দিন মধুমতীর খাড়া সুপারির রহস্য বিনু বুঝিতে পারিল।

একটি পাত্রে সিঁদূরের কৌটা, কয়েকটা পান-সুপারি লইয়া মধুমতী মা'র হাতে দু'টি পান ও একটি সুপারি দিয়া কপালে সিঁদূর পরাইয়া প্রণাম করিল। পরে বিনুকে দিয়া হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। বিনু বয়েসে তাহার ছোট, কিন্তু সম্বন্ধে বড় ভ্রাতৃ-বধূ, মাননীয়া।

বাড়ীর দুই সধবাকে পান-গুয়া দিয়া মধুমতী আর তিনটি সধবাকে পান-গুয়া দিতে চলিয়া গেল লবঙ্গদের বাড়ীতে।

বিনু চুপে চুপে কামিনীর মাকে প্রশ্ন করে, "মাসী এ পান-সুপারি হাতে দেবার মানে কি?"

"এত বড় ম্যায়া, তাও কি জান না বৌমা? ওয়ারে কয় মা মঙ্গল চণ্ডীর নামে খাড়া গুয়া দেওন। তেঁনার নামে মানত করি, কাজ সিদ্ধি হইলে কেউ দেয় পাঁচ এঁয়োর হাতে, কেউ দেয় সাত জনারে। স্বোয়ামির পত্তর আইতে দেরি হওনের নাগি ঠাকুজ্জি মানত করিছেল খাড়া গুয়া। কাল পত্তর আইল তোমাগো পত্তরের সাথে, তাই দিইচে খাড়া গুয়া।"

বিনুর সহসা মনে পড়ল সুবর্ণ দিদিকে। সেইবার, সেই ভূত ছাড়ানো।

স্বামীর চিঠির জন্য কত ব্যাকুলতা। ইহারা সকলে এমন করে কেন? সামান্য চিঠির মধ্যে থাকে কি?

শীতের পরে হঠাৎ গরম পড়িয়াছে, প্রভাত ও সন্ধ্যায় শীতল শিরশিরে ভাব থাকিলেও দ্বিপ্রহরে প্রখর তাপ। আহারাদির পরে মধ্যাহ্নে যে যাহার নিজের গৃহে খানিকটা গড়াইয়া লইতেছে।

বিনু শ্বশুরালয়ে আসিয়া নিজস্ব একখানা নির্জ্জন ঘরের অধিকারিণী হইয়াছে, ইহা তাহার কম সুবিধা নহে। মেঝেয় শীতল পাটি পাতিয়া বিনু অনেক দিন পরে হাতের লেখা লিখিতে বসিয়াছে। তাহার বুনিবার সরঞ্জাম বোনার বাক্সে উঠিয়াছে। স্বামীর জন্য মোজা মাফলার ও সোয়েটার যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহা সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে তাহার বেনারসী শাড়ীর বাক্সে কর্পূরের মালা দিয়া। তাহার দূর-সম্পর্কের এক মাসী পুরী হইতে তাহাকে আনিয়া দিয়াছিলেন দু'টি কর্পূরের মালা।

বিনু খাতায় লিখিতেছে যাহা মনে আসিতেছে। লিখিতে বসিয়াছে বটে, কিন্তু মন তাহার ছুটিয়া যাইতেছে পেছনের বাগানের ভিতরে। সেখানে ছোট ছোট আম ঝুলিতেছে শাখায় শাখায়। নিঝুম বনপ্রান্তে ঝরাপাতা মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়াছে। বিহগ-স্বর বিরত। নিভৃত নীড়ে তাহারা বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। এমন সময় ক্ষিতি আসিয়া ডাকিল "বৌঠান, আমাকে দুটো টাকা দিতে পারেন? বড্ড দরকার। আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

ক্ষিতির আজ ছুটির দিন।

বিনু খাতা হইতে মুখ তুলিল, "কি দরকার তোমার? কি কিনবে?"

"সে এক দুর্লভ জিনিষ বৌঠান, পয়সা দিলেও মেলানো যায় না। গোক্ষরো সাপের মাথার আটালি। ছোট সাদা পাথরের কুচির মতন সাপের মাথায় থাকে।"

"তা দিয়ে কি হয়?"

"তাও জানেন না? সাপের আটালি কাছে থাকলে সে লোকের কোথায়ও হার হয় না। সে মামলায় জিতে যায়, পরীক্ষা দিলে সকলের ওপরে হয়ে পাশ করে।"

বিনু ভাবে তাহার এ হেলা-ফেলার দিন চিরকাল থাকিবে না। সময় আসিলে তাহাকে ফের পড়ার বই পড়িতে হইবে, একজনার নিকটে পরীক্ষা

দিতে হইবে। এমন অমূল্য রতন সংগ্রহ করিয়া কাছে রাখিয়া দিতে পারিলে আর পরীক্ষার ভয় থাকিবে না।

সামান্য দুই টাকার বিনিময়ে এমন অসামান্য বস্তু পাইলে কে ছাড়িতে চাহে ?

বিনু ক্ষিতিকে টাকা দিয়া কহিল, "তুমি দুটো সাপের আঠালু পাবে, আমাকে কিন্তু একটা দিতে হবে। কোথায় সাপ ধরা হয়েছে, কত বড় সাপ ?"

"প্রকাণ্ড গোক্ষরো সাপ বৌঠান, আচার্য্যদের ভাঙ্গা ইটের স্তূপ থেকে দুই সাপুড়ে ধরেছে। এখন নিয়ে যাবে কবরেজ বাড়ীতে বিক্রি করতে। দুই সাপের মাথার আঠালু আমি দু'টকায় নিতে যাচ্ছি। আমার যেটা থাকবে থাকবে দরকারের সময় আপনি সেটা আপনার কাছে রাখবেন। এটাতেই দুজনার চলে যাবে। আর একটা আমার বন্ধু হারাণকে দেব বলেছি। ওরা বড় গরীব, টাকা দিয়ে কিনতে পারে না। ও এবার ক্লাশে উঠতে পারে নি। এই জিনিস পকেটে নিয়ে পরীক্ষা দিলে ফাষ্ট হ'বে আপনি দেখে নেবেন।"

বিনু হাসিল, "শুধু হারাণ কেন, তুমিও ফাষ্ট হবে পরীক্ষায় ?" ক্ষিতি প্রসন্ন হইয়া মহাউৎসাহে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

অলস দ্বিপ্রহরে বিনুর আর লেখার আগ্রহ রহিল না। উদাস হৃদয় উধাও হইল হীরাসাগরের তটবর্ত্তী শ্যামল-সুন্দর এক শান্তির নীড়ে।

সাপুড়েরা দুইটি নূতন মাটির হাঁড়িতে মুখে নূতন সরা চাপা দিয়া দুই বিশালকায় গোক্ষরো সাপ ধরিয়া আনিয়াছে। বিষ-বড়ি তৈরির জন্য ঠাকুরদা উপযুক্ত মূল্য দিয়া খরিদ করিলেন। ভেষজখানার পাশে বিরাট কাঠের চুল্লীতে কত শেকড়-বাকড় গাছ-গাছরা সিদ্ধ হইয়া ঔষধ তৈরি হয়।

চুল্লীর উপরে মাজা-ঘষা ঝকঝকে প্রকাণ্ড তামার ডেকচি বসানো হইল। ডেকচির মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হইল বালতি বালতি দুগ্ধ। সাপুড়েরা আজ এখানে থাকিয়া যাইবে। শ্রীধরের প্রসাদ পাইবে পেট পুরিয়া। বিষ-বড়ি না হওয়া অবধি তাহাদের ছুটি নাই।

তামার ডেকচির মুখে লোহার মোটা তারের জালি ঢাকনা দেওয়া হইল।

ঢাকনার ফাঁক দিয়া সাপুড়েরা বিরাট দুই সাপকে নিক্ষেপ করিল দুধের ভিতরে। তাহার পরে লোহার সরু শিকলে ডেকচির মুখ বাঁধিয়া দেওয়া হইল।

সাপ প্রথমে ভীষণ গর্জ্জন করিল, পরে শান্ত ও প্রফুল্ল, দুগ্ধে অনবরত ডুব দিতে লাগিল, হাঁ করিয়া দুধ খাইতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে দুগ্ধে স্নান দুগ্ধপান বেশিক্ষণ চলিল না। চুল্লীতে কাঠের আগুন জ্বলিতে লাগিল দাউ দাউ।

বিষধরদের সে কি আস্ফালন সে কি গর্জ্জন! জালের উপরে সে কি ছোবল, দাপাদাপি।

বিনু আর দেখিতে পারে নাই, সভয়ে পলায়ন করিয়াছিল মায়ের কাছে। কাঁদিয়া মা'র কোল ভাসাইয়া দিয়াছিল।

মা মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, "যারা জীবের অনিষ্টকারী তাদের জন্যে তোর কান্না কেন বিনু? তুই গেলি কেন ওই সব দেখতে? ওদের মরণে জগতের কত উপকার হবে। ওই বিষ-বড়িতে কত মুমূর্ষু রোগী জীবন ফিরে পাব।"

বিনু তখনকার মত শান্ত হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহার অদৃষ্টে ছিল আরও এক বিপর্য্যয়।

দুধ নূতন বস্ত্রে ছাঁকিয়া চাঁছি করা হইয়াছে। ঘন কালি বর্ণ তাহার রং। সরিষার দানার আকৃতি অসংখ্য বড়ি তৈরি হইয়াছে পাথরের পরাতে। তামার ডেকচি ও কাঠের বৃহৎ খুন্তি জলে ভিজানো হইয়াছে। পুকুরে কিংবা নদীতে এ' পাত্র ডুবাইয়া রাখিবার উপায় নাই। জল বিষাক্ত হইবে, জলচর মরিয়া যাইবে। সাপুড়েরা আগুনে পোড়াইয়া পাত্র পরিষ্কার করিবে।

বিনুদের বাড়ীতে একটি আদরের বিড়াল ছিল, নাম বুধি। বেলা-শেষে বুধি আসিয়া ঢলিয়া পড়িল বিনুর পদতলে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ নীল হইয়া গিয়াছে।

চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গেল, সকলে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু বুধিকে বাঁচানো গেল না। বুধি দুধের গন্ধে লোভাতুর হইয়া কাঠের খুন্তি চাটিয়াছিল। সেই বিনুর প্রথম শোক, হৃদয়ের তীব্র জ্বালা। ইহার পরে ঠাকুরদা আরও সতর্ক, সাবধান হইয়াছিলেন।

ক্ষিতির বর্ণিত সর্প সাপুড়েরা কোথায় লইয়া যাইবে? তাহার ঠাকুরদার কাছে কি?

যেখানেই লইয়া যাক বিনু আর সে-দৃশ্য দেখিতে চায় না। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়, বারে বারে যায় না।

দোলযাত্রার পূর্ব্বে শিব চতুর্দ্দশী ব্রত। পৃথিবীতে শিবের অগণিত ভক্ত। শিবরাত্রি সমাগমে "হর হর মহাদেব, বম্ বম্." জিগিরে কানে তালা লাগিয়া যায়।

দুই ঠাকুমা শিবরাত্রির উপবাস হইতে বিরত হইয়াছেন। শক্তিতে আর কুলায় না বলিয়া ব্রতভঙ্গ করিরাছেন। মনোরমা ও সরস্বতী ত আসল ব্রতী আছেনই, নকল ব্রতী মধুমতী এবার দলভ্রষ্ট হইয়াছে। এ সময় তাহার ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান পালন অ-বিধি। তরু ও বিনু মাকে ধরিয়াছে তাহারা শিবরাত্রির উপবাস করিবে।

মা তরুকে বলেন, "এক দণ্ড কাল যার খাবার বিরাম নাই, সেই ক'রবে দিনরাত উপবাস। এবার বাদ দে, আর একটু বড় হ'লে তখন করিস। বৌমা, তুমিও পারবে না বাপু. উপোস অভ্যাসের দরকার, এমনি হয় না।"

বিনু চুপে চুপে তরুকে বলে, এর আগে সে শিবরাত্রি করিয়াছে, উপোস করিতে সে পারিবে।

সরস্বতী কাছে ছিল, সে ঠোঁট বাঁকাইয়া মন্তব্য পাশ করে—"শিবরাত্রি না করলে কি এমন ভাগ্যি কারোর হয়।" মধুমতী সায় দেয় "যা বলেছ মেজদি, আমাদের বৌয়ের ভাগ্য ভাল, দাদার মতন মহাদেব পেয়েছে।"

সরস্বতী ভ্রাতার প্রতি সদয় নয়, মহাদেবের উপমায় সে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলে, "মহাদেব না নন্দী-ভৃঙ্গি। যেমন দেবা তার তেমনি দেবী।"

কি কথায় কি কথা, মধুমতী ব্যথিত হৃদয়ে বিনু-তরুকে লইয়া সরিয়া আসিয়া বলে, "মেজদির কথায় মনে কিছু ক'রো না বৌ, ওর ধরনই অমনি। দাদাকে দেখতে পারে না, যা-তা বলে দেয়। আমি ভাল করেই জানি, দাদা তোমার শিবপূজোর ফল, সাধনার ধন। মা যখন বারণ করলেন তখন শিবরাত্রি করা এবার ছেড়ে দাও। আসছে বছরে তরু তুমি আমি—তিন জনা মিলে করা যাবে। আর তুমি দিন-রাত উপোস করে পেরে উঠবে না। ওঁরা সারা রাত জাগবেন, পুরোহিত এসে সারা রাত জেগে চার প্রহরে ওঁদের চারবার শিবপূজো করাবেন। কাঁচা দুধ দই মধু ঘি চিনি দিয়ে শিবকে স্নান করিয়ে পূজো। দুইজনার মাটির শিব আটটা গড়ে দিতে হবে। পূজোর সোজা নট-ঘট নাকি? সাজ নৈবিদ্য জলপানি সাজানো, ন্যাদর চাল বানানো। উপোস করে তুমি অত পারবে না।

তরু জিজ্ঞাসা করে, "আচ্ছা সেজদি, শিবরাতের ন্যাদর চাল কি দিয়ে তৈরি হয়?"

"সাতকাণ্ড রামায়ণ শোনার পরে একজনা যেমন জিজ্ঞেস করছিল 'সীতা কার বৌ?' তোরও দেখছি সেই দশা। জন্মকাল থেকে শিবরাতের ন্যাদর চাল খেয়ে বলছিস, 'কি দিয়ে তৈরি হয়?' কি আবার, আতপ চাল ভিজিয়ে আধা-কোটা করে তার ভেতরে দিতে হয় সাদা তিলভাজা আদা, সমস্ত জিনিস আধাকোটা করে তা মাখতে হয় গুড় দিয়ে, একরত্তি কর্পূর ছিটিয়ে। শিবের প্রিয় খাদ্য, তাই শিবরাতে জলপানিতে দিয়ে তাঁর ভক্তেরা প্রসাদ পায়।"

শিবরাত্রি সম্বন্ধে গৌরচন্দ্রিকার দুই দিন পরে শিবরাত্রি সমাধা হইল। সংযম পূজা পারণ ব্রত কথা শ্রবণ এবং ব্রাহ্মণ ভোজন সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইল।

শিব চতুর্দ্দশীর পর হইতে ধীর মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল দোল যাত্রার আয়োজন।

দুর্গোৎসবের মত দোলযাত্রা অত সমারোহ না হইলেও ছোট নয়। রায়বাড়ীর দোলে বহু লোক নারায়ণের প্রসাদ পাইয়া থাকে। হোলির উৎসবে অনেকে যোগ দিয়া থাকে।

ইহাদের দেব দোলের পরে গোঁসাইদের শ্যাম রায়ের পঞ্চম দোল।

কালো কষ্টি পাথরের গঠিত শ্যামরায়ের বৃহৎ মনোহর মূর্ত্তি। দ্বিভূজে মুরলী বাদন করিতেছেন। চূড়ায় শিখিপাখা। গলায় সোনার কণ্ঠমালা দুই-বাহুমূলে বলয়। পায়ে রূপার নূপুর। রূপার আঁখি-যুগল ঝকঝক করিতেছে, তাহার মধ্যস্থলে নীল প্রস্তরের দুইটি নয়নতারা। এ সম্পদ্ শ্যাম রায়ের ভক্তদের দান।

গোঁসাইদের ব্যবসা গুরুগিরি যজন যাজন। শ্যাম রায়ের কৃপায় এবং মহিমার খ্যাতিতে গোঁসাইবাড়ী একদা সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের মূল শিথিল হওয়াতে অধুনা শ্যাম রায়ের পসার প্রতিপত্তি অনেকটা খর্ব্ব হইলেও এখনও দোলযাত্রার মহোৎসব হয়। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য লইয়া দোকানীরা শ্যাম রায়ের প্রাঙ্গণে মেলা বসাইতে আসে। নাগরদোলা আসে। যাত্রা কীর্ত্তন কবি আউল-বাউলের আসর বসিয়া যায়। দেব দোলের সময় হইতেই মেলার সূচনা। মেলা

জমিয়া ওঠে শ্যাম রায়ের পঞ্চম দোল কেন্দ্র করিয়া। মেলা দেখিতে আসে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরের অধিবাসীরা।

বাল্যকালে শ্যামরায়ের মেলায় বিনুরা কতবার আসিয়াছে। গরুর গাড়ী পথের বাঁকে রাখিয়া রায়বাড়ীর নীচের গলিপথে পদব্রজে মেলায় গিয়াছে।

নববধূ বেশে রায়বাড়ীতে প্রথম পদক্ষেপ করিয়া বিনুর মনে হইয়াছিল এগৃহ যেন তাহার দেখা, চেনা। তখন রায়-ভবনের প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রকাণ্ড সিংহ-দরজার দুই পাশে দুইটি ঝাঁকড়া পাতাবাহারের গাছ। সিংহ দরজার গায়ে দোলায়মান পিতলের দুইটি বড় বড় পাখীর পিঞ্জর। একটা শুভ্রবর্ণের এক কাকাতুয়া, অন্যটায় নীলকান্তমণি এক ময়না। তাহারা কথা শিখিয়াছিল। পথিককে দেখামাত্র ডাকিত, "আয়রে আয়, আয়রে আয়।"

মেলায় যাওয়া-আসার সময় বিনুর কতবার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে গোল বারান্দার আঙ্গিনায় একটি কিশোরকে সাইকেল-চালনা শিক্ষা করিতে। তখন কে জানিত যে এই প্রসাদ।

তখন কে জানিত যে বালিকা গলিপথের ধূলায় পদচিহ্ন আঁকিয়া মেলায় চলিয়াছে তাহারই ভাগ্য-সূত্রের সহিত রায়-পরিবারের ভাগ্য সূত্র একত্রে গাঁথা হইয়া যাইবে। সেই বুদ্ধিহীনা শিক্ষাহীনা ছোট মেয়েটি একদিন তাহার অক্ষম দুর্ব্বল লেখনীতে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইবে রায়-বংশের অকথিত কাহিনী। কাল অসম্ভবকে সম্ভব করে, যুগ-যুগান্তের কল্পকল্পান্তরের পার হইতে অব্যক্ত বারতা টানিয়া আনিয়া ব্যক্ত করে।

৪০

রায়বাড়ীতে দোলযাত্রার যোগাড় চলিতেছে। সেই ধান ভানা, মোয়া মুড়কি, চিড়া-কোটা, মুড়ি-ভাজা। তিলের নাড়ু ঝাঁকাখানেক নারিকেল।

ঠাকুমা চারিদিকে তদারক করিয়া সকলের বিরক্তিভাজন হইয়া নিজেও বিরক্ত হইতেছেন।

কামিনীর মা সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার মুখপাত্র, তাহার উপরে আক্রমণটা বেশি।

ভোগের আতপ চাল সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, ঠাকুমার বিশ্বাস সে চাল প্রচুর নহে। একটা বড় ডোলের এক ডোল চাল দিয়া ইহারা দোল নির্ব্বাহ দিবে, ইহা কি সম্ভব? আসলে প্রকৃত ব্যাপার হইল তিনদিনের, দোলের অধিবাসের রাতে কুঁড়ে পুড়িবে। বাদ্যকরেরা আসিবে, পুরোহিত

খাইবেনই। যাহারা কাজের ব্যাগার খাটিতেছে, তাহারা সকলে বসিয়া যাইবে পাতা পাতিয়া।

দোলের দিন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ বোষ্টম নিমন্ত্রিত হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীরাও বাদ যাইবে না। তাহার পরে সাধারণ কামার-কুমারের দল ত আছেই। মধ্যাহ্ন হইতে রাত অবধি সমানতালে চলিতে থাকিবে পাতা পারা, পাতা ফেলা। পরের দিন ভাঙ্গা দোল, তাহাতেও খাবার লোক কম হয় না। বিশেষতঃ শোনা যাইতেছে বৃন্দাবনের বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়িকা তাহার দলবল লইয়া আসিবে দোলের পরের দিন ভাঙ্গাদোলে কীর্ত্তন গাহিতে। তাহার ইচ্ছা ছিল দোলের রাতে সবাইকে হরিনাম শোনাইতে কিন্তু মধুমতীরা ব্যবস্থা দিয়াছে দোলের পরের দিন। দোলের রাতে বাড়ীর মেয়েরা ভাল শুনিবার স্থযোগ পাইবে না। ভোগ পরিবেশন, ভোগ বণ্টনে রাত দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইবে।

প্রভাত হইতে বকিয়া-ঝকিয়া ঠাকুমা ক্লান্ত হইয়া বসিলেন পূবের বারান্দায়। বেলা মন্দ হয় নাই। ধান-ভানুনীরা পুরাদমে সিদ্ধধানের চাল করিতেছে। পসারী পাড়ে বসিয়া ধান উল্টাইয়া দিতেছে। কামিনীর মা এক পাশে বসিয়াছে ভোগের ধামাখানেক মটরের ডাল বাছিতে। তাহার অনতিদূরে বিন্দু মধুমতীর মাথায় তেল বসাইয়া দিতেছে। মধুমতী মাথা নাকি গরম বোধ হইতেছে।

একান্তে ইহাদের সমাবেশে ঠাকুমার হৃদয়ের বিরক্তির মেঘরেখা নিমিষে মিলাইয়া গেল।

ঠাকুমা তোয়াজের স্বরে কহিলেন, "শোন লো রাজেশ্বরী, তোরে এক ডোল আলো চালের কথা কইতে গেলাম, তাতে তুই ব্যাজার হ'লি। নরণাকে কইলাম, 'বাসনগুলো কতক আজ বের করে দে, ওরা ধীরে-স্থস্থে মেজে রাখুক।' সে খেঁকিয়ে ওঠে, 'আজ মাজলে ফের দাগ পড়ে যাবে, আবার মাজন-ঘষণ করতে হবে। পরশু দিন বেবাক বাসন বার করে দেব।' কচিরামকে কইলাম, ঝাঁকা ভরা ছোলা নারকেল যে ঘরে এনে তুলে রাখলে, একেবারে পুকুরের জলে চুবিয়ে আনলে একটা কাজ হয়ে থাকত?' আমার কথায় উড়ে মাড়া ইড়িমিড়ি করে কি যে কইল বুঝতে পারলাম না। আমার হয়েছে 'যার জন্তে করি চুরি সেই কয় চোর।' কার কথা কাকে কই—আমার হ'য়েছে রাক্ষস বামুনের মানুষ বৌয়ের বিত্তান্ত!"

কামিনীর মা ডাল বাছিতে বাছিতে অপ্রতিভ হইয়া জবাব দিল, "আমি তোমাগো কি কইছি মাঠান, যাতে তোমাগো গোঁসা হইল? তোমাগো লক্ষীর

ভাণ্ডার আলা চাল ক্যামনে কমতি হইবে? এক ডোল লয়, দুই ডোল ভরা চাল রইচে। সগল লোক ত ভোগের পরসাদের পরে মাছের বেন্নুন সিদ্ধ চালের ভাত চাইয়া খায়। মাছের বেন্নুনে আলো চালের ভাত নাকি তাগরে জলা জলা লাগে।"

কামিনীর মা'র মাছের উল্লেখে ঠাকুমা ভিন্ন পথ ধরিলেন, "দোলে অনেকে মাছ করে না। আমার মহেশ পরাণ ভরে সকলকে খাওয়াতে ভালবাসে। কয় 'আমরা ত বোষ্টম নই। শক্তির উপাসক। নিরামিষ খেতে কেউ ভালবাসে না, সকলে মাছের ভক্ত। ভোগের পেসাদের পরে যারা মাছ খাবে তাদের তৃপ্তির জন্যে মাছের ব্যবস্থা।"

বিনুর তেল বসানোতে মধুমতীর ভারি আরাম বোধ হইতেছিল। তখনই উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সে ঘুম ঘুম চোখে বলিল, "বামুনীর রাক্ষস স্বামীর কথা বললে না ঠাকুমা? রাক্ষসের মানুষ বৌ, সখ দেখে বাঁচিনা?"

ঠাকুমা সুরু করিলেন, "রাক্ষস দিনমানে গরীব বামুন সেজে ভিক্ষা করে বেড়াতো। তার তিনটে মেয়ে ছিল। বড় দুটো বাপের সঙ্গে রাতে বেরিয়ে যে-সব বাড়ীতে ভিক্ষায় যেয়ে দেখে আসত তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। রাতে তিন বাপ বিটি মিলে ধরে এনে খেয়ে ফেলত। বামুনী দেখে-শুনে ভয়ে বুকফেটে মারা যায়। কারোকে বলতেও পারে না, সইতেও পারে না। তার মনে মনে বিশ্বাস হয়েছিল, ছোটমেয়ে তারই মতন মানুষ। মানুষ না হ'লে সে নর মাংস খায় না কেন? একদিন ছোটমেয়েকে ডেকে বামুনী বলে, 'দেখ মা, তোর বাপ দিদিরা রাক্ষস, মানুষ ধরে খায়। তুই আর আমি মানুষ, আয় আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই।'

মায়ের কথা শুনে মেয়ে খল খল করে হেসে ডাকে, 'ছোড়দিদিলো, বড়দিদিলো মা নাকি মানুষ, আয় আমরা মাকে ধরে খাই।"

তিনমেয়ে মিলে তখুনি বামুনীকে খেয়ে ফেললে।"

ঠাকুমার গল্প শুনিয়া বিনু হিহি শব্দে হাসিতে লাগিল। মধুমতী নিদ্রাবিজড়িত চোখে মৃদুমন্দ হাসিল।

তরু যেন কোথা হইতে ঝড়ের বেগে আসিয়া বিনুকে তাড়া দিল, "বৌদি, উঠে এসে জলদি, জলদি, দেরি ক'রো না।"

মধুমতী বিরক্ত, "কোথা হ'তে আসা হ'ল খেয়ে প্যায়দার মত। কি দরকার তোর বৌকে দিয়ে?"

"দরকার আছে বলেই না ডাকছি। 'তেলে মাথায়' আর তেল দিতে হবে না। আমি ছিলাম মণ্ডপে। ফুলদা হারাণ দা' জিতু সখা মেনী আমরা সকলে মিলে রঙ্গীন কাগজের শিকলি করছি। ফুলঝালর বানাচ্ছি। মণ্ডপ থেকে সিংদরজা অবধি কাগজের ফুলে মালায় ফুলদা সাজিয়ে দেবে বলেছে। দোলের অধিবাসের দিন দেবদারু আর আমের পাতায় মণ্ডপের থাম সাজানো হবে।"

কামিনীর মা প্রশ্ন করে, "বৌমারে নয়া যাইবে নাকি মণ্ডপে কাগজের নক্সা কাটিতে?'

"না বাপু না, আমার সে আক্কেল আছে। আমার অন্য দরকার আছে।" বলিতে বলিতে তরু বিন্নুর বাহুধারণ করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল।

তরু বিন্নুকে লইয়া বেশিদূর গেল না। গেল অন্তঃপুরের বাগানে।

একটু আগেই দমকা বাতাস বহিয়াছে। এখনও তরু-পল্লবের কম্পন থামে নাই। পদতলে ঝরাপাতা সর-সর-সর-সর করিতেছে।

তরু বিন্নুকে আনিয়াছে আম কুড়াইতে। মণ্ডপ সুসজ্জিত করিবার উৎসাহে আজ তাহার আম কুড়াইবার কথা মনে ছিল না। তাহার ভুল ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে বসন্তের দমকা হাওয়া অলক উড়াইয়া।

ফাগুন মাসের মাঝামাঝি, আমগুলি নিতান্ত ছোট নাই। গাছতলায় শুষ্ক পাতার স্তূপে ঝরিয়া পড়িয়াছে অসংখ্য কাঁচা আম।

তরু চটের থলি আনিতেও ভুল করে নাই, দুইজনা আম কুড়াইতে মত্ত হইয়া উঠিল।

বিন্নু বলে, "দেখ তরু, ওই মানকচুর ঝোপে যাস্‌নে, গরম পড়েছে, এখন সাপ বেরোয়। সেদিন আচার্য্যদের ভাঙ্গা ই`টের পাঁজায় থেকে সাপুড়েরা দুটো মস্ত সাপ ধরেছিল, শুনিস নি?"

তরু তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টায়, "আমাদের প্রাচীর ঘেরা পরিষ্কার বাগানে সাপ থাকে না বৌদি। থাকলেও সাপের মন্তর ত জানি? 'আস্তিকার মুনি' তিনবার বললেই সাপের দফা রফা। আস্তিকার মুনি সোনা-মান্তর সাপেরা ভয়ে পালিয়ে যায়। দেখ বৌদি, এবার কালবৈশাখী সুরু হবে। ঝড়ে দালান কাঁপবে, টিনের চালে ঝম্ ঝম্ শব্দ হবে। গাছেরা মাথা কোটাকুটি করে সারা হবে, তখন কিন্তু আম কুড়াবার ভারি মজা। কম রাতে কালবৈশাখী হ'লে আলো নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে আম কুড়াব। বেশিরাতে হ'লে কে দাঁড়াবে আমাদের সঙ্গে?"

বিন্নু কথা বলে না। আম কুড়ানো শেষ হইলে বিহ্বল নেত্র মেলিয়া দেয় কুরচি গাছের দিকে। বৃহৎ কুরচির একখানা মোটা ডাল হেলিয়া রহিয়াছে বিন্নুর শয়ন-গৃহের বাতায়নে। শুভ্র-সুরভিত ফুলে গাছ ভরিয়া গিয়াছে।

বহুকাল পূর্ব্বে স্বর্গীয় কর্ত্তা পাহাড় দেশ হইতে দুইটি চারা সখ করিয়া রায়বাড়ীতে আনাইয়াছিলেন। একটা রোপিত হইয়াছিল সদরে, এ'টা অন্দরে।

ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই সদরের চারাটা মরিয়া যায়, অন্দরের চারা শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমানে প্রাচীনত্ব লাভ করিয়াছে। বীচি হইতে ইহার অনেক চারার উৎপত্তি হইয়াছিল। সেগুলি গ্রামের অনেক বাগানে কর্ত্তার পুষ্পপ্রীতির নিদর্শন হইয়া কুরচির পরিবর্ত্তে 'কুটরাজ' নাম ধারণ করিয়াছে।

বিন্নু সরিয়া দাঁড়াইল গাছের তলায়, তাহার মস্তকে ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল ফুলের রাশি। অধরে কিঞ্চিৎ হাসির রেখা খেলিয়া গেল। মনে পড়িল তাহার কুরচি প্রশস্তি লেখা—

ছোট ছোট কুরচিফুল সারা গায়ে আতর মাখা
ঝুরঝুর পড়ে ঝরে, বক যেনরে মেলছে পাখা ?"

ছিঃ, কি ছিরির উপমা, ইহাকে আবার লেখা বলে কে ? আকাটা মূর্খ বুদ্ধিহীনা যেমন বিন্নু তেমনি তাহার রচনা।

তখনও মধুসূদনের কাব্যগ্রন্থের সহিত তাহার পরিচয় বাকী ছিল, 'কড়ি ও কোমলের' পাতা আঁখির আগে পাতা মেলে নাই। কামিনী, প্রিয়ম্বদা, মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, নবীন সেনরা অন্তরালে সঙ্গোপনে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে বিন্নুর বকেরা পাখা মেলিয়াছিল।

"একি বৌদি, তুমি ফুলের দিকে চেয়ে আপন মনে হাসছ কেন ? কষ্ট করে আম কুড়লে এখানে বসে খাবেনা দুটো ?"

বিন্নু সচকিত হইল, "এত ফুল দেখে আমার ভাল লাগছে তাই—এত কষা আম জলে না ধুয়ে খেলে মুখে ঘা-হয়ে যায়। একটু বড় হলে তখন অত কস্ থাকে না। কুড়িয়ে নিয়েই খাওয়া চলে। এগুলো এখন বোঁটা কেটে খানিক জলে ভিজিয়ে রেখে দে, তার পরে খোসা ছাড়িয়ে দিলে ছেঁচে মাখলে সুন্দর হবে খেতে।

"তা হ'লে আম ভিজিয়ে রাখিগে। নেয়ে এসে ছেঁচা কোটা করব। আর

ক'দিন পরে আমও বড় হবে, কালবৈশাখীও সুরু হবে। দাদা তখন বাড়ী আসবেন, তুমি আলো নিয়ে দাদার সঙ্গে রাতে আম কুড়িয়ো বৌদি ?"

"হ্যাঁ, সে কি ক্ষিতি না সুমু, বুড়োমদ্দ আবার আম কুড়োবে আমার সঙ্গে ! তার কোন সখ নেই, খালি পড়া আর বই !"

বিনুর কণ্ঠ হইতে আক্ষেপের সুর ঝরিয়া পড়ে।

তরু বলে, "না কুড়োয় না কুড়োবে, তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আলোটা ধরবে ত ? বেশি রাতে ঝড় হ'লে আমি যে বেরোতে পারব না শত্রুপুরী থেকে। আগ রাতে ঝড় হ'লে ভাবনা নেই, আমরা দুইজনা মিলে সাজি-ভরে আম কুড়িয়ে নেব।"

তরুর আশ্বাসে বিনু আশ্বস্ত হইল।

দোল আসিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় অধিবাস। খড় ও বাঁশের কঞ্চি দিয়া একটা কুঁড়েঘর প্রস্তুত হইয়াছে মণ্ডপের পাশে। ময়দার ভেড়া পুড়িবে ওইখানে। ক্ষিতি তাহার দলবল লইয়া মণ্ডপ মণ্ডপের বারান্দা আঙ্গিনা সজ্জিত করিয়াছে মনোরম বেশে। মণ্ডপের আঙ্গিনা বেড়িয়া পদ্ম-আঁকা সামিয়ানা টাঙ্গানো হইয়াছে। মাঝখানে এক অনুচ্চ মঞ্চ। মঞ্চ বেষ্টন করা হইয়াছে তুলসীকুঞ্জে। মঞ্চের চারিদিকে চারখানা সুবৃহৎ চিত্র সংরক্ষিত। গোষ্ঠলীলা, কালীয়দমন, পার্থসারথী, রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি। দোলের পরের দিন সুদূর বৃন্দাবন-বাসিনী সুপ্রসিদ্ধা শ্যামদাসীর কীর্ত্তন হইবে এইখানে।

শ্যামদাসী নাকি বাংলার দুহিতা। সম্ভ্রান্ত গৃহে জন্মিয়া সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূ হইয়াছিল। তাহার অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় একদা একজনার প্রলোভনে কিশোরী বয়সে সে গৃহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পথে বাহির হয়। তাহার পরে সচরাচর যাহা হইয়া থাকে শ্যামদাসীর ভাগ্যে তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। অনেক পথে ঘুরিয়া, অনেক ঘাটের জল খাইয়া অবশেষে শ্যামদাসী আশ্রয় পায় বৃন্দাবনের এক বৃদ্ধ বোষ্টমের আশ্রমে। শ্যামদাসীর আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ ছিলেন গোবিন্দজীর প্রকৃত ভক্ত ওস্তাদ। তিনিই কন্যাতুল্যস্নেহে নিজের অধীত বিদ্যাদান করিয়া গিয়াছেন শ্যামদাসীকে। কয়েকটি অনাথ বালিকাকে লইয়া শ্যামদাসী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার গুরুদেবের আশ্রমে।

বৎসরান্তে শ্যামদাসীর আগমন হয় বাংলায়। রাসের সময় নবদ্বীপ হরিনাম গানে প্লাবিত করিয়া শ্যামদাসী ফিরিবার সময় বন্দরে মেলায় দোলের কয়দিন

সকলকে নাম শুনাইয়া চলিয়া যায় বৃন্দাবনে। সেই শ্যামদাসীকে কেন্দ্র করিয়া এবার রায়বাড়ীর হোলির আনন্দ অপার।

শুধু তেমন আনন্দ নাই মধুমতীর মনে। ঘুম ভাঙ্গার পরেই মধুমতী বিনুকে ডাকিয়া বলিয়াছিল, "বৌ, আমায় একটু আবীর এনে দিতে পার?"

গোলাঘরে ধামাধামা আবীর আনিয়া রাখা হইয়াছে। চিনির সাঁচ-বাতাসা ফেনী-বাতাসা ঝাঁকাভরা আসিয়াছে।

বিনু কাগজে একটু আবীর আনিয়া দেয় মধুমতীকে।

পাতলা ছোট এক চিল্‌তে কাগজে একরত্তি আবীর মুড়িয়া মধুমতীকে চিঠিতে ভরিতে দেখিয়া বোকা বিনু চালাক হইয়া গেল। সেই মুহূর্তে সে নিজের গৃহে ফিরিয়া এতটুকু আবীর চিল্‌তে কাগজে মুড়িয়া লিখিল, "তোমাকে দোলের আবীর দিলাম।" দুইজনার দুই চিঠিই চলিয়া গেল সেই দিনের ডাকে।

শ্যামরাইয়ের মন্দিরের আশেপাশে দোলের মেলা জমিতেছে, ধীরে ধীরে। নাগরদোলা আসিয়াছে।

রায়বাড়ীতে সকলে নাগরদোলায় দুলিতেছে। বিগ্রহ লক্ষ্মীজনার্দ্দন মণ্ডপে রূপার চতুর্দ্দোলে বিরাজিত হইয়া আজ হইতেই দোল খাইতেছেন।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে দুই ঢোল এক কাঁসী এক বাঁশী আসিয়া চারদিক সরগরম করিয়া তুলিল। দোলে ঢাক বাজাইতে নাই। শক্তি পূজায় ঢাক সমাদৃত। ঠাকুমা প্রাণ খুলিয়া উলু দিতে লাগিলেন।

দোলের ঢোল কাঁসী বাঁশী বোল ধরিল—"শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন, মধুর মধুর বংশী বাজে এই ত বৃন্দাবন।" সত্যই আজ পল্লীভূমি ব্রজভূমিতে পরিণত হইয়াছে। না হইলে কি ব্রজগোপাল বনমালী মর্ত্ত্যে আবির্ভূত হন শ্রীচরণের রেণু বিতরণ করিতে।

প্রকৃত পক্ষে অধিবাসের অভিষেকে দোলযাত্রার সূচনা। খড়ের কুটিরের সামনের আসনে পুরোহিত বিগ্রহ লইয়া পূজায় বসিলেন। ফুলমালা নৈবেদ্য জলপানি থরে থরে সাজাইয়া দেওয়া হইল। আরও সেখানে স্থাপিত হইল রূপার সাগরী থালায় অভ্র-মিশ্রিত সুবাসিত কুঙ্কুম।

পুরোহিত কুশে করিয়া গঙ্গাজলের ছিটা ও মন্ত্র পড়িয়া আবীর শোধন করিয়া লইলেন। অশোধিত আবীর বিগ্রহকে দিতে নাই।

অভিষেক হইয়া গেল, লক্ষ্মীজনার্দ্দন আবীর গ্রহণ করিয়া নির্মাল্য করিয়া

দিলেন। রায়-পরিবারের সকলকে এই প্রসাদী ফাগ শিরোধার্য্য করিতে হইবে। আজ হোলি খেলা নাই, সে হইবে আগামীকাল প্রভাত হইতে।

বিগ্রহ রূপার সিংহাসনে মণ্ডপে ফিরিয়া আসিলে কুটীরে অগ্নি নিক্ষেপ করা হইল। ময়দার ভেড়া পুড়িতে লাগিল, দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিল।

পাড়ার ছোট ছোট বালক-বালিকারা দৌড়াইয়া আসিল ঢিল হস্তে। ঢিল ছুঁড়িয়া আগুন নিবাইয়া তাহারা কুঁড়ের কঞ্চি লইতে মহাব্যস্ত। এই কঞ্চি গৃহে রাখিলে ছারপোকা মশার উৎপাত হয় না।

বাহিরের পর্ব্ব সমাধা হইলে ঠাকুমা হাতীর মাথায় আসন লইলেন। শুধু কি আসন লওয়া, মুখে তুবড়ি ছুটিতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে রায়বাড়ীতে বিরাট্ মহোৎসব। তাঁহার হইয়াছে ছেলে-ছোকরার সংসার, তিনি নীরব থাকিলে ত্রুটি-বিচ্যুতি যে অনিবার্য্য।

"ও মন্যি, ঠাকুরমশায়ের খাবার যোগাড় কতদূর? যত্ন করে ব্রাহ্মণকে খেতে দে। আজ গেল ওঁর এক উপোস, কাল হবে আর এক উপোস। সন্ধ্যায় সন্ধি দোল সেরে তবে না উনি জল খেতে পারবেন।"

কর্ম্মশালায় চলিতেছে বিরাট সমারোহ। ছোট ঠাকুমা গঙ্গাজলে বাটি ভরিয়া চন্দন ঘষিয়া রাখিতেছেন। সরস্বতী চূণ খয়ের বর্জ্জিত একটুকরা সুপারি সংযোগে পূজার রাশি রাশি পানের খিলি বানাইতেছে। মনোরমার অধিবাসের প্রসাদ বিতরণ এখনও শেষ হয় নাই। তরু দলভ্রষ্ট হইয়া কাটিয়া পড়িয়াছে ক্ষিতিদের দলে। তাহাদের পূজা মণ্ডপের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। আমের পাতার মালা আরও গাঁথিতে হইবে। মধুমতী ও বিন্দু বসিয়া গিয়াছে তরকারির ঝাঁকা লইয়া—কচিরাম এখন পুরলক্ষ্মীদেরই দলভুক্ত। সে প্রস্ফুট জ্যোৎস্নালোকে উঠানে মানকচুর ডালনা কুটিতেছে। মানকচু কোটা হইলে তাহাকে কচুর শাক কুটিতে হইবে। দাসীরা জবাব দিয়াছে তাহাদের সময় নাই।

বড় ভোগের ঘরে কাল নারায়ণের ভোগ রান্না হইবে। কামিনীর মা ভোগের হাঁড়ি-কড়া কাঠ-কুটো সমস্ত সুচারুরূপে গোছ-গাছ করিয়া দুর্ব্বার আঁটি লইয়া বসিয়াছে কচিরামের অনতিদূরে।

সকলেই কাজে ব্যস্ত, কেহ ঠাকুমার কথায় উত্তর দেওয়া দরকার বোধ করিল না। ইহাতে তাঁহার কিছুই আসে যায় না। তিনি নিজের সম্বন্ধে নিজেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন "আমি কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে

বেঁধেছি কুলো।" তাঁহার ভাণ্ডারে তুবড়ির অভাব নেই, অফুরন্ত ভাণ্ডার। তিনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ফের ধরিলেন, 'ও মাধ্যি ঠাকুরমশায়কে খেতে দিবি কখন? আহা, সারাদিনের উপোসী ব্রাহ্মণ!"

মধুমতী পটল ভাজা কুটিতেছিল, মুখ তুলিয়া উত্তর করিল, "তাঁর খাওয়া হয়ে গেছে ঠাকুমা, তিনি খেয়েদেয়ে বাইরে চলে গেছেন। তোমাকে এবার প্রসাদ দেই? খেয়ে বিশ্রাম কর গে। এখন থেকে বিশ্রাম না করলে কালকে গলা ফাটাতে কষ্ট হবে কিন্তু?"

ঠাকুমা মধুমতীর কথা না শুনিবার ভান করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রাত পোহানোর সঙ্গে সঙ্গে পুজোয় বসতে হবে। পূর্ণিমা লেগে গেছে, পূর্ণিমার মধ্যে পুজো-আর্চ্চা সারা তাড়া করতে হবে। দ্বাদশ গোপালের জলপানিতে ছানা মাখন মিছরি লাগবে। ছানা মাখন তোরা ক'রে রেখেছিস ত মাধ্যি?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, ছানা মাখন ক'রে রাখা হয়েছে। কাল তোমার দ্বাদশ গোপালের প্রসাদে দেখতে পাবে।"

"পেসাদ আমার মাখন মিছরি খেতে বড় ভালবাসে, তার ঘরে মাখন মিছরির ছড়াছড়ি, সে কলের জলে পেট ভরায়। এ দুঃখ আমি কারে কই?"

"তোমার এত দুঃখের কি হয়েছে ঠাকুমা? তোমার প্রসাদ যেমন আসে নি, তেমনি তার প্রতিনিধি তোমার আদরের মণিমালা কাছে রয়েছে। কাল ওর সঙ্গে দোল খেলে ওকে আচ্ছা ক'রে মাখন মিছরি খেতে দিয়ে মনের আক্ষেপ মিটিও।"

ঠাকুমা আবার চুপ করিয়া রহিলেন। রজনী বাড়িতে লাগিল।

৪১

দুর্গাপূজার মতন দোলেও বাজনাদাররা ভোর বাজাইল। বাজনা শোনামাত্র রায়বাড়ী সজীব হইয়া কোলাহলে মুখর হইল। আগে পূজার আয়োজন, পরে দোলখেলা। স্নান না করিলে পূজার কাজে হাত দিবার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে সকলে ডুবাইয়া আসিল পুকুরের শীতল জলে।

মনোরমা শুদ্ধাচারে ভোগশালায় প্রবেশের পূর্ব্বে ছেলে-মেয়ে বধূকে নারায়ণের প্রসাদী আবীর ললাটে পরাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলে তাঁহার পদে আবীর দিয়া প্রণাম করিল। ভোগ চড়াইয়া দিলে শেষ না হওয়া

পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবেন না ; আবীরও ভোগশালায় ঢুকিতে পারিবে না। প্রথমেই তিনি শুভ অনুষ্ঠানটুকু সারিয়া রাখিলেন।

তরু-ক্ষিতিরা মিলিয়া বালতি বালতি রং গোলাইতেছে। সারি সারি পিতলের রূপার ও টিনের পিচকারি একত্রিত করিয়াছে। তাহাদের সকলের কোমরে ঝুলিতেছে এক একটা আবীরের থলে। এক ধামাভরা আবীর তাহারা কাছাকাছি রাখিয়া দিয়াছে। পুরোহিত পূজায় বসিলে পূজার উপকরণ মণ্ডপে পৌছিলেই তাহারা সম্মুখসমরে নামিবার অপেক্ষা করিতেছে।

বধূ ও ছেলে-মেয়েরা পিতার পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম সারিয়া আসিয়াছে। দুই ঠাকুমার সহিত ইহাদের অল্পবিস্তর আবীর বিনিময় হইয়াছে। তাহাকে হোলিখেলা বলে না, ঠাকুরমাদের সহিত আসল হোলি খেলা, বাকী আছে সকলের।

একটু বেলা হইতে পুরোহিত পূজায় বসিলেন। ঢোল কাঁসী বাঁশী তুমুল শব্দে বাজিতে লাগিল। ঠাকুমার উলুর বিরতি হইল না।

ওদিকে পূজা হইতে লাগিল, এদিকে সুরু হইল মাতামাতি। লবঙ্গ মেনীরা আবিরের থলে ঝুলাইয়া আসিয়াছে।

সুমু বালতির রং পিচকারিতে ভরিয়া যাহাকে সামনে পাইতেছে তাহাকেই পিচকারি ছুঁড়িতেছে। সে মানুষই হোক, বা কুকুর-বিড়াল হোক তাহার বাচ-বিচার নাই।

দাসী-মহলেও আরম্ভ হইয়াছে হোলিখেলা। আবীরে অনুরঞ্জিত হইয়া কাহারও মুখ চেনা যায় না।

বাহির মহলে ভৃত্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বাধিয়া গিয়াছে খণ্ডযুদ্ধ। সরকাররা বাদ্যকররা হিন্দু মুসলমানরা একত্রে হোলি খেলিতেছে। কুঙ্কুম উড়িতেছে ধূলি হইয়া ধূলির মত। গলি পথে পথিকদের মধ্যেও হাস্য-কোলাহলের অবধি নাই। পথ-ঘাট লালে লাল হইয়া যাইতেছে।

ঠাকুমা মধুমতীকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, "তুই হোলি খেলিস না। গুঁতো লাগতে পারে। বসে থাকিস এক জায়গায় স্থির হয়ে ; যার যত খুসী তোকে যেন আবীর মাথায়। তুই কারোকে মাথাতে যাস না।"

মধুমতী ঠাকুমার কথা রাখিয়াছে। সে বারান্দায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছে। যে আলস্য না করিতেছে সেই রং মাখাইতেছে মধুমতীকে।

চতুর্দ্দিক হইতে হাসির কলগুঞ্জন হোলিয়া হোলিয়া জিগীর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে।

স্ত্রীলোকের শালগ্রাম শিলা স্পর্শ নিষিদ্ধ। বছরে মাত্র দোলের একটি দিন অধমা স্ত্রীজাতের হস্তের কুঙ্কুম গ্রহণ করিয়া স্পর্শদানে ধন্য করিয়াছেন। দোল-যাত্রার ষোড়শোপচারে পূজা নির্ব্বাহের পরে সেই মাহেন্দ্রলগ্ন উপস্থিত হয়।

মেয়েরা হোলিখেলার মধ্যে সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে স্পর্শ করিয়া আবীর মাখাইবে।

সকলে রংএ রঞ্জিত হইয়াছে, শুধু বাকী রহিয়াছে শুভ্রবসনা সরস্বতী। সে কাহাকেও আবীর দেয় না, কাহারও নিকট হইতে লয়ও না।

আজকাল কচিরাম হইয়াছে তাহার হাতের লাঠি। নিয়মের কাজে কচিরামের জুড়ি নাই সেই কারণে বিনু একটু গা-ঝাড়া দিয়া বাঁচিতেছে।

ঢোল কাঁসী বাঁশী অনবরত বাজিয়া চলিয়াছে। ঠাকুমার উলুধ্বনিরও বিরাম নাই। তিনি আসন লইয়াছেন মণ্ডপের অন্দরের সিঁড়িতে। এমন সময় সর্ব্বাঙ্গে রং মাখিয়া তরু আসে নাচিতে নাচিতে, "মেজদি, মেজদি, বৌদি, ছোটঠাকুমা, তোমরা সবাই এস নারায়ণকে আবীর দিতে। ঠাকুরমশায় ডাকছেন। মাকে ডেকেছি, সেখানে ফণি ঠাকুরকে রান্নার পাহারায় রেখে মা গেছেন পুকুরে হাত-পা ধুতে।"

তরুর আহ্বানে সকলের হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া শুদ্ধ হইবার কথা স্মরণ হইল। সকলে স্নান সারিয়াছে ভোরে, কিন্তু রংএ আবীরে কি মূর্ত্তি হইয়াছে এক এক জনার। যেমন পরিচ্ছদ তেমনি মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত এক অভিনব বেশ।

বিনু মধুমতীকে বলিল, "ঠাকুরঝি, এমনি মূর্ত্তিতে আমরা মণ্ডপে যাব কেমন ক'রে? মাথায় গায়ে সাবান দিতে হবে, কাপড়-জামা ছাড়তে হবে।"

মধুমতী বলে, "এখন তার সময় নেই বৌ, পরিষ্কার হ'লেই কি কেউ পরিষ্কার থাকতে পারবে? ভোগ না সরা পর্য্যন্ত চলবে এই তাণ্ডব। যে-দিনের যে বেশ, তাতে লজ্জা কি? নারায়ণকে আবীর দিয়ে এসে পরিষ্কার হ'লেই হবে?"

ছোটঠাকুমার সহিত সরস্বতী ঘরের বাহির হইয়া মধুমতীকে বিরস মুখে তাড়া দিতে লাগিল "যাবি নাকি আবীর দিতে, চল, কাজের বাড়ীতে এমন হোলি নিয়ে মত্ত হয়ে থাকা আমি জন্মে দেখি নি। র'য়ে-স'য়ে সব করতে

হয়। কেবা বাড়ীর বৌ, কেবা মেয়ে, কাণ্ডকারখানা দেখে ঘেন্না করে। মা ওদিকে একঘর রান্না নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন, সেদিকে কারোর নজর নেই। এদিকে আমি চোখে সরষে ফুল দেখছি। এঁরা হোলিখেলা খেলছেন।”

মধুমতী হাসে, “বছরকার একটা দিন রাগ ক'রো না মেজদি, তোমার ঘরে ত কচিরাম মোতায়েন, তবু সরষে ফুল? ছোটঠাকুমা ত সমানে মা'র সঙ্গে রয়েছেন। নারায়ণকে আবীর দেওয়া হলে আমরা নেয়েধুয়ে দিচ্ছি কাজে হাত। আনন্দে নিয়ম নাস্তি, আজকের দিনে কারোকে কিছু বলতে নাই।”

সরস্বতী উত্তর না দিয়া থরথর করিয়া সকলের অগ্রে চলিতে লাগিল।

সিঁড়ির সামনে উপনীত হইয়া সকলে হাসিয়া অস্থির, ঠাকুমার একি বেশ! সাদা চুল আবীরে রাঙ্গা হইয়াছে, লাল মুখের এক গালে বেগুনী রংএর ছোপ। আর একগালে মেজেণ্টা রং মাখা।

ঠাকুমা সানন্দে প্রচার করিলেন, “ক্ষিতি তরু স্বমু তাঁহাকে সাজিয়ে দিয়েছে। ভালবেসে নাতনী-নাতিরা দিয়েছে, ধুলেই চলে যাবে রং-চং। মণিমালা, তুই আমার দিকে তাকিয়ে ঘোমটার ভেতরে ফিক ফিক করে হাসছিস কেন লো? আমি—'রাইয়ের অঙ্গের ছটা দেখে কালো হ'লাম গোরা।”

দুপুর গড়াতে দ্বাদশ গোপাল ও গোবিন্দের ভোগ সরিল। বিরাট ভোগ নিরামিষ যতরকম হইতে পারে তাহার কিছুই বাদ যায় নাই। যিনি দিবার মালিক, তিনি অযাচিতভাবে অজস্র ঢালিয়া দিয়াছেন মনোরমাকে, তাই তিনিও তাঁহারই উদ্দেশে উৎসর্গ করিতেছেন ভারে ভারে।

ভোগের বাজনা শুনিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ও ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আসিতে লাগিল। সাধারণ লোক ও অনুগত অভ্যাগতে ভিড় হইয়া গেল।

নিমন্ত্রিতের দল 'বোষ্টমকুল তাঁতীকুল' দুই দিকেই বজায় রাখিতে ভোজনে বসিয়া গেল। প্রথমে নারায়ণের ভোগ খিচুড়ি ভাজা নানাপ্রকার তরকারি দিয়া আরম্ভ হইয়া গেল ভোজন পর্ব্ব। তাহার পরে চলিল মাছের সমারোহ। মৎস্যপ্রধান দেশ। মাছ না হইলে কাহারও খাওয়া তৃপ্তিকর হয় না। সেইজন্য মহেশবাবু দোলে মাছের ব্যবস্থা রাখেন।

আহারান্তে এক দল উঠিয়া যায়, আর এক দল আসিয়া আসন লয়। দল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা হইয়া গেল।

সন্ধিদোলের সময় উপস্থিত। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিল ভিতরে-বাহিরে। স্থানে স্থানে স্থাপিত হইল ডেলাইট। কাগজের ফুলমালার সহিত কাননের ফুলমালা দেবদারু ও আম্রপত্রের মিশ্রণে মণ্ডপের আঙ্গিনাকে ভ্রম হইতেছিল ইন্দ্রের অমরাবতী বলিয়া। আবীর উড়িতে লাগিল ধূলির আকারে।

সন্ধিদোলের ঢোল কাঁসী বাঁশী তান ধরিল, ঠাকুমা উলু দিলেন। রূপার পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের সলতে জ্বালানো হইল। ধূপে দীপে কর্পূরে জলশঙ্খে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের আরতি হইল। মখমলের ঝালরযুক্ত পাখায় ও রূপার চামরে বিগ্রহকে সুশীতল করিয়া সন্ধিদোল সমাধা হইল।

সারাদিনের অভুক্ত পুরোহিতের আহারের পরে দুই ঠাকুমা সরস্বতী আহারে বসিল। আজ বিধবারা পূর্ণিমার উপবাস করিয়াছেন। মনোরমা খাইতে বসিলেন বধূ ও মেয়েদের লইয়া। থালায় থালায় প্রসাদ বাটিতে লাগিল পাচকরা। ইহাদের যেমন খাওয়া তেমনি গৃহে লইয়া যাওয়া। অপরিযাপ্ত আয়োজন, অপরিযাপ্ত বিতরণ। সকলে পরিতৃপ্ত, পুলকিত।

মধুমতীর প্ররোচনায় এত রাত্রে সর্ব্বাঙ্গ সাবানে মার্জ্জিত করিয়া বাসন্তী রংএর শাড়ী পরিয়া বিনু শয়নগৃহে ঢুকিল তখন রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। পূজাপ্রাঙ্গণে খোল-করতালের সহিত ভজন গান থামিয়া গিয়াছে। প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে বিশ্ব-চরাচর।

ছোট ঠাকুমা তাঁহার বিছানায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আলো আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে আলমারির পিছনে। গৃহের সবগুলো জানালা উন্মুক্ত। গবাক্ষপথে অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নাধারা প্রবেশ করিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে মেঝেয়, বিছানায়। উতলা বাতাসে রহিয়া রহিয়া ঝাড়লণ্ঠন দুলিতেছে ঠুং ঠুং শব্দে, কুরচি ফুল অঞ্জলি দিতেছে বাতায়ন-তলে। সুবাসে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে।

বিনু শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল তাহার আবাল্যের দোলের স্মৃতি। তাহার জ্ঞানবুদ্ধি বিকশিত হইবার পরে যাঁহাকে সে এই দিনে আবীর মাখাইয়া পরশ করিয়াছে এবার শ্রীধরের পরিবর্ত্তে তাহার আবীর লইলেন লক্ষ্মীজনার্দ্দন। তিনি ইনি ত ভিন্ন নন, এক ; কিন্তু তবু সেখানকার দোলযাত্রা তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া ভাসিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তুলিতেছে কেন ? শ্বশুরালয়ে বিনুর এই প্রথম দোল। দোলে এখনও সে স্বামীকে পায় নাই। সেই কারণে তাহার অভাব বোধ বিনু অনুভব করিতে পারিতেছে না। সে অভাব

বোধ করিতেছে তাহার স্বজনদের পায়ে আবীর দিয়া প্রণাম না করিবার। আর শ্রীধর, তাঁহাকে এবার মালা-চন্দন আবীর দেওয়া হইল না। ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়া সে যে মনে মনে তাঁহারই শ্রীচরণে লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তিনি তাহা জানিতে পারিলেন কি? না জানিলে কি তাঁহার চলে? তিনি যে অখণ্ড অনন্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, একমাত্র সত্য ধ্রুব। মানব জীবনের ক্ষণিকের সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না বিরহ-মিলন জন্ম মৃত্যু তাঁহাতেই নিহিত হইয়া রহিয়াছে। মোহে ভ্রান্তিতে কেহ তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না, তবু তিনি বিরাজ করিতেছেন সর্ব্বজীবে।

ধীরে ধীরে বিনুর আঁখিপাতে নামিয়া আসিল শান্তিদায়িনী নিদ্রা। বিনু উদাস হৃদয়ে স্বপ্নপুরীতে বিচরণ করিতে লাগিল—

বসন্ত বিদায় লয় নাই, তরুমূল ছাইয়া গিয়াছে ঝরাফুলে। পাখীরা মেলা বসাইয়াছে শাখে শাখে। ফুল ফোটার অবসান হয় নাই। বসন্তের সহিত খেলা করিতে আসিয়াছে চপল-চঞ্চল কালবৈশাখী মেঘ। ক্ষেপা দুষ্ট ছেলেটা বড় বড় গাছের মাথা নোয়াইয়া মড় মড় শব্দে ডাল ভাঙ্গিয়া রাজ্যের ঝরাপাতা ধূলা-বালি উড়াইয়া নাচিতেছে তাধিন-তাধিন। টিনের চাল ঝন ঝন টিন কাঁপাইয়া চিলেকোঠার আস্তর খসাইয়া পাগলটা হাসিতেছে হাঃ হাঃ হিঃ হিঃ।

কতদিনের পরে বিনুর ঘরে ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলিতেছে। ঝড়ের তাড়নায় বেলোয়ারী ঝাড় দুলিয়া দুলিয়া বাজনা বাজাইতেছে ঝুন ঝুন। মোমবাতির শিখা কাঁপিয়া কাঁপিয়া একবার নিবু নিবু হইতেছে আবার প্রজ্জ্বলিত হইতেছে উজ্জ্বলতর হইয়া। ঘরের মেঝেয় শয্যায় আসবাবের গায়ে প্রদীপের রশ্মি ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, দেয়ালে কাল কাল ছায়া কাঁপিতেছে থরথর করিয়া। প্রসাদ তাহার বিছানায় শুইয়া মেঘদূত পড়িতেছে। বিরহী যক্ষ উত্তর মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইতেছে প্রিয়ার সন্নিধানে। প্রসাদের কি উদাত্ত ভাবব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর, সেই স্বরের প্রভাবে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উত্তর মেঘ ঝরিয়া পড়িতে লাগিল রিম রিম ঝিম ঝিম। রিম রিম ঝিম ঝিমের সঙ্গে শিলাবর্ষণ। টুপ টুপ শব্দ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল পড়িতেছে টিনের ঘরের চালে।

কুরচি গাছের গা-ঘেঁষা বেলে-আমের গাছ। বেলের গন্ধে ভরপুর। এবার আম ফলিয়াছে প্রচুর। আমের জাত বৃহৎ। ইহারই মধ্যে আমগুলি ছোট ছোট বেলের আকার ধারণ করিয়াছে। কালবৈশাখীর দাপটে আম পড়িতেছে ধুপ ধুপ করিয়া।

বিন্নুর বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নাই বিরহিণী যক্ষ বধূর প্রতি, সে স্বামীর নিকটে মিনতি করিতে লাগিল, "তুমি আলোটা একটু ধরো না আমার সঙ্গে, আমি আম কুড়িয়ে আনি।"

"ঝড়-বৃষ্টিতে আম কুড়োবে কি বিন্নু ? শোন বিরহীযক্ষের কথা—।"

"ঝড়-বৃষ্টি যে থেমে গেল, কালবৈশাখীর আসতেও সময় লাগে না, যেতেও সময় লাগে না। আমি বেশি দূর যাব না। ঐ বেলে-আমতলা থেকে আম কুড়িয়ে আনব। ঝড়ের রাতে আম কুড়োতে আমি বড় ভালবাসি। উঠে চল, আলোটা একটুখানি ধর।"

"বৌ, উঠে পড় এখন, সকাল হয়ে গেছে। আজকেও তোমাদের কম কাজ নেই। সেই পূজো ভোগ, লোকজনও কম খাবে না, তবে কালকের মতন নয়।"

বিন্নু দুই হাতে চোখ মুছিয়া ছোট ঠাকুমাকে জিজ্ঞাসা করে—"ঝড় জল কি থেমে গেছে ছোট ঠাকুমা ?"

"ঝড় জল সে কি বৌ, তুমি বুঝি স্বপ্ন দেখছিলে ? আজও বায়ানরা ভোর বাজাচ্ছিল, তাদের কাঁসি বাঁশীর রব তোমার ঘুমের ভেতরে বাদলঝরা মনে হয়েছিল। এখন ঝড় জলে কাজ নাই বাপু, ছেলেরা কত আশা ক'রে গানের আসর সাজিয়েছে, তাদের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে। তোমাদের আজ হয়ে গেলেই চুকে-বুকে যাবে, কিন্তু শ্যামরাইয়ের পঞ্চম দোলের বাকী রয়েছে তিন দিন। মেলা বসেছে মাঠে, কত লোকজনের আনাগোনা। কত আহ্লাদ-আমোদ। কালবৈশাখী সুরু হ'লে নষ্ট হবে সব। আমি ইন্দ্র দেবতাকে দই-খই মানত করেছি। ভালভাবে দোল মিটে গেলে পূজো দেব।"

ছোট ঠাকুমা কথা শেষ করিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার পশ্চাতে বিন্নু।

পুরোহিত পূজায় বসিয়াছেন। আজও পূজা ভোগে আড়ম্বর কম নয়। তবে নেমন্তন্নের সংখ্যা বেশি না। মনোরমা ও ছোট ঠাকুমা ভোগ চড়াইয়া দিয়াছেন। এই ভোগেই বিধবাদের চলিবে। সেই জন্য বিন্নু রান্না ছুঁইতে পারিতেছে না, কাঁচা জিনিষের যোগাড় দিতেছে।

পূজায় বসিবার সময় শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর ঝাজর বাজনা বাজিয়াছিল, ঠাকুমা উলু দেওয়া সাঙ্গ করিয়া মণ্ডপের সোপানে বসিয়া মাথা চুলকাইতেছেন।

গতকাল যে আলস্য না করিয়াছে সেই ঠাকুমার শুভ্র কেশদাম অনুরঞ্জিত

করিয়াছে মুঠো মুঠো আবীরে। প্রভাতে প্রতিদিনের ন্যায় প্রাতঃস্নান হইয়াছে তাঁহার, কিন্তু মাথা ঘষিয়া আবীর ধুইবার শক্তি হয় নাই।

মধুমতী নারায়ণকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, ঠাকুমাকে মাথা চুলকাইতে দেখিয়া বলিল, "মাথা-ভরতি আবীর নিয়ে চুলকিয়ে খুন হচ্ছ ঠাকুমা, একে পাকাচুল, তায় আবীর জল লেগে চিরবির করছে। চল আমার সঙ্গে ঘাটে, তোমার মাথা আমি সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে দেইগে। ছত্রিশ কোটি দেবতার পুজো শেষ হ'তে সময় লাগবে, তার আগে তোমার ঘণ্টা বাজবে না। চল।"

ঠাকুমা জবাব না দিয়া নিজের মনে বলিতে লাগিলেন,

"সাধুপাপী তার গড়া, তাদের বোঝা সেই বয়,
ভাল মন্দ যাই কই, জানি সে যে দয়াময়।"

"বাবাঃ কি ভক্তি বিশ্বাস, বাইরে—"

মধুমতীর কথা শেষ হইল না। তরু দৌড়িয়া আসিয়া কহিল, "সেজদি শীগ্‌গির চল পুকুরপাড়ে। বৌদিকে ডেকে এসেছি, গাছের আড়াল থেকে দেখ গে, রাস্তায় মেটেহোলির রাজা বেরিয়েছে। ঠাকুমা, তুমিও চল, দেখবে কি কাণ্ড!"

তরুর 'কাণ্ড' সোজা নয়। রাস্তা সাধারণ শ্রেণীর ছেলের দলে ভরিয়া গিয়াছে। পথের দুই পাশের বাড়ী হইতে ঝি-বৌরা হোলির রাজা দেখিতে উঁকিঝুঁকি দিতেছে।

হোলির রাজা সাজান হইয়াছে একটি আঠার-উনিশ বয়সের গৌরবর্ণের ছেলেকে। তাহার একগালে চুন আর এক গালে কালি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। মস্তকে মুকুট হইয়াছে ভাঙ্গা মাছের খালুই (চুব্‌ড়ি), গলায় ছেঁড়া জুতার মালা। রাজাকে বসান হইয়াছে গাধার ওপরে পিছনে মুখ করিয়া। মাটি ও গোবর-গোলা জলে পিচকারি চলিতেছে পরস্পরের গায়ে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে হোলির গান হইতেছিল।

"যায়রে যায় হোলির রাজা, উল্টা গাধায় যায়,
দেখিস যদি হোলির রাজা, আয়রে তোরা আয়।
হোলিয়া হোলিয়া, হা রে রে হোলিয়া।
লাল হইল তরুলতা, লাল যমুনার জল
লাল হইল অষ্টসখী, অষ্টসখার দল।
হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।

লাল হইল গোরীবাই, লাল বৎস ধেনু
লাল হইল কালাচাঁদ নন্দের ব্যাটা কানু।
হোলিয়া হোলিয়া হা রে রে হোলিয়া।"

দুষ্ট ছেলের দল হোলির রাজার মুখে বিড়ি ধরাইয়া দিয়াছে। বিড়ি টানিতে টানিতে রাজা গ্রাম পরিভ্রমণে চলিয়াছেন। মুখে গর্ব্বিত হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙ্গা টিনের বাজনার সঙ্গে বিকটস্বরে গান গাহিতে গাহিতে রাজা-প্রজারা অগ্রসর হইয়া গেল।

মধুমতীরা পথের পাশের ঘন বন হইতে বাহির হইয়া বসিল পুকুরের চাতালের ছোট ছোট বসিবার ধাপে। ছায়াঘন চাতালে ঝির ঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে। শরীর যেন জুড়াইয়া দেয়।

ঠাকুমা একঝলক হোলির রাজা দর্শনান্তে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া তখনই ছুটিয়া গিয়াছেন মণ্ডপের সোপানে। কি জানি কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে রিণ রিণ রবে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে।

মধুমতী বিনু ও তরুকে লইয়া ধাপে বসিয়া জিরাইতে লাগিল। তাহার স্বভাব আয়েসী, এখন আয়েসের ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দাসীরা চারিদিকে জটলা করিতেছিল।

মধুমতী বলিল, "হোলির রাজা যাকে সাজিয়েছে, ও কি এ গাঁয়ের ছেলে? কেমন যেন নতুন নতুন লাগল?"

পসারী বলে, "ঠাকুজ্জি ঠিক ধরিলা, ও ছায়ালডা এ গেরামের নয়। আচার্য্যি বাড়ীর গুরুপুত্তুর দোলের পার্ব্বণ নইতে আইছে শিষ্যবাড়ী। পাড়ার পোড়ারমুখোরা ওয়ারে করিছে হোলির রাজা।"

কামিনীর মা আতঙ্কে সাড়া, "কয় কিলো, বাছি বাছি গুরুপুতরে হোলির রাজা সাজায়। ওয়ারা হইল কি? সাপের কি ছোট বড় আছে? গুরুকুলের পিতি এত বড় অপমান ইয়ার সাজা পাইবে না কেউ?"

তরু বলে, "যেই না আমার গুরুপুত্র, তার আবার সাজা। আমি আচার্য্যিদের টুলির কাছে শুনেছি ছোঁড়াটার বাপ নাই, মা পাঠিয়ে দেয় শিষ্য বাড়ী পাল-পার্ব্বণে টাকা আদায় করতে। কেউ কেউ আবার ঐ আকাটটার কাছ থেকে গুরুবংশ বলে মন্ত্র নেয়। ও লেখাপড়া কিছু জানে না, তার ওপর নেশাখোর। আহা, কি গুরুপুত্র, হোলির রাজা সাজিয়ে বেশ করেছে।"

গুরুপুত্রের প্রতি তরুর অবজ্ঞামিশ্রিত উক্তিতে কেহ সায় দিতে পারিল না।

গুরুপুত্র যেমন, তেমন হোক না কেন, গুরুবংশের সে বংশধর। বিষধর সাপের ছোটবড় নাই।

ইহা লইয়া আর কাহারও মাথা ঘামাইবার অবকাশ হইল না।

প্রকৃতপক্ষে আজ হইতেই দোলের মেলার আরম্ভ। এ মেলা শ্যামরাইয়ের পঞ্চম দোলের পরেও কয়েক দিন থাকিবে। ভারে ভারে পণ্যদ্রব্য লইয়া দোকানীরা যাইতেছে শ্যামরাইয়ের মন্দিরের মাঠে। কেহ কেহ গরুর বা মহিষের গাড়িতে নানাবিধ সামগ্রী লইয়া চলিয়াছে মেলায়। সেই দিকে সকলের উৎসুক দৃষ্টি প্রসারিত হইল। ঝাঁকা ভরিয়া যাইতেছে শোলার কাকাতুয়া টিয়া পাখীর শোলার খাঁচা। চিনির হাতীঘোড়া পশু পাখী ও বড় বড় ইলিশ মাছ। কাঠের বাসন-কোশন খেলনা। কাঁচের চুড়ি, টিনের বাঁশী। লোহার তৈজসপত্র। বেত ও বাঁশের ধামা ফুলকাটা তাঁতের শাড়ী, ছিটের জামা। ঝুড়িভাজা, তেলেভাজা, জিবেগজা ও জিলেপি ইত্যাদি লইয়া দোকানী পসারীরা মেলায় চলিতেছে। প্রভাত হইতে মেলা জমাইতে ঢোলক বাজিতেছে।

বিনু মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সেজ ঠাকুরঝি আপনারা শ্যামরাইয়ের মেলা দেখতে যাবেন না?"

মধুমতী ঘাড় নাড়ে, "না বৌ, বড়দের মেলায় যাবার রেয়াজ নেই এ গাঁয়ে। ছেলেবেলায় গিয়েছি। এখন তরু যাবে কামিনীর মা'দের সঙ্গে।"

কামিনীর মা হাসিল, "হ, ছোটঠাকুর্জি কারোর সাথে যাওনের তোয়াক্কা রাখে নাকি? এইদণ্ডে না মেলা থাকি ঘুরে আইল।"

তরু ধরা পড়িয়া অপ্রতিভ হইয়া জবাব দিল, "আমি কি মেলা দেখতে গিয়েছি? গিয়েছিলাম শ্যামদাসীর দল বন্দর থেকে এসেছে কি না তাই দেখতে?

মধুমতী প্রশ্ন করে, "এসেছে নাকি? কি দেখে এলি?"

"দেখলাম তার বাজনাদাররা বাজনা নিয়ে এসে গেছে। ওদের নামিয়ে দিয়ে ফের পাঁচখানা গরুর গাড়ি গেছে তাদের আনতে। শ্যামরাইয়ের মেলায় শ্যামদাসী তিন দিন গান গাইবে। আচার্য্যিদের গোলাবাড়ীতে ওরা বাসা নিয়েছে। দেখলাম শ্যামদাসীর দারোয়ানটা বাড়ী বাড়ী থেকে ফুল চেয়ে আনছে সাজি ভরে ভরে। ওরা নাকি অন্য সাজ না করে ফুলের সাজ করে। শ্যামদাসীর কীর্ত্তন এর আগে ত আমাদের বাড়ীতে হয় নি, তাই দেখি নি।"

মধুমতী বলে, "দেখবি কি? ও ত মোটে দু'ই বছর হ'ল এ অঞ্চলে আসা-যাওয়া করছে। কেউ কেউ বলে ওর শ্বশুরকুলের গুরু নাকি গোঁসাইদের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। সেই জন্যেই নাকি শ্যামরাইকে গান শোনাতে ওর এত আগ্রহ। কে জানে কোথায় ছিল ওর শ্বশুরবাড়ী, কোথায় ছিল বাপের ঘর। সে সুবাদ কেউ জানে না, এখন বৃন্দাবনের শ্যামদাসী তাই জানে সবাই।"

হঠাৎ পুকুরে সরস্বতীর আগমনে সকলের আলাপ-আলোচনা থামিয়া গেল। সকলে ত্রস্তেব্যস্তে বাড়ীর পথ ধরিল।

সরস্বতী রাগতস্বরে কহিল, "কাজের বাড়ীতে ঘাটে বসে সকলে দরবার করছে। ভোগ রান্না হয়ে এল, আমি ভোগের ঘরে ভোগের জায়গা করতে যাচ্ছিলাম কুকুরের বাচ্চা আমাকে ছুঁয়ে দিয়েছে। ঐ ভয়েই ঘরের বার হতে চাই না। এখন আবার নাইতে হবে আমাকে।"

সরস্বতী আপনার মনে গজর গজর করিতে করিতে জলে নামিয়া গেল।

মধ্যাহ্নে নারায়ণের ভোগ সরিল বাজনা বাজাইয়া। আজ ব্রাহ্মণদের সংখ্যা কম, কিন্তু অপর লোকের তেমনি ভিড়। উহারা দোলে দুই-তিন দিন ভূরিভোজন করিয়া থাকে। আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ধার ধারে না।

সন্ধ্যায় গানের আসর বসিবে, সকলেই ব্যস্ত-সমস্ত, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব সকলে তাড়াতাড়ি আহার-পর্ব্ব মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গ্রামস্থ সকলকেই কীর্ত্তন শুনিবার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার স্থান করা হইল মণ্ডপের চওড়া বারান্দার দুই দিকে চিক টাঙ্গাইয়া। তাহার নীচে ভদ্রমহোদয়দের বসিবার প্রকাণ্ড গালিচা পাতা। তাহার পরেই আঙ্গিনা ঢাকিয়া সতরঞ্চি প্রসারিত।

বিগ্রহের সম্মুখভাগ খোলা, যাহাতে তাঁহার কুঙ্কুমে অনুরঞ্জিত রূপার চৌদলে দোলায়মান মূর্ত্তিটি প্রত্যেকের দৃষ্টিপথে পড়িতে পারে।

কীর্ত্তনের পরে হরিরলুট দেওয়া হইবে, ধামা ধামা বাতাসা আনা হইয়াছে। প্রকাণ্ড দুই পরাতে আবীর রক্ষিত হইয়াছে। চাকররা পান সাজিতেছে ঝুড়ি ভরিয়া।

সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে মণ্ডপের অঙ্গন আলোয় আলোময় হইয়া গেল।

বাদকের দল সভাসৌষ্ঠব করিয়া বসিল। সারি সারি খোল করতাল খঞ্জনী হারমোনিয়ম ঢোলক বাঁশী বাজিতে লাগিল মধুর নিক্কণে। দলে দলে

লোক আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। ক্ষিতি পুরুষ-মহলে, তরু মেয়ে-মহলে প্রসাদী আবীরে প্রত্যেকের ললাটে তিলক পরাইয়া হস্তে জোড়া পানের খিলি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া ঘুরিতে লাগিল।

মধুমতী গানের পরম ভক্ত, সে সকলের আগে বিনুকে লইয়া জায়গা দখল করিয়া বসিয়াছে। দুই ঠাকুমা সামনের দিকে পা ছড়াইয়া আসন লইয়াছেন। সরস্বতীও আজ অনুপস্থিত নাই। মনোরমাই কেবল স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন না। সকলকে সমাদর করিয়া আসন দিতে হইতেছে।

বাঁশবনের মাথায় চাঁদ দেখা যাইতেছে রূপার থালার মত। বসন্তের বাতাস বহিতেছে মন্দমধুর।

বাজনা যখন গভীরভাবে জমিয়া উঠিয়াছে তখন আসরে অবতীর্ণ হইল শ্যামদাসী তাহার দল লইয়া। দলের দশ বারটি মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে কয়েকটির ব্রজ-রাখালের বেশ। মস্তকে বোষ্টমচূড়া, তাতে ফুলের মালা, নাকে রসকাটি ললাটে তিলক। ফুলের আভরণ। বৃন্দাবনী ছাপা শাড়ী ও উত্তরীয়। পায়ে নূপুর।

শ্যামদাসীকে দেখিয়া বয়েস অনুমান করা কঠিন। টানা টানা চোখে-মুখে একটা কোমল অপার্থিব ভাব পরিস্ফুট হইতেছে। বালিকাদের অনুরূপ তাহারও বেশভূষা সেই বৈষ্ণব চূড়া মাল্যভূষিত। সেই তিলক কণ্ঠে তুলসীর মালার সহিত ফুলের মালা দোলায়মান। বৃন্দাবনী ছাপা সরু লালপাড় ধুতি পরিধানে। গায়ে উত্তরীয়।

শ্যামদাসী প্রথমে বিগ্রহকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া মঞ্চের প্রতি চিত্রে ও তুলসী মূলে প্রণত হইয়া হাত তুলিয়া বিপুল জনতাকে নমস্কার করিতে লাগিল চতুর্দ্দিকে মুখ ফিরাইয়া। ক্ষিতিরা কয়েকজনা মিলিয়া মুঠা মুঠা আবীর নিক্ষেপ করিতে লাগিল চারিদিকে।

শ্যামদাসীর কীর্ত্তনের পদ্ধতি অনেকটা গ্রাম্য ভাসান যাত্রার মতন, বালক শ্রীকৃষ্ণ, বালিকা রাধিকা। মঞ্চের পাশে তাহাদিগকে দাঁড় করাইয়া শ্যামদাসী শত বীণা বেণু রবে তান ধরিল—

"উজর জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হিলন্ কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥
জয় যদুকুল জল নিধি চন্দ।
ব্রজকুল আকুল আনন্দ কন্দ॥

ভুরত মদন মধুভাণ্ড বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥
শুধু সুধাময় মধুরিম হাস।
জগজন মোহন মুরলি বিলাস॥
চূড়হি উড়ত রুচির শিখণ্ড।
টলবল কুন্তল ঢল ঢল গণ্ড॥
অবনি বিলম্বিত বাণী বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততহিরমাল॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নীছনি দাস গোবিন্দ॥"

জনতা মন্ত্রমুগ্ধ। এ কি সঙ্গীত, না সুধা বর্ষণ?

ব্রজবালক-বালিকারা সুরে তাল দিয়া হেলিয়া দুলিয়া 'থমকি-থমকি' নাচিতেছে মঞ্চ ঘেরিয়া। আবীর উড়িয়া যাইতেছে উর্দ্ধে। চন্দ্রকিরণ ঝরিয়া পড়িতেছে নিম্নে। নভোমণ্ডল ও ধরণীতল আজ যেন এক হইয়া গিয়াছে। আর দুই-এর দূরত্ব নাই, ব্যবধান নাই। দুঃখ-বেদনা বিরহ-বিচ্ছেদ ভুবন হইতে মুছিয়া গিয়াছে। হৃদয় হইয়াছে মধুর বৃন্দাবন। সেইখানে শাশ্বত অনন্ত অসীম হইয়া বিরাজ করিতেছেন বিশ্বের অধিপতি বিশ্বদেব।

গৃহের নিবিড় বন্ধন হইতে একদিন যিনি সে মেয়েটিকে প্রলোভন দেখাইয়া বিপথে টানিয়া বাহির করিয়াছিলেন সে আজ সার্থক হইয়াছে তাঁহারই নাম গান গাহিয়া। তাহার দেহমন ধৌত হইয়া গিয়াছে নামের মহিমায়। সে আজ শ্যামদাসী নহে শ্যাম-সোহাগিনী।

মৃদঙ্গের সংযোগে খঞ্জনি মধুর বোল তুলিয়াছে ব্রজবালক-বালিকার সহিত শ্যামদাসী গাহিতেছে—

"হো হো হোরি তুমুল উতরোল।
ঘন করতালি ভালি ভালি বোল॥
অরুণ তরুণ তরু অরুণহি ধরণী।
স্থল জলচর ভেল যভে এক বরণী॥
অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ।
অরুণ হৃদয় ভেল দাস গোবিন্দ॥"

ছোট ঠাকুমা সঙ্গীতে বিভোর হইয়া মালা জপিতেছিলেন। বিহ্বল

ঠাকুমার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সরস্বতী তন্ময়। জনতা নীরব স্তব্ধ।

ধীরে ধীরে মস্ত মধুর দোল-পূর্ণিমার উৎসব-মণ্ডিত রজনী গভীর হইতে গভীরতম হইতে লাগিল। পূর্ণিমার উজ্জ্বলতর পূর্ণচন্দ্র বাঁশবনের মাথার উপর হইতে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল দেবদারু তরুর সুউচ্চ শিরে। পবন তেমনি উতলা পুষ্পগন্ধী। আবীর তখনও তেমনি উড়িতেছে ধূলিকণা হইয়া। কল্পনার স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সহিত নিবিড় হইয়া মিশিয়া গিয়াছে। মধু বৃন্দাবন আর দূরে নাই। সকলের অন্তরের অন্তস্থলে জাগ্রত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে বিরাজ করিতেছেন চিদ্‌ঘনশ্যামসুন্দর।

ভাবে মুগ্ধ বিমুগ্ধ চৈতন্য যেন অন্তর্হিত হইয়াছে, জীবনের সমস্ত সত্ত্বা ধাবিত হইয়াছে ঐ শ্যামল চির সুন্দরের চরণ-প্রান্তে।

গান সমাপ্তির দিকে হরির লুটের বাতাসা প্রস্তুত। তখনও শ্যামদাসী থামে নাই। বিশ্বে অমৃত প্রবাহ বহাইয়া দিতেছে—

"আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব।
খেলতে বড় ভালবাসি তাইতে সদা খেলতে আসি,
মনের মতন খেলার সাথী আর কোথায় পাব॥"

করবী-মল্লিকা

উৎসর্গ

পঞ্চপাণ্ডব পৌত্র

শঙ্কর
অনিরুদ্ধ
হীরক
প্রবীর
চন্দন—সকলকে দিলাম

—তোমাদের দাদী

করবী-মল্লিকা

(উপন্যাস)

১

দার্জ্জিলিং। বৃষ্টিতে নয়, মেঘে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। জলপূর্ণ ক্যালকাটা রোডে আমার পিপাসিত নয়নের দৃষ্টি 'বদ্রাওনের রাজকুমারীকে' খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। নির্জ্জন গিরিগুহায়, শৈবালাচ্ছন্ন উপলখণ্ডে, নির্ঝরিণীর উপকূলে সেই চির-বিবশা বিরহিণীকে ধরি ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছি না। সে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে লুকোচুরি-খেলা খেলিলেও তাহাকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করি।

মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া পুষ্পরেণুর মত যে কুজ্ঝটিকা গলিয়া আমাদের মাথায় ঝরিয়া পড়ে, আমার কাছে তাহা তুচ্ছ বাষ্প নহে। এক অনাদৃতা, অভিমানিনীর বিগলিত নয়নাশ্রু "শত রূপে শত বার ঝরি পড়ে অনিবার।"

মল্লিকা বলে, আমার না কি ভাবপ্রবণতা প্রচুর। এমন কবির কল্পনা-বিভোর হৃদয় লইয়া সংসারে বাস করা চলে না। মল্লিকা যাহাই বলুক, আমি কিন্তু আমার মধ্যে কাব্যের লেশও খুঁজিয়া পাই না।

দীর্ঘ দ্বিপ্রহর হইল রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ পড়িয়া আমার মনে 'বদ্রাওনের নবাবনন্দনী' আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পাইয়াছেন। নহিলে, কাদের খাঁর পুত্রী দৌলত-উন্নিসা বা জেব-উন্নিসার আমি ধার ধারি না।

হিমালয়কে অনেকে মায়াপুরী বলিয়া থাকেন। কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য্য, মেঘ-রৌদ্রের আলো-ছায়া, শ্যামল বনরাজি মনশ্চক্ষে অলকার দ্বার খুলিয়া দেয়। চেরীকুঞ্জের মর্ম্মর গানে, ঝাউয়ের হা-হা নিস্বনে, আমি যেন কাহার বিশ্বব্যাপী বিলাপ-গুঞ্জন শুনিতে পাই।

বাবা বলেন, মানুষের জীবনে আনন্দের উপাদান অতি অল্প। বাবা এ কথা বলিতে পারেন। অকালে আমার মাতৃবিয়োগের পর বাবা নিরানন্দের স্বাদ পাইয়াছেন। আমি তাহা পাই নাই। শৈশব হইতে বাবা আমার মায়ের

অভাব পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন। বাবার মধ্যে পিতা-মাতা উভয়ের স্নেহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

আমার বাবা চিরদরিদ্র, ইস্কুল-মাষ্টার। বিদ্যা-শিক্ষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াও স্বেচ্ছায়, সানন্দে তিনি তাঁহার অখ্যাত জন্মভূমির সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

মর্ত্ত্যের এই স্বর্গপুরী পরিভ্রমণ করিবার সৌভাগ্য আর যাহার থাকে থাকুক, আমার বাবার নাই।

আমি আসিয়াছি আমার মাসীমার সঙ্গে। বাবা যেমন খ্যাতিহীন, বিত্তহীন দীনদরিদ্র, আমার মাসীমা তেমনি খ্যাতিসম্পন্না, এবং বিত্তশালিনী। আজ-কালকার সভ্য-সমাজে মাসীমাকে সকলেই চেনে, জানে। মাসীমা কলিকাতার মেয়ে-কলেজের অধ্যক্ষ।

মাসীমার একমাত্র আদরিণী কন্যা মল্লিকা। আমার দাদামহাশয় দু'দিনের ছোট-বড় দু'টি দৌহিত্রী-রত্ন লাভ করিয়া ফুলের নামে দু'জনের নাম রাখিয়াছিলেন। আমি শ্রীমতী করবী ; সংক্ষেপে 'করু'। আমার দু'দিনের ছোট মল্লিকা। মল্লিনাথের টীকা করিয়া মাসীমা তাকে 'মিলি' বলিয়া ডাকেন।

মিলি মাসীমার মত মেধাবিনী। শিক্ষায় তার প্রবল অনুরাগ, বুদ্ধি শাণিত ছুরির মত তীক্ষ্ণ ; মিলি হাবে-ভাবে বিলাসে লীলাময়ী। মিলির চেয়ে মিলির ছোট ভাই ভানুকেই আমি বেশী ভালবাসি। আমরা তিন ভাই-বোন মাসীমার সহযাত্রী।

হাঁ, যা বলিতেছিলাম। মেঘের রাজ্যে আসিয়া 'বদ্রাওনের রাজকুমারী'র কথা!—কোথায় সেই অকালবৃন্তচ্যুতা কোমল-পুষ্পমঞ্জরী ?

স্বাস্থ্যকামী নর-নারী দলে দলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, দূরে যা-কিছু অস্পষ্ট আব্‌ছা, ক্রমেই তাহা স্পষ্ট হইতেছে ; রডোডেনড্রন গাছটি এতক্ষণ কুয়াসায় নিজেকে অর্দ্ধ-আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল, বাতাসের স্পর্শমাত্রই তাহার সূক্ষ্ম, ধূসর উত্তরীয়খানি সরিয়া গেল। কি সুন্দর ফুলগুলি! মেঘমালার দেশে অরুণোদয়! নিশীথের তিমির-জাল ভেদ করিয়া রাশি রাশি আলোক-গোলক যেন পৃথিবীর বুকে বিকশিত হইয়াছে।

উর্দ্ধে প্রভাত-সূর্য্যের মত রাঙা টুক্‌টুকে অসংখ্য ফুলের ফুলঝুরি ; নীচে শ্যামল তরু-কাণ্ডের উপর ঈষৎ হেলিয়া মিলি দাঁড়াইয়া ছিল—জীবন্ত মনোরম ছবির মত!

সুন্দরী না হইলেও মিলি সাজিতে জানে। হিমালয়ের আলোর পাশে দাঁড়াইবে বলিয়াই বোধ হয় সে আজ গাঢ় লাল জর্জ্জেটের শাড়ী পরিয়াছিল। শাড়ীর নীচে পশম আঁটিয়া গায়ে দিয়াছিল চুম্‌কির কাজ-করা মকমলের ব্লাউজ। ফুলের আভা লাগিয়াছিল তাহার রক্তিম কপোলে—যেখানে মিলির স্বহস্ত-রচিত একটি কৃষ্ণ তিল জ্বল্-জ্বল্ করিতেছে। মিলির ভ্রূযুগল বাঁকিয়া কাণের পাশের রেশমগুচ্ছের মত কালো কুচ্‌কুচে চুলের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে। আমি জানি, মিলির ভ্রূ অত বাঁকা নয়, তার গালেও বসোরা-গোলাপ ফোটে না। অধরের কৃষ্ণ তিল জলে ধুইলে মুছিয়া যায়, সমরখন্দ বিকাইবার সে অকৃত্রিম তিলও নয়। তাই বলিতেছিলাম, সুন্দরী না হইলেও মিলি সাজিতে জানে।

মিলির দৃষ্টির অনুসরণ করিলাম, তাহার অনিমেষ দৃষ্টি অনতিদূরে পাষাণ-শিলায় আবদ্ধ। সেখানে এক ইংরেজ-বেশধারী তরুণবয়স্ক ভদ্রলোকের সহিত ভানু দিব্য গল্প জমাইয়া তুলিয়াছে।

ভানু বেচারা নিতান্ত নিরুপায়। অঙ্কে কাঁচা, সে জন্য এবার 'ম্যাট্রিক' পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে; তাই কাহারো কাছে আমোল পায় না। মাসীমা লজ্জায়, ঘৃণায় ছেলের সঙ্গে বাক্যালাপ একরূপ বন্ধই করিয়াছেন। মিলির অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্যের অন্ত নাই।

মাসীমার বাড়ীতে সবই সৃষ্টিছাড়া। পরীক্ষা, পাশ, ইহা ছাড়া জীবনের বিস্তৃতি নাই, পরিধি নাই। চৌদ্দ বছর বয়সের সরল বালকের প্রতি ইহাদের এই অকরুণ ব্যবহারে আমার কষ্ট হয়। ভানুর কিন্তু ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। গৃহের বন্ধন শিথিল হইলেও বাহিরের বন্ধনকে সে নিবিড় করিতে জানে।

আমি মিলির কাছে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলাম, "ভানু, সন্ধ্যে হলো যে!"

ভানু মাথা তুলিবার পূর্ব্বেই ভানুর সহচর চোখ তুলিলেন। তাঁহার চঞ্চল নেত্র বারেক আমার দিকে প্রসারিত হইয়া মিলির উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিল। চোরাকটাক্ষে আমি তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম। কি দেখিলাম? কেশবলালের 'গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনুদেহ' না হইলেও ভদ্রলোক সুদর্শন।

আমার সাড়া পাইয়া ভানু উৎসাহভরে বলিয়া উঠিল, 'করুদি, ইনি মিষ্টার জ্যোতিভূষণ সেন, ক'মাস হলো কলকাতা হাইকোর্টে 'ব্যারিষ্টারী' করছেন। এঁর কাছে আমি বিলেতের কত মজার-মজার গল্প শুনছিলাম! তোমরা এসো, আলাপ করিয়ে দেই।"

আলাপ করিবার জন্য আমাদের আর মিষ্টার সেনের নিকটে যাইতে হইল না। তিনিই অগ্রসর হইয়া টুপি খুলিয়া যুক্তকরে আমাদের নমস্কার করিলেন।

আমরা দুই বোনে প্রতি-নমস্কার করিলাম। সহাস্যে সেন কহিলেন,—"ভানু আপনাদের পরিচয়. দিয়েছে। আপনি করবী দেবী—ফোর্থ-ইয়ার। আর আপনি মল্লিকা দেবী বি-এ,—এম-এ ক্লাশ চল্‌ছে। আজ আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান্ মনে করছি।"

মিহি স্বরে মিলি উত্তর করিল—"আমরাও। ভানুর কথায় আপনি যে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন, এর জন্য ধন্যবাদ!"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "দেখুন, আমার শরীরে বিদেশী পোষাক থাকলেও আমি আমার নিজের দেশের সব কিছুই পছন্দ করি বেশি। বহু দিন বিদেশে থেকে, দেশের ওপর আমার টান অনেকখানি বেড়ে গেছে। সেই আগ্রহে ভানুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হতে আমার সময় লাগেনি। আজ নিয়ে আমরা পাঁচ দিনের বন্ধু, কেমন ভানু?" বলিয়া সস্নেহে তিনি ভানুর পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

"ভানু আমাদের নিয়েই বেড়াতে বেরোয়, কৈ, এর আগে কোথাও তো আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি! আপনাদের এত বন্ধুত্ব হলো কোন্ জায়গায়?"—বলিতে বলিতে মিলি জ্যোতি বাবুর দিকে তাকাইল।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "বন্ধুত্ব হয়েচে আমার স্বস্থানে, অর্থাৎ 'স্যানিটেরিয়ামে'। পথে-ঘাটে আলাপ তেমন জমে না বলে এত দিন আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের আনন্দ থেকে আমি বঞ্চিত ছিলাম। ভানুকে আমার বড্ড ভাল লাগে, বেশ ছেলে!"

মিলির ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। মিলি বলিল, "ওকে আপনার ভাল লাগে, আশ্চর্য্য? ও যে ভয়ঙ্কর বোকা!"

ভানুর উজ্জল হাসি-মুখ সহসা মলিন হইল। ভানুকে আমি ভালবাসি; তাহার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমি কহিলাম, "না, না, বোকা কেন? ভানু খুব ভাল ছেলে। আপনার কাছাকাছিই আমরা থাকি। বারান্দায় দাঁড়ালে আপনার 'হোটেল' স্পষ্ট দেখা যায়।"

মিলি কহিল, "হাঁ, কাছেই। আমাদের বাসার নাম "কাননছায়া"। আপনি দেখেননি? রাস্তার ডাইনে নীল রংএর বাড়ী?"

"দেখেচি বই কি! কত দিন কাননছায়ার পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা

করেছি। বাড়ীখানা যেমন সুন্দর, নামটিও তেমনি। মুল্লুকের বাসা রেখে আপনারা যে ঐ বাসাটা ভাড়া নিয়েছেন, এতে আপনাদের রুচির প্রশংসা করতে হয়। কাননেই যে 'মল্লিকা' 'করবীর' বাস।"

আমার ঠোঁটের ডগায় আসিল—কাননে বাস হইলেও জ্যোতির স্পর্শে মল্লিকা-করবীকে ফুটিতে হয়। কিন্তু মনে উদয় হইলেই কি কেহ এমন কথা বলিতে পারে? আর বলিবে কে? মেয়ে-মহলে 'মুখচোরা' বলিয়া আমার অপবাদ আছে। কাজেই আমাকে নিস্তব্ধ থাকিতে হইল।

মিলি কাজল-কালো নয়নে কটাক্ষ হানিয়া আবদার করিতে লাগিল, "ভানুকে আপনি বন্ধু বলে স্বীকার করেছেন, আমাদের বাসার আসে-পাশে ঘুরেছেন, অথচ এক দিনও তাহলে দয়া ক'রে আসেননি কেন? আপনাকে পেলে মা কত খুসী হবেন।"

"খুসী হবেন, তা তো জানতাম না। না জেনে ঢুকতে সাহস হয়নি। সকলেরই গলাধাক্কার আশঙ্কা থাকে মল্লিকা দেবী!"

বলিয়া জ্যোতি বাবু হাসিতে লাগিলেন।

২

আমাদের আলাপ-আলোচনা বেশী দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি ঝরিতে লাগিল। ছাতি, বর্ষাতি যাহার যাহা সম্বল ছিল, তাহাতে মাথা ঢাকিয়া সকলেই গৃহাভিমুখে ছুটিল।

আমরাও ছুটিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু মুস্কিল হইল মিলিকে লইয়া। বৈকালে স্নিগ্ধ, নির্ম্মল রৌদ্রের নিশানা পাইয়া মিলি আজ ছাতা লইয়া বাহির হয় নাই। আমার ছোট ছাতায় কুলাইবে না। একা ছাতায় গায়ে-মাথায় ঠেলাঠেলি করিয়া পথ চলিবার প্রবৃত্তিও মিলির নাই। তবু আমি মিলির পাশে গিয়া ছাতা খুলিলাম।

ক'পা চলিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া মিলি বলিল, "না করু, এমন করে যাওয়া আমার পোষাবে না। দু'জনের ভিজে লাভ নেই। তুই বরং ছাতা মুড়ি দিয়ে যা। আমি মাটীর ঢেলা নই, বাদলায় কাদা হবারও ভয় নেই; এ ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে যেতে আমি বেশ আরাম পাই।"

আমি ভানুর দিকে চাহিলাম। বৃষ্টির সম্ভাবনা হইবামাত্র ভানু তার ছাতা খুলিয়াছে। জানি, প্রাণান্তেও সে আমার ছাতায় আসিয়া তাহার ছাতা

মিলিকে দিবে না। মিলি তাহার প্রতি বিমুখ, সে-ও দিদির উপর অপ্রসন্ন। দুই ভাই-ভগিনীর স্নেহের সম্বন্ধ বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে।

জ্যোতি বাবু ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মিলির সাম্‌নে তিনি তাঁহার বর্ষাতিটা ধরিয়া মিনতি করিলেন, "যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে এটাকে স্বচ্ছন্দে আপনি কাজে লাগাতে পারেন, মল্লিকা দেবী! অনাবশ্যক বোঝা বইবার দায় থেকে আপাততঃ নিস্তার পেয়ে আমিও তাহলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচি! শীতের দেশে বৃষ্টিতে ভিজার মানে, যমের দক্ষিণ দুয়ারে হানা দেওয়া—এ কথা মানেন তো?"

কাণের মুক্তার ঝুম্‌কা দুলাইয়া মিলি প্রতিবাদ করিল, "না, তা হয় না মিষ্টার সেন! যমের দক্ষিণ বলুন আর উত্তরই বলুন, আমার বেলা সব দুয়ার বন্ধ করে আপনার বেলায় তা খুলে দিতে পারবো না আমি! যথার্থ বল্‌ছি, বৃষ্টি-বাদলে ভিজলে আমার কখনো অসুখ করে না, আজো করবে না। শরীরের উপর আমার অত দরদ নেই।"

"শরীরের ওপরে না থাকলেও, শাড়ীর ওপরে আছে তো মল্লিকা দেবী! আমি জানি, শরীরের চেয়ে মেয়েদের শাড়ীর ওপরেই মায়া বেশি। আমার জন্যে ভাবনা নেই, রৌদ্র-বৃষ্টি সর্ব্বসহা শিরস্ত্রাণটিকে আমি শিরোভূষণ করে রেখেছি।"—বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু হাতের টুপিটা মাথায় তুলিলেন।

মিলি বিনা-বাক্যব্যয়ে বর্ষাতি গায়ে দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জ্যোতি বাবুর কাছে সরিয়া গেল।

জ্যোতি বাবু ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া ক্ষিপ্রহস্তে মিলিকে বর্ষাতি-কোটে আবৃত করিয়া দিলেন।

মিষ্ট হাসি হাসিয়া মিলি বলিল, "ধন্যবাদ মিষ্টার সেন! আমাকে কিন্তু দেখ্‌ছি ভাল্লুক সাজিয়ে দিলেন!—আপনার মাপের এ-কোট আমার হবে কেন? আস্তিনের অর্দ্ধেকে হাত-দুটো আট্‌কা পড়ে গেছে। অনুগ্রহ করে বোতাম কটা—"

মিলিকে আর বলিতে হইল না। জ্যোতি বাবু সন্তর্পণে বর্ষাতির বুকের বোতাম কয়েকটা চট্‌পট্‌ আঁটিয়া দিলেন।

লজ্জায় সঙ্কোচে আমার চক্ষু নত হইল। জানি, মিলির মধ্যে লজ্জা-সরমের লেশ নাই; তবু প্রত্যেক মেয়েরই সম্ভ্রমের জ্ঞান আছে। এক স্বল্প-পরিচিত, অনাত্মীয় যুবকের সহিত এতখানি মাখামাখি আমার বড় দৃষ্টি-কটু মনে হয়।

কিন্তু মিলিকে সবই মানায়। তাহার আচার, ব্যবহার, বাক্যের অবারিত উচ্ছ্বাস, সমস্তই যেন প্রভাতের অনাবিল উচ্ছ্বসিত, মন্দ-মধুর সমীরণ-প্রবাহ! তাহার পদে পদে স্বাচ্ছন্দ্য, সাবলীল গতি। কোথাও বাধে না, কিছুতেই প্রতিহত হইতে জানে না।

মিলি যেন চঞ্চল জলাশয়ের প্রস্ফুটিত শতদল, মাধুরী ও সৌরভে সকলকে অহরহ আকর্ষণ করিতেছে। আমি সেই পদ্মের পাশে জলের ছোট ফুল—শৈবালাবরণে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি! না পারি সুগন্ধ বিলাইতে, না জানি তীরবর্ত্তী পথিকের মন হরণ করিতে। তবু মিলির অনুরূপ আমারও নারী-প্রকৃতি জাগ্রত, বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে তার 'মনের কামিনী-পাপড়ির উপর ভ্রমরের চরণ-ভর' সহিতে চায়। কোথায় আমার সে মনোমধুপ! হৃদয়ের পাতে যাহাকে আঁকিয়া রাখিয়াছি! বাস্তব জগতে তাহার তো সন্ধান পাই না! আমার নিশীথ-স্বপ্ন নৈশ-সুষুপ্তিতেই বিলীন হইয়া যায়।

"করবী দেবী যে একেবারে চুপ! কোন্ দিকে যাওয়া যায় বলুন? বাসার দিকে, না অন্য কোথাও? বৃষ্টি এখনি থেমে যাবে। বেড়ানোর সময় এখনো উত্‌রে যায়নি।"

জ্যোতি বাবুর কথায় দিবাস্বপ্ন হইতে সহসা আমি সজাগ হইলাম। তখনো মৃদু বর্ষণ চলিতেছে, চাঁদের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। তিথিটা জানা ছিল না, ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়া, ঝাউবনের ঘন পত্রাবরণ ভেদ করিয়া এক ঝলক করুণ জ্যোৎস্না-লেখা জ্যোতি বাবুর মুখে বিচ্ছুরিত হইয়াছিল। সেই মৃদু জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া কোন কথাই আমি কহিতে পারিলাম না। আমার ভীরু-কণ্ঠ ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিল না।

মিলি কহিল,—"আর বেড়ানো নয়, আজকের মত বেড়ান বিরাম দিয়ে কাননছায়ায় বিশ্রাম। কেবল আমাদেরি নয়, আপনারো। চলুন, আপনাকে মার কাছে নিয়ে যাই, মা আপনাকে পেলে খুব খুসী হবেন!"

"আমিও তাঁর কাছে গেলে খুসী হবো, মল্লিকা দেবী! তবে আজ রাত্রে তাঁকে বিরক্ত না করে, কাল সকালে গেলে আপত্তি আছে?

"আছে,—নিশ্চয়ই আছে। জানেন না কি, শুভ কাজ তাড়াতাড়ি সারতে হয়? এখুনি আপনাকে নিয়ে যাব। বর্ষাতি আটকেছি, এখন তার মালিককে আটকাতে পারলেই আমাদের জিত! কি বলিস্ করু?"

করু কি বলিবে? বলিবার শক্তি বিধাতা তাকে দেন নাই। তুমিই কথা

বলো মিলি, আমি শুধু শুনিয়া লই। যে বলিতে পারে না, হাসিটুকুই যে তাহার সম্বল!

মিলির কথায় জবাব না দিয়া আমি হাসিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "পদে পদে যারা আপনাদের কাছে পরাজয় মেনে আস্‌ছে মল্লিকা দেবী, নতুন করে তাদের জিতে নিতে হয় না। তবু বাঁধতে জানা চাই। যাকে বিদেশের একটি বিদেশিনীও আটকাতে পারেনি, সে আপনাদের বন্ধন সানন্দে স্বীকার করে নিচ্ছে। বখাতির লোভে নয়, বিশ্বাস করুন, ও-জিনিসের ওপরে আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই। কাছে থাক্‌লে নিজেকে ভারবাহী গর্দ্দভ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না। আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গসুখের প্রত্যাশায়।--চলুন।"

জ্যোতি বাবু অগ্রসর হইলেন। মিলি তাঁহার দক্ষিণ পাশ অধিকার করিয়া চলিল।

মিলির 'বোকা'—আখ্যায় দল-ছাড়া হইয়া ভানু আগাইয়া গিয়াছিল। আমি মিলির পিছনে চলিলাম।

বাহুতে বাহু ঠিক সংবদ্ধ না হইলেও, মিলি জ্যোতি বাবুর গা-ঘেঁষিয়া চলিতেছিল। চলিতে চলিতে কহিল, "বিদেশিনীরা বাঁধতে পারেনি বলে আপনার যে ভারী অহঙ্কার দেখ্‌ছি? জানেন না, অহঙ্কারই পতনের মূল? বিলেতে কি আপনার এমন একজনও মহিলা-বন্ধু জোটেনি, অনায়াসে আপনাকে যে বেঁধে রাখতে পারতো?

"যে বাঁধন চায় না তাকে বাঁধা শক্ত, মল্লিকা দেবী! বন্ধু কেন জুটবে না? অনেক বন্ধু জুটেছিল; কিন্তু তারা ছিল বাইরের বন্ধু, অন্তরের নয়। তেলে-জলে মিশ খায় না জেনে আমি খুব সাবধানেই ছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল লেখাপড়া শেখা, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা নয়। তা অহঙ্কার আছে বৈ কি, তবে অতি কিছু নেই। 'অতি' হলেই পতন—অল্পে সে ভয় নেই।"

"তাই না কি? অতি-অল্পের অত খবর জানি না। আপনার ভাল-থাকার ভেতরে নিশ্চয়ই 'মিসেস সেনের' অনুনয়-বিনয়, চোখের জলের শাসন ছিল। বাহাদুরি তাঁহারই প্রাপ্য, আপনার নয়।"

"না, মল্লিকা দেবী, এ বাহাদুরি আমারই প্রাপ্য। দুর্ভাগ্য বশতঃ মিসেস সেনের অস্তিত্বই নেই। না থাকলেও আমার মা আমার গলায় রক্ষাকবচ বেঁধে দিয়েছিলেন।"

"আপনার মা আছেন? আপনি বুঝি তাঁকে খুব ভালবাসেন? খুব মাতৃভক্ত ছেলে আপনি!"

"ভক্ত-টক্ত নই, তবে মাকে যে ভালবাসি, তা অস্বীকার করতে পারছি নে। মাকে কে না ভালবাসে? আপনারাও বাসেন নিশ্চয়, কি বলেন করবী দেবী?"

উত্তর দিলাম, "আমি ও-রসে বঞ্চিত জ্যোতি বাবু! আমার মা নেই।"

সহজ ভাবেই আমি কথাটা বলিতে গেলাম, কিন্তু কি জানি কেন, গলা কাঁপিয়া উঠিল। নিজের কথা আমার নিজের কানেই করুণ, কোমল হইয়া বাজিল।

বিগলিত কণ্ঠে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "বড় দুঃখের কথা। আমি জানতাম না করবী দেবি, আমায় মাফ্ করবেন।"

জ্যোতি বাবুর সহানুভূতিতে আমার হৃদয় আর্দ্র হইল, লজ্জার সীমা রহিল না। এতক্ষণ পরে আমি যদি কথা কহিলাম, তবে এমন কথা কেন কহিলাম—যাহাতে অপরের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়? আমার বেদনা সে আমারি নিজস্ব, আমার বুকেই তাহা লুকানো থাকুক। আমি তাহা কাহাকেও জানাইতে চাহি না।

আমরা কাননছায়ার কাছে আসিতেই আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। আঁকা-বাঁকা পথ নির্ম্মল জ্যোৎস্নাধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল।

বাঁক ঘুরিয়া উপর হইতে নামিবার সময় অকস্মাৎ পা মচ্কাইয়া মিলি জ্যোতিবাবুর গায়ে ঢলিয়া পড়িল।

ক্ষিপ্রহস্তে মিলিকে ধরিয়া উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হোল আপনার? পায়ে চোট লেগেছে? এই পাহাড়ে-রাস্তায় একটু অসাবধান হলে আর রক্ষা থাকে না।"

তখনি নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মিলি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিল, "না, বিশেষ লাগেনি—এই বাঁ পায়ে,—একটু টেনে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

জ্যোতি বাবু আমার দিকে তাকাইলেন।

আমি নত হইতেই মিলি বিরক্তির সহিত বলিল, "এ তোর কাজ নয় কৰু,

—তোর গায়ে কি জোর আছে? জোরে টেনে না দিলে আমার পা বাড়াবার উপায় নেই।"

"আপনার আপত্তি না থাকলে এ কাজের ভারটুকু আমিই সানন্দে নিতে পারি মল্লিকা দেবী,—অনুমতি করুন।"

"ধন্যবাদ—উপায় নেই। দিন—আপনি জোরে টেনে দিন, বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে।"

হেঁট হইয়া জ্যোতি বাবু মিলির জুতা-মোজা-বিমণ্ডিত পদপল্লবে হাত বুলাইয়া ধীরে ধীরে টানিয়া দিতে লাগিলেন, মিলি তাঁহার পিঠের উপর দেহ-ভার এলাইয়া, বেদনাব্যঞ্জক অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে ক্লিষ্টস্বরে মিলি কহিল, "হয়েছে মিষ্টার সেন, আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। এখন আমি ঠিক যেতে পারবো—টন্-টনানি কমে গেছে। দয়া করে একবার আপনার এই বোঝাটা খুলে নিন তো! বৃষ্টি অনেকক্ষণ থেমে গেছে।"

জ্যোতি বাবু মিলির গাত্র হইতে বর্ষাতি খুলিতে লাগিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া সেই আধ-আলো অন্ধকারে মিলির পানে চাহিয়া রহিলাম।

মিলি অভিনয়ে পটু। কিন্তু সে-অভিনয় এতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তা জানিতাম না। আমার সন্দেহ হইতেছিল, মিলির পদস্খলন ছলনা নয় তো? ইচ্ছাকৃত সুনিপুণ অভিনয় মাত্র? বেশী বকিতে না পারিলেও আমার অনুভূতির অভাব নাই। আমার মনে হয়, মিলি নিজেকে যতটা না জানে, আমি তাহাকে তার চেয়ে বেশীই জানি।

কিছুকাল পূর্ব্বে শুভ্র, সুন্দর প্রভাত-পদ্মের সহিত মিলির তুলনা করিয়াছিলাম। তাহার যৌবন-পুষ্পিত সুশোভিত দেহ পদ্মের মতই নয়নরঞ্জন; কিন্তু ভিতরে পঙ্ক-কর্দ্দম; মিলিকে পঙ্কজ বলা চলে না—পলাশ বলিলে শোভন হয়। মিলির কি মা জানি আমি? কেন জানিব না? মিলি প্রদীপ, আমি ছায়া। মিলি বাণী, আমি প্রতিধ্বনি। আমাদের স্বভাব বিপরীত হইলেও আমরা পরস্পরের অনুগামিনী। আমাদের অন্তর পরস্পরের কাছে চির-উদ্ঘাটিত।

৩

মাসীমা আজ বেড়াইতে বাহির হন নাই। চিম্‌নীর সাম্‌নে সোফায় কাত-হইয়া পড়িয়া বিলাতী ম্যাগাজিন পড়িতেছিলেন। মাসীমার বয়স অল্প

নয়,—কিন্তু শরীরটি দিব্যি আঁটো-সাঁটো, মজবুত। খুব চটপটে কাজের লোক, চুল শুকান, খোঁপা বাঁধা, এ-সব কাজে সময় নষ্ট হয় বলিয়া চুল ছাঁটিয়া তিনি বাবরী রাখিয়াছেন। মাসীমার মেজাজ বরাবরই কিছু খিটখিটে। মেশো মহাশয়ের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল কলেজের মেয়েদের প্রতি শাসন-গর্জ্জন করিয়া মেজাজ আরও রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বারে জুতার শব্দে চকিত হইয়া মাসীমা কালো ফ্রেমের চশমার ভিতর দিয়া তাকাইলেন।

মিলি জ্যোতি বাবুর পরিচয় দিতে লাগিল।

জ্যোতি বাবুর আভূমিনত নমস্কারের প্রতি-নমস্কারচ্ছলে মাসীমা হাত তুলিয়া জ্যোতি বাবুর অভ্যর্থনা করিলেন, "বসুন—আপনাকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেম।"

সকলে উপবেশন করিলে প্রথমে দার্জ্জিলিং-এর আবহাওয়ার প্রসঙ্গ উঠিল। তাহার পরে হাইকোর্টের মামলা-মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আলোচনা ও দেশের বর্ত্তমান আর্থিক সমস্যার কথা। শেষে যুদ্ধের আলোচনা আরম্ভ হইতেই মাসীমা আমাকে চা আনিতে বলিলেন।

জ্যোতি বাবু আপত্তি করিলেন, "না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমার চা খাওয়ার অভ্যাস খুব কম। চা খেয়ে বেরিয়েছি কি না, এখন আর দরকার নেই।"

ভানুর মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। সে কহিল, "বেড়িয়ে ফিরেই তো আপনি রোজ চা খান,—বাঃ! আমি বুঝি তা জানি নে, না, দেখিনি?"

"দেখবে না কেন ভানু, দেখেছ নিশ্চয়। কিন্তু এখনো যে বেড়িয়ে ফিরিনি!"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া মিলি বলিল, "বেশ, তো হোটেলেই খাবেন, আমাদের কাছে খাবার দরকার নেই। আমরা আপনার জন্য তো ব্যস্ত হইনি। আমাদেরো চা চাই কি না, নইলে জমে বরফ হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।"

জ্যোতি বাবু কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, হাসিলে জ্যোতি বাবুকে কি চমৎকার দেখায়! হাসে সকলেই, কিন্তু এমন সুমিষ্ট হাসি যে হাসিতে পারে, তাহারই হাসা মানায়।

আমি চা-এর ব্যবস্থা করিতে উঠিলাম। ইহা আমার দৈনিক কর্ত্তব্যের

অঙ্গ। মিলি সংসারের কাজ করিতে ভালবাসে না, আমি বাসি। না বাসিলে চলিবে কেন? আমি যে গরীবের মেয়ে। বাবার কাছে তাঁহারই সংসারে আমার বাল্য এবং কৈশোর কাটিয়াছে ঘরকন্নার কাজেই।

ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে পড়িবার জন্যে আমাকে মাসীমার কাছে আসিতে হইয়াছিল। মাসীমা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন; তাঁহার সংসার আমি মাথায় তুলিয়া লইয়াছি। ঘরে খাদ্য-সামগ্রী যাহা ছিল, সাজাইয়া-গুছাইয়া বেহারার হাতে চাএর সরঞ্জাম দিয়া বসিবার ঘরে আসিলাম।

প্রশংসমান নেত্রে আমার পানে চাহিয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "করবী দেবী, দেখ্‌তে পাচ্ছি, আপনি মস্ত কাজের লোক! এরি মধ্যে ডিম ভাজা, নিম্‌কি পর্য্যন্ত করলেন কি করে? চিঁড়ে ভেজে আনতেও ভোলেননি! সত্যি কথা বলতে কি, আমি এই চিঁড়ে-ভাজারই পরম ভক্ত; তাই বিলেতে মা আমার জন্য চিঁড়ে-ভাজা পাঠাতেন।"

মাসীমা সাধারণ লোকের সঙ্গে মেলামেশা তেমন পছন্দ করিতেন না; কিন্তু মিলি বি-এ পাশ করিবার পর হইতে—উপার্জ্জনক্ষম শিক্ষিত তরুণ-সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

গল্পচ্ছলে জ্যোতি বাবুর পরিচয় জানিয়া মাসীমার রুক্ষ, শুষ্ক মুখে একটি কোমল, মোলায়েম আভা ফুটিয়াছিল। জ্যোতি বাবুর প্রশংসায় তিনি প্রসন্ন মনেই যোগ দিলেন; বলিলেন, "হ্যাঁ, করু বড় ভাল মেয়ে, কাজে-কর্ম্মে ওর জোড়া নেই। ও হলো লক্ষ্মী, আর মিলি সরস্বতী। ইংরেজী অনার্সে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হয়েছে। এত অল্প বয়সে এমন ফল সচরাচর দেখা যায় না। মিলি করুর চেয়ে ছোট, তবু লেখাপাড়ায় এগিয়ে গেছে কত! শুধু কি লেখাপড়ায়? ওর গান যদি শোনেন! কি চমৎকারই ও গায়!"

মাসীমার এই বিজ্ঞাপনের উচ্ছ্বাসের মধ্যেই আমি জ্যোতি বাবুকে বলিলাম, "আপনি খান, খেতে খেতে কথা বলুন। সব জুড়িয়ে যাচ্ছে যে!"

"না, জুড়িয়ে যাবে না, ঠিক আছে।" বলিয়া জ্যোতি বাবু চিঁড়েভাজার ডিসখানা সম্মুখে টানিয়া লইলেন।

তৃপ্তিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া কত খাবার জিনিস আরও কত লোককে খাইতে দিয়াছি; অনেকেরই মুখে নিজের স্তুতি শুনিয়াছি, কিন্তু এমন অভূতপূর্ব্ব আনন্দে বায়ু-বিকম্পিত লতিকার মত আমার হৃদয় আর কখন তো কাঁপে নাই! সর্ব্বাঙ্গ পুলকে এমন রোমাঞ্চিত হয় নাই।

জ্যোতি বাবুকে খাওয়ানোর মধ্যে আমার এ কিসের পুলক, কিসের শিহরণ,—আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

সকলকে চা পরিবেশন করিয়া আমি চেয়ারে বসিলাম। নিজের চায়ের কথা ভুলিয়া গেলাম, কিন্তু তিনি ভুলিলেন না। চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে কহিলেন, "অন্নপূর্ণার কি অনাহারের বিধি আছে করবী দেবী! কৈ, আপনি তো চা নিলেন না?"

আমার কপোল রাঙা হইল কি না, জানি না; অন্তরে লালের ছোপ লাগিল। লজ্জায় আমি চোখ তুলিতে পারিলাম না। এত দিন এ-লজ্জা আমার কোথায় ছিল? কেহ কোন দিন আমাকে লজ্জাশীলা বলে নাই, মুখচোরা বলিয়াছে। সরমে সঙ্কুচিত, সঙ্কোচে আনত হইবার বালিকা-বয়স অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছি। আমাতে লাজনম্রা কিশোরীর অতর্কিত আবির্ভাবে আমি বিস্মিত হইয়া নিজের জন্য চা ঢালিয়া লইলাম।

কিছুক্ষণ পর মাসীমা ডাকিলেন,—"করু, চা খেলি না? তোর শরীরটা আজ ভাল নেই?"

"ভালই আছি; এই তো খাচ্ছি মাসীমা!" বলিয়া আমি চায়ের বাটি তুলিলাম। কিন্তু তখন তাহাতে বস্তু ছিল না। লজ্জা ঢাকিবার জন্য সেই দুধ-চিনি-মিশ্রিত শীতল পানীয় আমাকে পান করিতে হইল।

চা-খাওয়ার পরে জ্যোতি বাবু বিলাতের গল্প আরম্ভ করিলেন। মাসীমার বহু দিনের ইচ্ছা—বিদেশ ভ্রমণের; নানা বাধা-বিঘ্নে সেই ইচ্ছা এত দিন কাজে পরিণত না হইলেও তাঁহার আগ্রহ কি প্রবল! বিলাত-প্রত্যাগত কাহাকেও পাইলে মাসীমা খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিতেন।

আমাদের গল্পের আসর ভাঙ্গিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। গির্জ্জার ঘড়ির ঢং-ঢং শব্দে সচকিত হইয়া জ্যোতি বাবু বিদায় চাহিলেন।

মাসীমা বলিলেন, "আপনার গল্প আমার চমৎকার লাগ্‌লো। এক দিনেই শেষ করবেন না কিন্তু,—আরো ঢের খবর আমার জান্‌তে হবে। কাল সকালে সাড়ে সাতটায় আপনি আস্‌বেন—এসে আমাদের সঙ্গে চা খেলে খুব খুশী হবো।"

ভানু কহিল,—"না এলে আমি গিয়ে ধরে আনবো, মনে রাখবেন!"

মিলি আবদার করিতে লাগিল—"আসবেন নিশ্চয়, ভুলে যাবেন না।"

"কেন ভুলে যাব? আমার তেমন ভুলো-মন নয়। খেতে বল্লে কক্ষনো ভুলি না। করবী দেবী যে চিঁড়ে ভাজার লোভ দেখিয়েছেন, সেই লোভে এখানে তো দূরের কথা, কলকাতাতেও আপনাদের পিছু-পিছু আমাকে ধাওয়া করতে হবে। চিঁড়ে-ভাজা ছাড়া আরো একটা লোভ আছে। আজ আপনাদের গান শোনবার সৌভাগ্য হলো না; কাল কিন্তু পেটের খোরাক ও কানের খোরাক দু'টোই না আদায় করে আমি ছাড়ব না।"—বলিয়া সকলকে অভিবাদন করিয়া জ্যোতি বাবু প্রস্থান করিলেন।

আমার মনে হইল, ঘরের উজ্জ্বল-ইলেকট্রিক-আলো সহসা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কাচের জানালা দিয়া বাহিরের যতটুকু চোখে পড়িতেছিল, যেন তাহা গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেছে! মুখর বাতাসের সন্-সন্ শব্দের মধ্যে আবার আমি বিরহিণী 'বন্ত্রাওনের রাজকুমারীর' নূপুর-সিঞ্জিত পদধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। সে যেন অনাদৃত ভক্তি-ভার লইয়া, অনাঘ্রাত হৃদয়-ভার লইয়া, নির্ঝরিণীর তীরে তীরে ঘন গুল্মে আচ্ছাদিত দুর্গম বনরাজীর মধ্যে সে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।

৪

মিলি ও আমি এক-ঘরে শয়ন করিতাম। পাশাপাশি দু'খানি খাটে। খাটের নীচে জলন্ত চুল্লি রাখিয়া নীল আলো জ্বালাইয়া দিয়া "নানী" চলিয়া গেলে মিলি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"করু, আজ যে এরি মধ্যে লেপ মুড়ি দিয়ে জুজু-বুড়ি হলি? ঘুম পেয়েছে?"

মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। কহিলাম, "না মিলি, ঘুম পায়নি।"

মিলি বলিল, "আমারো না। মুখের লেপ খোল্ না ভাই, একটু গল্প করি।"

"এত রাতে কিসের গল্প, মিলি?"

"কিসের আবার! যাকে নিয়ে এতক্ষণ কাট্‌লো, তারি কথা। আচ্ছা, লোকটাকে তোর কেমন লাগ্‌লো?"

"কি করে বলি?" চোখে তো দেখিনি!"

মিলি খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "কি কথাই বল্‌লি করু! মানুষ মানুষকে চোখে দেখে তার পর না কি ভাল-মন্দের সমালোচনা করে? এ কথা কোথাও শুনিনি। এ-দিকে কারুর সামনে সাত-চড়ে তোর মুখে

য়া' সরে না! অথচ কথায় বাঁধুনি কত! সত্যি, বল্ না রে, সেনকে তোর কেমন লাগ্‌লো?"

"তুই আগে বল মিলি, পরে আমি বলবো।"

ক্ষণকাল ভাবিয়া মিলি উত্তর করিল, "হয় গবুচন্দ্র, নয় হ্যাকা। সাগর-পারের পালিশেও চকচকে হয়নি।"

আমি প্রতিবাদ করিলাম, "তা নয়। চরিত্রের মাধুর্য্য, আর চিত্তের সরলতা যে হারায়নি, তাকে তোরা 'গবুচন্দ্র' ছাড়া আর কি বল্‌বি, বল্? ভেতর-বার এক না হলে তাকে আবার মানুষ বলে কে? আমার কিন্তু ওঁকে বেশ লাগলো, দিব্যি মিষ্টি সরল স্বভাব।"

মিলি পরিহাস করিতে লাগিল, "পছন্দ হয়েছে? ও! তোর কাছে যত বোকার স্বভাব হয় মিষ্টি সরল! তুই মিছে দর্শন ঘেঁটে মরছিস করু, লোক চিন্‌তে পারিসনে! এক হিসাবে নির্ব্বোধ লোকগুলো মন্দ নয়! ওদের নিয়ে বেশ খেলা করা চলে। ভোঁতা ছুরিতে হাত কাটে না, ধারালোতে কাটাকুটির ভয়!"

"ছুরি নিয়ে কোন দিন খেলা করিনি। কোন্‌টা ধারালো, জানি না। জানতে চাই না, মিলি। তুই জিজ্ঞাসা করলি বলতে হলো! নাহলে আমার পছন্দ-অপছন্দর বালাই নেই, জানিস তো!"

"সত্যি করু, তুই যেন কেমন! এতখানি বয়স হলো তবু কচি-খুকী! নিরেট নির্ব্বিকার! না আছে কৌতুক, না আছে কৌতুহল! আমার মনে হয়, তোর মনের কোনো বালাই নেই, দিব্যি আছিস!"

"না থেকে কি করবো বল? যিনি ভাঙ্গা-গড়ার মালিক, তিনি মন গড়তে ভুল করেছেন!"

গায়ে লেপ টানিয়া মিলি বলিল, "আজ আর নয়, এইবার ঘুমো, করু। সকালে আবার তাণ্ডব আছে। বেশী রাত জাগলে শরীর বিশ্রী লাগে। তোকে আজ আমি বুঝতে পারছি না, হেঁয়ালির মত লাগ্‌ছে।"

আমি জবাব না দিয়া মনে-মনে বলিলাম, আমাকে বুঝিয়া তোমার প্রয়োজন নাই, মিলি। করবী ক্ষুদ্র, তার জীবনের পরিধিও বিস্তৃত নহে। তার কথা তাহারই থাকুক, তা তোমার কি দরকার জানিবার? কিন্তু তোমাকে আমি চিনি। তুমি অল্প-জলের শফরী, গভীর জলের মকর নও। তোমার লীলা-চাতুরী দিবালোকের মত স্বচ্ছ, আকাশের মত পরিষ্কার। তোমাকে জানিতে আমার বাকী নাই!

মিলির উদ্দেশে যাহাই বলি না কেন, আমার নিদ্রাহারা চোখের সামনে জ্যোতি বাবুর সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল! কেন যে এমন হইল, আমি তা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কত বসন্ত-সন্ধ্যায়, শরৎ-মধ্যাহ্নে আমার উন্মেষিত জীবনপথে কত পথিক আসিয়াছে, গিয়াছে! কিন্তু কাহারো চঞ্চল পদধ্বনি আমার হৃদয়ের কুঞ্জ-তোরণে প্রবেশ করিতে পারে নাই! আজ যেন অলক্ষিতে দক্ষিণ বাতাসের আবির্ভাব হইল। কুঞ্জ-দ্বার আপনা-আপনি খুলিয়া গেল।

যে-দিন যায়, তাহাই শান্তির। যাহা আগত, তাহা যবনিকার অন্তরালে রহস্যে প্রচ্ছন্ন। আমার ভবিষ্যৎ আমার জন্য কি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, জানি না। না জানিলেও আমি তাহারই পরিবেষ্টনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিতে চলিয়াছি।

পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে দেখিবামাত্র জ্যোতি বাবুকে আমার ভাল লাগিল কেন? মনের কাছে এ কেনর উত্তর না পাইয়া আমি জোর করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

ঘুম কি আসে? যে নব ভাবোচ্ছ্বাস এত দিন আমার অন্তরে অজ্ঞাতে রহিয়া গিয়াছে, আজ আমি সেই ভাবধারার কল-তান শুনিতেছি! সুপ্ত যৌবন-নদী সহসা তরঙ্গিত হইয়া হৃদয়-তটে কেবলই আঘাত করিতেছে। আমার চিরন্তনী নারী-প্রকৃতি কাহাকে চায়? যাহার কাম্য ছিল না, কামনা ছিল না, তাহারই ক্ষুধিত দীনতায় আমি ক্ষুব্ধ হইলাম, ভীত হইলাম!

সারা রজনী জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া দেখি, বেলা হইয়াছে। মিলি উঠিয়া স্নান সারিয়া প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে প্রসাধন করিতেছে।

আমি মিলিকে অনুযোগ করিলাম, "আমায় ডাকিসনি কেন মিলি? বেলা ঢের হয়েছে। কখন স্নান সারবো, কখন বা চা-এর যোগাড় করবো?"

মিলি সাবধানে ঠোঁটে রং-এর তুলি বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "বেলা বেশী হয়নি। আজকের দিনটা বড় সুন্দর। মেঘের বালাই নেই, চন-চনে রোদ উঠেছে। তুই ব্যস্ত হোস্‌নে করু, সাড়ে সাতটার দেরী আছে। ঠাকুরকে মা খাবার তৈরির কথা বলে দিয়েছেন। রাত্রে তোর ঘুম হয়নি, তাই ভেবে আমি তোকে ডাকিনি।"

মনে যত কৃত্রিমতা থাকুক, তবু মিলি আমাকে ভালবাসে। বিছানায় শুইয়া তাহার ভালবাসা উপভোগ করিবার সময় ছিল না। তখনই আমাকে স্নানের ঘরে ঢুকিতে হইল।

স্নানান্তে ফিরিয়া আসিবামাত্র মিলির আদেশ হইল, "আমার লট্‌কান রং-এর শাড়ী ব্লাউজ বার করে রেখেছি, পরে নে, করু। তোর সাদা শাড়ী লম্বা-হাতা জামা আমার দু' চোখের বিষ! যে বয়েসের যা, তা না হলে কি মানায়?"

বলিলাম, "এত কাল যা মানিয়ে এসেছে, আজও তা কেন মানাবে না মিলি? ছেলেবেলায় মিস্‌নারী স্কুলে পড়ে এটা আমার অভ্যাস হয়েছে, এখন বেশ বদ্‌লাতে ভাল লাগে না। আজ এমন বিশেষ দিন বা তিথি নয় যে, আমাকে ভোল্ বদ্‌লাতে হবে। আমি সাদা করবী, সাদাই আমার ভালো।"

মিলি রাগ করিল। বলিল, "যেমন সংএর মত সাজ, তেমনি ঢংএর কথা! রঙ্গীন শাড়ী পরতে পাঁজি-পুঁথির তিথি খুঁজতে হয়, জানতাম না। করবী ফুল সাদাই চোখে পড়েচে রাজা যেন দেখেননি! এক-বাড়ীতে দুই বোন রয়েছি, একজন সাদার বিশেষত্ব নিয়ে থাক্‌লে আর এক জনকে লোকে বলবে কি? ভানুর জন্মদিনে মিসেস সরকার এসে কি বলেছিলেন?"

"কবে কোন্ দিন কে এসে কি বলেছিল, তা আমার মনে রাখ্‌বার নয়, মনেও নেই!"

"তা থাক্‌বে কেন? বলেছিল, মাসীর আশ্রয়ে মা-মরা মেয়েটা বড় দুঃখে থাকে। না আছে বেশভূষা, না আছে হাসি-আহ্লাদ।"

"তুই শুনিয়ে দিলেই পারতিস্, করুর মা না থাক্‌লেও মাসিমা আছেন। মাসীর বাড়ী করুর দুঃখের আশ্রয় নয়। আমাদের করবী লাল নয়, সাদা!"

বিরক্তি-ভরে মিলি আমাকে ভ্যাংচাইল; বলিল, "আমাদের করবী লাল নয়, সাদা! সব-তাতে মেয়ের পাকামো!"

৫

বেলা সাড়ে সাতটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি আড়াল হইতে এক-ঝলক তাঁহাকে দেখিয়া লইলাম।

আজ জ্যোতিবাবুর অঙ্গে উঠিয়াছে ধুতি পাঞ্জাবী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের উপর শেওলা-রংএর শালখানাতে তাঁহাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। বাঙ্গালীর

ছেলেকে বাঙালী বেশে যেমন মানায়, বিদেশী পোষাকে তেমন নয়। আমি লক্ষ্য করিলাম, সত্যই জ্যোতিবাবুর চোখ দু'টি বড় সুন্দর! গত সন্ধ্যায় তীব্র দীপালোকে যাহা নক্ষত্রের মত দীপ্ত মনে হইয়াছিল, আজ ভোরের আলোয় তাহা ফুটন্ত ফুলের মত স্নিগ্ধ, মনোহর লাগিল।

একান্তে বেশীক্ষণ আমার দেখা হইল না। মাসিমা ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাড়া দিতে আসিলেন, "করু, তোমার কত দূর হলো? সেন এসেছে। ওঃ, সব হয়ে গেছে? এবার তুমি শাড়ী বদলে পরিষ্কার হয়ে এসো।"

তখন মিলিকে বিমুখ করিলেও আমার যে বেশ ও বাস-পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা একটুও ছিল না, তা নয়। তবু বলিলাম, "আমি তো স্নান করে পরিষ্কার হয়েই রয়েছি মাসিমা। আবার কাপড়-জামা ছাড়তে গেলে দেরী হয় যাবে।"

"কিসের দেরী? চট্ করে একখানা ভাল শাড়ী পরে নাও। এত সাদা-সিধে! মিলির পাশে বেমানান লাগে।"—মাসিমা চলিয়া গেলেন।

মিলির সাজের ঘটা আমার জানা আছে। আমি ইহাদের পরিবারভুক্ত—আমার সজ্জা-হীনতা মাসিমাকে লজ্জা দিবে মনে করিয়াই আমি সাজিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

লালপেড়ে গরদের শাড়ী পরিয়া আয়নার দিকে চাহিতেই আমার মনে হইল, অনাত্মীয় ভদ্রলোকের সামনে বাহির হইতে যতটুকু প্রসাধনের প্রয়োজন, তাহার চেয়েও আমি বেশী সাজিয়াছি। আমার ভিতরে দেহ-শোভনের এ স্পৃহা এত দিন কোথায় ছিল? আর কখনো তো এমন করিয়া সাজিতে পারি নাই!

পুলক-মিশ্রিত লজ্জায় ঈষৎ সঙ্কুচিত পদে আমি বসিবার ঘরে আসিলাম।

জ্যোতি বাবু অভ্যর্থনা করিলেন, "এই যে করবী দেবী! আসুন! সুপ্রভাত!"

আমি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরিবেশনে লাগিলাম। আজ আমার আড়ষ্ট-ভাব কাটিয়া গিয়াছিল, স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে এ মজলিসে যোগ দিতে বাধিল না। হাস্যকৌতুকে সকলের চা-পান চলিতে লাগিল।

মিলির সাজসজ্জা আজ অপূর্ব্ব অভিনব হইয়াছিল। গায়ের রং অনুজ্জ্বল গৌর বলিয়া সে গাঢ় রংএর শাড়ী ব্যবহার করিত। জ্যোতি বাবুর চঞ্চল নয়ন লুব্ধ ভ্রমরের মত মিলির মুখে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

মিলির আকর্ষণের শক্তি অসাধারণ। তরুণ হৃদয়কে পতঙ্গের মত আহত

করিতে—দগ্ধ করিতে তাহার ক্ষমতা অসামান্য। আমি মিলিকে ভালবাসিলেও তাহার এ হীন প্রবৃত্তিকে কোন দিন শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। সেই অশ্রদ্ধার ভিতর কি এক অজ্ঞাত জ্বালার আস্বাদ আজ আমি অনুভব করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দাঁড়াইয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "আপনারা আমাকে মাপ করবেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি আসছি।"

কাল জ্যোতি বাবুকে সিগারেট খাইতে দেখি নাই, এখন জানিলাম, তাঁহার সে-অভ্যাস আছে।

দৈনিক কাগজওয়ালা হিসাব লইয়া আসিয়াছিল ; মাসিমা হিসাব মিটাইতে উঠিলেন। ভানু জ্যোতি বাবুর সঙ্গী হইয়াছিল।

আমাকে একা পাইয়া মিলি পরিহাস করিতে লাগিল, "মরা-গাঙ্গে চাঁদের আলো কেন, করু? ব্যাপার কি? রং ধরলো না কি? রোজ টেনে-টুনে ঝুঁটি বাঁধা হয়, আজ দেখছি কাণের ওপর চুলের থর নেমেছে! গালে দোল খাচ্ছে কাণ-বালা। কুমকুমের কি ভাগ্যি, তিনি উঠেছেন দুই ভ্রূর মাঝখানে!"

লজ্জিত হইয়া উত্তর দিলাম, "ভিজে চুলে খোঁপা হয় না, তাই আঁচড়ে রাখতে হয়েছে মিলি। ঘুম থেকে না উঠতেই মিসেস সরকারের কথা নিয়ে তুই একবার শাসন করলি, তার পর মাসিমা তাড়না করলেন। আমি বেচারী নিরুপায়! কিছু করলেও দোষ, না করলেও দোষ! নাহলে রং-চং আমার আসে না ভাই, ও-জিনিস তোরি একচেটে!"

মিলি হাসিল, "ঠিক বল্‌তে পারলি নে করু! আমি রঙের মহাজন। অন্যকে রাঙাতে পারি, নিজে রাঙি না। জীবন আনন্দের, খেলার—যতটুকু হেসে-খেলে নিতে পারি, তাই লাভ। তুচ্ছ খেলা-ধূলো নিয়ে মানুষ যে কেঁদে মরে কেন, আমি ভেবে পাই না।"

বলিলাম, "ভেবে পাবি কি করে? তুই তো কখনো কাউকে ভালবাসিস না। যারা ভালবাসতে শেখে, তারাই কাঁদে, মিলি। শান্ত, সরল জীবন সুখের! কে তাকে সাধ করে জট পাকিয়ে তুলতে চায়? কোনো দিন বলিনি, আজ বল্‌ছি, ছেলেদের সম্বন্ধে তোকে যেন আমার কেমন লাগে। এত লেখাপড়া শিখে ভদ্র-ঘরের মেয়ের এ সব ভাল নয়।"

মিলি গর্জ্জিয়া উঠিল, "কি ভাল নয়? যারা বোকা মেয়েগুলোকে নাচিয়ে কাঁদিয়ে খেলার পুতুল বানিয়ে তুলতে পারে, তাদের জব্দ করা ভাল নয়? ওরা কি লেখাপড়া শেখে না, না, ভদ্রবংশের ছেলে নয়? সব তাতেই ওদের লাভ

খুন মাপ, যত মহাপাতক মেয়েদের বেলায় ! অন্ধ সংস্কারের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে মেয়েদের ওপর পুরুষ-জাত চিরকাল জুলুম করে আসবে, এর প্রতিকার নেই ?"

"জুলুম কেউ কাউকে করে না মিলি, স্ত্রী-পুরুষ দুই জাত মিশিয়ে ভাল-মন্দ। একের অন্যায়ে আর এক জনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া চলে না। নিজে না নাচলে কে কাকে নাচাতে পারে ? তুই কবে থেকে এত পুরুষবিদ্বেষী হলি ? ও-জাতের ভেতরেই বাবা, ভাই, স্বামী, পুত্র আছেন, তা ভুলে যাচ্ছিস কেন ?"

"মেয়েদের ভেতরেও কি মা, বোন, স্ত্রী, কন্যা থাকে না ? ক'জন পুরুষ তা মনে রাখে, বল্‌তে পারিস্ ? তুই বই নিয়ে কোণে বসে থাকিস, ও-জাতকে চিনিস না ! আমি সম্পূর্ণ না চিনলেও কতক চিনি। ওরা ভাল নয়, ওদের কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। আমি তো কোন অন্যায় করিনি। বল্‌তে পারিস, ভাণ করি ! কেন করবো না ? ওরা কি আমাদের সঙ্গে ছলনা করে না ? আসলে পৃথিবীর জীবমাত্রেই শিকারী। বনে-জঙ্গলে ঘরে-বাইরে দিন-রাত শিকার চল্‌ছে। এত শিকারের সমারোহের মধ্যে তুই ছাড়া আর কে চুপ করে আছে ?"

কি উত্তর দিব ? মিলির স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে সঙ্কোচে আমি যেন এতটুকু হইয়া গেলাম ! কি এক অব্যক্ত, গোপন ব্যথায় আমার হৃদয় খচ্-খচ্ করিতে লাগিল।

আমার মৌনতায় মিলি অধীর হইয়া উঠিল। কহিল, "রাগ হলো ? তুই যে মস্ত বড় নীতিবাগীশ, তা আমার মনে ছিল না রুক্ন। কি বল্‌তে কি বলেচি, ভুলে যা। মুখ গোমড়া করে থাকিস্‌নে। ওই ত্যাখ্, ওরা ফিরে আস্‌ছে।"

জ্যোতি বাবু ভানুর সহিত যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিলেন। মাসিমাও ফিরিলেন।

দুই-চারিটা অবান্তর কথার পরে জ্যোতি বাবু মিলিকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। গাহিবার জন্য মিলিকে বিশেষ অনুরোধ করিতে হয় না। এ ক্ষেত্রে তাহাকে ভাল বলিতে হইবে !

মিলি নীরবে অর্গানের টুলে গিয়া বসিল। তাহার পর সঙ্গীতের সুধাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। মিলির যেমন গলা, তেমনি শিক্ষা—জ্যোতি বাবু মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন।

কয়েকটি গানের পর মিলি আসন ত্যাগ করিলে জ্যোতি বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এবার আপনার পালা করবী দেবী। আমি গানের ভক্ত। কিন্তু নিজে অপারক। তবে শ্রোতা-হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারি। একটু কষ্ট করে আপনি এবার উঠুন, গান শুনিয়ে দিন।"

বলিলাম, "মিলির গানের পর আমার গান ভাল লাগবে না। আমি ভাল গাইতে জানি না। ছেলেবেলায় যা একটু শিখেছিলাম, তাও পচা পুরোনো হয়ে গেছে, শোনার যোগ্য নয়।"

মাসিমা সায় দিলেন; বলিলেন, "করু মিছে বলেনি। গানে ওর মন নেই। ইচ্ছে থাকলে শিখে নিতে পারে। সপ্তাহে দু'দিন মিলির ওস্তাদ আসে। আমি কত বলি, ও গা করে না। গলা ভাল ছিল, তার চর্চ্চা করলে না! হোক পুরোনো, যা জানিস গা করু, উনি শুনতে চাইছেন।"

জ্যোতি বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "গান কখনো পুরানো, পচা হয় না, করবী দেবী। দেখছেন না, কীর্ত্তনের যুগ আবার ফিরে এসেছে, লোকের রুচি বদ্‌লে গেছে। আরম্ভ করুন, আর দেরী করবেন না।"

না, আর দেরী করিব না! ফুটন্ত গোলাপ উদ্যানের অলঙ্কার-স্বরূপ হইলেও নগণ্য বনফুলের স্থানও যে তাহারই পাশে! মিলির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ বলিয়া আমার যাহা আছে, তাহাই বা দিব না কেন? আমি সঙ্গীতের মধ্যে আমার সমস্ত হৃদয় ঢালিয়া দিয়া গাহিলাম—

"তোমারেই করিয়াছি, জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে কভু আর হবো নাকো পথ-হারা।"

গান শেষ হইবামাত্র জ্যোতি বাবু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন, "বাঃ! বড় সুন্দর গলা আপনার। মল্লিকা দেবী কোকিলকণ্ঠী। আপনি বুলবুল! বুলবুলের মতই করুণ, মিষ্টি সুর!"

জ্যোতি বাবুর কথায় আমার ললাটের শিরা দপ-দপ করিতে লাগিল। আঁখি-পল্লব আনত হইল। আমি সঙ্গীতে পারদর্শিনী বা অনুরাগিণী নহি। কখনো কদাচিৎ দুই-একটা গাহিয়াছি মাত্র, শ্রোতারা ভাল বলিয়াছে, কিন্তু সে-প্রশংসা আমার হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলিতে পারে নাই। আজ এক দিব্য বিভায় আমার অন্তর-বাহির অনুরঞ্জিত হইল।

মিলি বলিল, "করু ওস্তাদী না জানলেও যা জানে তা খাঁটি। শিখ্‌লে হতো ভাল। ওর গলায় কি সুন্দর 'গিট্‌কিরি'! সচরাচর অমন দেখা যায় না।"

মাসিমা বলিলেন, "কাজ-কর্মে যেমন মন, অন্য কিছুতে তেমন নয় বলে আমার দুঃখ হয়।"

ভানু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার মাথায় দুষ্ট-বুদ্ধি জাগিল। নির্ব্বোধ ছেলেটা বলিয়া বসিল,—"করুদি একটা গান যা গায়, তেমন কোথাও শুনিনি! জ্যোতিদা সেইটে শুনুন, খুব ভাল।"

মিলি জিজ্ঞাসা করিল, "কি গান ভানু?"

"কি গান আবার! তুমি হাজার বার শুনেছ তো। সেই যে, এখানে আস্‌বার আগের দিন সন্ধ্যা বেলা গেয়েছিল।"

আমি ইসারায় ভানুকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে আমার দিকে না তাকাইয়া আপনার মনে আবোল-তাবোল বকিতে লাগিল।

মিলি বিরক্ত ভাবে বলিল, "এখানে আস্‌বার আগের দিন বল্‌লে কেউ মনে রাখ্‌তে পারে না। কথাগুলো কি, তাই বল্ না বাপু?"

"তা কি আমার মনে আছে যে বলবো? আমি তোমাদের মতন গায়ক নই, গানের খাতায় গান টুকে রাখি না। ভাল লাগ্‌লে শুনি, তার পর ভুলে যাই।"

মাসিমা গম্ভীর হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "এমন স্মরণ-শক্তি না হলে এ দুর্গতি হয়!"

জ্যোতি বাবু মিনতি করিতে লাগিলেন, "ভানুর ভাল গানটা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে করবী দেবী। শুনিয়ে দিন। না শোনা পর্য্যন্ত আমি কিন্তু ছাড়বো না।"

মনে ছিল। কাজেই শুনাইয়া দিতে হইল—

সে যে পরম প্রেম সুন্দর, জ্ঞান নয়ন-রঞ্জন,
পুণ্য মধুর নিরমল জ্যোতি, জগৎ-বন্দন।

৬

ঘাতে-প্রতিঘাতে সংশয়ে-সন্দেহে কোথা দিয়া যেন দিনগুলি অতীতের গর্ভে বিলীন হইতেছিল!

দিনে দিনে আমাদের সহিত জ্যোতি বাবুর ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইতে লাগিল। তিনি এখন আমাদের ভ্রমণের সঙ্গী, হাসি-গল্পের সহচর। তাঁহাকে না হইলে আমাদের আসর জমিতে চায় না, বেড়াইবার উৎসাহ থাকে না। পক্ষকাল

বিলাতের বিবরণ শুনিয়াও মাসিমার শ্রবণের পিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। জ্যোতি বাবু পাকা খেলোয়াড়, ভানু এবং মিলি মহা-আড়ম্বরে তাঁহার নিকটে টেনিস খেলা শিখিতেছে। আমি নিতান্ত অপদার্থ, খেলা-ধূলা আমার আসে না। তবু উহাদের সহিত যোগ না দিয়া পারি না। কারণ, জ্যোতি বাবুর সাহচর্য্য পাইতে হইলে গণ্ডীর বাহিরে থাকা চলে না। তাঁহাকে পাইবার আশা না করিলেও তাঁহার সঙ্গ যে আমার পরম-প্রিয়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই! আমার অন্তর্য্যামীকে ফাঁকি দিব কি করিয়া? জ্যোতি বাবু এখন আমার আলোক-শিখা, আমি মুগ্ধ ভ্রান্ত পতঙ্গ! এত দিন ছিলাম শাখা-পল্লবে লুক্কায়িত অরণ্যের ক্ষুদ্র একটি ফুল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় পুষ্প-পরাগে কীটের আবাস হইল! কালে সেই কীটের পরিণতি পতঙ্গে।

জানি, পতঙ্গ-জন্ম সুখের নয়! নিজেকে দগ্ধ করা তাহার বিধি-লিপি! সান্ত্বনা, পতঙ্গ দগ্ধ হয়, কিন্তু তাহার প্রাণস্বরূপ, উজ্জ্বল প্রদীপ-শিখাকে আঘাত করে না, আহত করে না।

আমি স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, মিলির প্রতি জ্যোতি বাবু অনুরক্ত। সময়ে ভ্রম হয়। মিলির নির্ম্মম হৃদয়ে তিনিও বোধ হয় রেখাপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেনই বা হইবেন না? রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি কোনটারই তো অভাব নাই। কুমারীর কামনার বস্তু তাঁহাতে প্রচুর। সর্ব্বোপরি জ্যোতি বাবুর সরল কোমল স্বভাব, এ যুগে দুর্লভ সম্পদ।

মিলির দুর্লভ-সুলভের বিচার আমি করিব না। অপরের হৃদয়ের গোপন-কাহিনী অপরে জানিতে পারিলে জগতে কিছুই অজানা থাকিত না। আমি কেবল জানি আমাকে। আমার মনের গোপন গহনে যাহা জাগিয়াছে, তাহাতে আবেগ নাই, উচ্ছ্বাস নাই। পাষাণ-শিলায় আবদ্ধ গিরি-নদীর মত একটু শুধু জল-কল্লোল! কেহ তাহা জানে না, জানিবার সম্ভাবনা নাই।

সে-দিন অপরাহ্নে সম্মুখের 'লনে' বল র‍্যাকেট লইয়া মিলি জ্যোতি বাবুর প্রতীক্ষা করিতেছিল, মাসিমা নিবিষ্ট মনে 'সোয়েটার' বুনিতেছিলেন, ভানু একটা বল লইয়া লোফালুফি করিতেছিল।

গেটের দুই দিক মরশুমী ফুলে আলোকিত, মাঝে একটি হরিদ্রা বর্ণের গোলাপ ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতে পারিতেছে না। কুঁড়িটা যেন আমারি মত

হিমে জর্জ্জরিত, সরমে সঙ্কুচিত! খুলি-খুলি করিয়াও হৃদয়-দ্বার খুলিতে পারে না!

আমি আগাইয়া গিয়া কলিটির গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। সাধ হইতেছিল, একটি স্নেহ-চুম্বনে কোরকটিকে অভিষিক্ত করি।

"কি করবী দেবী, হাত বুলিয়ে গোলাপ ফোটাচ্ছেন না কি? বৃথা চেষ্টা! রোদ না উঠ্‌লে ও ফুটবে না!" বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু আসিয়া সামনে দাঁড়াইলেন।

আমি অপ্রতিভ হইলাম। আমার পুষ্পপ্রীতি কাহাকেও জানাইতে চাহি না। সব-তাতে আমার সঙ্কোচ হয়। বলিলাম, "যে ফোটে না, তাকে কি জোর করে ফোটানো যায়? আমি দেখ্‌ছিলাম, ফোটার কত দেরী! আপনার কিন্তু আজ দেরী হয়ে গেছে। ওই দেখুন, মিলি রাগ করে দেবদারু-তলায় বসে রয়েছে।"

মিলি রাগ করিয়াছে শুনিয়া জ্যোতি বাবু অন্বেষণের ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকাইয়া উত্তর দিলেন, "মল্লিকা দেবী রাগ করেছেন? আপনাদের রাগকে আমার বড্ড ভয়। আমি রাগ করতেও জানি না, রাগ ভাঙ্গাতেও জানি না। হাটে যেতে হয়েছিল বলে আস্‌তে দেরী হয়ে গেল!"

"হাটে কেন? কিছু কেনবার ছিল বুঝি?"

"হাঁ। অনেক কিছু কিন্‌তে হলো। যাবার তাগিদ এসেছে। দিদির ফরমাশ—কুঁড়ি গাছ, কাঁচের মালা, দশখানা 'লাসা' শাড়ী। সেগুলো আপনাদের দিয়ে পছন্দ করিয়ে কিনবো। দিদির মনের মত না হলে আমার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধবে। সাধে বলি, আপনাদের রাগকে আমার বড় ভয়!"—বলিয়া জ্যোতি বাবু হাসিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহার হাসিতে যোগ দিতে পারিলাম না। শীঘ্র তাঁহাকে যাইতে হইবে শুনিয়া বর্ষার নদীর মত আমার হৃদয় চঞ্চল হইল। কেনই বা চঞ্চল হয়? জ্যোতি বাবুর সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ, কিসের যোগাযোগ? তাঁহার যাওয়া-আসায় আমার আনন্দ-বিষাদ হইবে কেন? এ বিপুল বিশ্বে কে কাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে? এখন যাহাকে একান্ত নিকটতম ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাই, পরক্ষণে সে সুদূরের যাত্রী হইয়া নয়নের অন্তরালে সরিয়া যায়। মানুষের বিচ্ছেদ-বেদনা পায়ে-পায়ে।

আগে আমার অহঙ্কার ছিল, হৃদয়ের ধরা-বাঁধার কারবারে আমি নির্লিপ্ত,

উদাসীন। পদ্মপত্রের মত জলে বাস করিয়াও আমাতে জল লাগে না! সে অহঙ্কার আমার কোথায় গেল? কিসের এ দুর্ব্বলতা? স্বপ্ন-বিহ্বলতা, আকাশ-কুসুম-রচনা আমার সাজে না।

আমি চিত্ত-চাঞ্চল্য দমন করিয়া সহজ ভাবে জবাব দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুই বলা হইল না।

জ্যোতি বাবুর সাড়া পাইয়া ভানু আসিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি তাহাদের অনুসরণ করিলাম।

মিলি যেমন বসিয়াছিল তেমনি রহিল। অভিমানিনী মিলির স্ফুরিত অধর, ছল-ছল চক্ষু, অপরূপ ভঙ্গিমা! দেখিবার জিনিস! মান-অভিমান সকলেরই আছে, কিন্তু এমন করিয়া ক'জন তাহা ব্যক্ত করিতে পারে?

জ্যোতি বাবু মিলির পাশে উপনীত হইয়া সহাস্যে বলিলেন, "আসুন মল্লিকা দেবী, আরম্ভ করা যাক। কাজে বেরিয়ে দেরী করে ফেলেছি।"

মিলি কহিল, "থাক, এখন আর খেলার সময় নেই। অনর্থক আরম্ভ করে কি হবে? আপনার কাজ থাকলে যেতে পারেন। আপনার মূল্যবান্ সময় অকারণ নষ্ট করতে চাইনে।"

মেয়ের বাঁকা-কথায় মাসিমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, জ্যোতি কাজ-কর্ম্ম সেরে খেল্‌তে এসেছেন। এইটেই তো খেলার সময়। রোদে পুড়ে খেলাধূলো আমি ভালবাসি না। শীতের দেশ হলেও রোদের তাতে গায়ের রং পুড়ে যায়। বিকেলের পড়ন্ত রোদ আমি একেবারে সইতে পারি না। মাথায় লাগলে মাথা টন্‌টনিয়ে ওঠে।"

মাসিমার রৌদ্র-বিভীষিকায় জ্যোতি বাবু বিচলিত না হইয়া মিলির অভিযোগের সূত্র ধরিয়া বলিলেন, "সময় আমার মূল্যবান্ নয় মিলি দেবী। যতক্ষণ আপনাদের কাছে থাকি, তখনি তাকে মূল্যবান্ মনে করি। আমি ইচ্ছা করে সময়ের অপব্যবহার করিনি। আজ চিঠি পেয়েছি, আমাকে শীগ্‌গির যেতে হবে। দিদি রাশীকৃত ফরমাশ পাঠিয়েছেন। লাসা-শাড়ী, মালা, ভুটানী চাদর, নেপালি বাটী, গেলাস, টাট্‌কা চা, মৃগনাভি, বাঘের নখ, কপি, কলাইশুঁটী, পেঁপে, ঝাঁটা,—সে এক বিরাট্ ফর্দ্দ! গোটা দার্জ্জিলিং সহরটাকে নিয়ে যাবার বিলি-ব্যবস্থা! চিঠি পেয়ে হাটে গিয়ে কতক সংগ্রহ করে রাখলাম। আর-এক হাট পর্য্যন্ত থাকা হবে কি না, সন্দেহ।"

অকস্মাৎ মিলির কাজল-কালো দুই চোখে মেঘের আমেজ লাগিল। মিলি

ভালবাসিয়াছে! নিশ্চয় বাসিয়াছে! তাই উহার অভিমান-বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে বিচ্ছেদ-বেদনা উদ্বেলিত হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া মিলি তাহার স্বপ্ন-ভারাতুর বিহ্বল নেত্র জ্যোতি বাবুর মুখের উপরে মেলিয়া দিল।

মুহূর্ত্তে জ্যোতি বাবু বিশ্ব ভুলিয়া সেই চোখের সহিত চক্ষু মিলিত করিয়া অনিমেষে চাহিয়া রহিলেন। আমি আঁখির ভাষা জানি না, জানিলে পিপাসিত প্রাণের অব্যক্ত ইতিহাস অধ্যয়ন করিতে পারিতাম।

ভানু নিষ্প্রভ হইয়া, মাথা দুলাইয়া বলিয়া উঠিল, "না জ্যোতিদা, এত শীগ্‌গির তোমাকে আমি যেতে দেব না। আমরা যে ক'দিন আছি, তোমাকেও থাকতে হবে। দিদিকে আজ আমি চিঠি লিখবো। আমার চিঠি পেলে দিদি তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে বল্‌বেন।"

জ্যোতি বাবুর সহিত ভানু নিজেকে জড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। ভদ্রতার মুখোস 'আপনি' খসিয়া গিয়া আত্মীয়তার 'তুমি' 'জ্যোতিদায়' পরিণত হইয়াছে। জ্যোতি বাবু কেবল আমার মধ্যে আলোড়ন-বিপ্লবের সৃষ্টি করেন নাই, আমাদের পরিবারে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা সম্ভাবনার আকার গঠিত হইতেছে! বৃক্ষের মূলের মত তিনি আমাদের হৃদয়-মৃত্তিকার অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া তাঁহার আসন পাতিয়া রাখিয়াছেন। বিরহের ঝটিকা শুধু বৃক্ষকেই নাড়া দিবে না, তাহার কম্পন-বেগ মাটিকেও আঘাত করিবে!

ক্ষুব্ধ স্বরে মাসিমা কহিলেন, "তাই তো, এত তাড়াতাড়ি তোমার যাওয়া হতে পারে না। সবে এখানকার পরিবর্ত্তন সুরু হয়েচে, স্বাস্থ্যের পক্ষে এ আবহাওয়া ভারী উপকারী।"

"থাকৃতে পারলে উপকার হতো। কিন্তু থাকৃতে আর পারছি কৈ! আমাকে যেতেই হবে। ব্যাঙ্কের একটা কাজের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম, তাঁরা ডেকেছেন। হয়তো কাজটা পেয়ে যাব।"—বলিয়া জ্যোতি বাবু পাথরের উপর বসিলেন।

মাসিমা ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "হাইকোর্ট ছেড়ে দিয়ে শেষকালে তুমি ব্যাঙ্কের কাজ নেওয়া ঠিক করলে। নূতন বেরোচ্ছ, কিছু দিন তোমার দেখা উচিত ছিল। স্বাধীন ব্যবসা, মান-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। সি. আর. দাশ যে এত-বড় হয়েছিলেন, তার মূলে ছিল এই স্বাধীন ব্যবসা।"

"মূলে শুধু স্বাধীন ব্যবসা ছিল না; ছিল দেশপ্রীতি—আত্মত্যাগ। ত্যাগ

না করলে কেউ প্রাতঃস্মরণীয় হতে পারে না। আমি হাইকোর্ট ছাড়ছিনে, ব্যাঙ্কের কাজ পেলে একটা বাঁধা আয় থাকবে। মামলা করে যা পাবো, সেটা হবে উপরি পাওনা। আপনাকে তো সব বলেছি, আমার বাবা নেই, মার পুঁজি ভেঙ্গে বিলাতের খরচ চালিয়েছি। আমার প্রতিজ্ঞা, বছর দুইয়ের মধ্যে সে টাকাটা রোজগার করতে হবে। একটা আঁকড়ে ধরে 'ভ্যারেণ্ডা-ভাজার' যুগ আর নেই। প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে, রীতিমত যুদ্ধ করে আয়ের উপরে দাঁড়াবার।"

মাসিমা ধারালো ছেলে পছন্দ করিতেন। ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া, নিশ্চেষ্টতা ভালবাসিতেন না। কথাচ্ছলে বহু বার তাঁহার মুখে শোনা গিয়াছে, যার ভেতরে তেজ নাই, বড় হবার স্পৃহা নাই, সে আবার কিসের মানুষ? তেজের আগুনে উচ্ছল যে জীবন, সেই তো সত্য।

জ্যোতি বাবুর ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনায় মাসিমার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল। তিনি কহিলেন, "হাঁ উন্নতির চেষ্টা করবে বৈ কি! এ হলো পুরুষের কথা, মানুষের কাজ। তোমার মত উদ্যমশীল ছেলে আমি ভালবাসি, জ্যোতি। যারা অলস, 'মিন্‌মিনে', তারা কি মানুষ? তারা হলো অসার ছাইয়ের গাদা। তাদের দিয়ে কোন কাজের আশা নেই!"

মাসিমার বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভানু সহসা প্রস্তাব করিয়া বসিল, "জ্যোতিদা, খেল্‌তে চলো না।" সন্ধ্যে হয়ে গেল যে! আজ একটুও খেলা হলো না।"

মাসিমা ছেলেকে প্রচণ্ড ধমক দিলেন, "হুজুগ্‌ না হলে থাকতে পারো না! কীর্ত্তিমান্‌ হয়েছ! যাও, অঙ্ক নিয়ে বসোগে। পাঁচটা অঙ্ক কষে পরে অন্য কথা বলো।"

মাসিমার আদেশ বেদবাক্যতুল্য! এক মিলি ভিন্ন এ পরিবারে আর কাহারো সাধ্য নাই তাহা লঙ্ঘন করে!

মলিন মুখে হাতের র‍্যাকেটখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভানু চলিয়া গেল।

মাসিমা জ্যোতি বাবুকে কহিলেন, "তোমরা বসো, আমি ভানুকে গোটা-কতক অঙ্ক দিয়ে আসি। ছেলেটা ফাঁকিবাজ হয়েছে, চোখের আড়াল হলে কিছু করতে চায় না। রুরু, আমার বোনার কাঠি থেকে ক'টা ঘর সরে গেছে, ঠিক করে দেবে, চল।"

মাসিমা উঠিলেন। জানি, বোনার ওস্তাদ মাসিমার ভুল হইতে পারে না!

মিলিকে নিভৃত আলাপের সুযোগ দিবার জন্য কৌশলে আমাকে সরাইতে চান! মিলি একা শুধু জ্যোতি-বিহঙ্গকে লুব্ধ করিতে জাল বিস্তার করিতেছে না, মাসিমারও চেষ্টার ত্রুটি নাই সে-দিকে! ব্যাধবৃত্তি কেবল বনচারী অনার্য্যের পেশা নয়, সভ্য সমাজেও ইহার প্রভাব কতখানি বিস্তৃত হইয়াছে, কে তাহার সন্ধান রাখে।

৭

বোনার অছিলায় মাসিমা আমাকে লইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু বোনার ধার দিয়াও তিনি গেলেন না। মাসিমার সঙ্গ এড়াইয়া কাপড় ছাড়িবার ঘরে গিয়া আমি ঢুকিলাম। দেখি, জানালার নীচে জ্যোতি বাবু আর মিলি মুখোমুখী বসিয়া। কাচের আবরণ ভেদ করিয়া আমার অনিমেষ দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ রহিল।

অন্যের অগোচরে, অলক্ষ্যে কাহাকেও লক্ষ্য করা—এমন স্বভাব আমার কোন দিন ছিল না। আজ আমার এ কি পরিবর্ত্তন! চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি এক প্রবল আকর্ষণী-শক্তি আমি অহরহ উপলব্ধি করিতেছি। আমার আর সাধ্য নাই, সরিয়া থাকিব! ধীরে ধীরে জানালার পাশে আশ্রয় লইলাম। আমার বুকের মধ্যে যেন ঝড় বহিতেছিল!

শুনিলাম, জ্যোতি বাবু বলিলেন, "আমার দুর্ভাগ্য, তাই আপনি আমার অবস্থা না বুঝে অসন্তুষ্ট হয়েছেন! আপনি জানেন না, কাজের ঝঞ্চাটে কত আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখতে হয়! কি করে জানবেন, এখনো ছেলে-মানুষ। আমার মত বয়স হলে বুঝতে পারতেন।"

উদাস স্বরে মিলি উত্তর দিল, "জেনে আমার কাজ নেই। বয়সের অহঙ্কার অত করবেন না। ভারী তো বয়স আপনার! আমার চেয়ে কতই বা বড়?"

"কতই বা বড়—বলেন কি? আমার বয়সের তুলনায় আপনাকে খুকী বললে চলে। আপনার রাগ কিন্তু খুকীর রাগ নয়। খুকীরা অল্পে রাগে, অল্পে খুশী হয়। কচিখুকীদের 'এক ডিগ্রি' ওপরে যাঁরা, তাদের রাগ বিষম!"

"কে বললে আপনাকে, আমি রাগ করেছি! আর সত্যিই যদি আমার রাগ হয়ে থাকে, তাতে আপনার কি ক্ষতি? আমি কোথাকার কে!

নব-অনুরাগের দীপ্তিতে জ্যোতি বাবুর আঁখি-তারকা ঝক্-ঝক্ করিতে লাগিল; আবেগের সহিত তিনি কহিলেন, "আপনি কোথাকার কে! আর

বেশী বলবেন না মিলি দেবি, আমাকে জান্তে আপনার এখনো বাকী আছে না কি? যাকে আহত করেছেন, তাকে নিয়ে আর খেলা কেন? বলতে ভরসা পাই না যোগ্যতার গৌরব করবার মত আমার কিছু নেই, তবু আকাঙ্ক্ষা আছে! আমার ভালোবাসার জোরে বলতে পারি, মল্লিকা দেবী আমার কাছে 'কোথাকার কে'র অনেক ওপরে। আমার দিকে চেয়ে বলুন, আমার আশা একেবারে দুরাশা?"

মিলি একটু হাসিল। হাসিয়া ঈষৎ মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আপনি তো বলেছেন, এ পর্য্যন্ত কাউকে ধরা দেননি, কেউ আপনার মনে দাগ দিতে পারেনি! এত বড় যে বিজয়ী বীর, তার আশা দুরাশা হবে, এ আমি বিশ্বাস করবো? আমার কি আছে? আমি কতটুকু!"

"কতটুকু, কি আছে, তা আমি জানি না! শুধু জানি, ভালো লেগেচে, ভালো বেসেচি। আমার সব কাজে সব সময়ে সাথী হলে ভাগ্য বলে মেনে নেবো। বলুন, আমাকে আপনি নিতে পারবেন?"

"দিলে নেবো না কেন?" বলিয়া মিলি টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

আমি আর শুনিতে পারিলাম না। আমার পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া যেন এক অসহ্য যাতনা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল! পায়ের তলার কাঠের মেঝেটা যেন হঠাৎ দুলিয়া উঠিল! আমি জানালার নীচে বসিয়া পড়িলাম। আমার আত্মীয়া বান্ধবী মিলির এ সৌভাগ্যে আমি পুলকিত হইতে পারিলাম না, এ কি কম লজ্জা, কম দুঃখ! মনের এ দৈন্য আমি কেমন করিয়া চাপিয়া রাখিব? ঈর্ষার আগুন মনে পুষিয়া মিলির নিত্যদিনের জীবনে সঙ্গিনী হইয়া থাকিব কি করিয়া?

কিছুক্ষণ পরে দ্বারে পদশব্দ শুনিলাম। চকিতে নিজেকে সংযত করিয়া বাহিরে আসিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে চারি দিক্ ভরিয়া গিয়াছে। আমাদের বাসার অনতিদূরে টিনের ঘরে গ্রামোফোনে গান হইতেছে,—

"বিদায় করেছ যারে নয়ন-জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?
ছিল তিথি অনুকূল শুধু নিমেষের ভুল,
চিরদিন তৃষাতুর, পরাণ জ্বলে।"

যে-গ্রামোফোনকে বিষ মনে হইত, সেই গ্রামোফোনের নাকি-সুর আমার কাণে যেন সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। সত্যই তিথি অনুকূল ছিল! ভুল! নিমেষের

ভুল! এ ভুল কে করিল? ভুল বিধাতার! এ ভুল না করিলে কি তাঁহার চলিত না? যে কৌতুক-খেলায় "চিরদিন তৃষাতুর পরাণ জ্বলে," তেমন খেলা তিনি কেন খেলিলেন? এ বিশাল বিশ্ব লইয়া কি তাঁহার আর কোন কাজ ছিল না? কি তাঁহার প্রয়োজন ছিল কুসুম-কোমল করিয়া হৃদয় গড়িবার? গড়িলেন যদি, তবে সে কুসুমে কীটকে বাসা দিলেন কেন?

মাসিমা ডাকিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে করু? তোমাকে আমি খুঁজ্‌ছিলাম।"

মাসিমার নিকটে সরিয়া গিয়া আমি কহিলাম, "এই দিকেই ছিলাম। কি করতে হবে, মাসিমা?"

"কিছু করতে হবে না। এমনি একটা কথা ছিল।"

"কি কথা?"

"কথা এই, জ্যোতিকে তোমার কেমন মনে হয়?"

মিলিও এক দিন এই প্রশ্ন করিয়াছিল। আজ মিলির মা সেই প্রশ্ন করিলেন। সে-দিন পরিহাস করিতে আমার বাধে নাই, আজ সহজ উত্তর দিতে কণ্ঠ জড়াইয়া যায়! কোন মতে আমি বলিলাম, "আমার তো মন্দ মনে হয় না, মাসিমা।"

"মন্দ কিসের! বল যে খুবই ভালো! এমন সচরাচর দেখা যায় না। ছেলেটির ভেতরে ইস্পাত আছে, শাণ দিলে আরো ধার হবে। ওর সম্বন্ধে মিলি তোমায় কিছু বলেছে? মিলির মনের ভাব টের পেয়েছ?"

মিলির বিবাহ-ব্যাপার লইয়া কোন দিনই মাসিমা আমার সঙ্গে আলোচনা করেন নাই। এখন করিতে আসিবেন, ইহা ছিল আমার স্বপ্নের অগোচর! মাসিমা রাশভারী মানুষ, বেশী কথা বলেন না; তুচ্ছ বিষয় লইয়া জটলা করেন না। আজ তাঁহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইলাম। কিন্তু এ গৌরবে গৌরবান্বিত হইতে পারিলাম না। ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "কৈ, মিলি তো আমায় কিছু বলেনি মাসিমা।"

মাসিমা ধমক্ দিলেন, "মুখের বলাই কি বড়? দিনরাত দু'জনে এক সঙ্গে আছ, তোমার বোঝা উচিত। জ্যোতিকে আমি এক-মিনিটে বুঝে নিয়েছি। কিন্তু শুধু জ্যোতিকে নিয়ে তো আমার চলবে না। সকলের আগে মিলির ইচ্ছা-অনিচ্ছা আমাকে জানতে হবে।"

বলিলাম, "জানাজানি দু'দিনের মাসিমা, তাতে সময় লাগে না। তুমি যদি

উপযুক্ত মনে করো, মিলি কোন আপত্তি করবে না। বেশ তো, আমি আজই মিলিকে জিজ্ঞাসা করবো। তোমার পছন্দর কথাও বলবো ?"

"আমার পছন্দ-অপছন্দ আমি বুঝবো,—তার সঙ্গে মিলির সম্পর্ক নেই। এ তো আর আদি যুগের আট বছরে গৌরীদানের যুগ নয়। বিয়েতে মিলিকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছি। যার সঙ্গে মনের মিল হবে, তাকে ও বিয়ে করবে। জ্যোতি থাকৃছে না—কাজেই এর মধ্যে ওদের একটা মীমাংসা হওয়া দরকার। মিলির ঠিক হলে তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে। উপার্জ্জনক্ষম স্বাধীন ছেলে পাওয়া শক্ত। একে আমাদের সমাজে বেশী ছেলে নেই, তাতে আবার একটা ছেলের পিছনে দশটা মেয়ের নজর থাকে!"

মাসিমা আমার অভিভাবিকা, কথাচ্ছলে 'ছেলে-ধরার' যে হিতোপদেশ আমাকে দিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হইল না!

আমি বলিলাম, "বিয়ে করতে আমার ইচ্ছা নেই মাসিমা। বিয়ে আমি করবো না।"

"বিয়ে করবে না, সে কি কথা! এ কথা ভালো নয়। বিয়ে তোমাকে করতেই হবে এবং এখন থেকে তার চেষ্টা করা দরকার।" বলিয়া মাসিমা প্রস্থান করিলেন।

৮

অনেক দিনের পর পড়িবার টেবিলে 'ল্যাম্প' জ্বালাইয়া পড়িতে বসিলাম। লেখা-পড়ায় এখন আমার মন বসে না। কি হইবে মিছা বই মুখস্থ করিয়া? মুখস্থ বুলি আওড়ানো ছাড়া প্রকৃত জ্ঞান কতটুকু লাভ করিতে পারি? যে শিক্ষায় মনে দৃঢ়তা আসে না, চিত্ত সংযত হয় না, সে শিক্ষার কি-বা দাম?

তবে আমাকে উপার্জ্জনের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বাবাকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া বিলাসের লীলা—আমার চলিবে না! আমি ছাড়া বাবার আর কেহ নাই।

মনে মনে বাবাকে স্মরণ করিলাম। মুহূর্ত্তে বাবার শান্ত, সৌম্য মূর্ত্তি আমার চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিল। আমার দুর্ব্বল হৃদয় সবল হইল—সরস হইল।

মনের প্রশান্তি লইয়া আমি বই খুলিয়া থাকিতে পারিলাম না, ভানুর সন্ধানে উঠিলাম।

ভানু নিজের মনে খাতায় হিজিবিজি কাটিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভানু, তোমার আঁক কষা হলো ভাই?"

ভানু বলিল, "না করুদি, ও আমার কিছুতেই হয় না। যত বার কষতে যাই, গুলিয়ে যায়। না পারলে কি শুধু শুধু ভুল করি?"

"পারো না বলেই ভুল হয়, তা আমি জানি ভানু। তোমার মত আমারও ঠিক এমনি হতো। ম্যাট্রিকের সময় এমনি ভুলের জন্য কত বকুনি খেয়েচি। তারপর অঙ্ক ছেড়ে আমি হাঁফ ফেলে বেঁচেছি। তুমিও বাঁচবে।"

"ম্যাট্রিক্ পাশ করতে পারলে তো অঙ্ক বাদ দেবো করুদি, তার আগে যে কষতেই হবে। আমি পারি না, কি করবো?"

"আচ্ছা, আমি দেখ্ছি। এতক্ষণ তুমি কি করছিলে? কিছুই যে করোনি ভানু! শুধু কাকের ঠ্যাং, বকের পালক এঁকে রেখেছ। ছি, এমনি করে সময় নষ্ট করে?"

"কেন করবো না? এটা কি আঁকের সময়? আজ খেলা হলো না, বেড়ানো হলো না। আমার ভারী রাগ হচ্ছে। জ্যোতিদা যেন কি! দেরী করে এসে এখন দিব্যি দিদিতে-ওতে মিলে আড্ডা দিচ্ছে। গল্প আর ফুরোয় না। দিদির সঙ্গে এত কি বকে জ্যোতিদা, বুঝি না।"

"তোমার সঙ্গে যখন গল্প করেছেন, তখন তো তুমি কিছু বলোনি ভানু!"

"তা কেন বলবো? সে তো বিলাতের গল্প। এমনি বাজে বকর-বকর নয়।"

"আজও উনি বিলাতের গল্প করছেন।"

"তা নয় করুদি, বাথ-রুম থেকে আমি সব শুনেছি। জ্যোতিদা দিদিকে বল্ছে, ভালোবাসি, আরো কত কি! মা'র ভয়ে ভালো করে শুন্তে পারলাম না, তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসতে হলো।"

বালকের সত্যভাষণে আমার চক্ষু আনত হইল, ভানুকে কিছু বলিতে পারিলাম না। লুকাইয়া আড়িপাতার বিরুদ্ধে নীতিমূলক উপদেশ দিতে আমার বাধিল! অজ্ঞান বালক বাল-চপলতা বশতঃ যাহা করিয়াছে, বয়স এবং শিক্ষার গর্ব্ব লইয়া আমিও তাহাই করিয়াছি। ন্যায়-অন্যায়ের বিচার কে করিবে? পরের সঙ্গে ছলনা চলে, নিজের সঙ্গে চলে না।

আমার বিমনা ভাবে ভানু ম্লান হইয়া কহিল, "আড়ি-পেতে দিদিদের কথা

শুনেছি বলে রাগ করলে করুদি! আর কখনো শুনবো না ভাই! কখ্খনো না।"

অপরাধী বালককে আমি কোলে টানিয়া লইলাম। ভানুর গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলাম, "আমি রাগ করিনি ভাই। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ অভ্যাস ভালো নয়। আর কোন দিন করো না। এসো, অঙ্ক ক'টা শেষ করে মাসিমাকে দেখিয়ে ছুটি নাও গে।"

"ছুটি পেলে কি হবে! বেড়ানো হবে না তো! রাত হয়ে গেছে।"

"রাত কোথায়! এই সবে সন্ধ্যে। বেশী দূরে না গেলেও তোমাতে-আমাতে সাম্‌নের রাস্তায় বেড়াতে পারবো।"

বেড়াইবার লোভে ভানু খাতা লইয়া বসিল। এবার ভুল হইল না। ভানুর সুবিধার জন্য অনেক সময় আমাকে অন্যায় করিতে হয়। না করিয়া উপায় নাই। ভানু ছেলেমানুষ এবং মাসিমার মেজাজ কড়া।

আঁকের পর্ব্ব চুকিলে ভানুকে লইয়া আমি বাহির হইলাম। বাঁকা পথ চাঁদের আলোয় হাসিতেছে, ঝোপে-ঝাপে অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি। ফোটা ফুলের গন্ধে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। এই বিপুল বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া কি এক অজানা উল্লাসে আমি রোমাঞ্চিত হইলাম। এমন ভরা আনন্দের হাটে সাধ করিয়া কে কাঁদে? সঙ্কীর্ণ মনের অতৃপ্ত পিপাসায় কে ক্ষুব্ধ হয়? হতাশা-পীড়িতের জন্য বিশ্ব-বিধাতা নয়নমোহন শোভা-সম্পদ্ স্তরে-স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ভ্রান্ত মানব কোন দিকে তাকাইতে জানে না। ওই উদার অনন্ত নির্ম্মল নীলাকাশ—চন্দ্রে, সূর্য্যে, নক্ষত্রে দীপ্তিময়, গগনচুম্বী গিরিমালা, পত্র-পুষ্পের শ্যামলিমা, ইহার পরিমণ্ডলে আসিলে মানুষের অশ্রু হাসির শতদলে রূপান্তরিত হয়!

"তুই এখানে করু! আর আমি তোকে সারা বাড়ী খুঁজে এলাম।" বলিতে বলিতে একরাশ বৈশাখী-জ্যোৎস্নার মত মিলি আসিয়া আমাকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিল। আমিও পরিপূর্ণ হৃদয়ে মিলিকে জড়াইয়া ধরিলাম।

মিলি আজ অমরার অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া আসিয়াছে। তাহার দেহে-মনে, আঁখি-তটে সুধার ধারা উছলিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ইহার অংশ হইতে নিজেকে আমি কেন বঞ্চিত রাখিব? মিলি আমার বোন, সখী—তাহার সুখে আমার সুখ। বিজন বনে কত ফুল নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝরিয়া যায়,—ঘন পত্রজালের বিচ্ছেদ-পথ দিয়া সূর্য্যের বিমল-রশ্মি তাদের

মধ্যে ক'টিকে পুলকিত করিতে পারে? ইহাতে কিসের দুঃখ! কিসের ক্ষোভ।

আমি কহিলাম, "কেন আমায় খুঁজছিলি মিলি? তোর খোঁজার জিনিস ধরা দিয়েছে। তাঁকে আঁচলে না বেঁধে কোথায় রেখে এলি?"

মিলি হাসিল। সে-হাসি নবপ্রেম-বিহ্বলা কিশোরীর অস্ফুট বাসনার হাসি নয়—সে হাসি বিজয়ের আত্ম-প্রসাদ!

হাসিতে হাসিতে মিলি বলিল, "বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাবের ঘরে আর সিঁদ কাটিস্‌নে রুরু। 'আঁচল-বাঁধা' উপমাগুলো একেবারে সেকেলে। বরং রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আধুনিক কিছু বল্, মিষ্টি লাগবে।"

"তোর মিষ্টি লাগলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে বৈষ্ণব-পদাবলীর অঙ্গ ভাবতেই আমার ভালো লাগে। তোর মনের মত কবিতা এখনি আমার মনে পড়ছে না, রাত্রে "চয়নিকা" খুঁজে দেখবো। কিন্তু না, জ্যোতি বাবু কোথায় গেলেন?"

"কোথায় আবার! মার কাছে। মা তোকে ডাকছেন। চল্।"

মিলি আমাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

জ্যোতি বাবুর সঙ্গে মাসিমা কথা কহিতেছিলেন। আমাদের অসাক্ষাতে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, তাহারই সূত্র ধরিয়া তিনি বলিতেছিলেন, "পরিবার প্রতিপালনের যোগ্য না হয়ে বিয়ে করা খুবই অন্যায়। বিয়ে বিলাসের জন্য, ভোগের জন্য। অনেকে বলে, ত্যাগের জন্য। আমি তার মানে বুঝি না। ত্যাগই যদি করতে হয়, তাহলে এক জনকে সঙ্গে জড়িয়ে ত্যাগের সার্থকতা কি? যারা অক্ষম, অপারগ, তাদের কখনো উচিত নয়, চিরদারিদ্র্যকে ডেকে আনা।"

জবাব দিতে গিয়া জ্যোতি বাবু আমাদের দেখিয়া থামিলেন, আমার পানে চোখ তুলিয়া বলিলেন, "আসুন। আপনি কোথায় ছিলেন? আপনাকে আত্মীয় মনে করবার অধিকার আমি পেয়েছি।"

আমার বুকখানা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। কোন কথা বলিতে পারিলাম না।

মাসিমা কহিলেন, "ও কি রুরু, চুপ করে রইলে যে! বুঝ্‌তে পারছ না? মিলিকে জ্যোতির পছন্দ হয়েছে,—আমিও মত দিয়েছি। কলকাতায় ফিরে বিয়ের দিন ঠিক করবো।"

মিলি আমার পিছনে ছিল, পিছন হইতে সামনে আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,

"এম-এ পাশ না করে আমি বিয়ে করতে পারবো না মা,—এ কথা ওঁকেও বলেছি।"

"বল্লেই তো হবে না মিলি! তোমার এম-এ পরীক্ষার এখনো এক বছর দেরী। কথা পাকা হবার পর এত দিন অপেক্ষা করা কি সম্ভব? বিয়ে হলেও তোমার অসুবিধা নেই। জ্যোতির কাজ-কর্ম্ম কলকাতাতে—তুমিও স্বচ্ছন্দে ক্লাশ করতে পারবে। বিয়ের পরে আমি যে বি-এ, এম-এ দুটো পরীক্ষা পাশ করেছিলাম। তাও যেমন-তেমন ভাবে নয় সকলের ওপরে।" বলিতে বলিতে আত্মগর্ব্বে মাসিমা প্রদীপ্ত হইলেন।

মিলি বলিল, "তোমার সঙ্গে কার তুলনা হয়, মা? তোমার মত মেয়ে ক'জন আছে? অসুবিধার কথা হচ্ছে না। আমার যা ইচ্ছা তাই বল্‌ছি।"

মাসিমা কহিলেন, "তুমি বললেই হবে না, মিলি,—পূরো এক বছর জ্যোতি কি অপেক্ষা করতে পারবে?"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "কেন পারবো না? বেশ তো, ওঁর পরীক্ষা হয়ে গেলেই বিয়ে হবে।"

৯

রাত্রে জ্যোতি বাবু আমাদের সঙ্গে আহার করিলেন। আমাদের অর্দ্ধ-বাঙ্গালী, অর্দ্ধ-সাহেবী সমাজে বিবাহের বাগ্‌দানের দিন একত্রে আহার করিবার নিয়ম। মাসিমার গৃহে কোন ফিরিঙ্গী-প্রথার ব্যতিক্রম হয় না। হইবার উপায় নাই।

হাসি, গল্পে, গানে রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। নিতান্ত অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়া জ্যোতি বাবু তার পর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহার বিদায়-বিমুখ হৃদয়ের ব্যগ্রতা আমার অন্তর স্পর্শ করিয়া আমাকে বিগলিত করিল। মিলির অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়—মিথ্যা ছল-ছুতায় কেনই বা এক জনকে প্রতীক্ষমাণ রাখা! জগতের চিরন্তন নিয়ম, নবীনের উচ্ছ্বাস বেশী! বর্ষার নব জলধারা দুর্নিবার বেগে বহিয়া যায়। বসন্তের দক্ষিণ বাতাস বাধা-বন্ধ মানে না। আষাঢ়ের নবীন মেঘের যেমন আড়ম্বর, তেমনি উন্মাদনা! কাব্যে পড়িয়াছি, তরুণের হৃদয়ের সদ্য-প্রজ্বলিত প্রেমানল অতিশয় প্রখর। যেখানে প্রজাপতি অনুকূল হইয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনডোর বাঁধিয়া দিতেছে, সেখানে হাতে হাতে বাঁধিতে কিসের বিলম্ব?

মিলির উপর আমার মন মুহূর্ত্তে কঠিন হইল। আমি মিলিকে কহিলাম, "তোমরা দু'জনেই ভালোবেসেছ, পছন্দ করেছে, কেন তবে মিছিমিছি একটা ওজর নিয়ে দেরী করবে? জানো না, শুভ-কাজ ফেলে রাখতে নেই, শীগ্‌গির সেরে ফেলতে হয়। যাকে ভালোবেসেছ, তাকে মিথ্যা কষ্ট দেবে কেন?"

কলহাস্যে মিলি কহিল, "কষ্ট দেওয়া—মানে? কিসের কষ্ট? ভালোবাসার পরীক্ষা নেওয়াও উচিত নয় রুক? জন্মে যাকে চিনতাম না, জানতাম না,—সে এসে প্রেম-নিবেদন করবামাত্র গলে যাবার মেয়ে আমি নই। ইনিয়ে-বিনিয়ে কত লোকই তো কত কি বলেছে, আমি তাতে ভুলি না। আমারো নিজেকে জানতে হবে। ভালো করে জানা-জানির জন্যই একটা বছর হাতে রাখতে চাই।"

বলিলাম, "এ কি ছেলে-খেলা মিলি? তুমি যদি সত্যি সত্যি ওঁকে ভালো না বাসো, তাহলে ভালোবাসার ভাণ করছ কেন? যার ভেতরে সত্যিকারের জিনিস নেই, তাকে গড়ে তোলা যায় না। পৃথিবীতে কে কাকে আগে থেকে চিনে-জেনে রাখে? জীবনের পথে জানা-চেনা হয়। পরিচয় হয়। জানা বাকী রেখে কেউ কাউকে কথা দেয় না। বাগ্‌দান বিয়ের প্রধান অঙ্গ। তোমাদের তা হয়ে গেছে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ তুমি এখন জ্যোতি বাবুর বাগ্‌দত্তা বধূ।"

মিলি খিল্‌-খিল্‌ শব্দে হাসিয়া উঠিল। নির্জ্জন গৃহের স্তব্ধতা সে উচ্চহাসির আঘাতে ভাঙিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে হাসির বেগ থামাইয়া মিলি বলিল, "এ-কালে জন্মানো তোর ঠিক হয়নি রুক, আরো ঠিক হয়নি তোর কলেজে পড়া। তোর জায়গা হলো পাড়া-গাঁয়ে, যেখানে উঠ্‌তে-বোসতে নিষেধের বেড়ি, মান্ধাতার আমলের সনাতনী শাসন! সংস্কারের মোহে তুই একেবারে অন্ধ, আচ্ছন্ন! ধর্ম্ম! ন্যায়! বাগ্‌দত্তা বধূ! খুব বড় বড় কথা শিখে রেখেছিস্। আর রাখবার অপরাধই বা কি? ছেলেবেলায় মিসনারী ইস্কুলে পড়ে যেটুকু বাকী ছিল, মেসোমশায় তা পূরণ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, কথা আমি দিয়েছি, অমন বাচালের মত বক্‌লে মানুষের মনে দুর্ব্বলতা আসে। বিয়ে যে করবো না, তা এখনি বলা আমার কঠিন, তবে যাচাই করে দেখা উচিত।"

"উচিত-অনুচিত জানি না মিলি। ভালো না বাস্‌লে বিয়ে করবে কেন? আমি যেন সেকেলে, আমার মন কুসংস্কারে সঙ্কীর্ণ—যাদের উদার মত, হৃদয়ের

ব্যাপারে তারাই না কি খাঁটী, শুনতে পাই। ছলনা, প্রতারণা সকলেরই ঘেন্নার জিনিস।"

"ছলনা-প্রতারণা করছি নে কক্ক, স্তব-স্তুতির যে মোহ আছে, তাও অস্বীকার করতে পারি না। সাময়িক মোহকে ভালোবাসার পর্য্যায়ে ফেলা চলে না। আমাকে বিবেচনা করতে হবে। ভেবে-চিন্তে না দেখে বিয়ের শিকলে নিজেকে আমি বাঁধতে পারবো না। কিন্তু এ নিয়ে তোরই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? তোর ওকালতিতে আমার খট্‌কা লাগে। মনে হয় ওঁর উচিত ছিল, তোর কাছে প্রস্তাব করা। আমি যা জানি না, মানি না, তুই হলি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার। আমায় লুকোস্ নে কক্ক, সত্যি করে বল্। আমি তোর ওকালতির ফীয়ের ব্যবস্থা করবো। আমার বদলে তোকে পেলে ওঁর লাভ বই লোকসান হবে না। মিলি কৃত্রিম, আমাদের করবী ফুল একেবারে খাঁটি অকৃত্রিম।"

কি জানি কেন, আমার চোখ বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে-বাষ্পে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। মিলি জানে না, বৃথা কাব্য-সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছে! বৃথা সে শর বিদ্ধ করিতেছে! চাহিলেই কি এখানে সব কিছু পাওয়া যায়? দু'জনে দু'জনকে না চাহিলে সে চাওয়া চাওয়াই নয়! সে পাওয়া পাওয়া নয়! নদীর গতি সাগর-অভিমুখে, সাগরের গতি কোথায়, কে জানে? চুম্বক লোহাকে টানে, লোহা কখনো চুম্বককে কাছে আনিতে পারে না। যেখানে প্রাণের যোগ নাই, সেখানে ব্যবধান ঘুচিবে কিসে? মিলিকে বুঝানো শক্ত। কাজেই কোন কথা বলিতে পারিলাম না। অন্ধকার গৃহে বিছানায় পড়িয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মিলি কহিল, "চুপচাপ রইলি যে! 'মৌনং সম্মতি-লক্ষণং' না কি?"

চোখ বুজিয়া জবাব দিলাম, "আমি কি দোষ করেছি মিলি, যে আমাকে এমন করে বিঁধিয়ে মারছিস্?"

"বিঁধিয়ে মারা! দোষ! এর মানে? আমি ঠাট্টা করছি নে! সত্যি, তোর রকম-সকমে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তুই স্পষ্ট করে বল্, তোকে এগিয়ে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াই! মনের খেদ মিটিয়ে তুই প্রেম করে নে।"

নিজেকে আমি আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া কথা বাহির হইল,—"থামো মিলি, আর বলো না। তোমাদের আশ্রয়ে

থাকলেও আমার মান-সম্ভ্রম আছে। কেন আমাকে তুমি অপমান করছ? আমি কি করেছি? এমন করলে সত্যি তোমাদের কাছে আমার থাকা হবে না। তুমি আমার ছোট বোন,—তোমাকে যিনি চাইছেন, তাঁকে আমি চাইতে পারি না। তুমি ওঁকে সুখী করো।"

"সুখী-অসুখীর জন্য আমার এতটুকু মাথা-ব্যথা নেই রুরু, কিন্তু তোর ব্যবহারে সত্যি আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি। এক দিনের ছোট-বড় যে ছোট-বড়র ভেতরে গণ্য হয়, তা আমার জানা ছিল না। আমার অপরাধ হয়েছে, মাপ কর্, আর কক্‌খনো বলবো না। এবার থেকে তোকে 'দিদি' বলে মান্য করবো। মানুষের বয়স বাড়া ঝকমারি! কৈ, এর আগে তো আমার কথায় তোর রাগ হয়নি, চলে যেতে চাসনি! এখন তোর কিছুই সহ্য হয় না!"

অভিমানে মিলির গলার স্বর বুজিয়া আসিল। মিলি বিলাসিনী, লীলাময়ী, অভিমানিনীও বটে, মাসিমার আদরিণী, স্বজনের স্নেহের পাত্রী, আমারো প্রীতির প্রতিমা। ঘরে-বাহিরে অযাচিত আদর-সোহাগের প্লাবনে যে ভাসিতেছে, অভিমান তাহার না থাকিলে কাহার থাকিবে?

মিলির দুর্জ্জয় মানকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারিত না, আমিও পারিলাম না। আমাদের দু'জনের বিছানা সংলগ্ন, হাত বাড়াইয়া মিলির একখানা হাত মুঠায় চাপিয়া আমি কহিলাম, "রাগ করিস্ নে মিলি। দিদি বলে এ বুড়ো বয়সে আর আমাকে তোর সম্মান করতে হবে না। আমরা চিরকাল যেমন আছি, এমনি থাকবো। তোর যা খুশী, তুই বলিস্। কেবল একটা মিনতি, জ্যোতি বাবুর নাম জড়িয়ে কিছু বলিস্‌নে। আমার বিশ্রী লাগে। আমরা কুমারী। কুমারীত্বের শীলতা আছে তো! 'কায়-মন-বাক্যের' নীতি মান্‌তে হয়।"

"নিশ্চয় মানতে হয়। রাম না জন্মাতে রামায়ণ! আমাদের রুরু ঠাকরুণ যদি না মানেন, তবে মানবে আর কে? কুমারী-জীবন বেপরোয়া, কোথাও বন্ধন নেই, আসক্তি নেই—মুক্ত, স্বাধীন। এর আবার নীতি-বিধি? হেটো মালের মত যাচাই, দর-কষাকষির পরে এক জায়গায় স্থিতি হলেই না শান্তি! একটা ছেলের বিয়েয় হাজারটা মেয়ে বাছাই হয়, লক্ষ লক্ষ কথা হয়, তাতে কি কোন মেয়ের মনে ছাপ পড়ে না? তাই বলি, কায়-মন-বাক্য অত ঠুন্‌কো নয়। আমার ঠাট্টার ঘায়ে তা ভাঙ্গে না। তবে তুই যদি বারণ করিস, তাহলে এমনি ধরণের কথা না হয় নাই বলবো।" বলিয়া মিলি মৌন হইয়া রহিল।

এ সব লইয়া মিলির সহিত তর্ক করিতে ইচ্ছা ছিল না, বিশেষতঃ কথায় কথা বাড়িয়া যায়। মিলি জোর-গলায় সাফাই গাহিতে জানে, আমার সে ক্ষমতার অভাব। আমি পদে পদে পরাভব মানি।

অগত্যা আমাকে ঘুমের ভাণ করিতে হইল। মিলি অনেকক্ষণ আমার উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিল,—তার পর বলিল—"ঘুমুলি না কি করু! কথার মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়া তোর চিরকালের রোগ! করু, করু,—নাঃ, রাত শেষ হয়ে এলো।"

১০

সকালে সকলে চায়ের আসরে জমায়েত হইতে না হইতে জ্যোতি বাবু আসিলেন। তাঁহার আগমন আজ অপ্রত্যাশিত নহে! আমরা জানিতাম, তিনি আসিবেন। আকুল আহ্বানে বারি-বিন্দুকে আসিতে হয়, ধরণীর ধূলায় নামিতে হয়। যে ভালোবাসে, না ডাকিতে সে কাছে আসে।

চা খাইতে খাইতে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এখনি একবার দয়া করে আমার সঙ্গে আপনাদের বেরুতে হবে। সাহায্য দরকার। কাল দিদির ফরমাশের ফর্দ্দ পেয়েছি—রং-বেরংয়ের শাড়ী, মালা। আমার পছন্দয় হবে না। পছন্দের বালাই আমার নেই। জন্মে কখনো মেয়েদের জিনিষ কিনিনি। অথচ দিদির মনের মত জিনিষ না হলে রীতিমত মার খাবার ভয় আছে আমার। মার খাবার কথায় আপনারা হাসছেন? সত্যি, বানিয়ে বলছিনে। দিদির আর কোন দোষ নেই, দোষের ভেতর মস্ত দোষ ঐ হাত চালানো। যাদের বেশী ভালোবাসেন, তাদের মারেন বেশী। দিদির ছাওর কমল আর আমি দিদির মারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াই।"

জ্যোতি বাবুর কথা শুনিতে শুনিতে মাসিমার মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিল। এক অপরিচিতা কৌতুকময়ীর কৌতুক-কাহিনী প্রীতির সহিত তিনি গ্রহণ না করিয়া তাচ্ছিল্যভরে কহিলেন, "তোমার দিদি তাহলে একেবারেই শিক্ষা পায়নি! পুরুষের গায়ে হাত তোল্‌বার সঙ্কোচটুকুও নেই?"

পলকে জ্যোতি বাবুর মুখ রক্তিমাভা ধারণ করিল। তীব্রস্বরে তিনি প্রতিবাদ করিলেন, "দিদিকে ভুল বুঝবেন না। দিদি উচ্চশিক্ষিতা না হলেও অশিক্ষিতা নয়। দিদির স্নেহের গভীরতার কাছে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু ভেদ নেই! তাঁকে না দেখলে তাঁর সম্বন্ধে ধারণা করা যায় না। আমার দিদির মত

মেয়ে আর কারো ঘরে আছে কি না জানি না। থাকলে সে-ঘরের সৌভাগ্য বলে মনে করবো।" বলিতে বলিতে শ্রদ্ধায়, গৌরবে জ্যোতি বাবুর চোখ ছল-ছল করিতে লাগিল।

মাসিমা ম্লান হইয়া গেলেন। ভাবী জামাতার ভগিনী-স্নেহে তিনি পুলকিত হইতে পারিলেন না। মাসিমার বাসনা ছিল গগনচ্যুত উল্কার মত, আত্মীয়-স্বজন-হীন, রূপবান্, অর্থবান্ একটি পাত্র তাঁহার করতলগত হইবে। বোঁটা হইতে বিচ্ছিন্ন পাকা ফলের রস মিলি একা আস্বাদ করিবে! তাহার উদ্দাম জীবন-পথে শ্বশুর-কুলের বাধা থাকিবে না! কাকের নীড়ে পালিত বসন্তের কোকিল তাঁহাদেরই নিজস্ব হইয়া থাকিবে! ইহার ব্যতিক্রম-সম্ভাবনায় মাসিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কাঁচা লবঙ্গের গুচ্ছ হইতে কয়েকটা লবঙ্গ লইয়া চিবাইতে লাগিলেন।

এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের মোড় ঘুরাইবার উদ্দেশ্যে আমি জ্যোতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "দিদি আপনার চেয়ে কত দিনের বড়? তাঁর নাম কি? ছেলে-মেয়ে কটি?"

"এক ছেলে এক মেয়ে, প্রবীর আর কঙ্কণ। আমার চেয়ে দিদি দু' বছরের বড়। এই আটাশ বছর বয়স হলো। দিদির নাম চপলা।"

মাসিমা গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তোমার ভগ্নীপতি উকীল? তাঁর পসার কেমন? তোমাকে কি দেখতে শুনতে হয়?"

"না ঠিক তার উল্টো। জামাই বাবু আমার দাদার মত। দিদি আর জামাই বাবুই চিরকাল আমার তদ্বির করে আসছেন। দেশে ওঁদের জমিদারী আছে। জামাই বাবুর আয়ও যথেষ্ট। লোককে খাওয়ানো-পরানো আমার দিদির একটা বাতিক! কঙ্কণ মোটে সাত বছরের, ভালো করে কাপড় পরতে শেখেনি, অথচ তার জন্য কিনতে দিয়েছেন রাশখানেক 'লাশা' শাড়ী। কঙ্কণের খেলার সাথীদের শাড়ী আর মালা না দিলে দিদির তৃপ্তি হবে না। দিদির সব ভালো। এক দোষ শুধু কারণে-অকারণে চড়-চাপড় মারা।"

চায়ের সঙ্গে ভানু নিবিষ্ট মনে জ্যোতি বাবুর বাক্যাবলী গিলিতেছিল। পেয়ালা নিঃশেষ হইলে সে বলিল, "আচ্ছা জ্যোতিদা, দিদি কি মাকেও মারেন? কাকেও বাদ দেন না? এত মার-ধোরে হাতে ব্যথা করে না? আমি ভজুয়া বেয়ারার গালে এক দিন ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে হাতে ভয়ঙ্কর ব্যথা পেয়েছিলাম হাতের সে কি জলুনি!"

ভানুর জ্বালার উল্লেখে আমাদের ভিতরকার থম্‌থমে গুমটের ভাব অকস্মাৎ কাটিয়া গেল। আমরা সকলেই হাসিতে লাগিলাম। মাসিমা সহজে কাহারো হাসিতে যোগ দেন না, কি জানি, কি ভাবিয়া তিনিও একটু ক্ষীণ হাসি হাসিলেন।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "মাকে মারেন না। তাঁর দৌরাত্ম্য অন্য সকলের ওপর। ছেলেবেলায় মা দুঃখ করে বল্‌তেন, মেয়ের চপলা নাম "কেউ যেন না রাখে।" ক্ষেন্তি বলে মার এক ঝী আছে। সে কোলে-পিঠে করে দিদিকে মানুষ করেছিল। বিয়ের পর থেকে সে দিদির কাছেই আছে। দিদি তাকে ভয়ানক ভালোবাসেন। কিন্তু বাস্‌লে কি হবে? সে বেচারী ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে!"

মিলি বলিল, "আপনার দিদি তো বেশ মজার মানুষ! এমন কোথাও শুনিনি! মারধোরে যাঁর এত হাত, তিনি বোধ হয় স্বামীকেও রেহাই দেন না?"

"শুনেচি, ছেলেবেলায় না কি দিতেন না। বারো বছরের মেয়ের সঙ্গে আঠারো বছরের ছেলের বিয়ে হয়েছিল। দু'জনেরই বুদ্ধির দৌড় ছিল খুব। এখন অবশ্য কারুর সাম্‌নে সে-সব চলে না। আড়ালে কি হয়, জানি না।"

মাসিমা বলিলেন, "তোমার দিদিরা কোন্ দিকে থাকেন? ভাড়া বাড়ী? না, নিজেরা বাড়ী করেছেন?"

"সাদার্ণ এভেনিউতে নিজেরা বাড়ী করেছেন। সেই বাড়ীতেই থাকেন। জামাই বাবু বড় একটা প্লট্ কিনেছিলেন। ওঁদের বাড়ী করে বাকী একটুক্‌রোয় আমারও আস্তানা গড়ে দিয়েছেন। দু'টো বাড়ী পাশাপাশি—খিড়কীর দরজা খুল্‌লে এক হয়ে যায়।"

এতক্ষণে মাসিমা নিশ্চিন্ত হইলেন। জ্যোতি বাবু যে দরিদ্র গলগ্রহ আত্মীয়ের নিপীড়নে ভারাক্রান্ত নহেন, এই সত্য তাঁহাকে উল্লসিত করিয়া তুলিল।

মাসিমা তাড়া দিলেন, "তোমরা না বাজারে যাবে জ্যোতি? বেলা বেড়ে যাচ্ছে, মিলিকে নিয়ে চট্ করে ঘুরে এসো। আর এ-বেলা আমাদের সঙ্গে খেয়ো। আপত্তি নয়। পরশু চলে যাবে। আজ-কাল দু'টো দিন মাত্র আমাদের কাছে আছো। এতে আপত্তি শুন্‌বো না।"

"রোজই তো খাচ্ছি! নিত্যি নিত্যি কত খাওয়াবেন! তাই বলছিলাম এ-বেলা না হয়,—তা খাবো'খন। হাঁ, এখনি ঘুরে আসা যাক! এঁরা তৈরি হলেই বেরিয়ে পড়ি।"

মাসিমা মেয়েকে আবার তাগিদ দিলেন, "মিলি, নাও চট্ করে, দেরী করো না। ভানু, তুমি বিকেলে বেরিয়ো, এখন সংস্কৃতর ধাতু-রূপটা মুখস্থ করোগে। রুরু, তুমি আমার সেমিজের হাত-তিনেক লেশ বুনে দাও। আজ-কাল করে তোমায় দিয়ে সেটা হয়ে উঠছে না। কোনো কাজ শেষ না করে ফেলে রাখা আমি ভালোবাসি নে।"

জ্যোতি বাবুর সহিত মিলিকে আলাপনের সুযোগ দিবার জন্যই মাসিমা কাজের অবতারণা করিলেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার বিলম্ব হইল না। বনের পাখীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করিতে কেহ-কেহ ভালো না বাসিলেও অনেকে বাসে। ভ্রান্ত মৃগ ব্যাধের ফাঁদে স্বেচ্ছায়, সানন্দে প্রবেশ করিলে ব্যাধের কি আনন্দ হয় না? সংসারক্ষেত্র মায়া-জাল! সভ্য শিক্ষিত মানুষ শিকারের নাম দিয়াছে প্রেম, পরিণয়। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে সেই মৃগয়া-উৎসব!

মাসিমার ব্যবস্থায় মিলি আবদার করিয়া বলিল, "মা, আমাকেই কেবল তৈরি হতে বল্‌ছো! রুরুকে বলছ না কেন? আমি একলা যেতে পারবো না। আমার ভয় করছে।"

জ্যোতি বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, "ভয়! ভয় কিসের?"

"অভয়ই বা কোথায়? দিদির মার-ধোরের যা গল্প শুন্‌লাম, তাতে তাঁর জিনিষ পছন্দ করতে আমার সাহস হয় না। তিনি আমাদের বাসার কাছাকাছি থাকেন, আমরা ফিরে গেলে, জিনিষ তাঁর পছন্দ না হলে, আমার ঘাড়ে যে বিরেশী-ওজন পড়বে না, তার প্রমাণ? তাই আমি রুরুকেও যেতে বলচি। মার যদি খেতে হয়, দু' বোনে ভাগাভাগি করে খাবো।"

মিলির ভয়ের-অভিনয়ে আমরা হাসিতে লাগিলাম। জ্যোতি বাবু সহাস্যে আশ্বাস দিলেন, "সে ভয় নেই! দিদির হাতের দোষ থাকলেও সেটা পাত্র-বিশেষে। আপনারা ফিরে গিয়ে দিদির সঙ্গে আলাপ করে দেখবেন—কি চমৎকার মানুষ! জিনিষ কেনা বলে বলচি নে, আপনারা সবাই চলুন না, বেড়িয়ে আসা যাক, আজকের সকালটি ভারী সুন্দর, বেড়ানোর মত!

ইহার পর মাসিমা আর আপত্তি করিলেন না।

১১

অলস দ্বিপ্রহরে আমাদের তাসের আড্ডা বসিল। মিলি ভালো 'ব্রীজ' খেলে। অসার আমোদ-প্রমোদে সময়ের অপব্যয় মাসিমা সহিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কখনো কদাচিৎ বন্ধুমহলে 'ব্রীজ' খেলিতে দেখা গিয়াছে। আজ মাসিমা খুব খুশী—সকালে বাহির হইয়া জ্যোতি বাবু মিলির জন্য একটি মূল্যবান্ হীরার আংটি কিনিয়া আনিয়াছেন। শুভ্র হীরকের দীপ্তিতে মাসিমার স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যের আবরণ ঈষৎ ফিকা হইয়াছে।

জ্যোতি বাবু চলিয়া যাইবেন, সময় সংক্ষিপ্ত। ইহারই মধ্যে যতখানি সম্ভব তাঁহাকে মিলির কাছে কাছে রাখিতে মাসিমা ব্যগ্র হইয়া তাসের অবতারণা করিয়াছিলেন। মাসিমাকে ইহাতে দোষ দেওয়া চলে না। ভুলাইবার প্রবৃত্তি নারী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য! জননী অহরহ শিশুকে ভুলাইতেছে, শ্রম-ক্লান্ত প্রিয়কে ভুলাইতে প্রিয়া গৃহাশ্রমে প্রেমের অঞ্চল বিছাইয়া রাখিয়াছে।

মাসিমার আদেশে মিলির দিকে আমাকে বসিতে হইল, মাসিমা বসিলেন জ্যোতি বাবুর পক্ষে।

খেলা কিন্তু তেমন জমিল না। আমার অমনোযোগে এবং অপটুতায় মিলি বিরক্ত হইতে লাগিল। জ্যোতি বাবুর সাম্‌নে নিজের অক্ষমতায় আমি যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম! কিছু দিয়া কাহারো চিত্ত-বিনোদনের শক্তি আমার নাই! আমি কিছুই পারি না! পদে পদে এ অক্ষমতা কাঁটার মত আমাকে বিঁধিতে থাকে! মিলির পাশে আমার স্থান হয় না! আমি নিতান্ত নিষ্প্রভ, নিজের মালিন্যে নিবিয়া আছি!

বৈকালে বেড়াইতে যাইবার জন্য আমার আহ্বান আসিল। জ্যোতি বাবু মিলিকে লইয়া 'বার্চ্চ-হিলে' যাইবেন জানিতাম, কিন্তু আমি উহাদের সঙ্গী হইতে পারিলাম না। প্রেমের সে মায়া-কুঞ্জে আমার প্রবেশাধিকার নাই! সেখানকার প্রতি শিলায়, প্রতি বৃক্ষকাণ্ডে যুগ্মনামের ছড়াছড়ি! সেখানকার অরণ্যানীর ঘন নিবিড়তায়, শৈলমালায় পরিবেষ্টিত জলভারে, ভারাক্রান্ত ধূসর আকাশে, ঝিল্লী-মুখরিত বনভূমিতে কিসের একটা মাদকতা যেন মিশিয়া আছে! সে আবেশের মধ্যে আমার পদক্ষেপ সাজে না! সেখানে যাইবে কাহারা? যাহারা অনুরাগ-সমুদ্রে স্নান করিতেছে, যাহাদের শিরোভূষণে দান-প্রতিদানের শুভ্র তরঙ্গ ভঙ্গ!

ভানু ও আমি বাসায় রহিলাম। আমার অহেতুক ওজর-আপত্তিতে

মাসিমা প্রসন্ন হইলেন। কিন্তু এক জনের প্রসন্নতা অপরকে যে কি পরিমাণে বিষণ্ণ করিল, তাহা মাসিমার অজ্ঞাত রহিয়া গেল। দেহ আমার গৃহে আবদ্ধ থাকিলেও মন উধাও হইয়া বাহিরে গেল। মানুষের দেহ আসল নয়। যেখানে মনের অধোগতি, দেহের নির্ম্মলতা সেখানে মূল্যহীন।

নিত্যকার কাজকর্ম্ম সারিতে দিনের আলো নিবিয়া আসিল। 'জলা পাহাড়ের' উপরে শঙ্করের শিরে শশিকলার মত বাঁকা চাঁদ উদয় হইল। চাঁদের আলোয় পৃথিবী আজ হাসিতে পারিল না। না পারিলেও মুগ্ধ, বিবশ নদ, নদী, স্থাবর-জঙ্গম আমারই মত নির্নিমেষে চন্দ্রলেখার পানে চাহিয়া আছে। নিরাশার কৃষ্ণপক্ষ ক্ষয় পাইয়া আশার শুক্লপক্ষ আসে, জগৎ আবার হাসে। কিন্তু প্রকৃতির হাসির সহিত মানুষের হাসির যোগসূত্র অব্যবহিত থাকে না।

সন্ধ্যার পর মিলিরা ফিরিয়া আসিল। জ্যোতি বাবু আমার কাছে আসিয়া একগুচ্ছ বন-ফুল আমার দিকে প্রসারিত করিয়া হাসি মুখে বলিলেন, "করবী দেবী, এই নিন, আপনার প্রতীক্ এনেচি। এই ছোট ফুলগুলি ঠিক আপনারি মত পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। মিষ্টি গন্ধ কিন্তু লুকোতে পারে না!"

কম্পিত হৃদয়ে তাঁহার উপহার আমি গ্রহণ করিলাম, কিন্তু চিত্তের চাঞ্চল্য দমন করিয়া ভদ্রতাসূচক কোনো কথা বলিতে পারিলাম না। আমার মুখ মৌনব্রত অবলম্বন করিলেও মুখর অন্তস্তল হইতে উত্থিত হইতে লাগিল, ওগো দাতা, তোমাকে ধন্যবাদ! আজিকার দিনে আমাকেও তুমি বঞ্চিত করিলে না। তোমার মানসীকে তুমি যাহাই কেন দাও না, আমিও তাহার অংশ পাইয়া ধন্য হইলাম। হোক এ তুচ্ছ বন-ফুল, তবু ইহারই সৌরভে আমার পূজার মন্দির ভরিয়া থাকিবে। তোমার সর্ব্বস্ব লইয়া মিলি রাণীর সম্পদ্ উপভোগ করুক, আমার তাহাতে কিসের দুঃখ? আমিও পাইয়াছি! পাওয়ার এ গৌরবে আমার স্থান আমি অটল রাখিতে পারিব।

পরের দিন বিদায়-মুহূর্ত্ত আসিল। আমাদের সকলের অন্তরাকাশ অকাল-বর্ষার ঘনছায়ায় আচ্ছন্ন হইল। জ্যোতি বাবুকেও বিষণ্ণ দেখাইতেছিল।

ষ্টেশনে বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। সজল নয়নে রুমাল উড়াইয়া আমরা বিদায়-পর্ব্ব সমাধা করিলাম।

জ্যোতি বাবুকে বহন করিয়া গাড়ীখানা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া

গেলে ভানু ছল-ছল চোখে কহিল, "আর ভালো লাগছে না! জ্যোতিদার সঙ্গে চলে গেলেই আমাদের বেশ হতো। আমরা কবে যাবো মা?"

মাসিমা আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, "আর দু'সপ্তাহ আমরা এখানে থাকবো, তা তো জানো! জিজ্ঞাসা করি, এটা কি মাস? তোমার পরীক্ষার কত বাকী? কেবল হাওয়া খাওয়াবার জন্য তোমাকে এখানে আনিনি। পড়া তৈরি করবে বলে কলকাতার হুজুগের ভেতর থেকে এনেছি। এত দিন জ্যোতির সঙ্গে দিব্যি জমিয়ে তুলেছিলে, এবার নিজের চরকায় তেল দাও।"

মায়ের তিরস্কারে ভানু বিমনা হইয়া বাড়ীর পথ ধরিল।

মিলি কহিল, "তুমি ভানুর সঙ্গে যাও মা, আমরা 'বাতাসীর' দিকে একটু এগিয়ে যাই।"

আমি অন্তর্যামী না হইলেও মাসিমার মনোভাব বুঝিলাম। তিনি ভাবিলেন, জ্যোতি বাবুর বিরহে মিলি বিবশ হইয়াছে! অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিবার জন্য প্রিয়-পদাঙ্কিত পথে ঘুরিয়া আসিতে চায়!

তাই অমত করিলেন না! যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেলেন, "আজ তোমাদের চুল শুকোনো হয়নি! ভিজে চুল বেঁধে এসেছো, শুকিয়ে নিয়ো।"

কয়েকটি স্মরণীয় সন্ধ্যায় জ্যোতি বাবুর সঙ্গে যে-জায়গায় বেড়াইয়াছিলাম, তাঁহাকে বিদায় দিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইলাম। আমাদের সম্মুখে বঙ্কিম পথ প্রসারিত, দূরে-নিকটে শ্যামল অরণ্যের ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-বড় শৈলমালা উঁকিঝুঁকি দিতেছে। পাহাড়ের গহ্বর হইতে ধূমাকার মেঘ ধীর-মন্থর গতিতে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। মেঘে সমারোহ আছে, কিন্তু বর্ষণের সম্ভাবনা নাই! পথ নীরব নিস্তব্ধ। দুই-একটি মাত্র পথিক। অদূর-উপত্যকায় পাহাড়ী-গাভী চরিতেছে।

বিরহের একটা রূপ আছে, যাহা আনন্দ-উল্লাসের চেয়েও মনোহর! রূপ আছে, এই জন্যেই বৈষ্ণব-কবিতার বিরহ এত হৃদয়গ্রাহী! উমার তপঃকৃশা, বিরহিণী মূর্ত্তিতেই না উমানাথের ধ্যান ভাঙ্গিয়াছিল!

আমার প্রতিদিনের দেখা জানা মিলিকে আজ আমারি স্বতন্ত্র, সুদূর মনে হইতে লাগিল। কবিতায় পড়া বিরহিণী যক্ষ-বধূর প্রতিচ্ছায়া মিলিতে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। মিলির বেদনা আমাকে ভিতরে-ভিতরে বিগলিত করিয়া

তুলিল। তাহার একখানি হাত আমার হাতে জড়াইয়া আমি বলিলাম, "তোর খুব কষ্ট হচ্ছে মিলি, না?"

"কিসের কষ্ট করু?"

"কিসের তা কি আমায় বলে দিতে হবে? আমি যদি তোর মত ভালো গাইতে পারতাম, তাহলে গাইতাম, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।' তুই যতই লুকোবার চেষ্টা করিস না কেন, তোর চেহারায়, বেশ-ভূষায় মূর্তিমান্ বিরহ ফুটে বেরুচ্ছে!"

চলিতে চলিতে মিলি বলিল, "তাই না কি? শুনে খুশী হলাম। সারা-সকালটা তাহলে আমার অপব্যয় হয়নি!"

"অপব্যয়?"

"অপব্যয় বৈ কি! প্রথম নম্বর, চুল পরিষ্কার থাকা সত্বেও সাবান দিতে হয়েছে। রং-বেরংয়ের শাড়ী হাতের কাছে রেখে বাক্সর তলা থেকে কালো নীলাম্বরী খুঁজে বার করতে হয়েছে। তার পর মুখে-চোখে রাখতে হয়েছে নির্লিপ্ত বৈরাগ্য! তবে না সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছি!"

চমকিয়া মিলির দিকে তাকাইলাম—তরুণতায় দীপ্ত, প্রতিভায় উজ্জ্বল সে-মুখে আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু মিলিল না। সে-মুখে বেদনা নাই, বিষাদ নাই, আপনার গৌরবে সে-মুখ গৌরবান্বিত! কিশোরীর বিহ্বলতা, নারীর কোমলতা সে-মুখে খুঁজিয়া পাইলাম না। এই নারীকে জ্যোতি বাবু তিলে তিলে ভালোবাসিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! ইহারই বিচ্ছেদে বিরস চিত্তে স্মৃতির ধ্যান করিতেছেন! এ নারী কোনো নরের ভালোবাসার নয়, বিরহ-মিলনের নয়, এ পাষাণ! এ পাষাণে ফুল ফোটে না, শ্যামল তৃণলতা আসন রচনা করিতে পারে না! মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রের ন্যায় শুধুই দাহ করিবার শক্তি ইহার আছে, স্নিগ্ধ সরল করিবার ক্ষমতা নাই!

পথের বাঁকে থামিয়া মিলি কহিল, "চল্ করু, ওই গাছের ছায়ায় বসে চুল শুকিয়ে নি। ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগছে না "

"না লাগে তো এলি কেন? ঘর কি অপরাধ করেছিল?"

পথের পাশে ছায়া-সুশীতল একখানা পাথরে বসিয়া মিলি বলিল, "ঘরের অপরাধ নয়, তোরা যে আমার এমন উদাসী ভাব দেখ্‌বি বলে আশা করেছিলি, তোদের কল্পনাকে বাস্তব করবার চেষ্টা করবো না? প্রিয়র চলার পথে এসে মাকে আনন্দ দিয়েছি, তুইও খুশী হয়েছিস্, এইটেই আমার লাভ, করু।"

আমি মিলির নিকটে বসিলাম, কিন্তু আমার মন বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। কি এ হৃদয়হীন অভিনয়! কোথায় ইহার শেষ?

মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, এ সম্বন্ধে আর কখনো মিলির সঙ্গে আলোচনা করিব না। মিলি অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হয়, আমার কি? আমি গরীবের মেয়ে, বড়লোকের খেয়ালের সহিত আমার কিসের যোগাযোগ? জ্যোতি বাবুর পক্ষ লইবার আমার কিসের প্রয়োজন? তিনি আমার কে?

আমার ভাবান্তর মিলির অগোচর রহিল না। পিঠের উপর খোঁপা এলাইয়া দিয়া হাতের 'ভ্যানিটি-ব্যাগ্' খুলিতে খুলিতে সে বলিল, "রাগ হলো?" 'কথা কও কথা কও, অনাদি অতীত এ 'দুপুরবেলা' কেন বসে চেয়ে রও?' মুখের আগল খুলিয়া সখি, আমারে গালি দাও।"

যাহার উপর রাগ করিয়াছি, তাহারই ব্যঙ্গে আমার মুখে হাসি আসিল। হাসিলাম বটে, কিন্তু মনের ঝাঁজ চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। তিক্ত কণ্ঠে বলিলাম, "লোকে পাশ-করা মেয়েদের নামে যে নানা অখ্যাতি রটায়, তা মিছে নয়! এই তো তার নমুনা!"

মিলি হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এক জন পাশ-করা মেয়ের ব্যবহারে সব শিক্ষিতা মেয়েকে অপবাদ দেওয়া চলে না! আমি ক'দিন আগে বি. এ. ডিগ্রী নিলেও কারুর সাধ্য নেই শ্রীমতী করবী দেবীকে মূর্খ বলে! অথচ আমাদের দু'জনায় কত অমিল!"

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

চুলে চিরুণী চালাইতে চালাইতে মিলি বলিল, "তুই শুধু শুধু রাগ করে কি করবি? তোতে আমাতে তফাৎ এইখানে। নে, চুল খুলে দে, চুল শুকোতে গিয়ে বাজে তর্কে দরকার নেই।"

বলিলাম, "আমার চুল তোর মত পথে-ঘাটে দেখানোর মত নয়! এমনি শুকিয়ে যাবে। তুই এখন চট্ করে সেরে নে। কন্কনে হাওয়া বইছে। বসে থাকতে পারছি নে।"

মিলি পরিপাটী করিয়া এলো খোঁপা বাঁধিল। মুখ মুছিয়া 'পাউডার' ঘষিতে ঘষিতে কহিল, "শীত করছে। শালখানা কোলে না রেখে গায়ে দিলেই হয়! বেশ নিরিবিলি জায়গাটা, আমার উঠ্‌তে ইচ্ছা করছে না। বাতাসীতে আর যাবো না, এইখানে বসেই তোর মিষ্টি গলার ক'টা গান শুনি।"

এমন অসময়ে মিলি কোনো দিন আমার গান শুনিতে চাহে নাই। চঞ্চল

স্বভাবের জন্য সে অকারণ বসিয়া থাকিতে পারে না। অকস্মাৎ আমার মনে সন্দেহের ক্ষীণ মেঘ সঞ্চারিত হইল। আমি বোধ হয় মিলিকে ঠিক ধরিতে পারিতেছি না! সে ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু জানাইতে চায় না। আমি কেবল মুখচোরা নহি, নির্ব্বোধ। অন্তরের অব্যক্ত ভাবের চেয়ে মুখের মিথ্যা-ভাষণকে বৃহৎ ভাবিতে শিখিয়াছি। যাহা জানি না, ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি লইয়া তাহার বিচার করিবার কি স্পর্দ্ধা আমার আছে? আমার সঙ্কীর্ণ মনে সন্দেহই আগে জাগে।

বলিলাম, "বাজনা না হলে আমার গলায় সুর বেরোয় না, তা তো জানিস্ মিলি। আমাকে দিয়ে কিছুই হয় না। তুই গা, আমি শুনি।"

ছড়ানো জিনিষপত্র 'ভ্যানিটি-কেসে' তুলিয়া মিলি কহিল, "উল্টো চাপ! আমাকে গাইতে হবে? বেশ, ওতে আমার আপত্তি নেই। কি শুন্‌বি? তুই পুরোনোর ভক্ত। পুরোনো গান শোন্—

দিবস-রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি,
তাই চমকিত মন, চকিত শ্রবণ, তৃষিত আকুল আঁখি।"

১২

দিন-তিনেক পরে জ্যোতি বাবুর চিঠি আসিল। আমাদের সকলকেই স্মরণ করিয়া তিনি চিঠি লিখিয়াছেন।

তরুণ প্রেমিক সরল সুললিত ভাষায় মিলির কাছে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। গিরি-পথে তিনি যে প্রস্ফুটিত গোলাপ কুড়াইয়া পাইয়াছেন, ভাবের আবেগে, ভাষার ঝঙ্কারে তাহার স্তব গাহিয়াছেন। ইহা ভালোবাসার চিরন্তন অন্ধ রীতি! প্রীতির অঞ্জন নয়নে না আঁকিলে কেহ কাহাকেও এত সুন্দর দেখিতে পারে না! তাঁহার ফুটন্ত গোলাপের পাশে ক্ষুদ্র বন-ফুলটিকেও তিনি ভোলেন নাই! ঈষৎ নীলাভ কাগজে জড়ানো অক্ষরে আমাকে লিখিয়াছেন—

"আপনাদের সুন্দর স্মৃতি পাথেয় করিয়া আমার যাত্রা-পথ নিরাপদ মধুর হইয়াছে। এখানে নানা কাজের মধ্যে সর্ব্বদা আপনাদিগকে মনে পড়িতেছে। মনে হইতেছে, কোথায় যেন আমার অতি-বড় সম্পদ্ ফেলিয়া আসিয়াছি। সেই হারানো সন্ধ্যা, মেঘাচ্ছন্ন প্রভাত দূর হইতে আজও আমাকে হাতছানি দিয়া ডাকে। হিমালয়ের মায়ায় আমি অভিভূত! দূরত্বের ব্যবধানেও আমার

সাধ্য নাই তাহার গণ্ডী অতিক্রম করি! আজ স্বীকার করিতে সঙ্কোচ নাই, আপনাদের সান্নিধ্য আমাকে নূতন জগতে আনিয়াছে। তাই আমার আনন্দ-উদ্দীপনার সীমা-পরিসীমা নাই। আমি আপনাদের সকলকে পাইয়া গৌরবান্বিত।

সংসার-ক্ষেত্রে নারীকে প্রেয়সীরূপে পাওয়াকেই আমি চরম সৌভাগ্য ভাবিতে পারি না! মানুষ পায় চারি দিক্ হইতে। কত জন কত দিক্ হইতে আসিয়া জীবনের ধারাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে।

মিলিকে পাওয়া আমার পক্ষে যে কি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। কিন্তু আমি বলিতে চাই, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া আপনার অপরিসীম প্রীতি ও সৌজন্য লাভ করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। মিলিকে মনে করিতে লইলে আপনার স্নেহবিহ্বল অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি চোখের সাম্‌নে উদিত হইয়া অমৃত-ধারায় আমাকে অভিসিঞ্চিত করে।"

চিঠি পড়িয়া আমার তৃপ্তি হইতেছিল না! কাগজের বুকে কালির অক্ষর তুচ্ছ নয়, সে-অক্ষরে মন ধরা পড়ে। তিনি যে আমাকে এমন উচ্চাসনে বসাইয়া এতখানি শ্রদ্ধা করেন, অক্ষরের ইঙ্গিতেই না আজ তাহা প্রকাশ পাইল! যে যাহাই বলুক, আমি বলি, হস্তাক্ষরের মধ্য দিয়া মানুষের স্বরূপ চেনা যায়। তাঁহার অক্ষরের স্বচ্ছন্দ অকস্মাৎ আজ আমার শিরে বিজয়-মুকুট পরাইয়া দিল!

'প্রেয়সী-রূপে' পাওয়াকেই তিনি পরম সৌভাগ্য মনে করেন না! জীবন-ধারায় বারিবিন্দুর মত তিনি আমাকেও পাইয়াছেন! এমন মিষ্ট করিয়া কেহ আমাকে এমন কথা বলে নাই! এ পর্য্যন্ত বলিতে পারে নাই! আমার এ আনন্দ আমি কাহাকে জানাইব? আমি আর তৃণাদপি তৃণ নই, তুচ্ছ নই, ক্ষুদ্র নই। জগতের একটি লোক অন্ততঃ আমাকে শ্রদ্ধা করে। আমি করুণাময়ী অন্নপূর্ণা! ওগো আমার দরদী বন্ধু, তুমি আমাকে সোনার চোখে দেখিয়া তোমার হৃদয়ের পটভূমিতে স্বর্ণতুলিকায় যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছ, আমি যদিও তাহা নই, তবু হইবার চেষ্টা করিব। তোমার রংয়ের পট মলিন হইতে দিব না। তোমার করপুটে যে শ্রদ্ধার অঞ্জলি রচিত হইয়াছে, তাহাই আমার সম্বল রহিবে। দুঃখিনী করবী ইহার অধিক আশা রাখে না, রাখিতে পারে না! ওগো দাতা, আমি যেন তোমার দানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি!

চোখের সাম্‌নে চিঠিখানা মেলিয়া আমি তাঁহার অঙ্গুলির স্পর্শ উপলব্ধি

করিতেছিলাম, এমন সময় মিলি আসিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিল, "কি রে করু, চিঠি নিয়ে যে একেবারে তন্ময়! যাই বলিস, লেখার বাঁধুনি আছে। আমাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখেছে বটে, কিন্তু তোর কাছেই কবিত্ব ফলানো হয়েছে। তোর উপর লোভের আর অন্ত নেই! ওর টান্ আমাদের দু'জনের উপরেই! কাউকে হাতছাড়া করতে চায় না!"

মিলির মন্তব্যে আমার লেশমাত্র ক্ষোভ হইল না। আমার চিত্ত-দাহ নিবিয়া গিয়াছে।

বলিলাম, "সকলকে পেতে চাওয়া সংসারের ধর্ম্ম, মিলি, এতে জ্যোতি বাবুর দোষ নেই। শুধু স্ত্রীকে নিয়ে কারুর জীবন কাটে না, স্ত্রীর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক চাই; পরিমণ্ডল চাই। পাতায় ঢাকা ফুলই বেশী সুন্দর। আবার তোড়া বাঁধতে গেলেও পাতা না হলে মানায় না। তুই তো তাঁর মনের বনে ফুল হয়ে ফুটে আছিস্, আমি তোর আবরণ-পাতা ছাড়া আর কিছু নই। ফুল নিয়ে পাতাকেও তিনি ফেলে দিতে চাইছেন না, এর জন্য রাগ করিস কেন?

"মা গো, এত কথা তুই শিখ্‌লি কবে করু? চিরকেলে মুখচোরার কথার ছটায় আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি! ও আমাদের দু'জনকেই চায়, এতে রাগ করবো কেন? তিব্বতে সবগুলি ভাইয়ের এক বৌ হয়। বাংলা মুল্লুকে আমরা না হয় নতুন আইন পাশ করিয়ে সব বোনের এক স্বামী করবো! না, না, ফোঁশ্ করতে হবে না, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিলাম। আমি যদি ফুল হয়ে থাকি, তাহলে তোকে পাতা হতে দেবো না, তুই চিরকাল হয়ে থাকবি সে-ফুলের পরাগ! কিন্তু না, ফষ্টি-নষ্টি রেখে এখন চল্ চিঠির জবাব দিতে হবে। এ অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারতের জবাব দিতে আমি একা পারবো না।"

"পারবি না কি-রকম! খুব পারবি! ওটা ধারের জিনিষ নয়! ওতে ভাগ চলে না। আমি জানি, তুই কাগজ-কলম নিয়ে বসবামাত্র মহাভারতের উত্তরে রামায়ণ লিখে ফেলবি। এখনি আরম্ভ না করলে বেড়াতে বেরুনো হবে না।"

হতাশ স্বরে মিলি কহিল, "বেড়াতে আর ভালো লাগে না, দার্জ্জিলিং বড্ড একঘেয়ে হয়ে গেছে। সেই একই পাহাড়, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, উঁচু-নীচু রাস্তা কত কাল আর ভালো লাগতে পারে? মা'র নড়বার নাম নেই! আমি হাঁপিয়ে উঠেছি।"

"হাঁপানো কেন? মন টেঁকছে না বললেই মাসিমা যেতে রাজী হবেন।"

"আমার বলা ঠিক হয় না করু, ভানুকে সঙ্গে নিয়ে তোরা বল্‌গে। আমি বললে মা ভাববেন, তাঁর ভাবী জামাইয়ের বিরহে মেয়ে পাগল হয়ে গেছে।"

"যদি ভাবেন, তাতে নিন্দার কিছু নেই! পাগল হওয়াটা এ-ক্ষেত্রে স্বাভাবিক।"

"স্বাভাবিক অত শস্তা নয়। আমার ভালো লাগছে না, মাকে এর ও অর্থ করতে দেব কেন? তোকে লুকিয়ে কি হবে? তুই আমার কি না জানিস্? কথা হচ্ছে, স্তাবক না হলে আমার সময় কাটে না, এটা কেমন অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এ দেশে আলাপ করবার মতন আর একটা লোকও খুঁজে পাচ্ছি না। মুস্কিল হয়েছে ওইখানে।"

আমার হৃদয়ে আবার আঘাত লাগিল। কল্পনার স্বর্গ নিমেষে মিলাইয়া গেল। সন্দেহে, সংশয়ে আমি মিলির দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

মিলি বলিল, "নীতিবাগীশ, তোর চিন্তা নেই, আমি যাই বলি না কেন, তুই ঠিক থাক্‌লেই হলো। তাকে সুখী করবার তোর সাধু ইচ্ছা এক দিন জয়যুক্ত হবে। এখন চ, চিঠি লিখিগে। আমাতে ভাবের অভাব, তোতে ভাব প্রচুর। লিখতে হলে তোর ভাবের ঘরে আমাকে চুরি করতেই হবে!"

বলিতে বলিতে মিলি আমাকে ধরিয়া লইয়া চলিল।

সেই দিনই মাসিমার নিকটে আমরা তিন ভাই-বোন কলিকাতায় ফিরিবার প্রস্তাব করিলাম। মাসিমা নিতান্ত নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই আমাদের কথায় সম্মতি দিতে বিলম্ব করিলেন না।

১৩

জিনিষপত্র বাঁধা-ছাঁদা, বাক্স-পেঁটরা সাজানো-গোছানোর মধ্য দিয়া কটা দিন অতিবাহিত করিয়া অবশেষে আমরা রওনা হইলাম।

ষ্টেশনে জ্যোতি বাবুকে দেখিয়া হৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিল। সারা পথ ইহাই আমি কামনা করিতেছিলাম।

ভানু সকলের আগে অকৃত্রিম উল্লাসে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তাহার পর আরম্ভ হইল আমাদের সহিত স্বাগত-সম্ভাষণ।

মাসিমার দরোয়ান দুখানা ট্যাক্সি লইয়া আসিল। মোট-ঘাট লইয়া আমরা ট্যাক্সিতে উঠিলাম। জ্যোতি বাবুর 'টু-সীটারে' মাসিমা মিলিকে বসাইয়া দিলেন। আমার বক্ষ স্পন্দিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য আমি

প্রস্তুত ছিলাম না। প্রস্তুত না থাকিলেই বা কি? মিলির সৌভাগ্যকে আমি অভিনন্দিত করিয়া লইয়াছি,—তবু কেন এ অশান্তি?

নিজের প্রতি ধিক্কারে, ঘৃণায় জ্বলিতে জ্বলিতে কত দিনের পর আবার সেই চির-পরিচিত আবাসে প্রবেশ করিলাম। যেখানে যাহা রাখিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি পড়িয়া আছে। জড়-পদার্থের পরিবর্ত্তন নাই। পরিবর্ত্তন মানব-হৃদয়ের! এ সেই গৃহ,—যেখানে আমি মিলির কঠোর সমালোচক হইয়া নিজের পবিত্রতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম। সে গৌরব বিসর্জ্জন দিয়া, নিতান্ত দীনহীনের হৃদয় লইয়া আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। গৃহ আমাকে আশ্রয় দিবে, শান্তি দিতে পারিবে না! যে-দিন যায়, তাহা আর ফিরিয়া আসে না। মাস, বর্ষ, দিন, রাত্রি, ঋতুর সমারোহ নিত্য যায়, নিত্য আসে। আসে না শুধু অতীতের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য! থাকিয়া-থাকিয়া হারানো দিনের স্মৃতি কেবলই উন্মনা করে।

"করু!"

মাসিমার আহ্বানে আমি চকিত হইলাম। মাসিমা কহিলেন, "এখন তোমাকে বিশ্রাম করতে দিতে পারছি নে। জ্যোতিকে চা খাইয়ে দিতে হবে। মিলিকে নামিয়ে দিয়েই সে চলে যাচ্ছিল, আমি বসিয়ে এসেছি। কোথায় কি আছে, খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তোমায় কিছু করতে হবে না মাসিমা। আমার সব ঠিক আছে। আমি যাচ্ছি।" বলিয়া আমি অগ্রসর হইলাম।

মাসিমা বলিলেন, "কি দিয়ে চা দেবে? ভজুয়াকে পাঠিয়ে দোকান থেকে খাবার আনিয়ে নাও।"

বলিলাম, "কিছু আনাতে হবে না। 'টিফিন'-বাক্সে আমার সব গোছানো আছে। বোতলে করে চাট্টিখানি চিঁড়ে ভাজাও এনেছি।"

"ভারী গোছালো মেয়ে! লক্ষ্মী মেয়ে!" বলিতে বলিতে মাসিমা প্রস্থান করিলেন।

তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইলাম। রাস্তার কাপড়ে খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

ভানু, মিলিকে জ্যোতি বাবুর কাছে রাখিয়া মাসিমা চাকরদের লইয়া গৃহ-সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আমি ঘরে ঢুকিতেই জ্যোতি বাবু কহিলেন, "আসুন করবী দেবী! এতক্ষণ আমি আপনার আশা-পথ চেয়ে

রয়েছি! জানি, দেবীর খালি হাতে আবির্ভাব ঘটে না, এক হাতে গরম চায়ের বাটি, আর এক হাতে মেঠাই-মণ্ডা! সত্যি, বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই আপনি এত জোগাড় করলেন কোথা থেকে? দেখছি, এ-লোভীর চিঁড়ে ভাজা আনতে ভুল করেননি! এত আপনার মনে থাকে?"

হাসিয়া তাঁহার সাম্‌নে রেকাবি নামাইয়া আমি চা ঢালিতে লাগিলাম।

মিলি কহিল, "যে জিনিষটি যে খেতে ভালবাসে, ও কখনো তা ভোলে না। ভানু পায়েস ভালোবাসে, হপ্তায় তিন দিন করু পায়েস রান্না করে খাওয়ায়। রোজ আমার টাট্‌কা ডালমুট্ যে কোথা থেকে আসে, তা জানি না! যেমন পাই, তেমনি খেয়েনি। ওর মতন খাওয়ানোর বাতিক কারো নেই।"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "যাঁরা নিজের কথা ভুলে পরের বিষয় বেশী ভাবেন, এই গুণটি তাঁদের থাকে। সাধে আমি ওঁর নাম দিয়েছি 'অন্নপূর্ণা'! উনি সত্যই সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!"

জ্যোতি বাবুর অত্যাধিক প্রশংসায় আমার বাহিরটা আরক্তিম হইল কি না জানি না, অন্তর কিন্তু লালে লাল হইয়া গেল! আমার প্রদত্ত খাদ্যে তিনি পরিতৃপ্ত,—ইহার চেয়ে আনন্দের আর কি আছে! আমার পুঁজি সামান্য, আকাঙ্ক্ষাও অল্প।

চামচ দিয়া ডিমভাজা ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভানু সায় দিতে লাগিল, "করুদি খুব ভালো! আমি সক্কলের চেয়ে করুদিকে ভালোবাসি।"

"তা আর বাস্‌বে না কেন! রোজ রোজ পায়েস পেলে সবাই বাসে।" বলিয়া জ্যোতি বাবু হাসিলেন।

ভানু প্রতিবাদ করিল, "তা নয়, করুদি তো সব্বাইকে খাওয়াতে ভালোবাসে। চাকরদের অবধি কাছে বসিয়ে খেতে দেয়। লক্ষ্মী মেয়ে বলে সবাই ওকে ভালোবাসে। আপনিও তো বাসেন, আমি বুঝি তা জানি না?"

কি জ্বালাতন! ছেলেটা আমাকে এখানে থাকিতে দিবে না? সসঙ্কোচে আমি ভানুকে ধমক দিলাম—"চুপ করে খেয়ে নাও ভানু, তোমার চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল। ঠাণ্ডা চা খাওয়ার চেয়ে না খাওয়া ভালো।"

ভানু অপ্রতিভ হইয়া চায়ের পাত্র তুলিয়া লইল।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "ভানুর অভ্যাস আমার দিদির মত। দিদি চা'র ভক্ত নন, কালে-ভদ্রে সর্দ্দি-কাশি হলে খান বটে, তাও একেবারে জুড়িয়ে জল

করে নিয়ে। বল্‌লে বল্‌বেন 'যাতে যা শোভা পায়, তাই করতে হয়। ভগবান্ মানুষের ঠোঁট নরম ক'রে গড়েছেন, নরম কথা বেরুবে বলে! সে ঠোঁটকে গরম ছ্যাঁকা দেওয়া সাজে না।' দিদি ভারী মজা করে বানিয়ে কথা বলতে পারেন, শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ যায়।"

মিলি কহিল, "খুব মজার লোক তো!"

ভানুর খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, রুমালে মুখ মুছিয়া সে বলিল, "আমাদের বাড়ীতে দিদি কবে আসবেন জ্যোতিদা?"

আমি বলিলাম, "আজ তো ছুটির দিন। বিকেলে দিদিকে আমাদের এখানে আনুন না, তাঁকে বড্ড দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সবুর সইছে না। আমাদের বাড়ী বেড়াতে আস্‌তে দিদি বোধ হয় অমত করবেন না?"

"না, অমত কিসের? যে জায়গায় ভাইটি হাজিরা-বইয়ে নাম সই করছে, সে-জায়গায় আস্‌তে দিদির বাধা নেই। আর তিনি তেমন নন্। কেউ তাঁকে ভালোবেসে ডাক্‌লে তাঁর গতি অবাধ হয়।"

মিলি বলিল, "বেশ ত, বিকেলেই তাঁকে আনবেন।

"আজ না হয় থাক্, আপনাদের অসুবিধা হবে! অনেক দিন পরে এলেন, জিনিষপত্র গোছ-গাছ আছে, নিজেদের বিশ্রাম আছে। আজ এনে আপনাদের বিব্রত করা উচিত হবে না।"

বলিলাম, "বিব্রত কিসের? আমরা রাতভোর ঘুমিয়ে এসেছি, দরকার হলে দুপুরে ঘুমোনো যাবে। দিদি আস্‌বেন, তাতে গোছগাছের কি! ঘরে আলোর ঝাড় টাঙ্গাতে হবে না, দরজায় ফুলের মালাও দোলাবো না। আমাদের যা আছে, তার মধ্যেই দিদি আস্‌তে পারবেন।"

আমার আগ্রহে প্রীত হইয়া জ্যোতি বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, আর বল্‌তে হবে না। দিদিকে দেখ্‌তে আপনি যেমন উৎসুক, তিনিও তেমনি ব্যাকুল। তা ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন, ওঁর তো সন্ধ্যাবেলা কাজ-কর্ম্ম নেই?"

"সন্ধ্যায় আবার মাসিমার কি কাজ থাক্‌বে? দিদিকে আনবেন শুনলে তিনি খুব খুশী হবেন।"

আমি উঠিলাম।

জ্যোতি বাবুকে যাহাই বলি না কেন, শুনিয়া মাসিমা খুশী হইলেন না। এ বাড়ীতে নিজস্ব লইয়াই কারবার। মাসিমা বিরক্ত হইলেন—"ঘরে পা দিতে না দিতেই তোমাদের হাঙ্গাম সুরু হলো! জ্যোতির দিদির যা পরিচয়

পেয়েছি, তাতে আমাদের সঙ্গে মেশবার যোগ্যতা তার নেই। তবু যদি তোমরা মিশতে চাও, মেশো।"

১৪

ঝাড়া-মোছা, সাজানো-গোছানো করিতেই দিনের আলো ফুরাইয়া আসিল। মাসিমা তাড়া দিলেন,—"সাত দিনের কাজ এক দিনে শেষ না করলে কি চলতো না? বাড়ী-ঘর তো দিব্যি ফিট-ফাট করলে, নিজের দেহটার পানে তাকাবার সময় মিললো না? তাদের আস্‌বার সময় হলো,—এখনো পরিষ্কার হতে পারলে না। এদিকে তোমার একেবারে দৃষ্টি নেই। বাড়ীর সম্ভ্রম যে সাজগোজের উপর নির্ভর করে, সে-কথা ভুলে যাও কেন?"

উত্তর দিলাম, "যাচ্ছি মাসিমা। আমার দেরী হবে না। মিলি কোথায়? তার হয়ে গেছে?"

মিলির নাম করিতেই মিলি আসিয়া হাজির হইল। মিলি সাজিতে ভালোবাসে। দিবসের অধিকাংশ সময় তাহার প্রসাধনে কাটিয়া যায়।

মিলি আজ ইন্দ্রাণীর সজ্জা করিয়াছে। রঙে-রুজে, শাড়ী-গহনায় তাহার প্রতি অঙ্গ যেন প্রতিমার মত ঝলমল করিতেছে। চিরদিনের অভ্যাস-অনুযায়ী মিলি চোখের ইশারায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তাহাকে কেমন দেখাইতেছে? মাসিমার কাণ বাঁচাইয়া অনুচ্চ স্বরে আমি বলিলাম,—"ভুবনমনোমোহিনী!"

হাসিয়া মিলি কহিল, "যা করু, আর দেরী করিস নে, চট্‌পট্‌ গা ধুয়ে তৈরি হয়ে নে। আজ কিন্তু যা-তা পরবি না। ভালো জামা-কাপড় পরতে হবে। ভদ্রমহিলা প্রথম আমাদের বাড়ী আস্‌ছেন, প্রথম আমাদের দেখ্‌বেন,—তাঁর সামনে ভালো হয়ে বেরুতে হবে।"

মাসিমাও মিলির কথা অনুমোদন করিলেন—"নিশ্চয়, আমিও তাই বলছিলাম। হাজার হলেও সে জ্যোতির বোন,—তার মনে আমাদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা না করিয়ে দিলে চলবে কেন?"

মাসিমার আদেশ শিরোধার্য্য করিতে চলিলাম।

মিলি প্রকৃত গৌরী না হইলেও তাহার রঙে দীপ্তি আছে। পরিপুষ্ট গড়নে, মাজা রঙে সব রকম শাড়ী-গহনাতেই তাহাকে মানায়। আমি একে শ্যামলা,

তার উপর লম্বা ছিপ্‌ছিপে। সাজিতে হইলে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে হয়। আমার রূপ নাই, রূপের পরিচর্য্যাও নাই, তবু সং সাজিতে পারি না।

আমি সাদা ঢাকাই শাড়ী পরিলাম, যেখানার সাদা জমিতে সাদা সূতায় হংস-মিথুন আঁকা, পাড়টি গোধূলির রক্তরাগে রঞ্জিত। বিগত জন্ম-তিথিতে বাবা আমাকে যে শঙ্খের মালা দিয়াছিলেন, গলায় পরিলাম। ছোট-ছোট শঙ্খের মাঝে মাঝে পলা দিয়া গাঁথা একাবলী-হার। কাণে মা'র মুক্তার থোপ্‌না দু'টি দুলাইয়া আমি প্রসাধন শেষ করিলাম।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে জ্যোতি বাবুর সঙ্গে দিদি আসিলেন। দিদি দেখিতে অনেকটা জ্যোতি বাবুর মত। সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি। বেশ-ভূষা সাধারণ। পরণে দেশী কালাপেড়ে শাড়ী আলতা-পরা পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে। রেখাহীন ললাটে সিন্দুরের টিপ, বাঁকানো ঠোঁট পানের রসে টুক্‌টুকে।

আমাদের 'হলে' অনেক সুন্দরীর নিত্য আনাগোনা লাগিয়া আছে, কিন্তু এমন কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর আবির্ভাব কখনো ঘটিয়াছে কি না মনে পড়িল না!

সকলের সঙ্গে দিদির পরিচয়ের পালা শেষ হইলে আমি অগ্রসর হইলাম। জ্যোতি বাবু বলিলেন, "ইনি করবী দেবী। আর ইনি আমার দিদি।"

আমি নত হইয়া দিদিকে প্রণাম করিলাম। চিরপরিচিতের মত আমাকে তিনি পাশে বসাইয়া স্নিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "তুমিই করবী! জ্যোতির কাছে তোমাদের কথা শুনে ভারী দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়েছিল। তুমি বড় লক্ষ্মী। জ্যোতি বলে, দেবী অন্নপূর্ণা। তোমরা এত লেখাপড়া শিখেও মেয়েদের সত্যিকারের যা গুণ—রান্না, খাওয়ানো ভোলোনি, আমার খুব ভালো লাগে।"

উত্তর দিবার জন্য আমি মুখ তুলিলাম। উত্তর দেওয়া হইল না। মাসিমা ঝঙ্কার দিলেন, "ঘরকন্নার কাজ, রান্না খাওয়াকেই কি আপনি সবচেয়ে বড় মনে করেন? ঐ হাতা-বেড়ি আমাদের মেয়ে-জাতকে কতখানি পঙ্গু করে রেখেছে, কখনো তা ভেবে দেখেছেন? শিক্ষিত স্বামীর স্ত্রী হবার যোগ্যতা এ দেশে সাড়ে পনেরো আনা মেয়ের নেই। আমার মতে সকলের আগে মেয়েদের শিক্ষা চাই, আলো চাই, তার পরে কাজ-কর্ম্ম, রান্নাবাড়া।"

মাসিমার এই আকস্মিক আক্রমণে দিদির শান্ত মুখের একটি রেখারও পরিবর্ত্তন হইল না। সহাস্যে তিনি জবাব দিলেন, "শিক্ষা, আলো চাই বৈ কি মাসিমা,—শিক্ষার সঙ্গে কিন্তু মেয়েদের সত্তাটুকুও বজায় রাখা দরকার।

ছেলেদের কর্ম্মক্ষেত্র বাইরে, আমাদের ঘরে। ঘরে হলেও তার দায়িত্ব কম নয়। লেখাপড়ার মতন করেই সংসারের শৃঙ্খলা আমাদের শিখে নিতে হয়। আমরা অল্পশিক্ষিতা হলেও শিক্ষিত পুরুষের অনুপযুক্ত নই। তবে জ্ঞানের জন্ত সকলেরই শিক্ষার দরকার। আমি লেখাপড়া জানি না, কিন্তু শিক্ষা ভালোবাসি। যে মেয়েরা শিখতে পেরেছে, তাদের ভালো লাগে।"

"ভালোবাস্‌তে শেখেন না কেন? শিক্ষায় দোষ নেই,—উপকারিতা অনেক। ইচ্ছা থাক্‌লে কারুরই শিখতে সময় লাগে না। আপনার বয়স এমন বেশি কিছু নয়। চেষ্টা করুন, অনায়াসে নিজের উন্নতি করতে পারবেন! এ-কালে 'জানি না', বলতে মানুষের লজ্জা হওয়া উচিত।"

জ্যোতি বাবু বলিয়া উঠিলেন, "দিদির কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। পাশ না করলেও দিদি বেশ লেখাপড়া জানেন। এখনো লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ার বই পড়েন। জানেন, শিখেছেন,—সেটা জানাতে চান না।"

মাসিমা নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। এ-কালে জন্মিয়া কেহ যে নিজের জয়ডঙ্কা না বাজাইয়া গোপনতার পিয়াসী হইতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণার অতীত! আজকাল নিজের মুখেই নিজের ঘোষণা করিতে হয়। নিজেকে বাড়াইয়া ফেনাইয়া সত্য-মিথ্যায় প্রচার করা—এ যুগের ধর্ম্ম।

মাসিমার নীরবতার সুযোগে মৃদু কণ্ঠে আমি কহিলাম,—"আপনি একা এলেন কেন দিদি? মা এলেন না?"

"মা পরে এক দিন আসবেন। প্রবীর, কঙ্কণ বাড়ীতে আছে বলে মা রইলেন। তা ছাড়া সন্ধ্যার দিকে মা বড় একটা বের হতে চান না, তাঁর সন্ধ্যে-আহ্নিক থাকে।"

সন্ধ্যা-আহ্নিকের উল্লেখে মাসিমার অধরে অবজ্ঞার হাসি খেলিয়া গেল। পূজা-অর্চ্চনার প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই। তাঁহার মতে এই বাহ্য আড়ম্বর কুসংস্কারেরই রূপান্তর। এ বাড়ীতে পূজার মণ্ডপ নাই—উপাসনার মন্দির নাই। ঈশ্বর নিরাকার কি সাকার, তাহা লইয়া এ বাড়ীতে কাহাকেও মাথা ঘামাইতে দেখি নাই।

মাসিমার পরিচালনায় প্রভাত হইতে সন্ধ্যা অবধি আমাদের একটানা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। ঘড়ি ধরিয়া কেশ-বেশের পারিপাট্য, আহার, নিদ্রা, অধ্যয়ন। বিশেষ লোকের সহিত বিশেষরূপে মেলামেশা,—এই

বাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। পূজা-পার্ব্বণের নাম-গন্ধ কেহ কখনো এ বাড়ীতে শোনে নাই।

দিদির আগমনের পরে মিলি তাঁহার দুই-চারিটা প্রশ্নের উত্তর দিয়া এতক্ষণ মৌন ছিল। লজ্জা-বিজড়িত নববধূর অভিনয় শেষ হইলে ধীরে নতনেত্রে দিদিকে কহিল, "প্রবীর, কঙ্কণকে আনলেন না কেন? আনলে বেশ হোত?"

দিদি বলিলেন, "আজ তারা অন্যায় করেছিল, তাই শাস্তির জন্য রেখে এসেছি। আর এক দিন তাদের এনে দেখিয়ে নিয়ে যাব। একবার এখানকার স্বাদ পেলে এ বাড়ী আর ছাড়তে চাইবে না। এসে বিরক্ত করে তুলবে!"

ভানু সাগ্রহে প্রশ্ন করিল, "তাদের শাস্তি দিয়েছেন কেন? কি করেছিল?"

"করেছিল লোভী স্বার্থপরের কাজ! আমাদের বাগানে একটা বারোমেসে পেয়ারা গাছ আছে। ওদের খেলার সাথীরা রোজ পেয়ারা খেতে আসে, ওরা দুই ভাই-বোনে আজ পাকা পেয়ারা খেয়ে কাঁচাগুলো তাদের দিয়েছিল। সেই দোষে আজ আর বাইরে বেরুতে পাবে না।"

এত লঘু পাপে এমন গুরুদণ্ড ভানু কোন দিন উপভোগ করে নাই। সে গম্ভীর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

ভানুর মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছেন খবর পাইয়া মাসিমা ভানুকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

মাসিমার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দিদির গাম্ভীর্য্যের ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল। ঘনকৃষ্ণ আঁখি-তারকায় চপলা ঝলসিতে লাগিল। মিলির একখানি হাত হাতে লইয়া দিদি আরম্ভ করিলেন, "হ্যাঁ মিলি, তোমার আঙ্গুলের নতুন আংটিটাও কি দার্জ্জিলিংএর রাস্তায় কুড়িয়ে পেয়েছ? এবার দার্জ্জিলিং-যাত্রীদের ভাগ্যযোগ প্রবল।"

মিলি বলিল, "আপনি তো এর আগে আমায় দেখেননি, দিদি, আংটিও চিনে রাখেননি! আমি কুড়িয়ে পাইনি এটা আমার ছিল।"

"দিদি তোমাদের মত বুদ্ধিমতী না হলেও বোকা নয়, নতুন-পুরানোর তফাৎ বুঝতে পারে। জ্যোতি যখন কুড়িয়ে পেয়েছে, তখন তুমিই বা পাবে না কেন, মিলি? তোমাদের এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হতে পারে না। ভাই আমার শেয়ানা ঘুঘু, ডুবে ডুবে জল খেতে ওস্তাদ! গাড়ী থেকে নামবামাত্র আমি ধরে ফেলেছি, — ও হাসে আর বলে, আংটি আমার কুড়িয়ে পাওয়া। আমি বল্‌লাম,

এত লুকোচুরী কেন রে? স্বঘরে বিয়ের স্বাধীনতা মা তো তোকে দিয়ে রেখেছেন। তুই মাকে বল্, মা খুশী হবেন, আমরাও কোমর বেঁধে ভোজের জোগাড় করি। তবে না বাবুর গোপন-বিদ্যা বের হলো।"

বলিতে বলিতে দিদি ক্ষণেক থামিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, "হাঁ, তুমি কি বলছিলে মিলি? এর আগে তোমায় দেখিনি? দেখেছি বৈ কি। বাইরে না হোক, অন্তরে নিত্য তোমায় দেখেছি। তাই এমন করে কাছে পেলাম। শুধু তোমাকে নয়, করুণও আমার মনে ছিল। এখন দেখ্‌ছি দু'টির একটিও আমার হেলা-ফেলার নয়, দু'টিকেই কাছে নিতে চাই।"

জ্যোতি বাবু পরিহাস করিলেন, "তাই নাও না দিদি, তোমার বাড়ীতে একটি কেন, দশ জনেরো অকুলান্ হবে না!"

"তোরও জায়গার অভাব নেই, তা আমি জানি জ্যোতি! তবুও যেখানে-সেখানে এ রত্ন ফেলে রাখা যায় না। এদের আসল জায়গা তোদের কবিরা যা বলেন, 'হৃদয়-আকাশে'। আকাশ একটি বই নেই, আবার 'ঊষা-মল্লিকার' আলোয় রাঙা হয়ে গেছে। দিনের বেলায় সেখান চাঁদের আলো ফুট্‌বে না। রাতের আঁধারে চাঁদে আনা-গোনা চলে জানি, কিন্তু দিনে তাকে রাখি কোথায়, ভেবে পাচ্ছি না।"

'না, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না দিদি! তোমার ঘরে-বাইরে সমান। আমি উঠে যাই, তোমার যত খুশী তুমি বকো।" বলিয়া জ্যোতি বাবু সত্যই বারান্দার দিকে চলিয়া গেলেন।

মিলিকে ঠেলিয়া দিয়া দিদি কহিলেন, "ভাই আমার রাগ করে চলে গেল। যাও তো মিলি, তুমি আমার প্রতিনিধি হয়ে ওর রাগ ভাঙ্গিয়ে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো।"

১৫

নির্জ্জনে দিদি আর আমি। আমাদের মাথার উপরে বিজলী-পাখা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। মিলির রচিত তোড়া হইতে ফুলের মিষ্ট গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া গিয়াছে। দিদির সাম্‌নে মুখোমুখী বসিয়া আমার যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হইতেছিল। ইঁহার হাস্যচপল, স্নিগ্ধ দৃষ্টির সাম্‌নে কিছুই যেন আবছা থাকিতে পারে না, গোপনীয় যাহা-কিছু সব প্রকাশ হইয়া পড়ে! এ নারীর প্রসন্ন হাসি, কোমল কটাক্ষ দূরের জিনিসকে কাছে টানে, ব্যবধানের

প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেয়। অনায়াসে ইনি অন্তরের অন্তঃপুরে নিজের আসন পাতিয়া লইতে পারেন।

এই মুহূর্ত্তে রহস্যচ্ছলে দিদি যে ইঙ্গিত করিলেন, তাহা উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়। মিলির মত মেয়েরা ইহাতে মার্জ্জিত-রুচির পরিচয় পাইবে না। কিন্তু আমার সঙ্গে কাহারো মিল নাই! আমার সন্দেহ হয়, দিদি যেন আমারই মর্ম্মোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়াছেন। আমার আকাশে সূর্য্য তো উদীয়মান।

দিদির প্রচ্ছন্ন পরিহাসে জ্যোতি বাবুর কপোলের রক্তিম-রাগ আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ও সলজ্জ সঙ্কোচ কিসের! অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় চোরা-বালিতে পা দিয়া অপরের গোপন তথ্য জানিবার আগ্রহ আমার মনে বিস্তার লাভ করিতেছে। আমি তাহা দমন করিতে পারি না, পরিহার করিতে পারি না।

সাদরে আমার চিবুকে হাত দিয়া দিদি বলিলেন, "ওদের বাইরে তাড়িয়ে দিলাম, দু'টো মনের কথা কয়ে ওরা বাঁচুক। তোমার কথা আমার সঙ্গেই হোক করু, বুড়ী দিদিকে লজ্জা করো না।"

বলিলাম, "না, লজ্জা কিসের? আপনি তো বুড়ো নন দিদি।"

দিদি হাসিলেন, "বুড়ো নই, কচি! চুল না পাক্‌লে বুঝি বুড়ো হয় না? আমি জ্যোতির দিদি, আমার কি বয়সের সীমা-সংখ্যা আছে? তা বয়স আমার যাই হোক, তুমি আমাকে তোমার নিজের দিদির মতই ভেবো। জ্যোতির কাছে তোমার গল্প শুনে তোমাকে দেখবার আগেই আমি তোমায় ভালোবেসেছি। এখন কাছে পেয়ে আরো যেন বেশী ভালো লাগছে। মিলিও মিষ্টি, বাগানের যত্ন-করা গোলাপের মত। তুমি যেন আমার বনের বন-ফুল। উঁচু ডালের করবীর চেয়ে তোমাকে 'বন-ফুল' বলে ডাক্‌তে আমার এমন ইচ্ছা করছে! যদি ডাকি, তোমার পছন্দ হবে?"

আমার চোখে জল আসিল। মনে হইল, আমার আপন-জন কেহ নাই, একমাত্র স্বজন দরদী যুগ-যুগান্তের পরে যেন এই দিদি আজ কাছে আসিয়াছে! আমার দুঃখ-বেদনায় অংশীদার মিলিয়াছে!

ধরা-গলায় আমি কহিলাম, "আপনি স্নেহ করে যে-নামে ডাক্‌বেন, তাই আমার ভালো লাগবে দিদি!"

সুকোমল বাহুর বন্ধনে আমাকে বাঁধিয়া দিদি ক্ষণকাল মৌন হইয়া

রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা কেমন আছেন? কত দিন তাঁর কাছে যাওনি?"

আমার তপ্ত হৃদয় সহসা সুশীতল বারিতে সিক্ত হইল। আমি জুড়াইলাম। এই দণ্ডে যাঁহাকে ভুলিয়া আমার অনাথ-জীবনের কল্পনায় ম্রিয়মাণ হইয়াছিলাম, তিনি আমার মানস-পটে উদ্ভাসিত হইলেন।

দিদিকে বাবার কথা বলিলাম। শৈশবের স্মৃতি-সাগর মন্থন করিয়া আমার স্বর্গগতা, পুণ্যময়ী মা'র কথা বলিলাম। আমার জন্মভূমির বাল্যের মধু-বৃন্দাবনের তুচ্ছ-কাহিনী-বর্ণনায় আমি যেন তন্ময় হইয়া গেলাম। ইহার পূর্ব্বে কেহ আমাকে এ-সব কথা কখনো জিজ্ঞাসা করে নাই, আমার ঘুমন্ত স্মৃতির দ্বারে এমন করিয়া আঘাত করে নাই! যে হারানো দিন এত কাল আমার মনে ঘুমাইয়াছিল, এক জনের মোহন অঙ্গুলির স্পর্শে সে আজ তাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ লইয়া জাগ্রত হইল!

সাধারণতঃ আমি বেশী কথা বলিতে পারি না; আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই-আমি অনর্গল কত কি বলিতেছি! আমার কথা যেন থামিতে চায় না! যে পাষাণ-গুহার ছিদ্রপথে গুরুভার পাষাণ চাপিয়া ছিল, হঠাৎ সে পাষাণ সরিয়া কথার উৎস খুলিয়া দিয়াছে।

আমার বাক্যস্রোতের অবারিত প্রবাহ আরো কতক্ষণ বহিয়া যাইত জানি না, মাসিমা ফিরিয়া আসিলেন—কাজেই আমাকে থামিতে হইল।

মাসিমার দিকে চোখ তুলিয়া দিদি কহিলেন, "আসুন মাসিমা, আমার ভানু ভাইটিকে রেখে এলেন? ভারী মিষ্টি স্বভাব ওর।"

মাসিমা বলিলেন, "পাকামোতেই মিষ্টি, আসলে নয়। লেখাপড়ায় ভারী অমনোযোগ! দিন-রাত ফাঁকি দেবার মতলব। ওকে মাষ্টারের কাছে বসিয়ে এলাম। মিলি, জ্যোতি কোথায়?"

"ওরা বারান্দায় আছে। ভানুর ফাঁকির কথা বলছেন, ওর বয়সই বা কত! এখন খেলা-ধূলোর সময়, দু'দিন বাদে বইয়ের বোঝা ঘাড়ে চেপে পঙ্গু করে দেবে। ছোটদের বইয়ের গাদা দেখলে আমার ভয় হয়। জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটে পড়া আর পরীক্ষা নিয়ে, তার পর আসে চাকরীর দায়! বেচারারা একটি দিন হাঁফ ছেড়ে জিরোতে পারে না!"

বিরক্ত হইয়া মাসিমা বলিলেন, "সত্যিকারের মানুষ হ'তে গেলে হাঁফ ছাড়লে চলবে কেন? ছেলেবেলা থেকে মনোযোগী না হলে কারুর কিছু হয়

না। বয়সের কথা কি বলছেন, ওর বয়সে আমি কুড়ি-টাকা স্কলারশিপ নিয়ে একটা পাশ করে আর-একটা পরীক্ষা দেবার জন্তে তৈরী হচ্ছিলাম। মিলি হয়েছে আমার মত। লেখাপড়ায় ভাল বলে সকলেই আদর করে ওকে নিতে চায়। যেমন বুদ্ধি, তেমনি মেধা, গানেও তেমনি ওস্তাদ। আমার মেয়ে বলে' বলছি না—একাধারে এত গুণ হাজারে মেলে না।"

"তা সত্যি মাসিমা, জ্যোতির কাছে শুনেছি সব। জ্যোতি রত্নের সন্ধান পেয়েছে। এখন ভালোয়-ভালোয় দু'টি এক হলেই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি। শুভ কাজে দেরী করা ভালো লাগে না। বিয়ের পরেও তো মিলি আমাদের কাছে থেকে 'ক্লাশ' করতে পারে! যাতে ওর অসুবিধা না হয়, তা আমরা নিশ্চয় দেখবো।"

মাসিমা ভাবিলেন, জ্যোতি বাবুর আগ্রহে তাঁহার দিদি অনুরোধ করিতে আসিয়াছেন। মাসিমার কড়া মেজাজ, জেদী স্বভাব। একবার যাহা ধরেন, সহজে তাহা ভাঙ্গিতে চান না। জ্যোতি বাবুকে জানিতে মাসিমার আর কিছু বাকী ছিল না। খাঁচায়-পোরা পাখীর উড়িবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া রুক্ষ স্বরে তিনি কহিলেন—"এ সম্বন্ধে গোড়াতেই জ্যোতির সঙ্গে আমাদের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়েছে। আমার মেয়ের কাছে পাশ করার চেয়ে বিয়ের দাম বেশী নয়। একবার স্বীকার করে এখন আবার তা পাল্‌টালে চলবে কেন? ভদ্রলোকের এক কথা।"

মাসিমার তীব্র স্বরে সচকিত হইয়া জ্যোতি বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন, করিয়া কহিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার কথার নড়চড় হবে না। এক বছর কেন, দরকার হলে তার বেশীও আমি অপেক্ষা করতে পারবো। মার আর দিদির ইচ্ছা, শীগ্‌গির হয়। ওঁদের এ ইচ্ছা অন্যায়ও নয়, স্বাভাবিক।"

জ্যোতি বাবুর এ কথায় আশ্বস্ত এবং দিদির নীরবতায় সুস্থ হইয়া মাসিমা অতিথি-সৎকারে মনোনিবেশ করিলেন। কহিলেন, "করু, এঁদের চা এনে দাও। চা দিতে বড্ড দেরী করলে!"

দিদি বলিলেন, "আমি তো চা খাই না মাসিমা। এ সময় কিছুই খেতে পারি না। আপনি আমায় গোটাকতক পাণ আনিয়ে দিন। পাণ না হলে আমার এক মিনিট চলে না। এরা চা খাক, আমি পাণ খাই।"

মিলি বলিল, "আপনি বুঝি পাণ খেতে খুব ভালোবাসেন দিদি?"

দিদির হইয়া জ্যোতি বাবু জবাব দিলেন, "ভালোবাসা বলে ভালোবাসা! পাণ না পেলে দিদির এক সেকেণ্ড কাটে না। শুধু পাণ নয়, সঙ্গে উপসর্গ আছে জরদা। হাঁ দিদি, আজ তোমার সাথের সাথী পাণের কৌটো আনতে ভুলেছ যে! এত বড় ভুল কখনো তো হয় না তোমার।"

দিদি হাসিলেন, বলিলেন, "ভুল করিনি। মাসিমার কাছে পাবো বলে কৌটো আনিনি।"

আমি বলিলাম, "এখনি পাণ এনে দিচ্ছি দিদি। পাণের দোকানে ভালো জরদা আছে কি না খোঁজ নিয়ে দেখছি। আমরা কেউ পাণ খাই না, জরদাও চিনি না!"

"পাণ আনালেই হবে। জরদার দরকার নেই। আমার রুমালে বাঁধা আছে। রুমালে জরদা বেঁধে বেড়াই শুনে তোমরা হাসছ! দিদির বেলাতে বুঝি যত দোষ! তোমরা যে বিলাতি রঙে ঠোঁট টুকটুকে করে রাখো। আমি না হয় স্বদেশী পাণে তোমাদের অনুকরণ করি। পাণ মিষ্টি করতে একটুখানি জরদা খাই। এর বেশী কিছু করি না তো।" বলিয়া দিদি হাসিতে লাগিলেন।

রঞ্জিত-মুখী মিলি মাথা নত করিল। আমি চা ও পাণের যোগাড় করিতে উঠিলাম।

বিদায়-কালে দিদি পরের দিন তাঁহার গৃহে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। চায়ের নিমন্ত্রণ নয়, রাত্রির আহারের।

মাসিমা সকলকে লইয়া নিমন্ত্রণ-রক্ষার সম্মতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিলিকে পছন্দ হলো তো?"

দিদি তাঁহার রেখাঙ্কিত সুন্দর গ্রীবা হেলাইলেন, বলিলেন, "তা আবার বলতে মাসিমা! কালো কুৎসিত মেয়েকে জ্যোতি পছন্দ করলে সেও আমাদের কাছে সোনা হতো। এতো সোনার প্রতিমা! দু'টিকেই আমার খুব মিষ্টি লেগেছে। দু'টির উপরেই সমান লোভ! জ্যোতি ছাড়া আর আমার ভাই নেই বলে দুঃখ হচ্ছে। এদের সমবয়সী আমার এক দেওর আছে। কিন্তু কমল এখনো এম-এ পড়ছে।

লজ্জায় আমি মাথা হেঁট করিলাম।

সকৌতুকে মিলি কহিল, "করুও পড়াশুনা করছে দিদি,—তাহলে আর দোষ কি।"

"তা মন্দ বলোনি। ছাত্র-ছাত্রীতে বেমানান হবে না। এতক্ষণে তোমার অমতের কারণ টের পেলাম মিলি। জ্যোতির ছাত্র-জীবন শেষ হয়েছে, তোমার হয়নি—অসমান হতে চাও না বলেই সময় নিয়েছ! সত্যি তো, সমান সমান না হলে মানাবে কেন?"

১৬

পরের দিন বৈকালে দিদির মোটর আসিয়া আমাদের দ্বারে দাঁড়াইল। আমাদের লইতে দিদি ছেলে-মেয়ের সঙ্গে গাড়ী পাঠাইয়াছিলেন। মাসিমা বাচ্চাদের বিশেষ পচ্ছন্দ করিতেন না। বালক-বালিকার চাঞ্চল্যে তাঁহার বিরক্তি হয়। তবু আজ ভদ্রতার খাতিরে প্রবীর-কঙ্কণকে আদর করিতে হইল। ছু'জনেই আদর পাইবার উপযুক্ত। মাসিমা বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলেন না।

সুন্দর ছেলে এই প্রবীর। সুস্থ সবল দেহ; চোখ ছু'টি উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত; মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। কঙ্কণ যেন মাধুর্য্যের খনি! বর্ষাবারিসিক্ত কোমল কুন্দকলি! ভাই-বোনের বেশভূষা বাহুল্য-বর্জ্জিত। প্রবীর ধুতি-পাঞ্জাবী পরিয়াছে, কঙ্কণের পরণে লাল রঙের তাঁতের শাড়ী।

মিলি মুঠা ভরিয়া তাহাদের হাতে বিস্কুট চকোলেট তুলিয়া দিল। তাহারা সামান্যমাত্র লইল; লইয়া বলিল, "আমরা খেয়ে এসেছি। আর নেবো না।"

মাসিমা রায় দিলেন, "হাঁ, ছেলে-মেয়ের শিক্ষা আছে! পাঁচ জনের মাঝখানে বার করবার মত।"

কঙ্কণকে কোলের কাছে টানিয়া আমি বলিলাম, "তোমার যে আমাদের নিতে এসেছো, বলো দেখি, আমরা কে?"

কঙ্কণ তাহার চোখ ছু'টি মেলিয়া আমাদের দেখিতে লাগিল; কোনো কথা বলিল না।

প্রবীর বলিল, "কঙ্কণের বড় ভুলো মন। মা শিখিয়ে দিয়েছেন, ভুলে গেছে। আমার কিন্তু মনে আছে।"

মিলি বলিল, "কি মনে আছে?"

"মনে আছে, আপনি আমাদের মামীমা, ইনি মাসিমা, আর উনি হচ্ছেন দিদিমা। ভানু মামা আছেন একতলায়।"

প্রবীরের কথা শেষ হইবামাত্র কঙ্কণ মাথা ছুলাইয়া চোখ নাচাইয়া বলিল

উঠিল, "আমারো সব মনে আছে।" তাহার বলার ভঙ্গীতে আমরা হাসিতে লাগিলাম।

ভবানীপুর হইতে 'সাদার্ণ এভেনিউ' দূর নয়। ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলিতে না জ্বলিতে আমরা গৃহে উপস্থিত হইলাম।

কত দিন লেকে বেড়াইতে আসিয়া এই বাড়ীর সামনে দিয়া যাতায়াত করিয়াছি. তখন কে জানিত, ঘটনাচক্র আমাদের এখানে টানিয়া আনিবে! কত দিন এই ফুলে-ফুলে ফুলময় গৃহসংলগ্ন বাগানটি দেখিয়া আমরা গৃহস্বামীর রুচির প্রশংসা করিয়াছি। আজ সেই ফুল, সেই বাগান আমাদের ডাকিয়া আনিয়াছে! বাড়ীর অনতিদূরে লেক্। জলাশয়ের স্থির জল চন্দ্র-তারকায় খচিত। পাড়ের গাছের ছায়া, বিজলী·বাতির ছায়া জলের বুকে প্রতিফলিত।

গাড়ীর শব্দে দিদি বাহিরে আসিলেন, মাসিমাকে প্রণাম করিয়া আদর করিয়া আমাদের ভিতরে লইয়া গেলেন। বহুমূল্য আসবাব-পত্রে সজ্জিত বৃহৎ হল-ঘরে আমাদের বসাইলেন। বাড়ীখানি সুন্দর। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। বাড়ীতে অনেক দাস-দাসী।

অনাহূত অবস্থায় দিদিকে পাইয়া মাসিমা সেদিন অবজ্ঞা-মিশ্রিত সমাদর করিয়াছিলেন। আজ এই সম্পন্ন গৃহের গৃহিণীর উপর তাঁহার সম্ভ্রম জাগিল।

মাসিমা বলিলেন, "আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন। আপনার মা কোথায়?"

"মা ও-বাড়ীতে। জ্যোতির এখনি ফিরলো কি না। মা তাকে জল খেতে দিচ্ছেন। হাঁ, ওটা জ্যোতির বাড়ী, ভিতর-দিকে একটা দরজা আছে। আমরা সারা দিন যাওয়া-আসা করি। দরজা খুলে রাখলে এক-বাড়ী হয়ে যায়। হাঁ, দেখুন মাসিমা, আমার একটা ভিক্ষা আছে। আপনি নিজের ভেবে দয়া করে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন আমাকে 'আপনি' বলে আমার অপরাধ বাড়াবেন না। আপনার মিলি-করুর মত আমি আপনার আর-একটি মেয়ে।"

প্রসন্ন হইয়া মাসিমা কহিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

"মাকে আমি খবর দিচ্ছি।" বলিয়া প্রবীর-কঙ্কণকে আমাদের কাছে বসাইয়া দিদি কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দিদির পশ্চাতে যিনি ঘরে ঢুকিলেন, অনুমানে বুঝিলাম, তিনি জ্যোতি বাবুর মা।

আমরা উঠিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি আমাদের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

আমি শৈশবে মাতৃহীনা। মা'র মূর্ত্তি মনে অস্পষ্ট হইয়া ছিল। মাসিমা আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, স্নেহ দিয়াছেন, তাঁহার করুণায় আমার বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র প্রশস্ত হইয়াছে। আমার কৃতজ্ঞ-হৃদয় মাসিমার প্রতি বিমুখ ছিল না। তবু মাসিমাকে আমি মায়ের মত ভালবাসিতে পারি নাই, ভক্তি করিতে পারি নাই। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও মা বলিয়া ডাকিয়া কাছে যাইতে পারি নাই।

আজ জ্যোতি বাবুর মাকে দেখিয়া আমার প্রাণ-মন 'মা' বলিয়া ডাকিতে উন্মুখ হইয়া উঠিল! এই প্রৌঢ়া বয়স্কা বিধবার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাতে তাঁহাকে দেখিবামাত্র মন লুটাইয়া পড়ে। এক-কালে হয়তো তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন! ষোলকলার চন্দ্র অস্তমিত, কিন্তু চন্দ্রের পরিমণ্ডল প্রভাহীন নয়! শান্ত সংযত মহিমা, অটল গাম্ভীর্য্য—হৃদয়ে সম্ভ্রমের উদ্রেক করে।

মাসিমার পাশে মাকে বসাইয়া দিদি চলিয়া গিয়াছিলেন; ক্ষণকাল পর ফিরিলেন চা এবং খাবার লইয়া।

মাসিমা বলিলেন, "এখন আবার চায়ের হাঙ্গামা কেন? এত খাবারই বা কি হবে?"

মা কহিলেন, "বেশী কিছু নয়। রান্নার একটু দেরী আছে, আপনারা কিছু খেয়ে নিন।"

আমাদের জলযোগ শেষ হইলে জ্যোতি বাবু দর্শন দিলেন। তাঁহার পশ্চাতে আসিলেন দিদির স্বামী সুকান্ত বাবু। তিনি পসারওয়ালা উকিল। বৈঠকখানায় মক্কেল গম্‌গম করিতেছে।

সুকান্ত বাবু বেশীক্ষণ আমাদের কাছে থাকিতে পারিলেন না। সময়ের অল্পতার জন্য সকলের কাছে যুক্তকরে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন।

সুকান্ত বাবু প্রস্থান করিলে দিদির সঙ্গে দিদির দেবর কমল বাবু আসিলেন আমাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিতে। ছেলেটি লম্বা ছিপ্‌ছিপে চেহারার—বয়স আমাদের চেয়ে কম বৈ বেশী হইবে না। মুখখানি সুকুমার, বয়সের অনুপাতে কোমল। এ-বয়সে ছেলেদের এমন কমনীয় মূর্ত্তি সচরাচর চোখে পড়ে না। ছেলেটি সত্যই কমল নামের যোগ্য। কমল বাবুর সরল হাসি,

সলজ্জ দৃষ্টিতে এতটুকু দ্বিধা হয় না, ছোট ভাইটির মত কাছে বসাইয়া তাকে আদর করিতে সাধ হয়।

গতরাত্রে বিদায়-কালে দিদি ইহার কথাই বলিয়াছিলেন। কি উপলক্ষে বলিয়াছিলেন, মনে পড়িতে আমার হাসি পাইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া দিদি অনুচ্চ স্বরে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—"কি রে করুণা 'বনফুল', কমলকে পেয়ে যে খুব আনন্দ! বসন্তের খবর কাউকে বলে দিতে হয় না, বনের দিকে চাইলেই জানতে পারা যায়।"

দিদির পরিহাসে আমার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ হইল না, কিন্তু কমল বাবুর গৌর-আনন লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।

সকৌতুকে আমি কহিলাম, "আপনার লজ্জা কিসের কমল বাবু? দিদির ও-সব কথায় কেউ না কি কাণ দেয়? আপনি আমার ভাইয়ের মত। আমাকে বোন বলে মনে করবেন।"

কমল বাবু নীরবে নতনেত্রে ঘাড় পাতিয়া নূতন সম্বন্ধ স্বীকার করিয়া লইলেন।

দিদি তেমনি হাসি-মুখে কহিলেন, "এবার জিনিসটা মধুর হলো। বনফুল কমলকে 'দাদা' বলে ডাকতে আরম্ভ করলে উপন্যাসের সুন্দর পরিকল্পনা হবে। 'দাদা' বলে আলাপ জমিয়ে বিয়ে না দিলে এ-কালের লেখকদের লেখা জমে না। হাঁ রে জ্যোতি, ওদিকে চেয়ে রয়েছিস কেন? মা-মাসিমা আমাদের রাজত্বে নেই,—দু' বেয়ানে ওদিকে দিব্যি জমিয়ে তুলেছেন। আমাদের কথা ওঁদের কাণেও যাচ্ছে না। ভানু ভিড়েচে প্রবীরদের দলে। ঐ যে 'ক্যারমের' খটাখট শব্দ শোনা যাচ্ছে! তোরা এখানে বোসে থেকে কি করবি? যা না, চার জনে লেকে থেকে একটু বেড়িয়ে আয়। আমি যাই রান্নাঘরে, আমার 'বংশীবদন' দ্রৌপদীর তদ্বির করতে।"

মিহি স্বরে মিলি বলিল, "লেকে যেতে এখন ভালো লাগছে না দিদি। বড় ভিড়। তার চেয়ে আপনার বাগানে আমাদের বেড়াতে দিন। অনেক ফুল ফুটেছে, তার উপর আকাশে দিব্যি জোৎস্না!"

"মিলি ঠিক বলেছে, তোমাদের নিরিবিলির দরকার, আমি তা ভুলে গিয়েছিলাম। বুড়ো হয়েছি—অত-শত মনে থাকে না। ফুল ঢের ফুটেছে, মালাকারও সঙ্গে রইলো, ছুঁচ-সুতোর দরকার হলে চেয়ে নিতে লজ্জা করো না। চলো, আমি তোমাদের এগিয়ে দিয়ে আসি।"

দিদির বাগানে প্রবেশ করিয়া মন যেন জুড়াইয়া গেল। বাগানটি দুই ভাগে বিভক্ত। মাঝখানে লাল সুরকির রাস্তা। গাছগুলি ফুলে-ফুলে ফুলময়।

মিলি চাঁপাতলার লোহার বেঞ্চ অধিকার করিয়া কমল বাবুকে পাশে বসাইল। বসাইয়া লেখা-পড়ার আলোচনা সুরু করিল। দু'জনে সহপাঠী। এক বিষয় লইয়া দু'জনে অধ্যয়ন করিতেছে। কমল বাবু প্রতিভাবান ছাত্র, বি-এ পরীক্ষায় মাত্র দু'নম্বরের জন্য মিলির নীচে হইয়াছিলেন। ছেলেটি লাজুক হইলেও বিদ্যাচর্চ্চায় অত্যন্ত আগ্রহশীল। মিলি জানে, কাহার সহিত কোন্ বিষয় লইয়া আলাপ করিতে হয়।

মিলিদের আলোচনায় যোগ না দিয়া জ্যোতি বাবু আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা পুষ্পরাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

সপল্লব একগুচ্ছ গন্ধরাজ সংগ্রহ করিয়া জ্যোতি বাবু আমাকে বলিলেন, এই নিন্, করবীকে গন্ধরাজ অভিনন্দন করছে। আচার্য্য বসুর গবেষণায় গাছের প্রাণ আছে প্রমাণ হলেও বেচারীরা চলৎশক্তি-রহিত। তাই তাদের নিবেদনের ডালা আমাকে পৌঁছে দিতে হচ্ছে।"

সাদরে আমি আমার প্রিয়-প্রদত্ত পুষ্পসম্ভার গ্রহণ করিলাম। তাঁহার অঙ্গের পুষ্পসারের মত ফুলের গন্ধে আমি যেন আচ্ছন্ন হইলাম। আবেগে; আবেশে আমার গলার স্বর ধরিয়া আসিতেছিল! বাধো-বাধো কণ্ঠে কোনরূপে বলিলাম, "ধন্যবাদ! করবী বড় ছোট। ফুলের রাজা গন্ধরাজ তাকে অভিনন্দন দেয় না। আপনি আমাকে অত বাড়ালে লজ্জা রাখবার ঠাঁই পাবো না, সত্যি।"

"আপনার ভুল! আমি কাউকে বাড়াতে জানি না। যার প্রাণ-মন ফুলের মত কোমল, পবিত্র—ফুল তাকেই সাজে। তাতে লজ্জার কি আছে?"

"লজ্জার যে কি, আপনি তা বুঝবেন না। আমাকে তো অনেক দিলেন, এইবার মিলির জন্যে ফুল তুলুন।"

"মিলি বাক্য-কুসুম নিয়ে মত্ত, গাছের ফুলে তাঁর আগ্রহ নেই। যাঁর আছে, ফুল তাঁকে চিনে নিয়েছে। সব জিনিস সকলে চায় না করবী দেবি! আপনি যে রকম ফুলের ভক্ত, মিলি সেই রকম জ্ঞানের পিপাসী। ওরা বেশ জমিয়ে তুলেছে। কমলটা লাজুক হলেও পণ্ডিত। দিদি ওর নাম দিয়েছেন গ্রন্থ-কীট, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টা বই নিয়ে থাকে। শুধু পড়ার বিষয়ে নয়, সব বিষয় জানতে কি ওর যত্ন! কমলের

পড়ার ঘর দেখেননি তো। আমার মত মূর্খ মানুষ সেখানে পা দেবামাত্র ভয়ে আধ-মরা হয়। চারি দিকে বই আর বই। তারি মধ্যে কমলের দিন-রাত কেটে যায়।"

"এখন এ কথা বলবেন বৈ কি,—লেখা-পড়া শেষ করেছেন কি না! ক'দিন আগে আপনারো কত পড়া পড়তে হয়েছে, পাশ করতে হয়েছে।"

"তা সামান্য কিছু করতে হয়েছে। কোনো রকমে সাতের খেলা বজায় রেখে পাশ করা ছাড়া আমার মধ্যে আর কিছু নেই। যাকে পাণ্ডিত্য বলে, আমি তার ত্রিসীমায় যাইনি। আমার শিক্ষা শুধু পুঁথিগত, অর্থকরী। তবু আমি বিদ্বান্ ভালবাসি, জ্ঞানের চর্চ্চা পছন্দ করি।"

"এতই যদি পছন্দ করেন, তাহলে আপনার মতে যা পাণ্ডিত্য, তা অর্জ্জন করুন না কেন? তাহলে আর আক্ষেপ থাকবে না, কমল বাবুর ওপর হিংসাও হবে না।"

"এখন আর হয় না করবী দেবি। সে দিন চলে গেছে। বুড়ো বয়সে দু'নৌকোয় পা দেওয়া মানে অপঘাত-মৃত্যু। যে চায় লক্ষ্মীর বরপুত্র হবে, সরস্বতী তাকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল দেবেন না। জোর করে আদায়ের শক্তি সকলের থাকে না। আমারো নেই। আপনারা ছেলেমানুষ, আপনাদের সময় আছে, শক্তি আছে। ও-পথ আপনাদের ছেড়ে দিয়ে আমি ভিন্ন-পথের পথিক হয়েছি। কমলকে আমি হিংসা করি না, ওর উদ্যমকে শ্রদ্ধা করি।"

জ্যোতি বাবুর সঙ্গে সঙ্গে বাগানের শেষপ্রান্তে আসিয়া আমি উত্তর দিলাম, "সময় আর শক্তির কথা মিলিকে বলা চলে, আপনি তো সাতের খেলায় জিতেছেন, আমি যে পাঁচের গণ্ডি কাটাতে পারিনি! আপনার মত আমারো অর্থকরী বিদ্যার আশায় পরীক্ষা দেওয়া। একটা ভাই থাকলেও আমি পাশের পড়া কখনো পড়তাম না। বাবার বয়স হয়েছে, সাহায্য করবার কেউ নেই, সেই জন্যই আমার চেষ্টা।"

"তাহলে আপনার উদ্দেশ্য টিচারী? তা কেন করবী দেবি? বাংলায় এখনো উপযুক্ত বরের অভাব হয়নি। বিয়ে করলেও আপনি আপনার বাবাকে দেখা-শোনা করতে পারবেন। আমার মনে হয়, সেই আপনার পক্ষে ভালো হবে।"

কত কি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতে লাগিল, তাহা বুকে চাপিয়া আমি কহিলাম, "না।"

আমার সে 'না' কথা আমারি কাণে বিকৃত শোনাইল! আমি আর তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না,—মিলির কাছে ছুটিয়া গেলাম।

১৭

মিলি আমাকে লক্ষ্য করিল না। তাহারা তখন 'টেনিসনের' কবিতা-সমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে। আমি সরিয়া আসিলাম। সরিয়া কামিনী-কুঞ্জের অন্ধকার-তলে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপরে বসিয়া পড়িলাম।

চোখ আমার জলে ভরিয়া গেল। মনে মনে বলিলাম, "আমার বিয়ের কথা আর যে বলে বলুক, তুমি বলিয়ো না। এখনো কি আমার বিবাহের বাকী আছে? লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান—তাহার মূল্য কতটুকু! লোকের দৃষ্টির অন্তরালে যাহা রহিয়াছে, তাহাকে তো মিথ্যা বলিতে পারি না। তোমার সহিত আমার মানস-পরিণয়ের সংবাদ তুমি জানো না, আমি জানি, আমার মন জানে। তাহার সাক্ষী উদার অনন্ত নীলাকাশ, নগাধিরাজ হিমালয়, নিবিড় বনানী, মৃদুস্বরা নির্ঝর! তাহাদেরই মত আমি নির্ব্বাক্ হইয়া আছি, মৌন হইয়া আছি। আমার নীরব অভিব্যক্তিকে সজাগ করিয়া তুমি ভাষা দিয়ো না! বাহিরে টানিয়া আনিয়ো না।

নির্জ্জনে নিজের সঙ্গে বেশীক্ষণ নিভৃত আলাপ চলিল না। বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মর-ধ্বনিতে চকিত হইয়া চাহিয়া দেখি, জ্যোতি বাবু কামিনী-ঝাড়ের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কখন তিনি নিঃশব্দে আসিয়াছেন, টের পাই নাই। ভাগ্যে সূর্য্যের আলো ছিল না, চন্দ্রালোকে নিজেকে সংযত করিতে আমার সময় লাগিল না। অতিরিক্ত প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া হাসি-মুখে আমি বলিলাম, "আজ কি আমাদের বনবাসেই রাখবেন না কি? আপনার বাড়ী-ঘর দেখাবেন না?"

জ্যোতি বাবু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "দেখাবো বৈ কি, কিন্তু দেখবার মত বাড়ী-ঘর আমার নয়। চলুন, নিয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা করবী দেবি, কথার মাঝখানে হঠাৎ আপনি পালিয়ে এলেন কেন?"

"না পালিয়ে কি করি বলুন! সাধুরা বলেছেন, অপ্রিয় প্রসঙ্গ বিষবৎ পরিত্যজ্য। তাই সরে আসতে হলো।"

"জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন বিষবৎ পরিত্যজ্য? কারণ?"

"কারণ, রুচি। নানা মুনির নানা মত। বা রে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবলি কথা বলবেন। বাড়ী-দেখানোর ইচ্ছা নেই বুঝি?"

বলিতে বলিতে আমি মিলির কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "মিলি, আর কত 'কচ্‌কচি' করবি? এক দিনেই সব ফুরিয়ে ফেলিস্ নে। কমল বাবুর লজ্জা ভাঙ্গার অস্ত্র হাতে রাখা ভালো। চল্, তোর মন্দির দেখে আসি, জ্যোতি বাবু দাঁড়িয়ে আছেন।"

নিরুত্তরে মিলি উঠিল। কমল বাবু আমাদের অনুসরণ করিলেন।

জ্যোতি বাবুর বাড়ীখানিও দিব্য পরিপাটী। সামনে এক-ফালি বাগান। কুন্দ, করবী, মল্লিকা, রজনীগন্ধা ফুটিয়া ক্ষুদ্র জমিটুকু আলো করিয়া রাখিয়াছে। টানা বারান্দার সিঁড়িতে সার-সার পাতা-বাহারের টব। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহ। অন্দরের দিকে আঙ্গিনা।

আমাদের দেখিয়া জ্যোতি বাবুর মা ডাকিয়া উপরে লইয়া গেলেন। মাসিমাকে লইয়া পূর্ব্বেই তিনি এখানে আসিয়াছিলেন! সমস্ত বাড়ীটা প্রদক্ষিণ করিয়া আমরা সিঁড়ির মুখের বসিবার ঘরে সমবেত হইলাম। মন-প্রাণ কিন্তু পড়িয়া রহিল কোণের ঘরে—যে-ঘরের দ্বারে ঘন নীল রঙের পর্দ্দা ঈষৎ নীলাভ দেওয়াল রেখাশূন্য, চিত্রশূন্য। একখানি অপ্রশস্ত খাটের উপর শুভ্র শয্যা। শিয়রে সাদা পাথরের 'টিপয়', তাহার উপরে পিতলের ছোট কলসীতে পাতা-সমেত কতকগুলি রজনীগন্ধা। এই তো গৃহ-সম্পদ্, তবু যেন এ-ঘর আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল!

অনাত্মীয় যুবকের শয়নাগার কাহাকেও যদি লুব্ধ করে, তো সে লজ্জার কথা! শুধু শয়ন-গৃহ বলিলে মিথ্যো বলা হইবে! সূচিকার্য্যে শোভিত শুভ্র শয্যা, আচ্ছাদনীর তলদেশ পর্য্যন্ত আমাকে আকৃষ্ট করিতেছিল! হৃদয়ের এ নগ্ন কদর্য্যতায় আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সেখানে থাকিতে পারিলাম না। চোরের মত নিঃশব্দে পলাইয়া আসিলাম। আমার অবাধ্য পা দু'খানা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে কোণের পর্দ্দা-ঢাকা ঘরে ঢুকিয়া থামিয়া পড়িল।

গৃহ অন্ধকার। দক্ষিণের জানালা দিয়া এক-ঝলক জ্যোৎস্না বিছানায় আসিয়া পড়িয়াছে। নীচের রাশি রাশি ফোটা ফুলের গন্ধে আজিকার রজনী যেন মোহাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছে! এমন মাধবী-নিশীথে যাহাকে যাহা দিবার, তাহা যেন অন্তরের অন্তস্তল হইতে নদীর ধারার মত অধীর বেগে প্রবাহিত হইয়া আসে? অব্যক্ত মার্ম্মাচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে বাধে না। ধরিবার, ধরা

দিবার এ যেন মাহেন্দ্রক্ষণ। আমার অন্তর্য্যামী জানেন, আমি ধরিতে চাহি না? জগতের অগোচরে নিজেকে শুধু ধরা দিয়া রাখিয়াছি?

আবরণ তুলিয়া তাঁহার উপাধানে সন্তর্পণে আমি মাথা রাখিলাম। তাঁহার কেশের সুরভি নিমেষে আমাকে আকুল করিয়া তুলিল! কপোল বহিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু বালিসে ঝরিয়া পড়িল।

এ অশ্রু আমার ব্যর্থ-জীবনের মর্ম্ম-গলানো নির্ঝর; আমার নীরব প্রেমের অভিষেক-বারি! ইহাই আমার জীবনের প্রথম ও শেষ! আমার স্মৃতির পুষ্পাঞ্জলি প্রিয়তমের উদ্দেশে রাখিয়া গেলাম! নিরালায় নিজেকে নিবেদন করিয়া দিলাম।

কিন্তু এ স্বর্গে বেশীক্ষণ নন্দন-গন্ধে বিভোর হইয়া থাকিতে পারিলাম না। চঞ্চল বাতাসে 'হারমোনিয়ামের' সহিত মিলির সুমিষ্ট স্বর ভাসিয়া আসিল। সেই স্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া দিদির কণ্ঠ, "আমার বনফুল কোথায়?"

শুনিবামাত্র আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার বালিসে একটি আকুল চুম্বন রাখিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহির হইয়াও সহসা সকলের সঙ্গে মিশিতে পারিলাম না। তখনও আমার চোখের কোলে অঝোরে জল ঝরিতেছে। বুকের মধ্যে মত্ত পবন দাপাদাপি করিতেছে। এমন ঝটিকাবিক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া কেহ কি কাহারও কাছে যাইতে পারে? দ্বারে দাঁড়াইবার সাহস হইল না,—কেহ যদি আমার অভিসার ধরিয়া ফেলে?

তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে প্রবেশ করিয়া দ্বার ভেজাইয়া দিলাম। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া নিজেরই বিশ্রী লাগিল। ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধুইয়া-মুছিয়া, কেশ-বেশের সংস্কার করিয়া কিছুক্ষণ পরে আমি সভাস্থলে উপস্থিত হইলাম।

সকলে তন্ময় হইয়া মিলির গান শুনিতেছিলেন। দিদি অন্যমনা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই দিদি আমার হাত ধরিয়া তাঁহার অধিকৃত সোফায় বসাইয়া দিলেন। তাঁহার পরে মুখ নামাইয়া চুপি চুপি কহিলেন, "কোথায় ছিলে বনফুল? রান্না হয়ে গেছে,—ডাকতে এসে তোমায় পাইনি।"

আমার উত্তর বাধিয়া গেল! নির্জ্জলা মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্তি হইল না। ক্ষণেক থামিয়া দিদি আবার বলিলেন, "মিলির শেষ হলে তোমাকে কিন্তু

গাইতে হবে। সে-দিন ক্লান্ত ছিলে, তাই বিরক্ত করিনি। আজ ছাড়বো না, তোমরা মিষ্টি বর্ষণ করো। প্রতিদানে আমি মিষ্টিমুখ করিয়ে দেবো। তা ছাড়া তোমাদের মত কাণে মধু দেবার ক্ষমতা আমার নেই ভাই।"

ধীরে ধীরে আমি কহিলাম, "মিষ্টি খাবারের চেয়ে সব জিনিসের চেয়ে আপনার কথাই যে মিষ্টি দিদি, আপনি তাই আমাকে দেবেন।"

সস্নেহে আমার গালে একটা টোকা দিয়া নিবিষ্ট মনে দিদি মিলির গান শুনিতে লাগিলেন।

মিলির স্বরের তান লয় গমকে যেন সুধাবৃষ্টি হইতেছিল! ঘরের সব ক'টি প্রাণী মন্ত্রমুগ্ধ রহিলেন! আমি চিরদিন মিলির সঙ্গীতের ভক্ত। তাহার চেনা স্বরের ইন্দ্রজালে আমিও অভিভূত হইয়া পড়িলাম।

ধীরে ধীরে গানের রেশ থামিয়া গেল। সকলের মুখে প্রশংসার গুঞ্জন-ধ্বনি উঠিল।

মমতায় বিগলিত হইয়া মা মিলির ললাট চুম্বন করিয়া কহিলেন, "খুব আনন্দ দিলে মা,—তোমার শেখা সার্থক হয়েছে। আশীর্বাদ করি, তোমার জীবন যেন তোমার গানের মত এমনি সুন্দর হয়।"

কমল বাবু সসঙ্কোচে বলিলেন, "চমৎকার! এমন গান একটা শুনলে তৃপ্তি হয় না,—আরো শুনতে ইচ্ছা হয়।"

দিদি ভেংচাইলেন, "আরো শুনতে ইচ্ছা হয়! দেখ কমলি, সোজাসুজি কথা বলতে পারিসনে কেন? বললেই হয়—'ভাল লেগেছে, আর একটা শুনিয়ে দিন।' এত লেখাপড়া শিখলি, তবু তোর লজ্জা গেল না?"

"বা রে, লজ্জা কিসের? কখন তুমি লজ্জা দেখলে?" বলিতে বলিতে কমল বাবু সত্যই লজ্জায় লাল হইয়া উঠিলেন!

জ্যোতি বাবু চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পর তিনি কথা কহিলেন। কৃত্রিম অনুযোগের স্বরে বলিলেন, "কমলের লজ্জার কোন কারণ হয়নি। তোমার খালি-খালি বানানো দিদি। সকলের পিছনে লেগে ঝগড়া করবার স্বভাব তোমার গেল না।"

"আমি ঝগড়াটে কুঁদুলে, না? আর উনি সাধু হয়েছেন! রোস্, সাধুপনার মজা দেখাচ্ছি।" বলিয়া দিদি ত্বরিতপদে অগ্রসর হইলেন।

মা বাধা দিলেন, "চপল, রাত হয়ে যাচ্ছে, কখন বা এঁদের গান শুনবি

কখন বা খেতে দিবি ? তোদের নিত্যিকার ঝগড়া-ঝাটি হাতা-হাতি এখন বন্ধ রাখ্ মা, খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে পরে করিস।"

ভ্রূভঙ্গীতে ভাইকে শাসাইয়া দিদি যথাস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

মাসিমা বলিলেন, "মিলি, তুমি আর-একটা গেয়ে করুকে বাজনা দাও।"

কমল বাবুর প্রতি কটাক্ষ করিয়া মিলি একটি প্রেমের গান ধরিল। মিলির গান হইয়া গেলে মা স্নিগ্ধ-কোমল কণ্ঠে আমাকে ডাকিলেন, "করু, এসো মা, এবার তোমার গান হোক্।"

তখনো আমার মনের ঘোর কাটে নাই! ভাবের বন্যায় সবে মাত্র ভাঁটার টান ধরিয়াছে, জোয়ারে তখনো তট উচ্ছ্বসিত। আমার বুক হইতে কণ্ঠ অবধি তখনো অশ্রুজলে ভরা। তবু অস্বীকার করিতে পারিলাম না। আমার দিবার যাহা, আজই নিঃশেষ করিয়া দিতে চাই! আতস-বাজির মত এই দণ্ডে পুড়িয়া নিজেকে ছাই করিয়া দিবার বাসনা! জানি, এখনো এ জীবনের অনেক বাকী! এমন সুন্দর ভুবনে কে মরিতে চায়? আমিও মরিতে চাই না। কিন্তু কামনার অনলে আজই আমাকে শেষ আহুতি দিতে হইবে!

কোন দিকে চাহিলাম না, কাহাকেও লক্ষ্য করিলাম না। আমার অফুরন্ত অশ্রু অপরিসীম বেদনা সুরে মিশাইয়া মুদ্রিত নয়নে গাহিতে লাগিলাম—

'আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো, ফুল ফুটবে,
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে, গোলাপ হয়ে উঠবে।'

আর্দ্রহৃদয়ে যাহা আরম্ভ করিয়াছিলাম, চোখের জলে তাহা শেষ করিলাম। চাহিয়া দেখি, সকলের চোখ ছল্‌ছল্ করিতেছে। সকলে নীরব!

সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া মা আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "করু, তুমি এমন গান কেন গাইলে মা? তোমার কিসের দুঃখ?"

হাসির ভাণ করিয়া মুখ তুলিতে আমার চোখে পড়িলেন জ্যোতি বাবু! তিনি রুমালে চোখ মুছিতেছিলেন।

মনে মনে আমি বলিলাম, তোর জীবন ধন্য করু! সার্থক তোর গান গাওয়া! যাঁহার হাসিতে তোর হাসি, তোর কান্নায় আজ তিনি কাঁদিয়াছেন। ইহাই তোর সকল পাওয়ার চরম পাওয়া, ইহার অধিক আশা তুই করিস না

১৮

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলে মিলি মায়ের কাছে বায়না ধরিল, "লেকের ধারে ফাঁকা জায়গায় তুমি একখানা ছোট বাড়ী করো মা। এটা ভাড়া দাও। এখানে আমার ভালো লাগছে না।"

মাসিমা সবিস্ময়ে বলিলেন, "লেকের ধারে বাড়ী? তার মানে কি মিলি? তোমরা যদি রোজ লেকে বেড়াতে চাও, এখান থেকে তাতে তো তেমন অসুবিধা নেই। মাঝে মাঝে গেলেই পারো। লেকের দিকে বাড়ী কর বললেই হয় না,—অনেক টাকার দরকার। ব্যাঙ্কের সুদের হিসাব ধরতে গেলে বাড়ী করা লোকসান। এক বাড়ী নিয়েই খরচান্ত, আর একখানা করে ফতুর হব শেষে!"

"ফতুর হবে কেন? বাড়ী করলে টাকা জলে পড়বে না, সম্পত্তি হয়ে থাকবে। টাকা তোমার ঢের জমেছে, ছোট একখানা বাড়ীতে তার সব ফুরোবে না, মা।"

মাসিমা রাগ করিলেন। বলিলেন, "আমার লাখ লাখ টাকা তোমরা তো দেখবেই। তোমাদের পিছনে খরচ নেই? কে আমাকে রোজগার করে দিচ্ছে? আমার সামনে রয়েছে বিরাট খরচ-পর্ব্ব। তোমার এখনো শেষ হলো না, ভানুর এই সবে সুরু। আমার একবার বাইরে ঘুরে আসবার ইচ্ছা কত দিন থেকে। কাজেই এখন আমি সব খুইয়ে আর একটা নতুন বাড়ী ফাঁদতে পারবো না। তুমি যদি জ্যোতির কাছাকাছি থাকতে চাও, সে ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। তোমার অমতের জন্যই আমাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

মাসিমার অনুমানে মিলি লজ্জিত না হইয়া বিরক্ত হইল। ঝাঁজালো কণ্ঠে উত্তর দিল, "কে তা চাইছে? আমার এখন দরকার কমল বাবুকে। ওঁর পড়া-শোনা আমার চেয়ে ঢের বেশি, কাছে হলে সুবিধা হতো, একসঙ্গে পড়তে পারতাম। যখন-তখন হটর-হটর করে ওখানে যাওয়া আমার পোষাবে না, অথচ পরীক্ষার ফল আমাকে ওঁর সমান করতে হবে। ও এগিয়ে গেছে। এখন থেকে চেষ্টা না করলে আমি ওর সঙ্গে পেরে উঠবো না।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া মাসিমা কহিলেন, "এর জন্য আমি আর একটা বাড়ী করতে যাবো কেন! তুমি ওদের ওখানে না যাও, কমল এখানে আসতে পারে। আমি তাকে বলে দেবো। আমরা খেয়ে এলাম, ওদেরো এক দিন বলতে হয়। করু, সবাইকে খাইয়ে দিতে পারবে তো?"

"কেন পারবো না মাসিমা? তুমি যে-দিন বলবে, সেই-দিনই ঠিক করা যাবে।"

"কলেজ খোলার আগেই এ হাঙ্গামা মিটিয়ে ফেলা ভালো। সামনের রবিবারে বন্দোবস্ত করি।" বলিয়া মাসিমা উঠিয়া গেলেন।

আমরা দুই সখী মুখোমুখী হইলাম। রাত্রে ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল. বাক্যালাপের অবকাশ পাই নাই। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। মিলির চঞ্চল চিত্ত আবার কোন্ রহস্যের অতল সাগরে সাঁতার দিতে চায়, অনুমান না করিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর কি আক্কেল মিলি, তুই কেবল মাসিমাকেই নিরাশ করিল না তো। আমাকেও করলি! লেকের ধারের সখ জেনে দারুণ সন্দেহ হয়েছিল, বুঝি জলে জোয়ার এসেছে! প্রিয়র বদলে প্রিয়র পরিজনদের সঙ্গসুখের প্রত্যাশী হয়েছিস্ শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি। কমল বাবু একেবারে গোবেচারা, আমাদের এক-বয়সী। তাঁর সঙ্গে না পড়লে তোর পড়া হবে না. —কি যুক্তিই তুই বের করেছিস!"

মিলি যেন গর্জ্জিয়া উঠিল, "একসঙ্গে পড়ি—তার সঙ্গে না পড়ে একটা বুড়ো-হাবড়ার সঙ্গে লোকে পড়ে না কি! ছাত্র-অবস্থাতে যারা বেশী বোকা থাকে, পরে তাদেরি পাখা গজায় তাড়াতাড়ি। সম-বয়সী বলেই আমার এত ভাল লেগেছে। ছেলেটি রত্ন! তুই জানিস নে করু, ওর কাছে আমি অপরাধী হয়ে আছি। বি-এ পরীক্ষার সময় যে দু' নম্বরের জন্য কমলের নাম আমার নীচে ছিল, তার ন্যায্য অধিকারী ওই। আগে জানতাম না, ওর কাছে আমার শেখবার ঢের আছে। কাল আলাপ করে বুঝেছি, আমার নাম ওর ওপরে কখনো উঠতেই পারে না। কেন যে উঠেছিল, এখন বলে লাভ নেই। এক দিন যাকে উচিত পাওনা থেকে বঞ্চিত করবার কারণ হয়েছিলাম, তাকে একটু স্নেহ করা অন্যায়?"

নীরবে মিলির মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। তাহার ব্যঙ্গবিদ্রূপ, রাগ-অভিমানের সঙ্গেই আমার নিত্য পরিচয়। এ ছলছল অশ্রু-পরিম্লান করুণার অভিব্যক্তি আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন! আমার মনে প্রচ্ছন্ন গর্ব্ব ছিল—মিলিকে জানিতে-চিনিতে লেশমাত্র বাকী নাই! কিন্তু এখন সংশয় জাগিতেছে, চিনি, জানি ভাবিলেই চেনা জানা যায় না। সংসারে কে কাহাকে সম্পূর্ণ জানিবার স্পর্দ্ধা রাখে? চিরসুখ-পরায়ণা, দাম্ভিকা, ছলনাময়ী মেয়েটির মধ্যে যে ন্যায়ের কাঁটা এত সূক্ষ্ম, তাহা জানিতাম না।

আমি নারী। কলহ করিবার শক্তি না থাকিলেও খোঁচা দিবার প্রবৃত্তি আছে। বলিলাম, "ভূতের মুখে রাম-নাম কেন মিলি? কমল বাবুর সৌভাগ্য বলতে হবে। এ পর্য্যন্ত কোন পুরুষের সঙ্গে যে ভাল ব্যবহার করতে পারে নি, তার দরদে সন্দেহ হয়। কমল কোন্ গুণে এত বড় কঠিনকে কোমল করে তুলেছে? শুধু কোমল নয়, জয় করেছে?"

"যারা জয় করতে শেখে না, জয় তাদেরি হয়, তা তুই জানিসনে করু? ছলনা, কৌশল লোভনীয় নয়। সাধে আমি পুরুষ-বিদ্রোহী? ওদের চেষ্টা, মেয়েদের জয় করে নেবে। আগে ছিল গায়ের জোর, এখন যাদের জোরের অভাব তারা শিক্ষার মুখোস পরে আমাদের ভুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েগুলোও তেমনি জলেভেজা মাটির ঢেলা! তেজ নেই, আগুন নেই, 'তু' বলে ডাকলেই হলো! পুরুষ-জাতকে চিনতে চাইবে না, জানতে চাইবে না, এমন নিরেট অন্ধ! জন্তু-জানোয়ার থেকে পাখী পর্য্যন্ত মেয়ে-জাতের মন-হরণের জন্যে ক'ত তৎপর! কোকিলের হাঁক-ডাক, ঘুঘু-পায়রার গলা ফুলিয়ে নাচ-গানের মূলে কি আছে, বল্ তো?"

মিলির সুদীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দিয়া আমি প্রতিবাদ করিলাম, "এক-তরফা গলাবাজি তো খুব করছিস মিলি, অন্য দল না থাকায় ঝাল ঝাড়বার সুবিধা হয়েছে। সৃষ্টির যত পুরুষই কি মন-চুরির ব্যবসা করে? আমাদের সরলা অবলাদের কি কোনো লোভ নেই, মোহ নেই? যে ধরা দেয় না, কার সাধ্য তাকে ধরে বা বাঁধে? স্ত্রী-পুরুষ দু'জনের ইচ্ছাতেই না ধরা-ছোঁয়া নাগালের সুযোগ! নাহলে সংসার হতো কেমন করে? সমাজ চলতো কিসের জোরে? যাদের নিন্দায় তুই পঞ্চমুখ, কমল কি তাদের ছাড়া? সবাইকে রসাতলে পাঠিয়ে যাকে ভালো করে জানিসনে, চিনিসনে, তাকে স্বর্গে তোলার মানে কি?"

"যে খাঁটি, নিস্পাপ তাকে জানতে সময় লাগে না করু! পাঁজি না দেখেও আকাশের দিকে চেয়ে পূর্ণিমা জানা যায়। জানি, আমাকে তুই ভালবাসলেও আমার ওপর তোর উঁচু ধারণা নেই। সে দোষ আমার। আমি তোর মত দুর্ব্বল নই। আমি খেলা ভালোবাসি। নির্ব্বোধ খেলুড়ি পেলে আমার উৎসাহ বাড়ে। যারা যুদ্ধের সাজে সেজে আসে, আমার যুদ্ধ তাদের সঙ্গে। কমলের যুদ্ধের সাজ নেই, কমল খেলা জানে না, তাই ওকে আমার ভালো লেগেছে। এ ভালো লাগা আমারি রইলো। এক দিন আমাকে দিয়ে ওর

যে ক্ষতি হয়েছিল, ওকে কাছে এনে, আমি যা কিছু জানি তাই দিয়ে, ওর সে ক্ষতি পূরণ করবো। এতে কারুর উপর অন্যায় অবিচার হবে না।"

"অন্যায় অবিচার জানি না মিলি। একটা কথা আমারো বলবার আছে! অন্যের ক্ষতি পূরণ করতে গিয়ে তুমি জ্যোতি বাবুকে যেন আঘাত দিয়ো না। তিনি তোমার দিকে চেয়ে আছেন। তাঁর বাগ্‌দত্তা তুমি, এ-কথা মনে রেখে যত খুশী খেলা খেলো। এক কমল কেন, হাজার কমলকে নেমন্তন্ন করে আনো। তোমার তূণে যত বাণ আছে, তা দিয়ে সবাইকে বিঁধিয়ে মারো। শুধু মনে রেখো, তুমি বাগ্‌দত্তা বধূ!"

"থাম্ রুকু, অত বিশেষণ দিতে হবে না। 'বাগ্‌দত্তা' শব্দটা আমার মিষ্টি লাগে না, তার সঙ্গে আবার বধূ! অসহ্য! ভাবী বধূ কারা? 'দিব্য-গঠনা, লজ্জা-ভূষণা, বিনত-ভুষণ-বিজয়ীনয়না' যারা। আমি নই! সে বয়স, সে মোহ আমাতে নেই। তোতে বধূ-সুলভতা আছে প্রচুর। আমার স্বভাব প্রেয়সীর, বধূর নয়! তবু এক জনকে মনে রাখতে হবে বৈ কি! তুই আমার কাছে থাকলে সেও থাকবে। আমার যখন যা মনে হয় বলে ফেলি বলে তুই রাগ করিসনে রুকু। জানিস তো, ঢাকা-চাপা আমার মধ্যে নেই। সে বিদ্যায় তুই সিদ্ধিলাভ করেছিস। বুক ফেটে মরে গেলেও তুই মুখ ফুটতে দিবিনে।"

বলিয়া মিলি সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। আমার মাথা নত হইল। মিলির পানে চাহিতে পারিলাম না। তার কথার কোনো উত্তর দিতে পারিলাম না।

১৯

'ঝর ঝর ঝরে জল, বিজুলী হানে,
পবন মাতিল আজ বাদল-গানে।'

এ-হেন সন্ধ্যায় জ্যোতি বাবুরা সকলে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন! কালবৈশাখীর নিবিড় মেঘের মত নীল শাড়ী পরিয়া খোঁপায় বৃষ্টি-ধৌত জুঁইয়ের মালা জড়াইয়া কাণে আধফোটা চাঁপার কলি দুলাইয়া মিলি সকলের সামনে আসিয়া উদয় হইল।

এ বাড়ীর উৎসবে রন্ধন-শালার ভার আমি লইতাম। মিলির উপর থাকিত সাজানো-গোজানো অভ্যর্থনার ভার। মিলির পছন্দ উঁচু-দরের, আমি অত জানি না।

জানলায়-জানলায় বকুলের মালা ঝুলাইয়া, ঘরের চার কোণে 'টিপয়ের' উপর কেতকী-কদম্বের তোড়া রাখিয়া বসিবার ঘরে মিলি সজল শীতল বর্ষার অভিনব রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

হলে পা দিয়াই প্রশংসমান নেত্রে দিদি আমার পানে তাকাইয়া কহিলেন,—বাঃ! ঘরেই যে তোমাদের বর্ষার সমারোহ! এ পরিকল্পনা কার? আমাদের নীরব কবি বনফুলের? না, মিলির?

হাসিয়া জবাব দিলাম—না দিদি, নীরব কবির কবিত্বের বিকাশ নেই। এ সব মিলি সাজিয়েছে।

আদর যত্ন করিয়া মাসিমা সকলকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমাদের জামাইকে দেখছি না কেন? তিনি এলেন না?

মা বলিলেন,—হঠাৎ টেলিগ্রাম পেয়ে কি মকদ্দমা বুঝিয়ে দিতে দুপুরের গাড়ীতে সুকান্তকে পাবনা যেতে হলো। বাছার খাটুনির আর অন্ত নেই! এখানে আজ আসতে চেয়েছিল, পারলে না বলে দুঃখিত হয়ে গেছে।

দিদি বলিলেন,—ফিরেই এখানে আসবেন। তাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর প্রতিনিধিকে নিয়েই আজকের মত ত্রুটি ক্ষমা করতে হবে মাসিমা। কমল তাঁর প্রতিনিধি হয়ে এসেছে।

জ্যোতি বাবু কহিলেন,—কমল কেন জামাই বাবুর প্রতিনিধি হতে যাবে? স্বয়ং সশরীরে তাঁর প্রতিনিধি তো উপস্থিত! পুরো-একের বদলে অর্দ্ধেক পেয়ে এঁরা ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন। সত্যি দিদি, তোমার লাভের বরাত দেখে হিংসা হয়। এক জন এসেছ মিঠাই মণ্ডা বোঝাই নিতে, আর এক গেলেন বোঝাই করতে টাকার থলি। পাওয়ার ভাগ্য তোমাদেরি একচেটে।

কৃত্রিম কোপে দিদি ঝঙ্কার তুলিলেন,—তা নয় তো কি? পরের ভাগ্য দেখতে পঞ্চাননের মত দশটি চোখ! আর নিজের বেলায় একচোখো হরিণ! আমি এসেছি মিষ্টির লোভে, উনি এসেছেন হাওয়া খেতে! হিংসা যদি করতে হয়, তোকে করা উচিত। তুই হচ্ছিস্ এ রাজ্যের রাজা, এ যজ্ঞের হোতা, এ আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ! তোর আলোতেই না অধমাধম আমরা মিট-মিট করে জ্বল্‌ছি! তুই একটু সরে দাঁড়ালে আমরা যে নিবে যাবো জ্যোতি! পরের টাকায় অত নজর দেওয়া ভালো নয়। দিন তোরও আগত, ভবানী-পুরের লক্ষ্মীকে লেক-লক্ষ্মী করে নিলেই ঝন-ঝন শব্দে আমাদেরো কাণে তালা লেগে যাবে!

—তালা লাগা কি এতই শস্তা দিদি? সকলে তোমার মত পয়মন্ত নয়। বলিয়া জ্যোতি বাবু চেয়ার ছাড়িয়া দর-দালানে চলিয়া গেলেন। সেখানে গালিচা বিছাইয়া প্রবীর-কঙ্কণকে লইয়া ভাম্ন মহা-উৎসাহে ছবির বই খুলিয়া ছবি দেখাইতেছিল। জ্যোতি বাবুকে পাইয়া বালক-বালিকার মহলে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

মিলিকে ডাকিয়া দিদি বলিলেন;—তুমি একবার ছাখো তো মিলি, ওরা সবাই মিলে কঙ্কণকে ক্ষ্যাপাচ্ছে। ছেলে-মানুষ পেয়ে জ্যোতি অষ্ট-প্রহর ওর পিছনে লেগে থাকে। ওকে কাঁদিয়ে জব্দ করবার জন্যই ও গিয়ে ওদের দলে ভিড়লো।

দিদির প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে মাসিমা প্রীত হইয়া বলিলেন,—যাও মিলি, এর পরে কমলের সঙ্গে লেখাপড়ার চর্চ্চা করো। করু, তুমিও খাবার-দাবার যোগাড় করো গে। রাত মন্দ হয়নি। আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমছে। বৃষ্টি বোধ হয় আরো জোরে নামবে। খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে বসাই ভালো। মেঘলা-দিন আমি ভালোবাসি না—ভারী বিরক্তি ধরে।

—বাদলার দিনে তুমি তো তাস খেল্‌তে ভালবাসো মা, আজ ঢের লোক পেয়েছ, খেল্‌লে খেলা জমবে বেশ।

মিলির প্ররোচনায় মাসিমা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—তা মন্দ নয়! খেয়ে-দেয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসা যাবে'খন। সব তৈরি, খাবার ঠাণ্ডা করার দরকার কি? করু, তুমি খাবার-ঘরে যাও, চট করে গুছিয়ে দাওগে।

মাসিমার তাড়ায় আমাকে উঠিতে হইল।

একতলায় রান্নাঘরের পাশের বড় ঘরখানা আমাদের খাবার-ঘর। টেবিলে, মেঝেয় দু' রকম ব্যবস্থাই আছে। দিদি টেবিলে খান না, তাই মেঝেয় আসন পাতিয়া জায়গা করা হইয়াছিল। আসনের সামনে থালা বাটী সাজাইয়া সকলকে ডাকিবার জন্ত আমি সিঁড়িতে উঠিলাম, কিন্তু উপরে আমার ওঠা হইল না। সিঁড়ির মুখে জ্যোতি বাবু ও মিলি! মিলির একখানি হাত জ্যোতি বাবুর হাতে। দু'জনের মৃদু বাক্যালাপে কলহাস্তে স্থানটি মুখরিত।

আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না, আস্তে আস্তে পা টিপিয়া নামিয়া আসিলাম, কিন্তু সরিয়া যাইতে পারিলাম না! সোপান-সংলগ্ন খোলা চাতালে দাঁড়াইয়া উহাদের রহস্তালাপ গিলিবার চেষ্টা করিলাম! ঝম-ঝম বৃষ্টির সহিত

গুরু গুরু মেঘের গর্জ্জন—তাহার মধ্যে দু'জনের হাসির গুঞ্জন-ধ্বনি বিলীন হইয়া গেল।

দেখিবার কিছু ছিল না, শুনিবার কিছু ছিল না, তথাপি আমি সে স্থান ত্যাগ করিতে পারিলাম না। যে কাজের ভার আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ভুলিয়া গেলাম।

কিয়ৎকাল পরে মিলির কোমল স্পর্শে আমার চেতনা ফিরিল।

মনের দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য শশব্যস্তে আমি বলিলাম,—ওঁদের ডেকে এনে বসিয়ে দে মিলি, আমার সব হয়ে গেছে! যা, যা, দেরী করিস নে।

মিলি আমার সর্ব্বাঙ্গে হাত দিয়া কহিল,—বৃষ্টির ঝাটে তুই যে একেবারে ভিজে গেছিস রুরু! ছি, জ্ঞান-হারার মত এমন করে ভেজে? যা, গা মুছে কাপড় বদলে আয়, আমি এদিকে আছি।

নিঃশব্দে সেখান হইতে আমি ছুটিয়া পলায়ন করিলাম।

২০

দিন কয়েক পরে গ্রাম হইতে বিন্দু পিসিমার পত্র পাইলাম। পিসিমা বাবার খুড়তুতো বোন। মা'র মৃত্যুর পর হইতে সন্তানহীনা বিধবা আমাদের ক্ষুদ্র সংসারে গৃহিণী।

পিসিমা লিখিয়াছেন,—মা রুরু, তুমি একবার আসিতে পারিলে ভালো হইত। কয়েক দিন হইতে দাদার শরীর ভালো যাইতেছে না। প্রায় জ্বর হয়! ঔষধপত্র খাইতে চান না; আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। তুমি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া যাইবে।

পিসিমার চিঠি পড়িয়া বাবার জন্য উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় অস্থির হইলাম। বাবার স্মৃতির অন্তরালে নগরের মোহ, প্রেমের মোহ সহসা অন্তর্হিত হইল। মনে পড়িল, কত দিন বাবাকে চিঠি লিখি নাই! বাবার শেষ পত্রের উত্তর এখনো দেওয়া হয় নাই!

পিতা যখন রোগে, শোকে, অভাবে সন্তানের শিক্ষার ব্যয়-বহনের নিমিত্ত উদগ্রীব, সন্তান তখন তাঁহারই কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থে শিক্ষার উপলক্ষ লইয়া ভালোবাসার স্বপ্নে বিভোর। হায় রে, এই সন্তান! ইহারি নাম উচ্চশিক্ষা!

মাসিমাকে বলিলাম,—বাবার শরীর খারাপ, পিসিমা লিখেছেন—আজই আমি বাড়ী যেতে চাই।

টেবিলে ঝুঁকিয়া মাসিমা কি লিখিতেছিলেন। বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—চিঠি কই? কি অসুখ? এবার তোমার পরীক্ষার বছর, কারণে-অকারণে ছুটোছুটি করবার সময় নয়।

বলিলাম,—বাবার চেয়ে আমার পরীক্ষার পড়া বড় নয়। আমি আজই যাবো। এই চিঠি দেখুন।

মাসিমা কয়েক ছত্র লেখার উপর চক্ষু বুলাইয়া তাচ্ছিল্যের স্বরে কহিলেন,—ম্যালেরিয়ার দেশে পড়ে থাকলে এমন একটু-আধটু জ্বর হয়েই থাকে। তার জন্ম এত ব্যস্ত হলে চলে না। যেতে চাইছো যাও, কিন্তু দেরী করো না। লেখাপড়ার অনর্থক ক্ষতি আমি সইতে পারি নে।

বলিলাম,—শীগগিরই ফিরে আসবো মাসিমা। পড়ার ক্ষতি হবে না।

মিলির ঘরের জানালা-দরজায় গাঢ় লাল রঙের পর্দ্দা। পর্দ্দার গায়ে মিলির স্বহস্তে রচিত সূচি-শিল্পের নিদর্শন, সোনালী রেশমী সূতায় বোনা মল্লিকাগুচ্ছ।

মিলির ঘরে বায়রনের কবিতা আবৃত্তি হইতেছিল! সে কাব্যালোচনার মধ্যে পদক্ষেপ করিতে আমার দ্বিধা হইল।

দ্বারে দাঁড়াইয়া আমি ডাকিলাম—মিলি—

মিলি সাড়া দিল—কে? রুক্ন! বাইরে কেন? ভিতরে আয়।

পাশাপাশি দু'খানি চেয়ারে কমল বাবু ও মিলি বসিয়াছিল। সম্মুখের টেবিলে খোলা বায়রন। মিলির অনাবৃত একখানা মৃণাল-বাহু কমলের স্কন্ধে স্থাপিত। মিলির চোখে-মুখে আনন্দ-কৌতুক ঝরিয়া পড়িতেছে।

এ দৃশ্যে আমি যেন মরমে মরিয়া গেলাম! উহাদের সামনে যাইতে পারিলাম না। পিছনে জানালার শিক ধরিয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

কিয়ৎকাল পরে মিলি কহিল—কি রে রুক্ন, ঘরে ঢুকে ধ্যানমগ্না তাপসী হয়ে রইলি যে! হাতে কার চিঠি? কোন্ ভাগ্যবান্ অভিসারের সঙ্কেত পাঠিয়েছে? পত্র দিল কেশর খাঁকে ভূপাল-বাগের রাণী!

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল! রুক্ষ স্বরে আমি কহিলাম—আমি আজ বাড়ী

যাচ্ছি। বাবার অসুখ। তাই বল্‌তে এসেছি। আমার সময় কম, গুছিয়ে নিতে হবে, বাবার জন্ম কয়েকটা ফল কিনতে হবে।

—ও, মেসোমশায়ের অসুখ! কি অসুখ? কত দিন হলো? বলিতে বলিতে মিলি কমলের গায়ে এলাইয়া পড়িল। সেই এলায়িত ভাবেই হাত বাড়াইয়া আমার হাত হইতে চিঠি লইয়া পড়িতে লাগিল।

আমার দৃষ্টি আবার আনত হইল। জানি, অল্প দিনেই কমলের সঙ্গে মিলির ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হইয়াছে। প্রতিদিন সকালে-সন্ধ্যায় পাঠ্য বিষয়ের গভীর গবেষণা চলিয়াছে। উহাদের আলোচ্য বিষয়ে আমার যোগ নাই—আমি দূরে সরিয়া থাকি।

মাসিমার ব্যবস্থায় লেখা-পড়ার জন্ম আমরা সকলে পৃথক্ ঘর পাইয়াছিলাম। এক জায়গায় নানা বিষয়ের জটলা মাসিমা পছন্দ করেন না। পড়ার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রখর। সে জন্ম মিলির পাঠাগারের রহস্য আমি তেমন ভেদ করিতে পারি নাই। আজ মিলির নূতন অভিযান আমাকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। মিলির এ খেলার অবসান হইবে না? নবীন তরুর মত, অম্লান ফুলের মত এই কিশোর পতঙ্গটিকে মিলি কোন্ প্রাণে তীব্র অনলের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে? ধাপে-ধাপে মিলি এত দূর নামিয়াছে, জানিতাম না!

—এত ভাবছিস কেন করু। মেশোমশায়ের তেমন কিছু হয়নি! মাঝে মাঝে জ্বর হচ্ছে, দিনকতক সাবধানে থেকে ওষুধ খেলেই ভালো হয়ে উঠবেন। কিছু দিন এখানে এনে রাখতে পারলে সেরে যেতেন। তুই গিয়ে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে আয়, সেইটেই সব চেয়ে ভালো ব্যবস্থা হবে।

আমি জবাব দিতে মুখ তুলিলাম, কিন্তু জবাব দেওয়া হইল না। কমলের পিঠের উপর ঝুঁকিয়া মিলি কথা কহিতেছিল, তখনো দু'জনের হাতে-হাতে জড়ানো।

কথার জের টানিয়া মিলি বলিতে লাগিল—যে জিনিস সঙ্গে নিবি, ঠিক করে রাখ্‌গে। ধোপা আস্‌ছে না, আমার আল্‌মারি খুলে কাপড়-জামা যা দরকার হয়, বের করে নে। ফল এখন এনে দরকার নেই। যাবি তো রাত দশটায় ঢাকা মেলে। বিকেলে দরোয়ানকে পাঠিয়ে ফল আনিয়ে দেবো।

এবারও কিছু বলিতে পারিলাম না। চুপ করিয়া রহিলাম।

লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে কমল বলিল,—বেলা হয়েছে। আমি এখন উঠি।

সোজা হইয়া কমলের আরক্ত গণ্ডে একটা মৃদু টোকা দিয়া মিলি বলিল,—হ্যাঁ, দশটা বেজে গেছে। আজ একটায় ক্লাশ। দিদি তোমার ভাত নিয়ে বসে-বসে আমাকেই গাল দেবেন। তুমি যাও। আমার বাবু, গাল খাবার সখ নেই! শোনো কমল আর একটা কথা, জ্যোতি বাবুকে বলো, করু আজ রাত্রের গাড়ীতে বাড়ী যাবে। তিনি যেন সন্ধ্যা বেলা আসেন! বলতে ভুলে যেয়ো না।

ঘাড় নাড়িয়া কমল চলিয়া গেল।

আমার কাছে আসিয়া সরলা বালিকার মত মিলি আমাকে বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া অতি কোমল, স্নিগ্ধ স্বরে বলিল,—কেন এত ভাবছিস করু? অসুখ কার না হয়? সামান্য অসুখের জন্য এমন উতলা হোস্ নে!

বিরক্তি-ভরে মিলিকে ঠেলিয়া দিয়া আমি বলিলাম,—বাবার জন্য ভাবছি না, আমাকে দেখলেই তিনি সেরে উঠবেন, জানি। আমি অবাক হচ্ছি তোর রকম-সকমে। এই যদি শিক্ষার পরিণতি হয়, এমন শিক্ষায় আমার কাজ নেই। ভাবছি, বাড়ী গিয়ে আর ফিরবো না, পরীক্ষা দেবো না।

—ছি করু! ছেলেমান্ষী করিস নে! ভাবের বন্যায় ভেসে যাস্ নে। আমার কুশিক্ষায় তোর সুশিক্ষা মাটী হতে পারে না। তুই না বলিস, ভালো-মন্দ নিয়ে সংসার! আমি মন্দ হলেও তোর ভালো থাকায় বাধা নেই। এত কষ্ট করে পড়েছিস, পরীক্ষা না দিলে মেশোমশায় দুঃখ পাবেন। পরীক্ষা তোকে দিতে হবে, আমার কাছে থাকতেও হবে। ছাড়তে পারবি নে করু। সে সাধ্য তোর নেই।

বলিয়া মিলি আমাকে আবার আবেগ-ভরে জড়াইয়া ধরিল।

২১

সন্ধ্যার পর জ্যোতি বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে দিদি ও কমল। যাইবার পূর্ব্বে মনে-মনে দিদিকে একবার কামনা করিয়াছিলাম। দিদির সঙ্গে আমার বেশী দিনের ঘনিষ্ঠতা নয়, তবু তাঁহাকে সব-চেয়ে আপনার বলিয়া মনে হইত।

দিদিকে আমি চাহিলেও দিদির ভাইটির দর্শনাভিলাষী ছিলাম না। যে প্রদীপ আলো দেয় না, দাহ আনে, কে তাহাকে চায়? মিলির উপর আমার রাগ হইতেছিল, জ্যোতি বাবুকে খবর দিবার কি তাহার প্রয়োজন ছিল? যে

অবোধ মৃগ তাহারই মায়া-পাশে আবদ্ধ, তাহাকে কেন অপরের নয়ন-পথে আনিয়া আকুল, উতলা করা!

জ্যোতি বাবুর পাশ কাটাইয়া দিদিকে আমার ঘরে লইয়া গেলাম। দিদি একটি বেতের বাক্স আনিয়াছিলেন। সেটা আমার সামনে রাখিয়া বলিলেন,—কমলের কাছে শুন্‌লাম—বাবার অসুখ, তুমি আজ যাবে। এতে তাঁর জন্ম ক'টা জিনিস এনেছি। বেশী কিছু নয়,—আচার, আমসত্ত আর মোরব্বা। আমি তৈরি করেছি। তাঁকে খেতে দিয়ো।

—কষ্ট করে এত আপনি বয়ে এনেছেন দিদি!

—কষ্ট কেন বনফুল! সামান্য জিনিস। তোমার বাবা হলেও তিনি আমারো আপনার। তাঁকে দেবো, তাতে তোমার আপত্তি আছে?

—না দিদি, আপত্তি কিসের! তোমাকে—আপনাকে আমি পর ভাবতে পারি নে, নিজের মনে করি।

—পর ভাবতে কে বলে বনফুল? যদি নিজের মনে করিস্, তবে ভদ্রতার 'আপনি' মুখোসটা রেখেছিস কেন? তুই কার সঙ্গে যাচ্ছিস?

—কারুর সঙ্গে নয়। আমি একাই আসি-যাই।

—একা যাওয়া ভালো কথা নয়। পাড়াগাঁয়ে গুণ্ডাদের যে অত্যাচার-অনাচারের কথা শোনা যায়, তাতে কোনো মেয়ের পক্ষে পথে-ঘাটে একা বেরুনো উচিত নয়। গাড়ী থেকে নেমে তোকে তো আবার গোয়ালন্দে ষ্টীমারে চাপতে হবে! সঙ্গে লোক থাকা ভালো।

—ভয়ের কিছু নেই দিদি। সকাল বেলা ষ্টীমার ছাড়ে, বেলা তিনটে নাগাদ ভেতর-বাড়ী পৌঁছে যাবো। গুণ্ডা-বদমাইস সব-জায়গাতেই আছে। মেয়েদের লুকিয়ে রাখলেই কি এর প্রতিবিধান হবে? শক্তি সঞ্চয় না করতে পারলে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

—সত্যি, বইয়ের বোঝা না বয়ে বাঙ্গালীর ছেলেদের এখন লাঠির আদর করা দরকার।

আমাদের কথার মাঝখানে পাণ ও সরবৎ লইয়া মিলির শুভাগমন হইল। মিলি কহিল,—দিদি, সরবৎটুকু খেয়ে নিয়ে পাণ খান।

দিদি বলিলেন,—আবার সরবৎ কেন মিলি? পাণ পেলে তোমাদের দিদির আর কিছু দরকার লাগে না। ওঁরা সব কোথায়? মাসিমা কি করছেন?

—ওঁরা চা খাচ্ছেন, মা সেইখানেই আছেন।

দিদি পাণ চিবাইতে-চিবাইতে বলিতে লাগিলেন,—আমি বনফুলকে বলছিলাম, ছেলেদের এখন লাঠির আদর করা দরকার। জাতির যারা ভবিষ্যৎ, তাদের ডিগ্রি নিয়ে থাকার যুগ চলে গেছে। এখন উচিত শক্তির সাধক হওয়া। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তবু আমার এই মনে হয়।

মিলি বিদ্রূপের হাসি হাসিল, বলিল—দিদির আশা তো কম নয়! এ দেশের ছেলেরা করবে শক্তির সাধনা? তবেই হয়েছে! এরা জানে প্রেমের সাধনা! তাও উঁচুদরের নয়, নেহাৎ মামুলি! শস্তা, জলো প্রেম যে-জাতের মজ্জাগত, তাদের মধ্যে বীরত্ব, মহত্ত্ব জাগবে কোথা থেকে? যে-জাতির পুরুষ ভীরু কাপুরুষ, সে-জাতির মেয়েরাও হয়েছে তেমনি খেলার পুতুল!

দিদি বলিলেন,—মানলাম, ছেলেরা ভীরু কাপুরুষ, কিন্তু শক্তিমতী মা না হলে শক্তিমান ছেলে হবে কোথা থেকে? 'দুর্গা' মা বলেই না কার্ত্তিক তাঁর ছেলে! সুভদ্রা পেয়েছিলেন অভিমন্যুকে! লব-কুশের মা সীতা!

মিলির চোখ যেন জ্বলিতে লাগিল। মিলি বলিল,—আপনি ঠিক বলেছেন দিদি! দুর্ব্বল মা হলে সবল সন্তানের আশা করা যায় না। কিন্তু বীর-মা হবার আগে বীর-জায়া হতে হবে। আগে বীর-পত্নী, তার পরেই না বীর-জননী! শিবের শিবানী, অর্জ্জুনের সুভদ্রা, রামের সীতা—এঁরা হয়েছিলেন বলেই অমন ছেলে পেয়েছিলেন! শেয়ালের বাচ্ছা শেয়াল হয় দিদি, সিংহ হয় না! তাঁরা কি প্রেম করেননি? সে প্রেমের আদর্শ কত উঁচু! আর এরা নেমে গেছে কোন্ অতলে! এদের হরধনু ভাঙ্গা নেই, লক্ষ্যভেদ করা নেই, প্রিয়ার জন্য যুদ্ধ নেই, পরিশ্রম নেই।—শুধু দু'টো মিষ্টি কথা আর ছলনা! এর চেয়ে শস্তা জিনিস আর আছে? সাধে ভালবাসার ন্যাকামি আমি সইতে পারিনে! আমার গা জ্বালা করে। ওরা যেমন মেয়েদের খেলার পুতুল ভাবে, আমিও তেমনি ভাবি, ওরাও আমাদের খেলার পুতুল!

সন্দেহাকুল নেত্রে দিদি মিলিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আমি অনুমান করিলাম, দিদির শান্ত হৃদয়ে সংশয় জাগিয়াছে, দ্বিধা আসিয়াছে। মিলির প্রবল মত-বাদে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। যে-মেয়ে ভালোবাসা পাইয়া, ভালোবাসিয়া বিবাহে সম্মতি দিয়াছে, তাহার এ মত-বাদ শোভা পায় না! প্রেমে পাষাণ গলিয়া যায়! কঠোরকে প্রেম কোমল করিয়া তোলে!

দিদি কি উত্তর দেন, শুনিবার আশায় আমি দিদির মুখের দিকে তাকাইলাম।

দিদির উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মাসিমা সদলে আসিয়া হাঁকিলেন,—করু কি করছ! আজ কি তোমার যাবার ইচ্ছা নেই? খেয়ে-দেয়ে তৈরি হবে কখন? সময় যে হয়ে এলো!

সত্যই সময় বেশী ছিল না। লজ্জিত হইয়া আমি কহিলাম,—সব ঠিক আছে মাসিমা, এখুনি খেয়ে নিচ্ছি। ভজুয়া ট্যাক্সি নিয়ে আসুক।

জ্যোতি বাবু বলিলেন,—গাড়ী আমাদের সঙ্গে আছে। আমি আপনাকে পৌছে দিয়ে আস্‌ছি, চলুন। দিদি বসবে? না, তোমায় বাড়ী পৌছে দিয়ে আসবো?

—না জ্যোতি, আজ আর বসতে পারবো না। কমলকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। আমি গিয়ে গাড়ী ফেরত পাঠিয়ে দেবো।

দিদি উঠিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

এত রাত্রে জ্যোতি বাবুর পাশে বসিয়া ষ্টেশনে যাইবার সম্ভাবনায় আমার বুকে যেন ঝড় বহিতে লাগিল! কুণ্ঠিত ভাবে আমি বলিলাম—রাত করে ওঁকে আর কষ্ট করতে হবে না দিদি। দরোয়ান্ সঙ্গে থাকবে, আমি ট্যাক্সিতেই যাবো'খন।

মিলি বলিল,—গরমের রাতে মোটরে বেরুতে কারো কষ্ট হয় না করু! বেশ তো, ওঁর সঙ্গে চ আমিও তোকে তুলে দিয়ে আসি।

—তাই তোমরা যেয়ো মিলি। আমরা তাহলে আসি। বলিয়া দিদি কমলের পিছনে-পিছনে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন।

সদরে আসিয়া আমি ডাকিলাম—দিদি আমার প্রণাম করা হয়নি।

দিদি থামিয়া আমার একখানা হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিলেন। একবার ইতস্তত: করিয়া অত্যন্ত মৃদু স্বরে বলিলেন,—আমি যেন মিলিকে ঠিক বুঝতে পারছি না বনফুল! আমার ভয় হচ্ছে, জ্যোতি হয় তো ওকে না জেনে না বুঝেই জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছে! ভগবান কি করবেন জানি না! জ্যোতি আমার একটি মাত্র ভাই, সে সুখী হলেই আমাদের সুখ।

দিদি নারী! নারীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া স্নেহের অনুভূতিতে তিনি যাহা বলিলেন, আমি সে-কথার জবাব দিতে পারিলাম না। নীরবে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইলাম।

২২

'যেখানে পথের বাঁকে গেল বধূ নত আঁখে, ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী', সেইখানে আসিয়া আমার পথের শেষ হইল।

যখনই গ্রামে পদার্পণ করি না কেন, পল্লীর স্নিগ্ধ-শ্যাম শোভা আমাকে পুলকিত করে। গ্রীষ্মের শুষ্ক বনস্থলী, বর্ষার ঘন-নীল মেঘ-মালা, শরতের সোনালী প্রভাত, হেমন্তের নির্ম্মল শিশির-কণা, শীতের নিরানন্দ কুহেলিকা, বসন্তের অপরূপ মাধুরী আমার হৃদয়ে সুধা-রস বিকিরণ করে। পর্য্যায়-ক্রমে ছয় ঋতু আসে-যায়, আমি যে কাহাকে বাদ দিয়া কাহাকে হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিতে চাই, বলিতে পারি না!

নদীর উপকূলে আমাদের মাটির কুটীর। বৃষ্টিধৌত সরস বৃক্ষশিরে পড়ন্ত-রৌদ্র ঝিকিমিকি করিতেছিল। সাম্‌নে ভাদ্রের ভরা নদী। ক্ষান্ত-বর্ষণ নীলাকাশ নদীর বুকে মুখ দেখিতেছিল!

বাহিরের বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসিয়া বাবা বই পড়িতেছিলেন, আমি যেমন দেখিয়া গিয়াছিলাম, তেমনি প্রসন্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি। পরিবর্ত্তনের মধ্যে কিছু কৃশ, দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল।

যাঁহাকে দেখিবার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে উদ্বেলিত হৃদয়ে আসিতেছিলাম, তাঁহাকে দেখামাত্র আমার আর তর্ সহিল না। ছোট শিশুর মত উল্লাস-ভরে বাবার কাছে আসিয়া ডাকিলাম, "বাবা আমি এসেছি।"

বাবা চমকিয়া মুখ তুলিলেন। নিমেষে তাঁহার মুখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইল।

আমার প্রণত-শিরে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মমতার বিগলিত কণ্ঠে বাবা কহিলেন, "এলি মা! ভালো আছিস? তোদের কলেজে কিসের ছুটি রে? কই, ছুটির কথা তো শুনিনি!"

বলিলাম, "না বাবা, ছুটি নয়। পিসিমার চিঠিতে তোমার অসুখের খবর পেয়ে এসেছি। আজ কেমন আছো বাবা? জর হয়নি তো?"

আমাকে কোলের কাছে বসাইয়া কপালের চুল সরাইয়া দিতে দিতে বাবা বলিলেন, "জর হয়নি মা, আমি ভালো আছি। ক'দিন সামান্য জর হয়েছিল, সে কিছু নয়। বিন্দু আবার তাই লিখে তোকে ব্যস্ত করে এনেছে! বিন্দুর এ বড় অন্যায়!"

"কিসের অন্যায়, বাবা? আমাকে তোমার দেখতে ইচ্ছা না হলেও আমার হতে নেই বুঝি?"

জানি না, কেন আমার চোখ হঠাৎ জলে ভরিয়া গেল। যেখানে অকৃত্রিম ভালোবাসা, সেইখানেই অভিমান অপরিমিত।

ঈষৎ আহত হইয়া বাবা বলিলেন, "কে বলে, দেখতে ইচ্ছা হয় না? তোর ভালোর জন্য, লেখাপড়ার জন্যই না দূরে রেখেছি! তুই ছাড়া আমার কে আছে, রুরু!"

মুখে কিছু বলিতে পারিলাম না; মনে মনে বলিলাম, আমারো তুমি ভিন্ন কিছু নাই বাবা।

আমার সাড়া পাইয়া পিসিমা বাহির হইয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ও মা রুরু এসেছিস্! আগে জানলে ষ্টীমার-ঘাটে লোক পাঠাতুম, ভাত রেখে দিতুম। আমার চিঠি পেয়েই বুঝি রওনা হয়েছিস্?"

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া উত্তর দিলাম, "হাঁ পিসিমা, সকালে চিঠি পেয়ে রাত্রে রওনা হয়েছি।"

"বেশ করেছিস মা। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না এলে কি মানায়? গরমের ছুটিতে পাহাড়ে গেলি, আমি বকে মরি। গাছের যাহোক আম-জাম দুটো পেড়ে কার হাতে দিই? পাহাড়-পর্ব্বত ভালো হলেও নিজের বাড়ীর চেয়ে ভালো নয়। পথের কষ্টে মুখ তোর শুকিয়ে গেছে রুরু, আগে হাত-পা ধুয়ে জল খা, আমি ভাত চড়িয়ে দিই।"

"না পিসিমা, তাড়াহুড়ো করে তোমাকে ভাত চড়াতে হবে না। বেলা গেছে, অসময়ে আমি ভাত খেতে পারবো না! রাত্রে বাবার সঙ্গে খাবো। মাসীমা সঙ্গে খাবার দিয়েছিলেন, ষ্টীমারে খেয়ে নিয়েছি। এখন ক্ষিদে নেই। বারে-বারে খেতে পারি না। অভ্যাস নেই।"

"তা থাকবে কেন মা, তোমরা যে সহুরে হয়েছে! না খেয়ে খেয়ে ঢেঙা রোগা লিকলিকে চেহারা করেছো! জোয়ান বয়সের মেয়ে তিন বেলা ঠেসে পেট পুরে ভাত খাবে, দিন-ভোর মুখ নাড়বে, তবে না হবে চেহারার চেক্‌নাই! তা না, ঘড়ি ধরে বাতাস খেয়ে খেয়ে মেয়ের কি ছিরি হয়েছে, দেখেছো দাদা? এর নাম কি পাহাড়ের হাওয়া-খাওয়া দেহ?"

সস্নেহ দৃষ্টিতে বাবা আমার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সত্যি রুরু, বিন্দু মিথ্যে বলেনি! সত্যি এত রোগা হয়ে গেছিস কেন? অসুখ করেছিল? না, পড়াশোনার খাটুনি?"

"রোগা কেন হবো বাবা? আগে যেমন ছিলুম, এখনো তেমনি আছি।

আমার কিছু হয়নি। তুমি পিসিমার কথা শোনো কেন?" বলিয়া আমি দিদির প্রদত্ত বেতের বাক্সটা খুলিতে লাগিলাম।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি এনেছিস রুরু? রাজ্যের ফল, আচার, মোরব্বা, কিছুই বাকি রাখিসনি যে! তুই বোধ হয় ভেবেছিলি, তোর বাবা মরণ-পথের যাত্রী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

পিসিমা বাবাকে ধমক দিলেন, "আঃ, কি বলছো? মেয়েটা এই মাত্তর এলো, আর তুমি ঐ-সব কথা আরম্ভ করলে! বাপের জন্য মেয়ে জিনিস আনবে না তো আনবে কে? এখানে এ-সব জিনিস মেলে না। আচার-বিচার অত-শত আমিও করতে জানি না। রুরুর বুদ্ধি আছে, তাই এনেছে। আয় মা, ঘরে আয়। দাদাকে ফল ছাড়িয়ে দিই, তুইও নেয়ে নে। এর পর নাইলে চুল শুকোবে না।"

বলিলাম, "যাই পিসিমা। এ ফলগুলো মিলি বাবাকে খেতে দিয়েছে। আমাদের এক দিদি আছেন, তিনি দিয়েছেন এই সব। তাঁর নিজের তৈরী।"

বাবা বলিলেন, "তোদের দিদি আবার কে, রুরু? কৈ, এর আগে তো দিদির কথা শুনিনি।"

মিলির বিবাহের আদ্যোপান্ত ইতিহাস বলিয়া কাপড়-জামা লইয়া আমি স্নান করিতে গেলাম।

দরমা-ঘেরা কুয়োতলা হইতে শুনিলাম, পিসিমা গজর-গজর করিতেছেন, "শুনলে দাদা, মিলির বিয়েও ঠিক হলো, তুমি কেবল চুপ করে আছো? মেয়ে ডাগর হলে চার দিকে খোঁজ-খবর নিতে হয়। ছোট মেয়ের বিয়ে যত সহজ, বড় করে লেখাপড়া শেখালে তত নয়। মেয়ের যোগ্য পাত্র জোটাতে চোখে সরষে-ফুল দেখতে হয়। মিলির মা হুঁসিয়ার, তার অসাধ্য কাজ নেই। মা-মরা বোনের মেয়েটা কাছে থাকে, মিলির চেয়ে বয়সে বড়, আগে তার বিয়ের জোগাড় করতে হয় না? তা না করে নিজেরটিকে নিয়ে মত্ত! ছেলেও ধরেছে ছেলের মত!"

বাবার প্রত্যুত্তর শুনা গেল, "মিলি বেশ ভালো মেয়ে, তার ভালো বিয়ে হচ্ছে জেনে আনন্দ হচ্ছে। মিলির মত মেয়ে আমাদের সমাজে মেলে না।"

পিসিমা ঝাঁজিয়া উঠিলেন, "কত ভালো, আমার জানা আছে। তোমরা ব্যাটা ছেলে, বাইরেটা দেখেই বাহবা দাও। গেল-বছর গঙ্গাস্নানে গিয়ে

ওদের ওখানে ক'দিন থেকে সব দেখে শুনে এসেছি। যেমন মা, তার তেমনি মেয়ে! না আছে নরম-সরম, না আছে মেয়েলি ভাব। মেয়ে নয় তো গোরা-পল্টন, অহঙ্কারে আটখানা, রাগে দিশাহারা! যাকগে, পর-নিন্দা করতে চাইনে। করুর এখন কি করবে, তাই বলো? তুমি গাঁয়ের বাইরে পা না দিলে ভালো পাত্তরের খবর পাবে কি করে? আছে এক জন—তোমারি চোখের সামনে। তোমার তো খেয়াল নেই, মেয়ের বিয়ের কথা মনে করো না, সেই জন্য আমিও কথা কইনে, চুপ করে থাকি। তবে ছেলেটি ভালো হলেও এক দোষ আছে, তাই আমি কিছু বলিনি।"

"কার কথা বলছো বিন্দু? কে ছেলে? কোথায়?"

"বাড়ী হরিপুরে। আমার সেজ ননদের বড় ছেলে। ওই যে চন্দর গো, চন্দ্রচূড়। ছেলে ভালোই। আমেরিকা, না বিলেত কোথা থেকে চাষবাস, না, পাটের চাষ শিখে এসেছে। ভেবেছিলুম, জজ, ম্যাজিষ্টার কি দারোগাগিরি শিখে আসবে, তা না হয়ে এলেন স্বদেশী হয়ে! তাই তো আমি কথা কইনি। নাহলে অবস্থা ভালো, পাকা ঘর। কোন্ কালে বিয়ে দিয়ে দিতুম!"

বাবা বলিলেন, "ও, তুমি চন্দ্রচূড়ের কথা বলছো! আমি আগে বুঝতে পারিনি। চন্দ্রচূড়ের মত ছেলে দুর্লভ, বিন্দু, তাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা। সে কত বড়, তার কাজ কত বড়, তুমি তা বুঝ্‌বে না! সে তো তোমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসে। তার হাতে করুকে দিতে পারলে আমার আনন্দের সীমা থাকবে না। কিন্তু তা কি হবে?"

"হবে না আবার! তুমি যে তাকে এত পছন্দ করো, তা আমি জানতুম না। জানলে কোন্ কালে ঘটিয়ে দিতুম। এখনকার ডাগর ছেলে-মেয়েরা নিজেরা দেখে-শুনে বিয়ের ঠিক করে, মিলিও তাই করছে। করু এসেছে, এই সময় আমিও চন্দরকে একখানা চিঠি লিখে ডেকে পাঠাই। লিখি, 'অনেক দিন দেখি না, শীগ্‌গির এসে দেখা করে যাও!' লিখলেই সে আসবে। সে এসে করুকে দেখুক, করু তাকে দেখুক—তার পরে যা হয় হবে। ছাখো দাদা, আমার সাধ ছিল—করুর একটি টুকটুকে বর হয়, পাঁচ জনকে ডেকে এনে দেখাই। তা চন্দরের রূপে পৃথিবী আলো হয়ে যায়, অমনটি কোথাও পাবে না। দোষের মধ্যে মস্ত দোষ, ছেলে স্বদেশী করে।"

"তা করুক বিন্দু, বললুম তো, সব কাজের বড় কাজ সে। তাতে বাধবে

না। আমাকে সকলের আগে নিতে হবে করুর মত। করু বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার অনিচ্ছায় কিছু করবো না। সে যাকে চাইবে, তাকেই আমি এনে দেবো।"

আমি মনে মনে হাসিলাম। বাবা সরল আপনা-ভোলা, সংসারের কুটিল গতি জানেন না! এখানে চাহিলেই কামনার ধন মেলে না। যাহা দুষ্প্রাপ্য, চিরদিন তাহা আয়ত্তের বাহিরে থাকে।

২৩

রাত্রে পিসিমার কাছে শয়ন করিলাম। পিসিমা বার-বার মিনির আসন্ন বিবাহের প্রশ্নে আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। বাড়ীতে বয়স্কা কুমারী মেয়ে থাকিলে অন্য বাড়ীর মেয়ের বিবাহের সংবাদে অনেকে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া ওঠেন!

মানুষ-হিসাবে পিসিমাকে মন্দ বলা যায় না। তবে মাসিমার উপর তাঁহার নিদারুণ আক্রোশ। পিসিমার সত্যকারের দাবীর স্থান কোথাও নাই। পিতা-মাতা বাল্যে পরলোকগত, ভাই-ভগিনীরা একে একে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়াছে। পিতৃকুলে থাকিবার মধ্যে আমার বাবা! শ্বশুরকুল আরও চমৎকার। চরিত্রহীন স্বামী মৃত্যুকালে পিসিমার দাঁড়াইবার ভিটাটুকু পর্য্যন্ত নিঃশেষ করিয়া গিয়াছেন।

পিসে মহাশয়ের মৃত্যুর পরেই আমি মাতৃহীন হই। বাবা নিজে গিয়া অনাথিনী ভগিনীকে আমাদের গৃহে আনিয়া গৃহিণীর আসন দিয়া রাখিয়াছেন। সেই অবধি পিসিমা আমাদের সংসারে আছেন। তাঁহার ননদ, নন্দাই, ভাগ্নে, ভাগ্নীর অভাব ছিল না। বহু বার তাঁহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু পিসিমা যাইতে রাজী হন নাই।

বাবার কাছে আসিবার কিছু কাল পরে মাসিমার সঙ্গে পিসিমার দেখা হইয়াছিল। পরাশ্রয়ে, পরান্নে জীবন যাপনের জন্য পিসিমাকে মাসিমা ধিক্কার দিয়াছিলেন। লেখা-পড়া শিখিয়া স্বাধীন উপার্জ্জনের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে হিতোপদেশে পিসিমা কাণ দেন নাই, কিন্তু ধিক্কারটুকু মনে রাখিয়াছেন!

তার পর কত বার দু'জনে সাক্ষাৎ হইয়াছে। একবস্ত্র-পরিহিতা, নিরক্ষরা বিধবাকে খ্যাতিসম্পন্না, শিক্ষাভিমানিনী মাসিমা প্রীতির চক্ষে দেখিতে

পারেন নাই। পিসিমাকে মাসিমা করিয়াছেন অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য; বিনিময়ে পিসিমা করিয়াছেন মাসিমার নিন্দা, কুৎসা, বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষের আগুন অলক্ষ্যে মিলিকেও স্পর্শ করিয়াছে, নহিলে পিসিমার কাছে মিলি কোনো অপরাধ করে নাই। আমার বিবাহের পূর্ব্বে মিলির বিবাহের সম্ভাবনায় পিসিমা নিজেই শুধু জ্বলিতেছিলেন না, আমাকেও জ্বালাইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন!

আমি বিরক্ত হইলাম। বলিলাম, "মিলির বিয়ের কথায় আমাদের কাজ কি, পিসিমা? তাদের টাকা আছে, সে নাম-করা মেয়ে, তার সঙ্গে কার তুলনা? যে যেমন, তার উপযুক্ত পাত্র খুঁজে আনতে হয় না! সে আপনি আসে। মিলিকে দেখে জ্যোতি বাবু নিজেই পছন্দ করেছেন, মাসিমা খুঁজে আনেননি।"

পিসিমা অবিশ্বাসের স্বরে আমাকে কহিলেন, "বয়সে সেয়ানা হলে কি হবে করু, আসলে তুই বোকা। মায়ের ইশারা না থাকলে কি মেয়ে কখনো ছেলে ধরতে পারে? তুই রং-চং না মেখে থাকলেও মিলির চেয়ে অ-সুন্দর নোস্! সে ইলি-বিলি পাশ করেছে, তুইও করেছিস। তার চেয়ে তুই খাটো কিসে? সে পাহাড়ে উঠে বর ধরলো, তুই পারলি নে! পারবি কি করে, তোর পিছনে তোর মা ছিল না তো!"

এত কাল পর মা'র জন্য পিসিমার আক্ষেপে আমারো মা'র অভাব মনে পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল আর-এক জনকে, যাঁহাকে ভুলিবার জন্য আমার প্রাণ অহরহ ব্যাকুল! আশা করিয়াছিলাম, সে পরিমণ্ডলের বাহিরে আসিলে আমার হৃদয়ের এ-মেঘ কাটিয়া যাইবে, আমি মুক্তি লাভ করিব! কিন্তু ভাগ্যদোষে আমার সে আশা দুরাশায় পরিণত হইল। যে-প্রসঙ্গ এড়াইতে চাহিয়াছিলাম, কুক্ষণে সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমি নিজের জালে জড়াইয়া পড়িলাম।

নিশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিলাম। আমার দুঃখ কাহাকে বলিব? কে শুনিবে? সত্যই তো আমার মা নাই! হারানো মায়ের ক্ষীণ-স্মৃতি হাতড়াইতে লাগিলাম। সেখানে কিছুই মিলিল না।

ক্ষণেক পরে পিসিমা ডাকিলেন, "ঘুমুলি না কি করু? আহা, ঘুমো! সারা রাত জেগে এসেছিস!"

না ঘুমাইলেও সাহস করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না।

প্রভাতে জাগিয়া দেখি, বেলা অনেক হইয়াছে। পিসিমা বাসি কাজ সারিয়া তরকারী কুটিতেছেন।

আমি কাছে যাইতেই বলিলেন, "মুখ ধুয়ে এসেছিস। আয়, চা-দুধ খা। সাত-তাড়াতাড়ি তোর জন্য আমি বাতাসা দিয়ে দুধ জাল দিলুম। কলকাতায় তোরা তো খাঁটী দুধ পাস না! যে ক'দিন আছিস, গাইয়ের বাঁটের টাট্‌কা দুধ খেয়ে নে। তোর চা করে উনুনের মুখে বসিয়ে রেখেছি।"

বলিলাম, "চা খাচ্ছি পিসিমা, কিন্তু দুধ এখন খাবো না। বাবা কোথায়?"

"কোথায় আবার! ভোরে উঠে তাঁর যা কাজ, লেগেছেন! বাগানে গেছেন। কিন্তু এখন দুধ খাবো না বল্‌লে চলবে না করু, আমি কত করে জাল দিলুম! চা খেয়ে দুধটুকু মুখে দে। জুড়িয়ে গেল!"

দুধ জুড়াইবার ভয় না থাকিলেও পিসিমার অনুনয়ের ভয়ে চা-সংযোগে দুগ্ধ পান করিলাম।

পিসিমা প্রসন্ন হইয়া বেড়ার গা হইতে একখানা পোষ্টকার্ড আনিয়া আমার হাতে গুঁজিয়া দিলেন। দিয়া বলিলেন, "আমাকে একখানা পত্তর লিখে দে দিকিনি। নিতাইকে দিয়ে ডাকে পাঠিয়ে দিই। দেরী হলে আজকের ডাকে আবার যাবে না।"

পিসিমা কাহাকে চিঠি দিবেন, কিসের তাড়া, বুঝিতে বাকী ছিল না। ন্যাকা সাজিয়া বলিলাম, "সকালেই কাকে চিঠি দেবার ধুম পড়লো পিসিমা? যাকে দিয়ে তুমি চিঠি লেখাও, তার কাছে যাও না কেন? আমি বাপু, এখন লিখতে পারবো না!"

পিসিমা মিনতি করিতে লাগিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার, সোনা মেয়ে, লিখে দে। জিতুর বৌকে দিয়ে আমি চিঠি-পত্তর লেখাই, তা এ সাত-সকালে সে তো সময় পাবে না। দুপুর-বেলা লিখ্‌লে আজকের ডাকে যাবে না। দরকারী বলেই তোকে বল্‌ছি। চিঠি কাকে আবার লিখবো, আমার ভাগ্নে চন্দ্রচূড়কে। অনেক দিন দেখিনি, মন কেমন করছে। লিখে দে, পত্রপাঠ এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

"আচ্ছা পিসিমা, তোমার তো আরো ভাগ্নে-ভাগ্নী আছে। সবাইকে বাদ দিয়ে চন্দ্রচূড় না চন্দ্রপীড়, চন্দ্রশেখর না চন্দ্রকান্তকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? তোমার চন্দ্রকেতু এত দিন কোথায় ছিলেন? কখনো দেখিনি, নামও শুনিনি!"

"মাগো, মেয়ের কথা শুনে আর বাঁচি নে! দেখবি কোথা থেকে বল্! সে কি এ দেশে ছিল? কত বছর ধরে আমেরিকা না বিলেত—সেই দেশে থেকে পরীক্ষার পড়া পড়ছিল। ফিরে এসেই আমার কাছে এসেছিল। তুই তখন এখানে ছিলি না, তাই দেখিসনি। হাঁ, ভাগ্নে-ভাগ্নী আরো আছে মা, কিন্তু চন্দরের মত কেউ আমাকে যত্ন-আত্যি করে না। আমিও তাই তাদের ডাকি না। চন্দর বড় ভালো। বলে, 'মামিমা, চলো, আমার কাছে থাকবে, আমি তোমার ছেলে।' আমি বলি, 'দাদাকে একা ফেলে আমি যেতে পারবো না বাবা, তাতে তুই দুঃখ করিস নে'। যখনি আসে, আমার জন্য নিজের হাতে কাপড় বুনে আনে, টাকা আনে। চন্দর আমার ছেলের মত ছেলে! এক দোষ, শুধু স্বদেশী করে।"

"চন্দ্রচূড় স্বদেশী করুক আর বিদেশীই করুক, তাহার বিশদ-বিবরণ জানিতে আমার লেশমাত্র আগ্রহ ছিল না। আমি বলিলাম, "কি লিখতে হবে বলো, আমি লিখে আনি!"

"আমি আবার কি বলে দেবো? তোরা লিখুনে-পড়ুনে, যা লিখতে হবে জানিস তো! যাতে শীগ্‌গির সে আসে, তাই লিখে দে! দিয়ে ভালো কাপড়-জামা পরে একবার পাড়া থেকে ঘুরে আয়, সকলে তোর কথা জিজ্ঞাসা করে।"

"জিজ্ঞাসা যা করে, তা আমার জানা আছে, পিসিমা। আমার খবর মানে, বিয়ের কথা তো? তা শোনাতে আমি একা যাবো কেন? তোমার সঙ্গে গেলেই হবে।"

২৪

গ্রামে তেমন নিকট-আত্মীয় কেহ না থাকিলেও আমাদের পাতানো ঠাকুরমা, জেঠাইমা, কাকীমার অভাব ছিল না। বাবার সৌজন্যপূর্ণ সরল ব্যবহারে প্রতিবেশীদের সহিত আমাদের আত্মীয়তা-বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল। পল্লীগ্রাম হইলেও আমাদের গ্রামখানিকে খাঁটি 'পাড়াগাঁ' বলা যায় না। গ্রামে হাট-বাজার, ডাকঘর, ষ্টেশন, ইংরেজী স্কুল এ সকলই ছিল—কিন্তু এক মিশনারী স্কুল ভিন্ন মেয়েদের জন্য পৃথক কোনও বিদ্যালয় ছিল না। বহুকাল পূর্ব্বে পাটের ব্যবসায়ের জন্য ইংরেজ কুঠিয়ালরা এই গ্রামে আসিয়া 'মিশন' স্থাপন করিয়াছিল। তদবধি গ্রামস্থ বালিকারা 'বাইবেল' গ্রন্থে যীশুখৃষ্টের অপূর্ব্ব

ত্যাগের কাহিনী পাঠ করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। আমার অগ্রবর্ত্তিনীদের শিক্ষা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রাথমিক শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই অধিকাংশ বালিকাকে বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ী যাইতে হইয়াছে। 'মিশনের' একমাত্র পুরাতন ছাত্রী আমিই কলেজে পড়িতেছি। মিশন স্কুল হইতে সর্ব্ব-প্রথম আমিই 'ম্যাট্রিক' পাশ করায় মিশনের শিক্ষানেত্রী পূতচরিত্রা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

পিসিমার চিঠি শেষ করিয়া আমি বাগানে ঢুকিলাম। পুষ্প ও পুস্তক বাবার অত্যন্ত আদরের জিনিস। প্রভাত ও সন্ধ্যা তিনি বাগানেই অতিবাহিত করিতেন।

নিতাই চাকরের সাহায্যে বাবা স্থলপদ্ম ফুল-গাছের গোড়ার মাটি আলগা করিয়া দিতেছিলেন। ফুল ফুটিবার মরসুম সবে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি-শাখায় অসংখ্য কুঁড়ি। একটি ক্ষুদ্র শাখায় চারিটি স্থলপদ্ম ফুটিয়া যেন একটি সুন্দর তোড়া রচনা করিয়াছে। গন্ধরাজের পাতা দেখা যায় না, ফুলে ফুলে শাখা-পত্র আচ্ছন্ন। শেফালির মৃদু সৌরভে পুষ্পোদ্যান আমোদিত।

আমি মুগ্ধ—পুলকিত চিত্তে কহিলাম, "কি সুন্দর! আগে তো এত গাছ, এত ফুল ছিল না?"

বাবা হাসি-মুখে বলিলেন, "এ-দিকের এ গাছগুলো নতুন লাগিয়েছি; তুই অনেক দিন পরে এসেছিস কি না তাই দেখিসনি। এ লতাটা সিষ্টার 'ডরোথি' আমাকে দিয়েছেন। বড় সুন্দর এই লতার ফুলগুলি।"

বলিলাম, "ঐ স্থলপদ্মের ডালটা ভেঙ্গে তার সঙ্গে অন্য ফুল মিশিয়ে আমায় দাও না বাবা! আমি এক্ষুনি গিয়ে 'সিষ্টারের' সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দিয়ে আসি। লতার নতুন ফুলও দু'টো দাও। এত ফুল, কাউকে না দিলে আমার তৃপ্তি হয় না। এখন না তুললে, পরে রোদের তাতে শুকিয়ে ঝ'রে পড়বে।"

—"ঝ'রে পড়লেও আবার ফুটবে, ফুলের অভাব কি? কত ফুল চাস্? সকালে তোর স্নানের অভ্যাস, করু! তা তুই স্নানও করলি নে, কিছু খেলিও না! আজ না হয় থাক, কাল সকালে যাস্?"

—"না, বাবা, এখুনি একবার ঘুরে আসি। বাড়ী এসে ভোরে স্নান করতে ভাল লাগে না। খানিক বেলা হোক, তখন নাইলেই হবে। এই এখুনি তো পিসিমা এক বাটি গরম দুধ খাইয়ে দিলেন। কাল থেকে তো পাড়ায় পাড়ায়

নেমন্তনের পালা চলবে, সময় পাবো না। আমার আসার খবর এখনো কেউ পায়নি কি না! খবরটা পেলে বাড়ী এতক্ষণ লোকে ভরে যেতো।"

—"বিন্দু বিধবা, আমিও তার সমান। বাড়ীতে মাছ আসে না বলেই সকলে স্নেহ করে তোকে খেতে বলেন। সকলের স্নেহ-ভালবাসা পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়, করু! পাড়াগাঁয়ে এখনো এটার অভাব হয়নি; কিন্তু শহরে এর অস্তিত্ব আছে কি না, টের পাবি নে। সবাই ভালবাসে, তাই দেখতে আসে, খেতে বলে; সে জন্যে কি বিরক্ত হ'তে আছে?"

—"না বাবা, বিরক্ত হবো কেন? দেখতে আসেন, খেতে বলেন—সে তো সুখের কথা। কিন্তু ওঁরা এত বাজে বকেন, তা আমার ভাল লাগে না। শহরে ভালবাসাও নেই, বাজে কৌতূহলও নেই। কার ছেলে-মেয়ে বড় হলো, সে জন্যে কারও দুশ্চিন্তা নেই; কারও মাথা-ব্যথাও করে না।"

—"যেখানে মাথাই নেই, সেখানে ব্যথা করবে কি? এদের ছোট গণ্ডী, ছোট কথা; বৃহৎ জগতের সঙ্গে এদের পরিচয় নেই। রান্না, খাওয়া, জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—এই হলো এখানকার চিন্তার ফিরিস্তী। তোর রাগের কারণ জানি, রাগ করিস নে। যা পল্লীসুলভ তার কোন ব্যতিক্রম দেখলেই প্রশ্ন করা এদের স্বভাব।"—বলিতে বলিতে বাবা ফুলে পাতায় প্রকাণ্ড একটা তোড়া বাঁধিয়া ফেলিলেন।

আমার হাতে তোড়াটা দিয়া তিনি কহিলেন, "সিষ্টারকে এটা দিয়ে আয়। ছোট ফুল-ক'টা তাঁরই দেওয়া লতায় ফুটেছিল—বলিস্। গল্পে মত্ত হ'য়ে দেরী করিস নে। বেশী বেলায় স্নান করলে মাথা ধরবে। নিতাই তোকে রেখে আসুক, কি বলিস্?"

—"নিতাইয়ের দরকার নেই, এইটুকু রাস্তা, আমি একাই যাচ্ছি। নিতাইকে পিসিমা ডাকছেন। তুমি আজ স্কুলে নাই-বা গেলে বাবা! শরীর তোমার ভাল নয়, ক'দিনের ছুটি নাও না। দুপুরে তোমার গল্প শুনবো।"

—"সন্ধ্যাবেলা যত খুসী গল্প শুনো মা! "করুর গল্প-পর্ব্ব" নাম দিয়ে এখন ছুটি নেওয়ার সুবিধা হবে না। গেল সপ্তাহে শরীর খারাপ ছিল—দু'দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কতখানি সময়ই বা স্কুল! চারটেয় তো ফিরে আসবো। তুমি যাও, রোদ উঠছে।"—বলিয়া বাবা আমার সঙ্গে আসিয়া বাগান পার করিয়া দিলেন।

'মিশন' আমাদের বাড়ী হইতে বেশী দূরে নহে, নদীর ধারে নির্ম্মিত গড়ো-

বাংলো। বামে প্রকাণ্ড মাঠ—শ্যামল দুর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত; দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান। ভরা-নদীর পরপারে শুভ্র কাশগুচ্ছ, তাহার সীমারেখা ঘেঁষিয়া বিস্তীর্ণ বালির চর ধূ-ধূ করিতেছে। বিচরণরত বনহংসের কল-কাকলি শরত-প্রভাতের উদাস বায়ুপ্রবাহে ভাসিয়া আসিতেছে।

'বাংলো'-সংলগ্ন বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বসিয়া সিষ্টার 'ডরোথি' বাইবেল্ পড়িতেছিলেন। তিনি যৌবন-সীমা অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ দেহ এখনও অটুট স্বাস্থ্যে সমুজ্জল। প্রশান্ত প্রসন্ন মুখচ্ছবি; শুভ্র বরণে, শুভ্র বসনে চিত্তের শুভ্র নির্ম্মলতা যেন পরিস্ফুট। মাথায় সাদা 'হুড্,' বুকে রূপার 'ক্রশ'।

তোড়াটা তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া আমি অভিবাদন করিলাম।

তিনি সাদরে, সস্নেহে আমার করতল স্পর্শ করিয়া প্রস্ফুটিত কুসুমের তোড়াটি তুলিয়া লইলেন, এবং আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া, ফুলের আঘ্রাণ লইতে লইতে ইংরেজিতে কহিলেন, "করু, তুমি আজ প্রভাতেই আমাকে আনন্দ দিলে। প্রথম আনন্দ—তোমার আগমনে, দ্বিতীয় আনন্দ—তোমার প্রদত্ত উপহার লাভে; এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি কবে এসেছ? আশা করি, ভাল আছ। এবার তুমি 'গ্র্যাজুয়েট্' হবে, আমার 'মিশনে'র বালিকার এই উন্নতিতে আমি গৌরব অনুভব করবো।"

আমি বলিলাম, "আমি বাবাকে দেখতে কাল এসেছি 'সিষ্টার'! এবার পড়া ভাল তৈয়েরী করতে পারিনি। তোমার 'মিশনে'র গৌরব বজায় রাখতে পারবো কি না বলা শক্ত।"

—"নিশ্চয়ই তার মান রাখবে। তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—প্রভু যীশু তোমার মঙ্গল করবেন। পরীক্ষায় পাশ করে তুমি কি করবে—স্থির করেছ কি?"

কি যে করিব, তাহা নিজেই জানি না; কাজেই চট্ করিয়া উত্তর দিতে পারিলাম না।

'সিষ্টার' ক্ষণেক আমার দিকে চাহিয়া, মাথার হুড ঘোমটার আকারে সম্মুখে টানিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তুমি এই করবে করু! আমি তা বুঝেছি। সে কে—কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি? বলতে বাধা আছে কি?"

আমি হাসিলাম, "না সিষ্টার, আপনার অনুমান ঠিক হয়নি। বিয়ে করলে

তো ঐ ভাবে ঘোমটা দেওয়া ; আমি বিয়ে করবো না। আমার ভাগ্যবান্ ব্যক্তি কেউ নেই।"

'ডরোথি' সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ে করে সংসারী হতে তোমার অনিচ্ছা কেন করু? আমার সন্দেহ হচ্ছে—তুমি হয়তো কোনো তরুণ শয়তানের প্রলোভনে পড়ে হৃদয়ের শান্তি হারিয়ে বসেছ!"

—"না সিষ্টার, আমার হৃদয়ের শান্তি হারায়নি। তোমার পবিত্র জীবনের দৃষ্টান্তে আমার সাধ হয়—বিয়ে না ক'রে জগতের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করি। আমি যতটুকু শিখেছি, যারা তা জানে না, তাদের সেইটুকু শিখাই।"

—"তোমার সাধু-সংকল্পে খুশী হলাম করু! কিন্তু তুমি বালিকা, এ পথ তোমার নয়। আমার বয়স ও অভিজ্ঞতা হতে জেনেছি—এ বড় কঠিন কাজ। তোমার মা নাই, আমি তোমাকে স্নেহ করি। আমার মনে হয়—একটি চরিত্রবান, উদার স্বভাবের ক্ষমাশীল তরুণকে বিয়ে করলে তুমি অনেক ভাল কাজ করতে পারবে। তুমি হিন্দু, শুনেছি, তোমাদের সমাজে চিরকুমারী থাক্‌লে নিন্দা হয়; তাই তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি হৃদয়কে শান্ত করে বিয়ে করো। যদি নিতান্ত না পার, তাহলে কোথাও যেয়ো না। তুমি 'মিশনের' মেয়ে, মিশনেই তোমার কাজ হবে। আর একটি আমার অন্তরের কথা, তুমি মনো রেখো—তোমার বাবার অমতে কিছু করো না। তিনি অত্যন্ত সাধু-প্রকৃতির লোক। তাঁকে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি।"

বিদেশিনী 'ডরোথির' স্নেহসিক্ত উপদেশ আমার প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করিল। যদি কখনো প্রয়োজন হয়,—উত্তাল তরঙ্গিণী-স্রোতে ক্ষুদ্র তৃণের মত যদি আমাকে ভাসিয়া যাইতেই হয়, তাহা হইলে ইঁহাকেই আশ্রয় করিয়া আমি সেই উদ্দাম স্রোতোবেগ রোধ করিব। সামান্য খড়কুটার মত ভাসিয়া যাইব না, স্রোতে বিলীন হইব না! এই সকল কথা ভাবিয়া এত দিনে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হইল। চিত্তের প্রসন্নতা ফিরিয়া আসিল।

বলিলাম, "তোমার হিতোপদেশ, শুভ ইচ্ছাই আমি গ্রহণ করলাম সিষ্টার! তোমার অকৃত্রিম স্নেহের জন্য ধন্যবাদ! এখনো আমি আমার যাত্রাপথের নিশানা পাই নাই,—না পেলে আর কোথাও যাব না; তোমারই কাছে আসবো। জানি, তুমি আমায় ঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারবে।"

আমার আন্তরিক নির্ভরতায় 'ডরোথির' নীল নয়ন দু'টি সজল হইল।

তিনি আমার একখানা হাত হাতে লইয়া প্রার্থনার ভঙ্গিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

২৫

'মিশন' হইতে ফিরিয়া দেখি, বাড়ীতে রীতিমত হাট বসিয়াছে! প্রাতিবেশিনী ঠাকুরমা, জ্যেঠাইমা, মাসী-পিসির দল আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া দেখিতে আসিয়াছেন। বাবা স্নানাহার সারিয়া স্কুলে গিয়াছেন। পুরুষশূন্য গৃহ নারী-কণ্ঠের কল-কল, খল-খল শব্দে মুখরিত হইতেছে!

কুণ্ঠিত ভাবে সকলের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। প্রণামের সঙ্গেই 'বড় ঘরে ছোট-বরে বিয়ে হোক', 'সাত ব্যাটার মা, ভাগ্যবতী হও', — ইত্যাদি মামুলি আশীর্ব্বাদধারা আমার মস্তকে বর্ষিত হইতে লাগিল।

আমি গ্রাম্য নারী-সম্প্রদায়কে অতিশয় 'সমীহ' করিতাম। অশিক্ষিতা পল্লী-রমণীর প্রতি ইহা আমার অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য নহে। আমার কুণ্ঠিত মন, বেশি আলোচনা-আন্দোলনের মধ্যে থাকিতে পারিত না। জনতা দেখিলে আমার অন্তরাত্মা পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিত। আমি নির্জ্জনের প্রয়াসী, নিরালায় স্নেহের মাধুর্য্য অনুভব করিতে ভালবাসি।

গ্রামে আমার বয়সের একটি মেয়েও অবিবাহিতা নাই। বিদ্যাশিক্ষার অনুরোধে আর কেহ এমন বন্ধনহীন জীবন যাপন করিতেছে না। এই কারণে সকলের সহিত আমার ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়াছিল। সকলের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া কুশল প্রশ্নের উত্তরে 'হাঁ, না' ভিন্ন আমার যেন আর কিছুই বলিবার ছিল না।

গ্রাম-সম্পর্কে ঠাকুমা আমার নতমুখ তুলিয়া ধরিয়া ঝঙ্কার দিলেন, "দেখি লো নাতনী, সোনা-মুখের কেমন ছিরি হলো? কত দিন দেখিনি, প্রাণটা ঝুরে ঝুরে মরে। আকুলি-বিকুলি আমরাই করি, তুই তো দিব্যি সব্বাইকে ভুলে গেছিস্? নইলে আমাদের সঙ্গে দেখা না-করেই ছুটেছিলি—সকলের আগে সেই খিষ্টান মাগীর আড্‌ডায়!"

এ আক্রমণ হইতে পিসিমা আমাকে রক্ষা করিলেন; নির্জ্জলা মিছা কথা কহিলেন, "কল্প কি তোমাদের ভুলতে পারে? বাড়ীতে পা দিয়েই তোমাদের কথা! সকালেই যেতে চেয়েছিল, তা আমি বললাম, 'মেমের' কাছে তোর লেখাপড়ার যা দরকার—সে সব সেরে আয়। মোটে সাত দিন

থাকবি, এরা তো তোর আপন-জন, যখন খুশী যাবি-আসবি।—তবে না মেয়ে সেখানে গেল।"

ঠাকুমা প্রীত হইলেন, "তা তো সত্যি, আগের কাজ আগে সারতে হয়। এ-বেলা তুমিই নানানখানা রেঁধেছ—রাতে কিন্তু ও আমার কাছে খাবে। কলকাতায় মাছের যা দশা, তোমাদেরও নিরামিষের ঘাঁটী, বাছা প্রাণ ভরে মাছ খেতে পায় না। মাছে-দুধেই বাঙ্গালীর শরীর; তা পায় না বলেই সোমত্ত বয়েসের মেয়ের ছিরিছটা খোলে নি! যেমন ঢেঙা, তেমনি লিকলিকে গড়ন-পেটন। লেখা-পড়াই শেখো—গান গেয়ে আসরই মাত কর, আর ধেই ধেই নেত্য ক'রে পৃথিবী রসাতলে পাঠাও, তাতে কি বাপু ব্যাটাছেলের মন ভোলে? সকলের আগে চেহারার চটক দেখানো চাই।"

পিসিমা সায় দিলেন, "যা বলেছ কাকীমা, মিছে নয়। এ কালের ছুঁড়ীগুলো বই নিয়েই মত্ত, শরীরের তোয়াজ জানে না। না খেয়ে মেয়ের এমনি ছিরি হয়েছে, তোমরা আদর করে খেতে দাও। সেখানে কে দেবে, কে আছে? কাল ও তোমার কাছে খাবে কাকীমা, আজ আবার আমি দু'টো পিঠে-পুলি করতে গিয়েছি। চিরকাল করু তোমাদেরি খাচ্ছে, তোমাদের যত্ন-আত্যিতে এত বড়টি হয়েছে।"

পিসিমার আপ্যায়নে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে প্রস্থান করিলেন, আমি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

দিনান্তের ম্লানছায়া চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতে না হইতে বাবা ফিরিয়া আসিলেন। বিশ্রামান্তে জলযোগ করিয়া, আমাকে লইয়া তাঁহার ঘরে বসিলেন।

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো নিবিয়া গেল। জানালার নীচের বাগান হইতে ফোটা ফুলের মিশ্র গন্ধ সন্ধ্যার বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। আমি ইচ্ছা করিয়াই প্রদীপ জ্বালিলাম না। আমার বলিবার যাহা, দীপালোকে তাহা বাধিয়া যায়। অপার স্নেহ-সমুদ্রের উপকূলে, নিঝুম অন্ধকারে মানুষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। চন্দ্রচূড়কে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিবার পর হইতে আমার চিত্তচাঞ্চল্য আরম্ভ হইয়াছিল। পিসিমার মনোভাব সুস্পষ্ট, বাবাও অনুকূল। সাত দিনের ছুটিতে আসিয়াছি, দুই দিন থাকিয়া প্রস্থান করিলেও ইহাদের মত-পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই। আমার যাহা বলিবার, এখন তাহা না বলিলে নিজেই জটিলতার জালে জড়াইয়া পড়িব, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বাবার মাথায় চুলে অঙ্গুলি-চালনা করিতে করিতে আমি বলিলাম, "তখন সিষ্টারের কাছে গিয়েছিলাম বাবা! তিনি বল্লেন, আমি বি-এ পাশ করলে তিনি 'মিশনে' কাজ দেবেন। এখন পারিশ্রমিক দিয়েই ওঁরা লোক রাখেন। তোমাকে অসুখ নিয়েই কাজ করতে হয়; আমি ফিরে এসে তোমাকে নিষ্কৃতি দানের জন্য মিশনে চাকুরী নেব। তোমার কাছে থাকবো—অন্য কোথাও যেতে হবে না।"

আমি যেন শুধু বাবার জন্যই অতিরিক্ত চিন্তার ফলে ব্যাকুল হইয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই অনুমানে বাবা স্নেহে মমতায় বিগলিত হইয়া বলিলেন, "আমার শরীরের ভাবনায় তুমি এত অস্থির হয়েছ কেন, মা! আমার স্বাস্থ্য সাধারণের স্বাস্থ্যের তুলনায় ভালই বলতে পারি। এ বয়সে এক-আধ দিন সর্দ্দি বা জ্বর হলে তাকে অসুখ বলা চলে কি? তোমার হয়তো বিশ্বাস, আমি কষ্টে পড়ে ছেলে পড়িয়ে খাচ্ছি! কিন্তু সত্যই তা নয়। যাদের আকাঙ্ক্ষা বেশী, অভাব তাদেরই; আমার অভাব নেই। কাজকর্ম্ম নিয়ে আছি, ভালই আছি, আনন্দে আছি। কাজ না থাকলে আমার থাকা না থাকা সমান রুরু! আর যা বলতে হয় বল; তোমার বুড়ো ছেলেকে কাজ ছাড়তে বলো না মা!"

—"কেন বলবো না, বাবা? আমি যদি তোমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, আর চাকরী নিয়ে ভাল-রকম রোজগার করতাম; তাহলে তখনো কি তুমি চাকরী করতে?"

—"করতাম কি না, তা অন্যের ওপর নির্ভর করে না, সেটা নিজস্ব। অকর্ম্মণ্য অলস জীবন সকলেরই বাঞ্ছনীয় নয়। আর ছেলের কথা বলাই বা কেন? ছেলে মেয়েতে কিছুই প্রভেদ করিনি। তুমি আমার যা করছ, ছেলে থাকলে এর বেশি পারতো না। আমি তোমাকে পেয়ে সব পেয়েছি, রুরু! আমার ছেলের আক্ষেপ নাই।"

আমার দুই চোখ দিয়া ঝর-ঝর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। আমাকে পাইয়া বাবা সব পাইয়াছেন—এ কত বড় দরাজ মনের কথা! কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, করুণায়, অমৃত-ধারায় অভিষিক্ত হইয়াও আমি সন্তাপে জ্বলিতেছি। বাবার মত আমিও কেন বলিতে পারি না—পিতৃস্নেহের অধিকারিণী হইয়া আমি সবই পাইয়াছি; আমার আর কিছুরই প্রয়োজন নাই?

গলা ধরিয়া আসিয়াছিল, তবু কথা কহিতে হইল; কহিলাম, "তোমার

আক্ষেপ নাই বলে আমার কি উচিত অনুচিত বোধ থাকবে না বাবা? তোমার মত-খুসী খাটতে থাকো, আমিও তোমার সঙ্গেই খাট্‌বো। পরীক্ষা শেষ হলেই আমি 'মিশনে' ঢুকবো, আগেই তা বলে রাখছি; তখন কিন্তু তুমি অমত করতে পারবে না।"

বাবা ক্ষণকাল নতমুখে কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, 'মিশনে' চাকরী নেওয়া ছাড়া আর কিছু কি তোমার মনে হচ্ছে না, করু! তুমি জান, উপার্জ্জনের উদ্দেশে পুরুষের সাথে মেয়েদের প্রতিযোগিতা আমি পছন্দ করি নে। দায়ে পড়ে অবশ্য অনেককেই অনেক কিছু করিতে হয়। সে ব্যবস্থা পৃথক্। পয়সার লোভে, ইচ্ছা করে ঘরের লক্ষ্মীদের এই ছেঁড়াছেঁড়ি, কাড়াকাড়ি ব্যাপারের আমি সমর্থন করিনে। আদিম কাল থেকে ঘরে বাইরের পার্থক্যে যে সুন্দর শান্তির ধারাটা বয়ে আসছে, তা নষ্ট হতে দেখলে আমি ব্যথা পাই। দাসত্ব করা ছাড়া কর্‌বার কাজ ঢের আছে। লোকের উপকার করতে চাও, শিক্ষা দিতে চাও, দাও না কেন? অর্থের বিনিময়ে সৎকাজের দাম কমে যায়, তা মনে রেখো।"

—"তা হলে আমি কি করবো বাবা? তোমার কি ইচ্ছা—আমি এম-এ পড়ি, না বি-টি? যা হোক্-একটা কিছু করতে হবে তো? যদি তোমার মত থাকে, তাহলে না হয় কিছু না নিয়েই 'মিশনে'—"

বাধা দিয়া বাবা বলিলেন, "আমার মত অন্য। তুমি যদি আরো পড়তে চাও, তাতে আমি অমত করবো না। আমার ইচ্ছা, তোমাকে তোমার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা। তোমার মা নেই, দুই জনার যা করণীয় কাজ, আমাকেই একা তা সম্পূর্ণ করতে হবে। তোমাকে বড় করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি; এখন যোগ্য পাত্রে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হতে পারি।"

লজ্জায় মস্তক অবনত হইল; কিন্তু এটা আমার লজ্জার সময় নয়—মৃদু স্বরে বলিলাম, "তুমি যা ভেবেছ, তা আমি পারবো না বাবা। আমার প্রবৃত্তি নেই। আর কোন বিষয়েই আমি তোমার অবাধ্য হবো না, কেবল ওইটা বাদ। কেনই বা তোমরা চন্দ্রচূড় বাবুকে আন্‌ছ? আমার মা নেই বলে তোমরা আমাকে ভার বলে মনে করছ? কিন্তু মা থাক্‌লে এমন তাড়াতাড়ি বিলিয়ে দিতে চাইতে না।" বলিতে বলিতে আমার এত দিনের সঞ্চিত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল। আমি নিজেকে আর সম্বরণ করিতে পারিলাম না, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

বাবা চকিত হইয়া আমাকে কোলে টানিয়া লইলেন। আমার মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "সংসারী হতে চাও না—তা বলতে এত কান্না কেন, মা! আমি জানি না, আমায় তো কখনো বলোনি। তোমাকে ভার মনে করে বিলিয়ে দিতে চাচ্ছি, এটা তোমার ভুল ধারণা। তোমাকে সুখী করতেই আমার যত্ন আগ্রহ। তোমার মা থাকলেও এ-ই চাইতেন। তাঁর চাওয়া আমার চাওয়া ভিন্ন হতে পারে না। বিয়েতে তোমার প্রবৃত্তি নেই কেন—সেটা জানতে চাইলে কি তোমাকে পীড়ন করা হবে? আমাকে লজ্জা করো না মা। মনে কর, তোমার মাকে বলছ, যার কোলে রয়েছ। বল—কেন ইচ্ছা নেই, কারণ কি?"

অশ্রুর প্রথম উৎস-ধারা বর্ষণের পর আমার অশান্ত হৃদয় কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছিল। বাবার কথায় আমার অবারিত উচ্ছ্বসিত অশ্রুর ধারা সহসা থামিয়া গেল।

আমার দুর্নিবার লজ্জার কাহিনী কেমন করিয়া বলিব? ইহা কি বলিবার কথা? সে নগ্ন কদর্য্যতা বাহিরের নহে, অন্তরের। আমি বাবার কোলে মুখ গুঁজিয়া তেমনি পড়িয়া রহিলাম।

বাবা ধীরে আমার চুলের রাশি গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার সুকোমল স্পর্শ আমার গোপন বেদনা যেন প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল। আজ নানারূপ প্রসঙ্গে একাধিক বার আমার পূতহৃদয়া স্বর্গগতা মায়ের নাম শুনিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা শোনা পর্য্যন্তই! আমি মাতৃস্নেহের আস্বাদ জানি না। মা থাকিলে কি করিতাম বলিতে পারি না; তবে ইহাই বলিতে পারি যে, বাবাকে যাহা লুকাইলাম, জগতে কাহারো কাছে তাহা বলিতাম না। বিশ্বে আমার বাবা অপেক্ষা আর কেহ বড় নাই, থাকিতে পারে না।

অনেকক্ষণ পর বাবা কহিলেন "তুমি বলতে পারলে না করু! আমার কাছেও লজ্জা-সঙ্কোচ? তা না বল্লেও আমি জানি—আমার করু-মা লজ্জার কোনও কাজ করতে পারে না।—চন্দ্রচূড় আসবে, তাতে কি? সে বিনুর আপনার জন, আমাদেরও আত্মীয়। আমি কাউকে কথা দেব না, চেষ্টা করবো না।—যখন তোমার ইচ্ছা হবে, সময় আসবে, আমি তার জন্যে অপেক্ষা করবো।"

২৬

সে-দিন দ্বিপ্রহরে পাড়ার নিমন্ত্রণ সারিয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাবা স্কুলে, পিসিমা মেঝেয় পাটী পাতিয়া দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছিলেন। আমার সঙ্গী সাথী নাই, গোলমালের মধ্যে আমি থাকিতে পারি না। সাধারণতঃ নিজের নিভৃত নীড়ে থাকিতেই আমার ভাল লাগে। মাসীমার ব্যবস্থায় সেখানেও আমি নিজস্ব একটি ঘর পাইয়াছিলাম ; এখানেও বাবা আমার জন্ম একখানা পৃথক্ ঘর রাখিয়া দিয়াছেন।

গৃহের সম্পদ্ বেশি কিছু নয়। কাঁটাল-কাঠের একখানি ক্ষুদ্র চৌকী, তাহার উপরে বিছানা। দুইটি কাচের আলমারী-ভরা প্রাচীন গ্রন্থ। একটা 'সেল্‌ফে' আধুনিক লেখকদের গুটিকতক বাছা বাছা বই। এক কোণে কাপড় রাখিবার আল্‌না।

বিছানায় বসিয়াই নদীর তরঙ্গ-ভঙ্গ চোখে পড়ে ; পর-পারের মসীবর্ণ গ্রাম যেন হাতছানি দিয়া ডাকে। পশ্চাতের বাঁশঝাড়ের ভিতর হইতে কত শব্দ বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া মিলাইয়া যায়। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিতে আমাকে বন-বনান্তরে খুঁজিতে হয় না, আমার ঘরখানিতেই তাহা যেন লুকানো থাকে। তাই এখানে আসিয়া বেশিক্ষণ বাহিরে থাকিতে পারি না। ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় পিসিমা ডাকিলেন, "করু, খেয়ে এলি ? কি দিয়ে খেলি—আয় শুনি। অমনি একখানা বই নিয়ে আসিস্।"

ইতিপূর্ব্বে ছুটির অবকাশে আসিয়া 'সংস্কৃত' কাব্য হইতে পিসিমাকে একটু-আধটু পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। কাব্যের রসের সহিত যত না হোক, গল্পের সহিত পিসিমার পরিচয় হইয়াছিল।

'রঘুবংশ'-খানা বাহিরেই ছিল ; আমি তাহাই লইয়া পিসিমার পাটীতে আশ্রয় লইলাম। সময়টি রঘুবংশ পড়িবার মত, শরতের অলস মধ্যাহ্ন, প্রকৃতি গভীর ধ্যানমগ্ন। তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গাইতে বাগ্‌লা বনে ঘুঘু করুণ কণ্ঠে ডাকিতেছে।

আমি বই খুলিলাম বটে, কিন্তু পিসিমা সে-দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রান্না-খাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। কি মাছ, তরকারী কি, কে রাঁধিয়াছিল ? এমনি ধরণের অসংখ্য প্রশ্নে আমার বই-পড়ার নেশা ছুটিয়া গেল। ভয় হইতে লাগিল, রন্ধন-বিশেষে ফোড়নের বিশেষণ হয়তো আরম্ভ হইবে।

সামান্য বিষয়ের চর্চ্চা করিতে মেয়েরা যে এত ভালবাসেন, আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। পিসিমার প্রতি আমার মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পারও সঞ্চার হইল। ইহারা যেন পিঞ্জরের পোষা পাখী, অসীমের গান ভুলিয়া গুটিকত বাঁধুলি বুলি শিখিয়া রাখিয়াছেন! জগতের সহিত কোন যোগ নাই; অশান্তি-উদ্বেগেরও আশঙ্কা নাই। যাঁহাদের বিচরণ-ক্ষেত্র আলোকে, তাঁহারা এই অন্ধকারের জীবদের কি চোখে দেখেন জানি না। আমার মনে হয়, ক্ষুদ্র জীবনের এই সঙ্কীর্ণ পরিসর মন্দ কি? এ একটানা হৃদয়-নদীতে জোয়ার-ভাঁটা না থাকিলেও শান্তি আছে, নির্ভরতা আছে। হাটের মাঝে বেচা-কেনায় অনেক জ্বালা!

পল্লীর সরলা শিক্ষাহীনাদের আমি ছোট ভাবিতে পারি না। নগরের আবিলতায় ইহারা মনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত নির্ম্মলতা হারাইয়া ফেলে নাই। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল আস্বাদন করিয়া সন্দেহ-সংশয়কে বরণ করিয়া লয় নাই। ইহাদের প্রকৃতি যেন ছায়াসমাচ্ছন্ন দীঘির শীতল জল—তরঙ্গহীন, স্রোতো-বিহীন।

ইহাদের মধ্যে আমিও প্রথম আঁখি মেলিয়াছিলাম, এখানকার সুস্বাদু নীরে, স্নিগ্ধ সমীরে আমার অস্ফুট জীবন-কলিকা ধীরে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আমার স্থান হইল না। ঝড়ে-ছেঁড়া ফুলের মত শহরের জটিলতার মধ্যে উড়িয়া পড়িলাম। রাশীকৃত বই ঘাঁটিলাম, দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। তাহার ফলে চিত্তের সরলতা, সরসতা হারাইয়া ভ্রান্তির পিছনে ঘুরিয়া মরিতেছি! আমার বাল্যসখীরা আজ এক এক গৃহের গৃহিণী, সন্তানের জননী। তাহাদের শিক্ষা সামান্য, আকাঙ্ক্ষা পরিমিত—যাহার ভাগ্যে যাহা ছিল, নির্ব্বিচারে তাহাই মানিয়া লইয়াছে। কাহারো সহিত বিরোধ বা বিদ্রোহ করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

পিসিমার টুক্‌রো-টুক্‌রো বাক্যের ভিতর দিয়া কত জনকে আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমার সখীরা এখনো দলভ্রষ্ট হয় নাই, দিক্‌ভ্রান্ত হয় নাই; আমিই কেবল অনেক জানিবার ভাণ করিয়া, অনেক শিখিবার ছলনায় সাথীহারা হইয়াছি!

সংক্ষিপ্ত উত্তরে গল্পের আসর জমে না। ঘণ্টাখানেক পিসিমা আপন মনে বকিয়া-বকিয়া অবশেষে শ্রান্ত হইয়া কহিলেন, "বেলা গেল, কখন বই শোনাবি রুকু? আমায় আবার কাজে লাগতে হবে।"

আমি বই খুলিলাম, কিন্তু পড়া হইল না। হঠাৎ পিসিমা চমকিয়া বলিয়া

উঠিলেন,—"ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি! চন্দ্র এলো বুঝি?"—বলিতে বলিতে পিসিমা ভারী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তেপান্তরের রাজপুত্রের আবির্ভাব আমি কল্পনা করিতে পারি নাই। সে-দিন বাবার আশ্বাস পাইয়া চন্দ্রচূড়ের আসন্ন-আগমনের ভীতি আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। সে নামে কেহ যে আছে, আসিতে পারে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পিসিমার ব্যগ্রতায় আমার কৌতূহল প্রবল হইল। আমি বলিলাম, "ধন্য তোমার সাধনা পিসিমা! গাছের পাতাটি নড়লেও কে আসছে, তা বলে দিতে পারো।"

—"পারি বৈ কি? সময় এলে তুইও পারবি। আমি মিছে বলিনি,—চেয়ে দেখ, ওই যে নিমগাছের তলায়!"

পিসিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।

পিসিমার অনুমান-শক্তিতে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। ঘোড়াটি পক্ষিরাজ নামের যোগ্য না হইলেও, আরোহীকে রাজপুত্র বলিলে অত্যুক্তি হয় না। নামের উপযুক্ত রূপ বটে! দীর্ঘ, বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষঃ, উন্নত নাসিকা; আয়ত উজ্জ্বল উদাস নয়ন। সর্ব্বোপরি 'রজতগিরিনিভ' বর্ণ। তরুণ বয়সের কোমলতার সহিত পুরুষোচিত উগ্র সৌন্দর্য্যের সংমিশ্রণে চন্দ্রচূড়কে অপরূপ মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে। মনে মনে স্বীকার করিতে হইল, বাঙ্গালার অভিজাত সমাজেও এমন রূপ দুর্লভ, পিসিমা সেকেলে হইলেও তাঁহার রুচি প্রশংসার যোগ্য বটে।

নিতাইয়ের হাতে ঘোড়ার ভার দিয়া চন্দ্রচূড় বাবু প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রৌদ্রের উত্তাপে পথশ্রমে তাঁহার সুগৌর গণ্ড আরক্তিম, গা বহিয়া ঘাম ঝরিতেছে।

পিসিমা অগ্রসর হইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন—"ভাদ্দরের কড়া রোদে বের হয়েছিস্ কেন চন্দর! আহা, ঘেমে নেয়ে উঠেছিস্! আয় বাবা, ছায়ায় এসে বোস্।"

পিসিমাকে প্রণাম করিয়া চন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন, "রোদে বের না হয়ে কি করি,—তুমি যে ডেকেছ মাসীমা? রোদ-বৃষ্টিকে তোমরা যত ভয় করো, আমরা—চাষাভূষো মানুষ, তত ভয় করি নে। আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। মামা বাবু স্কুলে বুঝি? তা এত তাড়া কিসের?"

"কিসের আবার? অনেক দিন দেখিনি কি না, দেখতে ইচ্ছা হয়েছিল। দাদার সংসার গলায় নিয়ে আমার তো কোথাও পা-বাড়ানোর যো নেই; তবু তুই মাঝে মাঝে আসিস্, তাই তো তোর মুখখানা দেখতে পাই। তোদের খবর সব ভাল তো?—বাবা, মা, ছেলে-মেয়েরা কেমন আছে?" বলিয়া পিসিমা হাঁকিলেন, "করু, বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দে; আর একখানা পাখা নিয়ে আয়!"

যাঁহাকে কখনো দেখি নাই, সহসা তাঁহার সম্মুখে যাইতে আমার সঙ্কোচ হইতেছিল; তবু পিসিমার আদেশ উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

আমি বাহির হইয়া বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিলাম। মাদুরের উপর পাখা রাখিলাম।

পিসিমা আমার পরিচয় দিলেন, "এই আমার ভাইঝি করু,—যার কথা তোকে বলেছিলাম। ক'দিন হোল এসেছে—করু, এ-দিকে আয়; চন্দরকে লজ্জা করিস্ নে, পায়ের ধূলো নে।"

পিসিমার 'পায়ের ধূলো নে'র মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত উঁকি-ঝুঁকি দিতেছিল। মানুষের আশা কি ভ্রমপূর্ণ, কল্পনা মরীচিকা ভাবিয়া আমার হাসি আসিল।

আমি চোখ তুলিতেই চন্দ্র বাবু যুক্তকরে আমাকে নমস্কার করিলেন। আমাকেও যুক্ত দুই হাত তুলিতে হইল।

"আমি এখানে আজ নতুন আসিনি। আমার আসা-যাওয়া আছে। আমাদের মৌখিক পরিচয় না থাকলেও আমরা অপরিচিত নই, আপনি বসুন।"—বলিয়া চন্দ্র বাবু বসিলেন।

পিসিমা পাখায় হাত দেওয়া মাত্রই তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন, "না, না, আর হাওয়া করতে হবে না। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া আস্‌ছে—এর কাছে কি তালপাখার বাতাস!"

—"কিচ্ছু না হোক বাপু, তুই খা তোর ঝিরঝিরে হাওয়া। আমি একটু সরবত করে আনি।"

বাগানের পাশের নারিকেল গাছে ডাব ঝুলিতেছিল; চন্দ্র বাবু সেই দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া কহিলেন, "মাসীমা, তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? পিপাসা নিবারণের অমন চমৎকার জিনিস থাকতে চিনি-মিছরীর সরবত আমার রুচবে কেন?"

আমি এতক্ষণ নীরবে ছিলাম, ভদ্রতার খাতিরে কিছু বলা দরকার মনে করিয়া বলিলাম, "নিতাই তো নারকেল গাছে উঠতে পারে না। রামচরণকে ডাকুক, সে ডাব পেড়ে দেবে।"

—"আপনাদের নিতাই—রামচরণে দরকার নেই; আমি নিজেই ও-সব কাজ পারি। আমাকে একগাছা মোটা দড়ি আর একখান কাটারি দাও তো মাসীমা! দেখি তোমাদের কত ডাবের দরকার।"

পিসিমা কাটারি আনিয়া দিলেন; তাঁহাকে আর কষ্ট করিয়া দড়ি জোগাইতে হইল না, খুঁটির গায়ে একগাছা মোটা দড়ি ঝুলিতেছিল, চন্দ্র বাবু চক্ষুর নিমেষে সেই দড়ি খুলিয়া-লইয়া বাগানের বেড়া পার হইলেন। সেই বেড়ায় গায়ে পাঞ্জাবীটা রাখিয়া, গেঞ্জির নীচে কোমরে কাপড় জড়াইয়া লইলেন।

পিসিমার ভাগিনার কত গুণ, তাহা আমি জানিতাম না। দ্বিপ্রহরের খর-রৌদ্রে ঘোড়ার পিঠে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া কোনও ভদ্রলোক যে বিশ্রামের পূর্ব্বেই গাছে—বিশেষতঃ ডাবগাছে উঠিতে পারে, ইহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।

দেখিতে দেখিতে দড়ির সাহায্যে চন্দ্র বাবু ডাবগাছের মাথায় উঠিয়া বসিলেন। তাহার পর সুরু হইল দুম-দাম শব্দ! পিসিমার চীৎকার,—"ও চন্দর অতো ডাবে দরকার নেই। ঢের হয়েছে! কে খাবে এত? মিছে-মিছি ডাবগুলো নষ্ট করিস্ নে। আয় বাবা, নেমে আয়!"

গাছের উপর হইতে সরল হাসির সহিত গুরুগম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল, "ও কটা যে আমারি গলা ভিজোতে লাগবে মাসীমা! তোমাদের জন্যে কি থাকবে?"

আমার এ বয়সে কখনো আমি এমন অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে আসি নাই। উনি যেন বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যেমন রূপের বৈচিত্র্য, তেমনি স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। অমন মানুষের কাছে লজ্জা লজ্জায় সরিয়া যায়, দূরত্বের ব্যবধান থাকে না।

আমি ঊর্দ্ধে চাহিয়া বলিলাম, "আপনি কত খেতে পারেন—দেখা যাবে। এখন নেমে আসুন; আর দরকার নেই।"

আমার আহ্বান ব্যর্থ হইল না। শাখাবাহী কাঠ-বিড়ালের মত ক্ষিপ্রগতিতে তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন।

নিতাই রাশীকৃত ডাব কুড়াইয়া বারান্দায় রাখিয়া দিল। আমি আনিলাম—পাথরের গেলাস, বাটি।

চন্দ্র বাবু ডাব কাটিতে বসিলেন। প্রথম ডাবটা কাটিয়া পিসিমার সাম্‌নে ধরিয়া আদেশের ভঙ্গীতে কহিলেন, "নাও মাসীমা, চট করে খেয়ে নাও। কাটা ডাব রাখতে নেই ;—'তুই আগে খা' বলো না যেন। আমি আরম্ভ করলে সব কিন্তু এঁটো হয়ে যাবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে জোরের আভাস পাইয়া আমি অনুমান করিলাম, উনি যাহাকে যাহা বলেন, তাহা নিছক মুখের কথা নহে, দৃঢ় হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, কেহই তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না।

পিসিমা বিপন্ন ভাবে আমার পানে তাকাইলেন। আমি বলিব কি? তখনই আমার সাম্‌নে আর একটা ডাব হাজির হইয়াছে! সঙ্গে সঙ্গে আদেশ,—"নিন, এটা খেয়ে ফেলুন; গেলাস লাগবে না। কাটা-জায়গায় মুখ লাগিয়ে এমনি চোঁ চোঁ করে—"

আমি যে ঐ ভাবে খাইতে পারি না, তাহা বলিতে পারিলাম না; চেষ্টা করিলাম, কিন্তু উদরস্থ হইবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধেকের বেশি জল পড়িয়া গেল! তবে অপর পক্ষ আমার এই অবস্থা টের পাইলেন না। তখন তিনি একটির পর একটি ডাব কাটিয়া ঊর্দ্ধমুখে তৃপ্তির সহিত গলায় ঢালিতেছিলেন।

২৭

ডাবের জলপানের এই সমারোহের মধ্যে বাবা আসিয়া পড়িলেন। চন্দ্র বাবুকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না; বলিলেন, "চন্দ্র কতক্ষণ? মাঠে তোমার ঘোড়া দেখেই বুঝলাম তুমি এসেছ।"

—"অনেকক্ষণ এসেছি মামা বাবু! এসেই কাজে লেগে গেছি; এখনো শেষ করতে পারলাম না।"

—"শুধু ডাবের জলেই পেট ভরাচ্ছ—পাগল ছেলে! আর কিছু খাও।"

—"সে হবে স্নানের পরে মামা বাবু! আপনি আর দাঁড়াবেন না, মুখ ধুয়ে আসুন। আমি হাত ধুয়ে আপনার ডাব কাটি।"

বাবা কাপড়-জামা বদলাইতে গেলেন। পিসিমা তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

আমি চন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার কি দুই বেলা স্নানের অভ্যাস? ক'টায় স্নান করেন?"

—"ক'টা তা তো বলতে পারবো না। গাছের মাথায় যখন রোদের লেশও থাকবে না, তখুনি আমার স্নানের সময়,—তার আগে নয়।"

—"আপনি রোদ, বৃষ্টি, ছায়া দেখে সময় ঠিক করেন না কি? ঘড়ির অপরাধ কি?"

—"অপরাধ কিছু নয়, কিন্তু বাহুল্য। আমার বন্ধুরা ঘড়ির ধার ধারে না, দিনের আলোয়, রাতের তারায় তাদের সময় নির্দ্দেশ হয়, ওদেরই কাছে আমার শেখা। দেখুন, যা অযাচিত, অনাহূত ভাবে পাচ্ছি, তা না-নিয়ে আড়ম্বর করবো কেন? আমাদের গরীব দেশ, বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ হলে আরো যে বেশি করে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়বো। এখন ভাববার সময় এসেছে—দেশের পয়সা কি করে দেশে থাকবে।"

বিলাসিতার প্রতি আমার কোন কালে স্পৃহা ছিল না। সাধারণ বেশভূষাতেই আমি অভ্যস্ত। আজ নিমন্ত্রণ ছিল, এ জন্য আমি স্নানের পরে একখানা বাদামী রংএর 'ভয়েলের' শাড়ী পরিয়াছিলাম। আমি সাদার ভক্ত হইলেও কিছু কাল হইতে আমার ভিতরে রঙ্গের নেশা ধরিয়াছে। দার্জ্জিলিংএ এক মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মিলির শাসনে এই শাড়ী আমার অঙ্গে উঠিয়াছিল। এক জনের মুখে এই রংএর স্তবগান শুনিয়া বাদামী রং সকল রঙ্গের চেয়ে আমার প্রিয় হইয়াছে। শাড়ীটা দেশী নহে, তাহা আমি জানিতাম। আমার মনে হইল, চন্দ্র বাবু আমার শাড়ী লক্ষ্য করিয়াই দেশের দুর্দ্দশায় বিগলিত হইয়াছেন।

মেয়েরা অনেক সহিতে পারে, সহিতে পারে না কেবল প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। তর্কাতর্কি যদিও আমার স্বভাববিরুদ্ধ, তবু একটু খোঁচা দিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না; বলিলাম, "দেশের জিনিসের আদর করা সকলের উচিত; যা সম্ভব তা করাই দরকার। আগে আর্য্যরা গাছের বাকল পরতেন, আপনারা তা পারেন না বলেই সুতোর কাপড় পরছেন, তাতে খরচ বেড়ে গেছে। অথচ গাছের বাকল গাছে অনর্থক নষ্ট হচ্ছে—তার আদর নেই!"

চন্দ্র বাবু সোৎসাহে বলিতে লাগিলেন "ঠিক্ বলেছেন, আমাদের অক্ষমতায় দেশের কত জিনিস ধ্বংস হচ্ছে, তার সীমা নেই! এ-দিন থাক্‌বে না—

আপনি দেখে নেবেন। লুপ্ত যা, ধ্বংস যা, তা আমরা ফিরে পাবো! যত দিন বাকলের কাপড় তৈরীর প্রণালী শিখতে না পারবো, তত দিন নিজেদের কাপড়ের স্থতো হাতে কেটে, তাঁতে কাপড় বুনে নিতে হবে। ক্ষেতের তুলো, হাতের কাপড়—এ কম তৃপ্তির বিষয় নয়! আমার যা দেখছেন, এ আমি স্থতো কেটে তাঁতে বুনে নিই।"

—"ভাল কাজই তো করছেন। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতেই কি আপনি বাইরে গিয়েছিলেন? স্বাধীন দেশের, স্বাধীন জাতের কাছে কি শিখে এলেন? ওদের কাছে নাকি ঢের জিনিস আমাদের শিখবার আছে?"

—"থাকতে পারে, আমাদের কাছেও ওদের শিখবার অনেক আছে। তাঁত বোনা, চরকা-কাটা শিখতে কেউ বিদেশে যায় না। আমি গিয়েছিলাম হারানো সম্পদ্ ফিরিয়ে আনতে। রামায়ণে পড়েননি—রাজর্ষি জনক লাঙ্গল চষতে চষতে সীতাদেবীকে পেয়েছিলেন। পুরাকালের হাল-লাঙ্গলের প্রচলন আমরা ভুলে গেছি, আমাদের গৌরবের অনেক জিনিস চুরি হয়েছে। কলের লাঙ্গল আমাদের সৃষ্টি, উড়ো জাহাজও আমাদের। কত বলবো? আমার যতটুকু সাধ্য করে যাই। আশা আছে, আমার চেয়ে শক্তিমান্ যারা পরে আসবে, তারা জঙ্গল কেটে মন্দির গড়বে, পাথর গুঁড়ো-করে সোনা ফলাবে। হারানো জিনিস কড়ায় গণ্ডায়, স্থদে আসলে ফিরিয়ে আনবে।"

আশায়, উৎসাহে চন্দ্র বাবুর চক্ষু মধ্যাহ্ন-ভাস্করের মত জলিতে লাগিল। উদীয়মান্ সূর্য্যের মত সেই দীপ্তিশালী পুরুষের দিকে চাহিয়া আমার কণ্ঠ নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল, মুখে ভাষা ফুটিল না।

কিয়ৎকাল পর বাবা আসিয়া মাদুরে বসিলেন; বসিয়া কহিলেন, "আগে তোমার ডাব খাই চন্দর! তুমি স্নান করে এলে একসঙ্গে জল খাব।"

পিসিমা এক বাটি সরিষার তৈল আনিয়া তাড়া দিলেন—"চন্দর যা বাবা, চট করে নেয়ে আয়। বর্ষার নতুন জলে সন্ধ্যা বেলানাইলে অসুখ বিসুখ হতে পারে।"

—"আমার অসুখ হয় না, মাসীমা,, তোমার ভয় নেই।"

আমি বলিলাম, "আপনি তেল মেখে আসুন; আপনার জল, সাবান কুয়োতলায় রাখি গে!"

—"আমি তোলা জলে স্নান করি না। এত কাছে নদী থাকতে

'ঘটীগঙ্গায়' কে স্নান করে? আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমার কিছু লাগবে না। কাপড় গামছা সঙ্গেই আছে; সাবান তো ব্যবহার করি না।"

—"কেন, দেশে কি সাবান তৈয়েরি হয় না?"

—"তা হয়, কিন্তু এক পয়সার বেশমে পাঁচ দিন চললে পাঁচ আনা দামের একখানা সাবান মাখব কেন? সব চেয়ে খাঁটী সরষের তেলই আমার ভাল।"

বাবা বলিলেন, "তেলে-জলেই বাঙ্গালীর শরীর। তোমার মত এমন মজবুত শরীর ক'জনের আছে? সাবান-ঘষা, পাউডার-মাখা, মেয়েলি ধরণের বাবুর দল তোমার পাশেও দাঁড়াতে পারবে না। শুধু রংএ মানুষকে সুন্দর করতে পারে না, থাকা চাই স্বাস্থ্যসৌষ্ঠব।"

সত্যই বলিষ্ঠ, সুগঠিত দেহ সৌন্দর্য্যের প্রধান উপাদান। চন্দ্র বাবুর অনাবৃত দেহ দেখিয়া আমি বাবার উক্তির সমর্থন করিলাম। সেটা মনে মনে করিলাম; প্রকাশ্যে বলিতে পারিলাম না, সঙ্কোচ হইল। কিন্তু তাঁহার নিঃসঙ্কোচ, সরল ব্যবহারে আমি মুখচোরা—এই দুর্নামের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছি। তাঁহার অনাবৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দর্শনীয় বস্তু বটে, কিন্তু প্রশংসমান নেত্রে সে-দিকে চাহিয়া-থাকা আমার পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ।

আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাগানে প্রবেশ করিলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশ দিনান্তের ম্লান ছায়ায় অবসন্ন, তরুতল ঝরা ফুলের স্নিগ্ধ সৌরভে রোমাঞ্চিত।

টগর গাছের আড়াল হইতে আমি চন্দ্র বাবুর গমনশীল মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। বাগানের সম্মুখ দিয়া নদীর পথ প্রসারিত, তিনি হরিদ্রা রঙ্গের গামছা কাঁধে লইয়া স্নানে যাইতেছেন। কটিদেশ মাত্র আবৃত, অনাবৃত সর্ব্বাঙ্গ হইতে সুগৌর বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া বাহির হইতেছে! হাঁ, স্বীকার করি—বিশ্বশিল্পীর রচনার উহা সার্থকতা বটে!

দুঃখ হইতে লাগিল, এই ভীষণ মধুর, রুক্ষ-শীতল চিত্রপটখানি মিলির চোখের সামনে ধরিতে পারিলাম না! যে মর্ম্মর-ফলকে কখনো কাহারো প্রতিচ্ছবি রেখাঙ্কিত হইতে পারে নাই, সেই মনোমুকুরে এই রূপের প্রতিবিম্ব পড়িত কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতাম।

২৮

বাবার কাছে আসিলে বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দ্রচূড়কে কেমন দেখলি করু ?

বাবা এ প্রশ্ন করিবেন, জানিতাম। চন্দ্র বাবুর সহিত আমার বিবাহের সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়া আমার কুণ্ঠা হইল। অঙ্কুরে যাহার বিনাশ হইয়াছে, তাহার অস্তিত্ব জাগাইয়া রাখা মূঢ়তা! সহজ কণ্ঠেই আমি জবাব দিলাম, "ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌লো বাবা। কারো সঙ্গে ওঁর মিল নেই। উনি যেন সৃষ্টিছাড়া!"

'অনেকটা তাই! সত্যই আশ্চর্য্য ছেলে! মাস-দুই আগে আমি হরিপুরে গিয়েছিলাম। পাশাপাশি গাঁগুলো ঘুরে কি আনন্দ পেয়ে এসেছি, বলবার নয়। যাদের কথা কেউ ভাবে না, কেউ যাদের মুখ চায় না—সেই সব গরীব; চাষা-ভূষোদের নিয়েই চন্দরের কারবার। তাদের সঙ্গে মাঠে মাটী কুপিয়ে সার দেওয়া, রাত্রে গাছতলায় ছেলে-বুড়োর ক্লাশ করা, দশ জন লোকের খাটুনী মানুষ একা খাটতে পারে, ওকে না দেখলে ধারণা করা যায় না!"

বলিলাম, "চাষ-আবাদ শেখানো খুব ভালো মানি, তবে ওদের লেখাপড়া শেখানো কি ঠিক? লেখাপড়া শিখলে ওরা আর হাল-লাঙ্গল ধর্‌তে পারবে না; ক্ষেতের কাজ করতে চাইবে না! হঠাৎ আলোয় এলে আলো-আঁধার—দু'কূলই হারাবে। শিক্ষার মোহে ওদের জাত-ব্যবসা আর ভালো লাগবে না, আশা বেড়ে যাবে! ওরা হতে চাইবে অফিসের বাবু, থানার কনেষ্টবল, যাত্রার দলের অভিনেতা। পাট না বুনে হতে চাইবে পাটের দালাল, ধানের ব্যাপারী।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বাবা বলিলেন, "কুশিক্ষায় মানুষ নিজেকে ভুলে যায়, জাত-ব্যবসা করতে তাদের লজ্জা হয়, এ-কথা তুমি মিছে বলোনি, মা! আজ-কালকার অর্থ-সমস্যার যুগে ঐটিই হচ্ছে প্রধান বিপদ, তবে চন্দ্রকে দেখে ওর ছেলে-বুড়ো ছাত্রের দল নিজেদের ভুলতে পার্‌বে বলে মনে হয় না। চন্দরের উদ্দেশ্য চাষ-আবাদের সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান-বুদ্ধি দেওয়া, নিরক্ষরকে অক্ষরের মধ্যে আনা। তুমি তো জানো না, ওর ত্যাগে-মহত্ত্বে সকলে ওকে দেবতার মত ভক্তি করে, প্রাণের চেয়ে ভালোবাসে। চন্দর ছোট-বড় সকলের দাদা-ঠাকুর, দেবতা! রূপে-গুণে চন্দ্রচূড় সত্যই চন্দ্রচূড়ের মত!"

বাবার উচ্ছ্বসিত প্রসংসায় অন্তরের সহিত আমি যোগ দিতে পারিলাম না। অতি সূক্ষ্ম এক বিদ্বেষের হুল আমার বুকে খচ্‌-খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছিল। আমি

যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি—ত্যাগে, মহত্ত্বে আর কেহ যদি তাঁহাকে ছাপাইয়া যায়, কেন তাহাতে আমার ঈর্ষা হইবে? আমার যিনি আরাধ্য, তিনি জগতের আরাধ্য না হইলে কিসের দুঃখ? আমার প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি, প্রেমের মালা তো অম্লান উজ্জ্বল রহিয়াছে – প্রাণের দেউলে সঙ্গোপনে দেবতার পূজা-আরতি চলিতেছে, তবু বাহিরের প্রলোভনে অন্যের গুণ-বাহুল্যে আমার ভয় হইবে কেন?

মুহূর্তে মনের এ বিদ্বেষ-ভয় ঝাড়িয়া মুছিয়া বলিলাম, "চন্দ্রবাবুর আদর্শ খুব উঁচু বাবা! আমাদের দেশে অমন লোকের সংখ্যা যত বাড়বে, ততই মঙ্গল।"

বাবা বলিলেন, "তা আর বলতে! মনের প্রেরণায় চন্দর সকলের সেবা-ব্রত নিয়েছে, মিথ্যা আড়ম্বর দেখাবার জন্য নয়। ওর তো অভাব নেই! স্বচ্ছল সংসারে আদরের ছেলে। চন্দরের মা আমার কাছে কত দুঃখ করলে, এই বয়সে ও মাছ-মাংস খায় না, ভোগের জিনিস স্পর্শ করে না। আমি চন্দরকে ডেকে এ কথা বল্‌লাম। তাতে সে জবাব দিলে, 'মা'র কথা শুনবেন না মামা বাবু। আমার বিবাগী হবার সম্ভাবনা নেই! উদয়াস্ত কাজ নিয়ে থাক্‌লে বৈরাগ্যের ছোঁয়াচ লাগতে পারে না। মাছ-মাংসর চেয়ে ভালো খাবার পেলে ও-সবে কার রুচি থাকে, বলুন? 'বিয়ে' কথাটা হয়েছে মা'র জপমালা, কিন্তু মা তলিয়ে দেখেন না—তাঁর অসভ্য গোঁয়ার, চাষা ছেলেকে কোন্ ভদ্রলোক মেয়ে দেবে? আমার কাজকে যিনি নিজের কাজ করে নিতে পারবেন, তেমন মেয়ে পেলে আমি বিয়ের কথা বিবেচনা কর্‌বো।' ছেলের কথা শুনে চন্দরের মা রেগে অস্থির! বললে, 'দয়া করে আমাকে জেল-খাটা, খদ্দর-পরা একটা মেয়ে এনে দিন তো দাদা! ঘরে বৌ এলে তার পর ছেলের বাহাদুরি আমি দেখে নেবো'।"

এ সম্বন্ধে কি উত্তর দিব, ভাবিতে লাগিলাম। বাবার আলোচনায় যোগ দিয়া চন্দ্র বাবুর ভাবী বধূ-নির্ব্বাচনের ভার আমি আনন্দে লইতে পারিতাম, কিন্তু পিসিমা সোজা-জিনিসটাকে একটু বাঁকাইয়া দিয়াছেন! যতই ইংরেজী বই পড়ি না কেন, স্বাধীন মনোবৃত্তির অনুশীলন করি না কেন, তবু আমি বাঙ্গালীর মেয়ে!

ক্ষণকাল পরে আমি বলিলাম, "আমাদের দেশে অনেক মেয়ে আছে বাবা, যারা যথার্থ দেশসেবিকা। তাদের ভিতর থেকে এক জনকে বেছে বার করতে পারলে চন্দ্র বাবুর অযোগ্য হবে না।"

আমার পিছন হইতে পিসিমা থর্-থর্ করিয়া উঠিলেন,—"যুগ্যি-অযুগ্যি কি বলছিস্ রে করু! চন্দরের মত বর পাওয়া তপিস্তের ফল। ছেলের গুণের সীমা নেই। দোষের মধ্যে ছোট-লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, আর স্বদেশী করে! তা হলেও অমনটি আর পাওয়া যাবে না। তোরা বড় হয়েছিস্, দেখে-শুনে নিলি। এখন আর কোনো ওজর শুনবো না! দাদাকে তো ঠাকুরঝি কনে দেখার ভার দিয়ে রেখেছে। দাদা গিয়ে সব ঠিক করে এসো, সামনের অগ্রাণে দু'হাত এক করে দিই।"

"কাদের দু'হাত এক করে দেবে মামিমা?" বলিতে বলিতে স্নানান্তে চন্দ্র বাবু ফিরিয়া আসিলেন।

লজ্জায় আমার চোখের পাতা বুজিয়া গেল। আমি মনে মনে বলিলাম, ধরণি, দ্বিধা হইয়া আমাকে তুমি লুকাইয়া রাখো!—কলির মেয়ের কাতর মিনতিতে ধরণী বিচলিত হইলেন না!

পিসিমার মুখে খই ফুটিতে লাগিল? "কার আবার! তোদের কথা বলছিলাম। তোতে-করুতে দু'হাত এক হলে দিব্যি হয়। এমন গুণের মেয়ে তুই আর কোথাও পাবি নে চন্দর! এত যে লেখাপড়া করেছে, তবু কি ধীর, শান্ত! মাটি নড়ে তো মেয়ে নড়ে না! তুই করুকে নে বাবা, আমার পুরানো সম্পর্ক আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিই।"

সরমে আনত হইলেও আমি নারী, আমার নয়ন নারীর নয়ন! সে তাহার স্বভাবের বঙ্কিম ভঙ্গিমা তুলিল না। নত চক্ষু ঈষৎ তুলিয়া আমি চন্দ্র বাবুর মুখের দিকে তাকাইলাম, সে রুক্ষ-কোমল মুখের অদৃশ্য লিপি পাঠ করিতে পারিলাম না। তাঁহার উজ্জল ভাস্বর আঁখি-তারা আমারই মুখে নিবদ্ধ দেখিয়া তাড়াতাড়ি আমি চোখ নামাইয়া লইলাম।

স্নিগ্ধ-মধুর হাস্যে পিসিমার প্রস্তাব তিনি খণ্ডন করিলেন। বলিলেন,— "তুমি কি বল্‌ছো মাসীমা! মামার মেয়ে—ও যে আমার বোন, তা তুমি ভুলে গেলে! তোমার কিসের লজ্জা করু, আমাদের ভাই-বোন সম্পর্কের মধ্যে লজ্জার কিছু নেই!"

কি মিষ্ট সম্বোধন! আমার সমস্ত মন অমৃতে ভরিয়া গেল।

বাবা সস্নেহে বলিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ চন্দর, করু বোনই তো! এ সম্বন্ধ কেল্‌না নয়। তোমার যেমন বিয়ের অনিচ্ছা, করুরো তাই। সে-দিক্ দিয়ে দুই ভাই-বোনের মিল দেখছি। কাল আমি ওকে অভয় দিয়েছি, যত

দিন বিয়ে না করে থাকৃতে চায় থাকবে! ইচ্ছা না হলে বিয়ে ও করবে না।”

আহত ফণিনীর মত পিসিমা গর্জ্জিয়া উঠিলেন, “কি বলছো দাদা! তোমাদের সব অনাসৃষ্টি! করুর মা থাকলে এ-কথা মুখে আন্‌তে পার্‌তে না! তোমার কি, লোকে কথা শোনাতে এসে আমাকেই শোনায়। কেনই বা শোনাবে না? এত বড় মেয়ে কার ঘরে আছে? আইবুড়ো মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে কে তার খেয়ালে তাল দিয়ে যাচ্ছে! ওর মাসীর যে অত খিষ্টানী মত, সে-ও মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে। যা খুশী করো গে। ভালো মনে করে চেষ্টা-চরিত্তির করতে গিয়েছিলাম, নাহলে আমার কিসের দায়!”

বাবা নিতান্ত নিরীহ। পিসিমার সে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তির সম্মুখে ম্লান হইয়া গেলেন। সামান্য একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিতে পারিলেন না।

এই অপ্রীতিকর ঘটনাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন চন্দ্রদা, বলিলেন, “মিছিমিছি রাগ করছ কেন মাসীমা? তোমরা না এত মানো, বিশ্বাস করো! তবে ভুলে যাও কেন—হিন্দুর জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে—ঈশ্বরের অভিপ্রেত! এ জোরের জিনিস নয়। সময় হলে হয়ে যাবে, তার জন্য চিন্তা কেন? কৈ, তুমি না খেতে দেবে, তখন তাড়া দিচ্ছিলে! এখন হাত গুটিয়ে বসে রইলে।”

পিসিমা অপ্রতিভ হইয়া জল-খাবার আনিতে উঠিলেন।

২৯

সন্ধ্যার পরে বারান্দায় শুভ্র চন্দ্রালোকে আমাদের সভা বসিল। আমি অসঙ্কোচে চন্দ্রদার পাশে স্থান করিয়া লইলাম। অপরিচিত, অনাত্মীয় ভাবিয়া উঁহাকে আর পরিহার করিতে পারি না। আজ আমি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলাম, মানুষের প্রকৃতি সর্ব্ব দিক্ দিয়া সর্ব্বপ্রকার রস গ্রহণ করিতে উন্মুখ। আমার নিজের ভাই-বোন না থাকিলেও মিলির কাছে ভগিনীর প্রীতি লাভ করিয়াছি! ভানু আমাকে দিয়াছে ছোট ভাইয়ের বিশ্বাস, নির্ভরতা। জ্যেষ্ঠের স্নেহ-সৌহার্দ্দ্য আমি পাই নাই। পাইবার জন্য আমার চিত্ত কোন দিন লালায়িত হয় নাই। চন্দ্রদার স্নেহ-সম্ভাষণে আজ আমার সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত লাগিয়াছে। যেখানে সত্যের অভাব, সেখানে মিথ্যাকেই সত্য ভাবিয়া আঁকড়িয়া ধরিতে সাধ হইতেছে।

জীবনে বেশী পাই নাই। পাইবার যোগ্যতা সকলের থাকে না। কিন্তু যিনি আজ অযাচিতরূপে দিতে চাহিতেছেন, তাঁহাকে ফিরাইব কেন ?

কথায় কথায় আমি চন্দ্রদাকে বলিলাম "আপনি কখনো কল্‌কাতায় যান কি ? এবারে গেলে আমাদের ওখানে যাবেন।"

চন্দ্রদা বলিলেন, "মাঝে মাঝে যেতে হয় বৈ কি। আমরা গেঁয়ো হলেও আমাদের এক প্রতিনিধি কলকাতাতেই থাকে। সে সনাতন দাদা। তার খাতিরে কাজ না থাকলেও যেতে হয়।"

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সনাতন কে,—চিনলাম না।"

"চিনবেন কি করে মামা বাবু! ও তো দেশে থাকে না। অনেক দিন হলো কলকাতার বাড়ীতে দরোয়ান হয়ে আছে। দশ বছর বয়সে সনাতন-দা আমাদের কাজে বাহাল হয়। চল্লিশ বছর পার হতে গেল, কাজই করছে। এক ছেলে ছাড়া ওর আর কেউ নেই। আমার সঙ্গে গিয়ে ছেলে বাপকে দেখে আসে। গঙ্গার তীর থেকে এক দিনের জন্য সনাতন দাদাকে আনা যায় না, এমনি তার গঙ্গা-ভক্তি!"

পিসিমা বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার বাড়ী ভাড়া দিয়েছো ? সনাতন বুঝি ভাড়া আদায় করে ?"

"নীচের তলাটা দোকানদারদের ভাড়া দেওয়া আছে, ওপরটা ভাড়া দেওয়া হয় না। কলকাতায় গেলে আমরা থাকি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন্ দিকে আপনাদের বাড়ী ?"

"আশুতোষ কলেজের কাছে।"

বাবা বলিলেন, "ও! তা'হলে করুর মাসীর বাড়ীর কাছে।"

বলিলাম, "হ্যাঁ, আমাদের খুব কাছেই হবে। আপনি এবার কলকাতায় গিয়ে কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন।"

"যাবো বৈ কি, গেলেই যাবো। তুমি তো পরশু যাচ্ছো! পূজোর ছুটিতে আবার আসবে কি ?"

"বোধ হয়, আসা হবে না। পরীক্ষার আগে মাসিমা আসতে দেবেন না।"

পিসিমা কহিলেন, "তুই কালকের দিনটা থাক্ না চন্দর, পরশু ওকে ষ্টীমারে তুলে দিয়ে তার পর যাস্। বাড়ীতে আমরা দু'টো বুড়ো মানুষ থাকি, ওর কথা বলবার একটা লোক অবধি নেই! এই দুঃখে করু এখানে আস্‌তেই চায় না।"

পিসিমার মিথ্যা ভাষণে চমকিত হইলাম। তাঁহার আশা-তরু ভূপতিত জানিয়াও তিনি তাহার মূলদেশে বারিসিঞ্চন করিতেছেন! তাঁহার বিশ্বাস, স্রোতের গতি বিপরীত মুখে বহিলেও বহিতে পারে। সময় এবং সান্নিধ্যের সহযোগে অনেক সময় অসাধ্য-সাধন হয়।

চন্দ্রদা কহিলেন, "কালকে থাকতে পারলে তো ভালোই হতো মাসীমা। কিন্তু তা হবার নয়। আমার আবার ক'টি রোগী আছে। আজকের ওষুধ দিয়ে এসেছি, কাল গিয়ে তাদের ব্যবস্থা ক'র্‌বো। স্কুলের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু রোগী রেখে থাকা চল্‌বে না।"

কহিলাম, "আপনি কি সব্যসাচী! চিকিৎসা-বিদ্যাও জানেন্! কখনো লাঙ্গল ধরেন, তাঁত বোনেন, আবার মাষ্টার, ডাক্তার হতেও বাধে না। মানুষ তো আপনি একা, এত পারেন কি করে?"

"ইচ্ছা থাক্‌লে সময়ের অকুলান হয় না। আসলে আমি চাষা। ডাক্তার বা তাঁতি নই। সংসারে থাকতে গেলে সব জিনিস একটু-আধটু শিখে রাখতে হয়। বিনা-ওষুধে মরার চেয়ে আমার হোমিওপ্যাথি ছিটে-ফোঁটা মন্দর ভালো নয় কি?"

বাবা মাথা নাড়িলেন। বলিলেন, "ভালো নয়, কে বলবে চন্দর? তুমি মহৎ বলেই লোকের দুঃখ-কষ্টের দিকে চাইছো। কার জন্যে কে এত করে? তোমার আদর্শ সকলের অনুকরণ করা উচিত।"

আত্মপ্রশংসায় লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদা এ প্রসঙ্গের ধারা পরিবর্ত্তনের জন্য পিসিমাকে কহিলেন, 'কাল থাক্‌তে পারবো না,—শুনে তুমি রাগ করলে মাসীমা! এবারের মত আমাকে মাপ করো, আবার যে দিন হুকুম করবে, এসে হাজির হবো।"

পিসিমা ম্লান হাসিলেন। কহিলেন, "তোর ওপরে রাগ করে কে চন্দর?" রাগ করলেও তুমি রাগের কত ধার ধারছো! মাকে তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক্ করে তুলেছো। ভদ্দর ঘরের ছেলে হয়ে চাষা বনেছো। কি যে তোমার লেখাপড়া শেখা, কি যে তোমার বিলিতি বাঁদর হওয়া! সমস্তই ভস্মে ঘী ঢালা হয়েছে।"

বাবা কহিলেন, "কি বলছিস বিন্দু। ভস্মে ঘী ঢালা কি রে! ভস্ম থেকে আগুন বেরিয়ে এসেছে। বাপ-মা'র সৌভাগ্য এমন ছেলে পাওয়া! এরা দলে বেশী নয় বলে আমার দুঃখ হয়।"

চন্দ্রদা শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িলেন। কহিলেন, "আমার বাহনটির তোয়াজ করতে চল্লাম মামাবাবু। ওর আবার ডলাই-মলাইয়ের ব্যারাম আছে। সেটা ঠিক-মত না হলে বোঝা বইতে চায় না। এখন তোয়াজ করে না রাখলে শেষ-রাত্রে ওকে দাঁড় করানো যাবে না।"

বাবা বলিলেন, "তুমি বসো, নিতাইকে বলি, সে ও-সব বেশ জানে।"

"জানলে কি হবে মামা বাবু, অচেনা লোককে পবন গায়ে হাত দিতে দেবে না। ও যেমন আমাকে এক বেলার রাস্তা আধ বেলায় পৌঁছে দেয়, আমিও তেমনি ওর সেবা করি। পবনের কৃপায় আমি পাকা একজন সহিস হয়েছি।"

চন্দ্রদা বাহির হইয়া গেলেন। আমি তাঁহার পিছু লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার ঘোড়ার নাম বুঝি পবন?"

"হ্যাঁ, আমি ওর নাম রেখেছি—পবন-নন্দন। হাস্‌ছো! ঘোড়ায় চড়তে জান্‌লে পবনের পিঠে চেপে মুগ্ধ হয়ে যেতে। বললে হয়তো বিশ্বাস করবে না, পবন আমাকে খুব ভালোবাসে, বেশীক্ষণ না দেখলে খুঁজে বেড়ায়!"

"বিশ্বাস করবো না কেন? আপনি ভালো বলে সবাই আপনাকে ভালোবাসে। পশুদের ভালোবাসার অনুভূতি মানুষের চেয়ে না কি বেশী শুনতে পাই। আমরা ওতে বঞ্চিত। ঘোড়ায় চড়তে জানি না।"

"না জান্‌লে শিখে নিতে দোষ নেই। জানি না, পারি না, ও কথা গৌরবের নয়। শিখবে ঘোড়ায় চড়া? আমি এখনি তোমায় শিখিয়ে দেবো!"

"আপনি যেন শিখিয়ে দেবেন, কিন্তু সময়ে কুলোচ্ছে কৈ? আপনি চলে যাচ্ছেন ভোরে। আমি যাচ্ছি পরশু,—কখন শেখাবেন? আর শিখতে গেলে তো আপনার পবনের পিঠে চাপতে হবে। চাপা দূরের কথা, ওর কাছে যেতেই আমার ভয় করে।"

"ভয় করে! পবনের মত শান্ত নিরীহ প্রাণীকে ভয়! কোনো ভয় নেই। এসো, আমি পবনের পিঠে তোমায় বসিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া চন্দ্রদা নিঃসঙ্কোচে আমার হাত ধরিলেন।

চকিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম। সে মুখ স্নেহে-করুণায় প্রদীপ্ত, তাহাতে অন্য ভাবের লেশ নাই। তাঁহার ধরা হাতখানা তখনই টানিয়া লইতে পারিলাম না, কিন্তু কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ধরা ছোঁয়া আমি ভালোবাসি না।

চন্দ্রদার পক্ষে কিছুই যেন অশোভন নয়! তিনি সরল, নির্ম্মল, কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত হইলেও আমার মন বারি-ধৌত শুভ্র যুথিকা বলিতে পারি না! এ ক্ষেত্রে লজ্জার ভাণ অচল। আমাকে ভয়ের ভাণ করিতে হইল।

তাঁহার মুঠার মধ্য হইতে হাত টানিয়া লইয়া ভীতি-ব্যাকুল স্বরে কহিলাম, "আমি পারবো না চন্দ্রদা, আমার কাজ নেই ঘোড় সওয়ার হয়ে। মা গো, পবন যেন কেমন করে চাইছে!"

প্রসন্ন কোমল হাসিতে চন্দ্রদার মুখ ভরিয়া গেল। সস্নেহে, সকৌতুকে তিনি বলিলেন,—"কি ভীরু মেয়ে! থাকো শহরে, লেখা-পড়া শিখেছো, তবু তোমার এত ভয়! জানো না, আমাদের দেশের মেয়েদের সাহসে-বীরত্বে পুরাণ-ইতিহাস এখনো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। যারা সামান্য ঘোড়ার ভয়ে অস্থির, তাদের দিয়ে দেশের কোন্ বড় কাজ হবে, করু?"

চন্দ্রদার হাসির অন্তরালে যে-শ্লেষ, সেই শ্লেষের খোঁচা আমাকে বিঁধিল। অপ্রতিভ না হইয়া সগর্ব্বে আমি উত্তর দিলাম, "আমার ভয় দেখে মেয়ে-জাতকে ভীরু বলো না চন্দ্রদা। একজনের ভীরু স্বভাবের অপবাদে আর সব মেয়েদের সাহসের অভাব আমি স্বীকার করে নিতে পারি না। পুরাণ-ইতিহাস উল্টোতে হবে কেন? আমার মাসতুতো বোন মিলির সাহস দেখলে আপনি আশ্চর্য্য হবেন। দশ জন পুরুষের যে সাহস নেই, মিলির তা আছে। সাঁতার, মোটর চালানো, ঘোড়ায় চাপা থেকে হেন কাজ নেই, যা সে জানে না। আবার এ-দিকে যেমন বুদ্ধি, তেমনি মেধা! সে এখানে থাকলে এক-মিনিটে আপনার পবনকে বশ করে নিতো।"

চন্দ্রদা সাগ্রহে বলিলেন, "চমৎকার মেয়ে তো! মামা বাবু তখন তাঁর কথাই বলছিলেন। আমি ভাবি, আমাদের দেশে অমন মেয়ের সংখ্যা কেন বাড়ে না? তুমি তাঁর বোন, তাঁর কাছে থাকো, অথচ দু'জনের স্বভাবে এত তফাৎ কেন?"

"আমার স্বভাবের আপনি কি জানেন চন্দ্রদা? ক' ঘণ্টা আমাদের জানা-শোনা, এর মধ্যে কারো স্বভাব জানা অসম্ভব।"

"খুব অসম্ভব নয়। আমি বেশ বুঝেছি, আমার করু বোনটি লক্ষ্মী হলেও খুঁত আছে। কি খুঁত, তা বলবো না। শুনলে তুমি রাগ করবে।"

চন্দ্রদা মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বলিলাম, "রাগ করবো কেন? খুঁতের কথা বলুন না!"

"বলি। তুমি ছল-ছুতোয় রাগ করতে ভালবাসো, ঠিক ছেলেমানুষের মত। তোমার রাগটুকু বড় মিষ্টি—ভারী ভালো লাগে। রাগে রাঙা হয়ে উঠলে যে! এখনি না বললে, রাগ করবে না!"

ভাগ্যে চন্দ্রদা আমাকে ভগ্নী সম্বোধন করিয়াছিলেন, ভাগ্যে তাঁহার প্রকৃতি জানিতে আমার বাকী ছিল না, নহিলে এ মন্তব্যে আমি হয়তো পলকে প্রলয় করিয়া তুলিতাম! এমন সরল, আপন-ভোলা লোকটিকে কি উত্তর দিব ভাবিয়া না পাইয়া হাসিতে লাগিলাম।

আমার সে হাসিতে খুশী হইয়া চন্দ্রদা পবনের সেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

৩০

সে রাত্রে ভোরের পাখী ডাকিতে না ডাকিতে চন্দ্রদা আমাদের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে কালো ঘোড়ার সাদা সওয়ারটির আবির্ভাবে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলাম। সেই বিরক্তির অনুপাতে বিষাদের মেঘে আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল। এক একজন মানুষের মধ্যে কি জানি কিসের যেন প্রভাব থাকে! তাহারা দূরে চলিয়া গেলেও অন্তরের অন্তস্তলে অনেক কিছু রাখিয়া যায়। ক্ষণেকের অতিথির সে ক্ষণেক আলাপ, ক্ষণেক হাসির স্মৃতি হৃদয়কে অকারণ ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে!

প্রতিদিনের মত প্রভাতের আলোয় ধরণী আলোকিত হইল। সে-আলোয় আমার মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় কিন্তু আলোকিত হইল না।

যিনি ভাইয়ের স্নেহ লইয়া, বন্ধুর সহৃদয়তা লইয়া আমার এত কাছে আসিয়াছিলেন, তাঁহার বিচ্ছেদ বেদনা আমাকে ম্রিয়মাণ করিল। কিন্তু কেন এমন হয়? সংসার-তরুর শাখায় কত পাখী আসে, চলিয়া যায়! এ আনা-গোনা জগতের বাঁধা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে চিরকাল।

পিসিমার কাছে ঘেঁষিতে আজ আমার সাহস হইল না, আশাভঙ্গের আঘাতে তিনি অত্যধিক গম্ভীর।

বাবার ফুল-বাগিচার পরিচর্য্যায় যোগ না দিয়া আমি আমার নিভৃত কোটরে ঢুকিলাম। সময় আমার সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিতেছে। আজিকার দিনটা মাত্র আমার আয়ত্তের মধ্যে। কাল সকালে আবার সেই গণ্ডীরেখার মধ্যে পা দিতে হইবে। মাঝখানে থাকিবে দিগন্ত-প্রসারিতা, সঙ্গীতমুখরা,

নৃত্যশীলা পদ্মা। এ-পারে পড়িয়া থাকিবে বিশাল অরণ্য, নিবিড় বনানী, শান্তির নির্ঝর, স্নেহের অফুরন্ত উৎস! ও-পারে তৃণহীন, ছায়াহীন, বিশুষ্ক মরুভূমি, আর ভ্রান্তির মরীচিকা। তবু তাহারই পরিবেষ্টনের মধ্যে আমার হৃদয় ধাবিত হইতে চায় কেন?

এ চাওয়ার মীমাংসা হইল না, পিসীমা গরম দুধের বাটি লইয়া উপস্থিত।

লজ্জিত হইয়া বলিলাম, "আমাকে ডাকলে না কেন? তুমি আবার ব'য়ে নিয়ে এসেছ?"

"ডাকবো কি, তোমার তো গোছগাছ আছে। সারা বাড়ী জুড়ে সব ছড়িয়ে রেখেছো। আগে দেখে-শুনে না নিলে অর্দ্ধেক পড়ে থাকবে। এসে থাকা নেই, কেবলি যাওয়া-আসার ভোগান্তি!"

অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বলিলাম, "সাধ করে তো যাই না পিসিমা! তোমরাই লেখাপড়া শিখতে দিয়েছো! না গিয়ে কি করবো?"

"কেন, বিয়ে করে রাজার রাণী হবে, সোনার চাঁদ কোলে আস্‌বে। নাত্‌নী আমার কি করবেন, তা যেন জানেন না!"

কথা শুনিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম! ঠান্‌দির অতর্কিত আগমনে আমার মন যেন দমিয়া গেল। এত সকালে ঠান্‌দিকে আশা করি নাই!

পিসিমা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া ঠান্‌দিকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিলেন। বলিলেন, "এসো জ্যেঠাইমা, তোমার ফুল-দূর্ব্বো তোলা হলো? তোমরা পাঁচ জনে বিচার করো—একটা মেয়ে—সে-ও কাছে থাকে না। রাত ফরসা হলে রওনা দেবে। ভালো লাগে কখনো? যখনকার যা, তা না হলে কি সাজন্ত হয়? বলো।"

ঠান্‌দি ফুলের ডালা নামাইয়া দ্বার চাপিয়া বসিলেন। হাই তুলিয়া, তুড়ি দিতে দিতে পিসিমার স্বরে স্বর মিলাইলেন। বলিলেন, "যা বলেছিস্‌ বিন্দি, উচিত কথা! কালে কালে হলো কি! আইবুড়ি ধিঙ্গি মেয়েগুলোর জ্বালায় জাত-জন্ম রইলো না! কাল ছিল আমাদের! সাত চড়ে বৌ-ঝি রা-কাড়্‌তো না, এক-হাত ঘোমটায় লজ্জা-সরম অঙ্গের ভূষণ করে রেখেছিল। এ ঘোর কলিতে সব ধিঙ্গি হয়েছে! কোথায় যাবে শ্বশুর-ঘর করতে, না, যাচ্ছেন কলেজে পড়তে!"

পিসিমার মেজাজ আজ ভালো ছিল না বলিয়াই তিনি খেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। নহিলে আমার শিক্ষার অনুকূলে বরাবর তিনি সায় দিয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার সামান্য অসতর্কতার সুযোগে এ অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণায় তিনি কেমন সচকিত হইলেন।

ত্রুটি-সংশোধনের আশায় পিসিমা বলিয়া উঠিলেন, "আমাদের যেমন পোড়া-কপাল জ্যেঠাইমা, এমন কারো নয়। লোকের ঘরে গণ্ডা-গণ্ডা ছেলে-মেয়ে, কেউ কাছে থাকে, কেউ দূরে যায়। দাদার এই সবে-ধন নীলমণি, তাকে নিয়ে পুতু-পুতু করছেন। ওকে পড়াচ্ছেন ছেলের আক্ষেপ মেয়ে দিয়ে মেটাবেন বলে!"

শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা পিসিমার ব্যর্থ হইল। ঠান্‌দি ঝঙ্কার দিলে, "ও মা, কি সৃষ্টিছাড়া কথা বলিস্! ছেলেতে-মেয়েতে সমান হয় কখনো? মেয়েকে ছেলে বানালেই কাছে রাখা যায় না। কাছে রাখার সামগ্রী নয়! হ্যাঁ লা বিন্দি, কাল বুঝি তোর ভাগ্নে এসেছিল? নাত্‌নীর সঙ্গে ভালোবাসা করতে হবু-নাত-জামাইকে ডেকেছিলি না কি? তা ভাগ্নেটি তোর বড় সোন্দর, এমনটি আর নজরে পড়ে না। বেশী-দূর গড়াতে না দিয়ে তাড়া-হুড়ো করে সেরে দে, আমরা মিষ্টি-মুখ করি।"

সকৌতুকে ঠান্‌দির পানে চাহিলাম। ইহারা নিতান্ত অবলা অখলা, ভালো-মন্দের বিচার-বুদ্ধি কম, কিন্তু ইহাদের মন-মক্ষিকা মধু আহরণ করিতে জানে না! মনের দৃষ্টি ফোটা ফুলে উধাও না হইয়া আবর্জ্জনার স্তূপে আবদ্ধ থাকে! যাহা সহজ, সুন্দর, তাহাকে বিকৃত না করিয়া থাকিতে পারে না! স্ত্রী-পুরুষের মেলা-মেশার মধ্যে ইহারা এক-ভিন্ন দ্বিতীয় রূপ কল্পনা করিতে জানে না!

মনের উত্তাপ মনে চাপিয়া হাসিয়া আমি বলিলাম, "ভালোবাসা করতেই কি লোকের কাছে লোক আসে ঠান্‌দি! বিয়ে-ভালোবাসা ছাড়া কি কারোর সঙ্গে কারু কথা থাকতে পারে না? যাঁকে আমি প্রথম দেখলাম, ক'ঘণ্টার জন্য আলাপ হলো, তাঁর সঙ্গে বেশী দূর গড়ানো যে বললে, তার মানে কি?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, ঠোঁট উল্টাইয়া ঠান্‌দি থর্-থর্ করিয়া উঠিলেন, "মেয়ের কথা শুনে বাঁচি নে! মা গো, কোথায় যাবো? তুই বাছা থাকিস্ ভিজে-বেড়াল সেজে, তলে-তলে বাক্যি শিখেছিস্ তো বেশ! হলোই বা নতুন দেখা, কইলিই বা গুণে-গেঁথে কথা, মন থাকলে এর বেশী সময় লাগে না। এতেই এত মাথামাথি, হাত-ধরাধরি! সময় পেলে না জানি কি করতিস্!"

রাগে, ঘৃণায় মরিয়া হইয়া আমি বলিলাম, "কি আর করতাম? অমন

গুণের দাদাকে কাছে পেলে অনেক বিদ্যা শিখে নিতাম। বড় হয়েছি বলে কি সম্পর্কে যিনি ভাই হন, তাঁর হাত-ধরা অন্যায় ঠান্‌দি? তোমরা কি তোমাদের দাদার সঙ্গে কথা বলোনি? হাত ধরোনি? দাদা কি জানতাম না, চন্দ্রদাকে পেয়ে আমার সে অভাব পূর্ণ হয়েছে।"

আমার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তিতে পিসিমা বিবর্ণ হইলেন। তাঁহার আশার ক্ষীণ প্রদীপটি নিবিয়া গেল!

নীরস স্বরে ঠান্‌দি কহিলেন, "কি জানি বাছা তোমাদের একেলে খিরিষ্টানি ঢংয়ের দাদা-দিদি আমরা বুঝি নে। যেখানে রক্তের সম্পর্ক নেই, সেখানে সম্পর্ক পাতাতে গেলে লোকের সন্দ হয়। আমরা সেকেলে মনিষ্যি, একালের ধরণ-ধারণ জানি না।"

মনে মনে উত্তর দিলাম, সম্পর্ক না পাতাইতে জানিলে আমি নাত্‌নী হইলাম কোন সুবাদে? আমাকে লইয়া এত নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণেরই বা প্রয়োজন কিসের?

মনে যাই হোক্, কথা আর বাড়াইতে সাহস হইল না। এমনি যেটুকু বলিয়াছিলাম, তাহা না বলিলেই বোধ হয় ভালো হইত!

নারী-প্রকৃতি আসলে এক! শিক্ষায়, সংস্কারে উন্নত হইলেও হৃদয়ের প্রসার সঙ্কীর্ণ। তাহাতে অতুলনীয় মহত্ত্ব থাকিলেও উদারতার একান্ত অভাব। স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-নির্ণয়-ব্যাপারে মেয়েরা সরল মীমাংসা করিতে জানে না। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও উদার মনে বিশেষ প্রভেদ নাই। শিক্ষাহীনা, নিরক্ষরা ঠান্‌দি স্থূল ভাষায় এই মুহূর্তে যাহা প্রচার করিলেন, লেখাপড়া শিখিয়া আমরা সূক্ষ্ম, সুললিত বিশেষণে ইহারই যে অনুশীলন করি! মিলির প্রতি কাজে প্রতি পদক্ষেপে আমার মনে সন্দেহ সজাগ হয়! সে কিসের সন্দেহ? মিলির স্বভাবের? না, আমার অনুদার চিত্তের?

এ পর্য্যন্ত একটি মেয়েকেই এ সন্দেহ, এ সংশয় হইতে মুক্ত দেখিয়াছি— সে মিলি। অন্যের বিষয় জানিবার কৌতূহল, অন্যের ছিদ্র অন্বেষণের স্পৃহা নাই! তরুণ-তরুণীর অবাধ মেলামেশার মধ্যে দৃষ্টিকটু কোনো কিছু থাকিতে পারে, মিলি তাহা জানে না। তাহার তেজস্বী মনে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নাই, নিন্দা-কুৎসার আশঙ্কা নাই। কিন্তু মিলির মত আমার মন নির্বিকার, নিঃসংশয় নয়! চন্দ্রদার সহিত মিশিবার সময় আমারই বিবেচনা করা উচিত ছিল। এখানকার পরিস্থিতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পারিপার্শ্বিক ভুলিয়া ছিলাম। মনে

থাকিলে আপন-ভোলা চন্দ্রদার নির্ম্মল নামের সহিত আমার নাম যুক্ত করিবার সুযোগ দিতাম না।

৩১

নিঃশব্দে আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম।

আমার ঘরের পিছনে খানিকটা পড়ো জমিতে আগাছার ঝোপে-ঝাড়ে এক নিভৃত কুঞ্জ ছিল। আমি তাহারই মধ্যে গিয়া আত্মগোপন করিলাম। ঠানদির কথার জ্বালায় রাগে ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া খাক্ হইতেছিল। লোকালয়ে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতেছিল না।

কিছুক্ষণ পরে বাবা আমার সন্ধানে আসিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাগানের কাজ হলো বাবা ?"

"হলো মা। গাছের সেবা তো আমার রোজ থাকবে, তুমি থাকবে না। গাছের গোড়া খোঁড়া-খুঁড়ি কম করে আজ তাই তোমার কাছে এলাম। বিন্দু বললে, জ্যেঠাইমার কথায় তুমি না কি খুব রাগ করেছ! রাগ করেই কি জঙ্গলে এসে বসে আছো, করু ?"

"রাগ করে আসবো কেন বাবা ? ঠানদির কথায় জবাব দিতে না পেরে পালিয়ে এসেছি। সত্যি, এঁরা এমন কেন ? ভারী ময়লা মন, ডোবার পাঁকের মত।"

"ঠিক তা নয়, করু। মন ছাড়া সংস্কার বলে একটা জিনিস আছে। সেইখানেই ওঁদের বাধে। সেকেলে মত অনুদার হলেও তাতে অশান্তি ছিল না। আধুনিক মতের দু'-চারটে যা নমুনা খবরের কাগজে বেরোয়, পড়ে স্তম্ভিত হতে হয়।"

"যারা আসলে খারাপ, তাদের কথা ছেড়ে দাও। মন্দর দলে ভালোকে টানলে আমার রাগ হয়। চন্দ্রদা'র মত ছেলে ক'জন আছে, বাবা ? তাঁর নাম নিয়ে সমালোচনা!"

সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়াইয়া সান্ত্বনার স্বরে বাবা বলিলেন, "বিন্দু আমায় সব বলেছে। জ্যেঠাইমা সমালোচনা করেননি, সম্ভাবনার প্রত্যাশায় বলেছেন। তাতে তোমার রাগ করে উঠে না এসে হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। নিজে ভালো হলে লোকের কথায় কিছু এসে-যায় না। লোকে ভুল করে, মিথ্যা বানিয়ে এক দিন বলে, দু' দিন বলে, তিন দিনের পরে আর

সে বলতে পারে না। চন্দ্রকে এঁরা কতটুকু জানেন? যে দিন ভালো করে জানবেন, সে দিন নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। এতে কি মন-খারাপ করে? তুমি যদি এখন 'মিশনে' যেতে চাও, আমি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি। আজ ছুটির দিন হয়ে ভালো হয়েছে মা, সারাটা দিন তোমার কাছে থাকবো। চলো, সিষ্টার ডরোথির সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে আসি।"

আমি ঘাড় নাড়িলাম, "না বাবা, পাশ না করা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে আমি আর যাবো না। যদি পাশ করতে পারি, তখন গিয়ে দাঁড়াবো।"

"বেশ ভালো কথা মা, তাই যেয়ো। পাশ তুমি করবে, আর ভালো করেই করবে। চলো, বরং নদীর ধারটা ঘুরে আসি।"

বাবার সহিত অগ্রসর হইলাম।

বর্ষার প্রলয়-নর্ত্তনের পরে নটিনী তটিনী শ্রান্ত হইলেও এখনো সে নৃত্য-উচ্ছ্বাস থামাইতে পারে নাই। বায়ুহিল্লোলে রহিয়া রহিয়া নৃত্যের মহলা দিতেছে।

নদীর তীর ঘেঁষিয়া আমরা পদচারণা করিতে লাগিলাম। মুহূর্ত্তে আমার উত্তপ্ত হৃদয়-মন জুড়াইয়া গেল।

ভাবিয়া দেখিলাম, কাহারও ইঙ্গিতে আমার রাগ অভিমান শোভা পায় না। কুমারীর অমলিন নির্ম্মলতার গৌরব আমি হারাইয়াছি। কেন হারাইলাম? অবাধ মেলা-মেশার ফলে? চন্দ্রচূড় না হোক, জ্যোতিভূষণ তো আমার হৃদয়ে রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আমার নিষ্ঠা অবিচল থাকিলেও ইহা যে অন্যায়, তাহা অস্বীকার করিতে পারি না। যাঁহার কথায় ক্ষুব্ধ হইয়াছি, ছোট তিনি? না, আমি? পুরাকালের রক্ষণশীলতার বিচার করিলে ঠান্‌দিকে হীন ভাবিবার কারণ নাই। হীনতা এবং সাবধানতা এক নয়।

সহসা দূরে চোখ চাহিয়া দেখি, পথের বাঁকে কলসী কাঁখে ঠান্‌দি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! একটু আগে যাঁহার উপর বিমুখ হইয়াছিলাম, তাঁহাকে পাইয়া আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল। আগাইয়া গিয়া কহিলাম, "কি ঠান্‌দি, এত সকালে স্নান করতে চলেছো! এখন স্নান করে করবে কি?"

ঠান্‌দি হাসিলেন, বলিলেন, "শোনো মেয়ের কথা,—করবো কি? কাজের আবার আদি-অন্ত আছে? স্নান সেরে আগে পূজোর জোগাড়ে লাগতে হবে। সাজ আছে, নৈবিদ্যি আছে, শিব গড়া আছে। এদিক্ করে নিয়ে তার পর

রান্নার পাট। রান্না-খাওয়া মেটাতে মেটাতে সেই যাকে বলে বেলা পড়ন্ত। বিন্দিকে বলে এসেছি, তুই দুপুরে আমার ওখানে খাবি নাত্‌নি। তখন তাই বলতেই তোর কাছে গিয়েছিলাম। ঠিক সময়ে যেতে ভুলে যাস্ নে দিদি!"

বাবা বলিলেন, "ভুলবে না, জ্যেঠাইমা। আজকের দিনটাই ও আছে, কাল এতক্ষণে বেরিয়ে যাবে। পূজোয় আসবে না, এবার আসবে সেই পরীক্ষার পরে।"

"ছাই পড়া! ছাই পরীক্ষে! মা-মরা একটা মেয়ে—তাকে সাধ করে এমন বনবাসে পাঠায়? বাছা আমার বাপের জন্য হেদিয়ে কাঁটা-সার হয়েছে। মা মঙ্গলচণ্ডী করুন, পাশ দিয়ে ঘরের বাছা ভালোয়-ভালোয় ঘরে আসুক।" বলিয়া ঠান্‌দি উদয়-সূর্য্যের পানে তাকাইয়া যুক্ত-করে প্রণাম করিলেন।

৩২

মুক্ত অবাধ নীল আকাশের নীচে সবুজ বন-বনান্তরকে দূরে রাখিয়া বন-বিহঙ্গী আসিয়া আবার নগরের কোটরে প্রবেশ করিল।

বাবার স্নেহ-সজল মুখ, পিসিমার বিরাম-বিহীন অশ্রু স্মৃতির কোঠায় ভরিয়া আমি ফিরিলাম মাসিমার গৃহে।

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মিলিরা কেহ বিছানা ছাড়িয়া ওঠে না। আসিবার দিন নির্দ্দিষ্ট করিয়া এখানে কাহাকেও আমি তাহা জানাই নাই, কাজেই কেহ আমার প্রতীক্ষায় ছিল না।

চাকরদের পাশ কাটাইয়া দ্বিতলে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে আমি স্নান করিলাম।

স্নানান্তে চায়ের টেবিলটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিতেছি, এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া মিলি আসিল বারান্দায়।

মিলি আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করে, ক'দিনের অদর্শনের পর আমাকে দেখিয়া তাহার স্নেহের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ব্যগ্র বাহু দিয়া আমার কটি ঘিরিয়া উল্লাসে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "রুরু! এখন এলি? আজ আসবি, তা এক ছত্র লিখেও জানাস্‌নি তো! এসেও একটা ডাক দিসনি! এর মানে? মেসোমশায় কেমন আছেন? ছাখ্, ভারী মজা হয়েছে, এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোকেই আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম। আমার ভোরের স্বপ্ন সত্য হলো, সুপ্রভাত বলতে হবে!"

বলিলাম, "সকালে আমার মুখ দেখে উঠ্‌লে কারো সুপ্রভাত হয় না মিলি!

'কুপ্রভাত' বল্। ক'দিনের জন্যই বা যাওয়া-আসা, তার আবার লিখবো কি ? ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি করে সকলের ঘুম ভাঙ্গানোর দরকার ছিল না বলেই আমি এসে স্নান করে নিয়েছি। বাবা ভালো আছেন। তোরা কেমন ছিলি ?"

"এ দিকে মন্দ নয়। শুধু তোর বিরহে যা জর-জর, মর-মর। এতক্ষণে দেহে আমার প্রাণ এলো !"

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "এত-ও জানিস্ মিলি ! আমার বিরহে কারো এমন শোচনীয় দশা হতে পারে, এ আমার গৌরবের কথা। যাঁর বিরহে হবার সম্ভাবনা, তিনি তো কাছেই ছিলেন। খুব আমোদেই বোধ হয় তোদের এ ক'টা দিন কেটে গেছে ? ওঁদের খবর কি ? দিদিরা কেমন আছেন ?"

"ভালো আছেন। খুব বেশী আনন্দে দিন কাটেনি রে ! বাধ্য হয়ে আমাকে এক অপ্রিয় কাজ করতে হয়েছে। যাকে ভালোবাসি, তার ভালোর জন্য মানুষকে কত কি করতে হয়।"

আমার মনে কাল-বৈশাখীর উদয় হইল। আমার অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে না জানি কি আঘাত করিয়াছে ! তিনি আমার নন্, মিলির ! তবু তাঁর বেদনা যেন আমারই বেদনা !

নিরুত্তরে মিলির মুখের দিকে চাহিলাম।

মিলি বলিল, "অমন করে চাইছিস্ কেন রে ? তোর ভয় নেই, জ্যোতি বাবুকে কিছু বলিনি। তুই যাবার পরে একদিন মাত্র মিনিট-পাঁচেকের জন্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি বল্‌চি কমলের কথা। বেচারা ছেলেমানুষ, কাণ্ডজ্ঞান নেই। জানার মধ্যে জান্‌তো শুধু বই। আমার মরণ ! সেই দুগ্ধপোষ্য বালক শেষে কি না আমার প্রেমে পড়লো !"

"প্রেমে পড়ার অপরাধ কি বল্ ? তোর পাল্লায় পড়লে পাথরে ঘাস গজায়, মরা নদীতে বান ডাকে। কমলের দোষ কি ? অমন করে লেগে থাকলে কার না মতিভ্রম হয় ?"

মিলি সরোষে গর্জ্জিয়া উঠিল, "তোর যুক্তিতে গা জ্বালা করে রুক্ষ, ভালোবেসে কারো গায়ে হাত দেওয়া, কাউকে আদর করা দোষের ? পৃথিবীতে এক ছাড়া আর অন্য কোন সম্বন্ধ থাকতে পারে না ? ছেলেয়-ছেলেয় গলা জড়িয়ে এক-বিছানায় শুতে পারে, মেয়েয় মেয়েয় ভালোবেসে একসঙ্গে থাকতে পারে, তাতে দোষ হয় না ! যত দোষ, ছেলেতে আর মেয়েতে মুখোমুখী হলে ! ভালোবাসার ভিন্ন রূপ যারা জানে না, তাদের উচিত নয়—মেলা-মেশা করা।

কমলকে আমি বলে দিয়েছি, একসঙ্গে পড়া সুবিধে হচ্ছে না। তোমার মতন তুমি পড়ো, আমার মত আমি।"

চন্দ্রদাকে আমার মনে পড়িল। এ ভালোবাসার আস্বাদ আমিও সন্ত পাইয়া আসিয়াছি।

মাসিমার সাড়া পাইয়া তখনকার মত চন্দ্রদার অবতারণা করিতে পারিলাম না।

মাসিমার সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্ত্তা হইল না। কলেজ কামাই করিয়া আমার বাড়ী যাওয়ার ক্ষোভ এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই। ছাত্রীর একাগ্রতার বিষয়ে কতকগুলি হিতোপদেশ দিয়া মাসিমা আমার প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন। মৃদু কণ্ঠে মিলি বলিল, "এখন মুখ বুজে থাক্ করু, কলেজ কামাই হয়েছে বলে মা তোর উপর ভীষণ চটে আছেন। আমাদের দুই মুখের কথা শুন্‌লে আরো চটে যাবেন। দুপুরবেলা আমরা গল্প কর্‌বো।"

দ্বিপ্রহরে মিলির সহিত গল্প করিবার আগ্রহ থাকিলেও তাহা কাজে পরিণত হইল না। আহারান্তে বিছানায় যাইতে না যাইতে গত-রজনীর নিদ্রাহারা নয়ন ঘুমে জড়াইয়া আসিল।

মিলির আহ্বানে যখন ঘুম ভাঙ্গিল, বেলা তখন বেশী ছিল না।

মিলি বলিল, "আর ঘুমোয় না। খুব হয়েছে! এখন উঠে তৈরি হয়ে নে। চল্, দিদির ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। মা'র হুকুম, কাল থেকে খোপে বন্ধ হয়ে বই মুখস্থ কর্‌তে হবে, বেড়ানো চলবে না। এত দিনের ফাঁকির শোধ মা এবার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নেবেন।"

"বেশ তো, আমার ভালোর জন্যই মাসিমা কড়াকড়ি করছেন। পড়া আমার একেবারেই হয়নি, তা তাঁর জানা আছে। আরো ভালো করে জানা আছে, আমার নিরেট মাথার দৌড়! সকলের স্মরণশক্তি মল্লিকা দেবীর মত নয়। এক বার চোখ বুলোলে মনের মধ্যে অক্ষরগুলো দাগ কেটে বসে না। মল্লিকা কাটেন ধারে, আমরা কাটি ভারে! ভারের ভার নিতে আজ থেকেই আমি প্রস্তুত মিলি। চাই নে কোথাও যেতে। যাবার দরকার কি?"

"দরকার আছে। তোর যাবার দিনে দিদি নিজে এসে কি যত্নে মেসোমশায়ের জন্য কত জিনিস সাজিয়ে দিয়ে গেলেন, তাঁর ভাই গাড়ীতে তুলে দিলেন। ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করা খুব অভদ্রতা হবে। চট্ করে ঘুরে আসবো।'

আমার বুক স্পন্দিত হইতে লাগিল। যে মহা-পারাবারের উদ্দেশে আমার হৃদয়-নদী অবিরাম ধাবিত হইতে চায়, আমার দুরদৃষ্ট বশতঃ আমি তাহার দিকে ছুটিতে পারি না। কি জানি, কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে কি করিতে কি করিয়া বসিব! কি বলিতে কি বলিব!

বাহ্যিক দর্শন-স্পর্শনের প্রয়াসী আমি আর নই। বাহিরে যোগসূত্র ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াই না তাঁহাকে আমার অন্তরের অন্তরতম করিতে চাহিতেছি! ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য জানি না,—জানি, তিনি মিলির। তাঁহার কাছ হইতে দূরে সরিয়া থাকা আমার বিধি-লিপি। প্রলোভনের মরীচিকায় দিশাহারা হইলে আমার চলিবে না। দিদির স্নেহাঞ্চল যে তাঁহারও আনন্দ-নীড়, একের সন্নিধানে দুইয়ের সংঘাত। দিদির অমূল্য স্নেহ অন্তরে অন্তরে আমি উপভোগ করিব, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া তাঁহার কাছে যাইতে পারিব না। বিশাল জলধির উপকূলে তৃষিতা চাতকী যেমন ঘুরিয়া মরে, আমিও তাহারই মত। চাতকীর আশা—আকাশের নব-নীল মেঘ-সম্ভার, মেঘের স্নিগ্ধ বারি-ধারা। আমার আশা—মরণের শান্ত-কোমল আশ্রয়!

আমি বলিলাম, "আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না মিলি, বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি। এর পর একদিন গিয়ে দেখা করে আসবো।"

মিলি রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। দূর হইতে তাহার গানের স্বর ভাসিয়া আসিল—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর,
তোমার মাঝে আমার বিকাশ, তাই এত মধুর।'

৩৩

আলোর সাম্‌নে বইয়ের পাতা সবেমাত্র খুলিয়াছি, দিদি আসিয়া ডাকিলেন, "বনফুল। এসেই তোমার শরীর খারাপ হয়েছে না কি? তবে পড়তে বসছো কেন?"

আমি চমকিত হইলাম। শুধু দিদিই আসেন নাই, তাঁহার পিছনে জ্যোতি বাবু আর মিলি। হৃদয়কে শান্ত করিয়া দিদিকে প্রণাম করিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "মিলি ফোন্ করেছিলেন, আপনার অসুখ করেছে, বেরুতে পারবেন না। শুনে এখানে আস্‌বার জন্য দিদি একেবারে অস্থির! কারো অসুখ শুনলে দিদির আর জ্ঞান থাকে না! কি হয়েছে আপনার?

গাঁয়ের ম্যালেরিয়াকে সঙ্গী করে নিয়ে এলেন না কি? আপনার বাবা কেমন আছেন?"

মিলির দুষ্টবুদ্ধিতে আমার রাগ হইতেছিল। মিলির পানে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া আমি জবাব দিলাম, "বাবা ভালো আছেন। আমার ম্যালেরিয়া নয়, রাত্রে ঘুমুতে পারিনি, তাই বেলা-ভোর শুয়েছিলাম। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসবেন।"

"মাসিমা বাড়ী নেই, তোমার ঘরেই আমাদের কুলিয়ে যাবে বনফুল,—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন তো তোমার মাথা-ধরা নেই? একটু ভালো বোধ করছ তো?" বলিয়া দিদি আমার বিছানায় বসিলেন।

চেয়ারখানা জ্যোতি বাবুর দিকে আগাইয়া দিয়া আমি দিদির পাশে বসিলাম।

আমার অসুস্থতার সংবাদ দিয়া মিলি ইঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছে,—কাজেই আমার শরীর লইয়া তাহাকেই জবাবদিহি করিতে হইল। মিলি বলিল, "এখন ওর মাথাধরা নেই দিদি,—সারা দুপুর খুব কষ্ট পেয়েছে। যেমন মাথার যন্ত্রণা, আপনাদের দেখবার জন্য তেম্‌নি ছট্‌ফটানি।"

মিলির কথা আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, এ মিথ্যাজাল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য আমি কহিলাম, "আপনারা বসুন, আমি চা নিয়ে আসি।"

জ্যোতি বাবু বাধা দিলেন, "চা আমরা খেয়েই আস্‌ছি, আর চাই না। দিদিকে গণ্ডাদশেক পাণ এনে দিন—পাণের জাবর না কাট্‌লে দিদি নিস্তেজ হয়ে পড়েন।"

দিদির চোখে কলহের বাষ্প ঘনাইয়া আসিল। দিদি বলিলেন,—"হ্যাঁ, সব-তাতেই দিদির দোষ! পাণ জুগিয়ে খোঁটা দিলে তবু না হয় মেনে নিতাম, আমি পাণের জাবর কাটি। সিগারেটের জাবর কাটে কে রে? যেমন সিগারেট, তেমনি চা। দুই নেশায় যিনি মশ্‌গুল, তিনি এসেছেন আমার সমালোচনা কর্‌তে! দিন-রাত অগ্নিমুখো হয়ে কথা বল্‌তে তোর লজ্জা করে না জ্যোতি?"

"লজ্জা কিসের দিদি? এটা পুরুষের গর্ব্ব, মুখে আগুন ভিতরে উত্তাপ না থাক্‌লে এ-জাত এত দিনে নিবে যেতো, তোমাদের কোন কাজে লাগতো না। পাওয়ার চেয়ে আরো আদায়ের আশাতেই না এমন জায়গায় পাঠিয়েছিলে, যেখানে চা-সিগারেটের চেয়েও তেজস্কর জিনিসের আমদানী।

ভাগ্যে তার ভক্ত হয়ে ফিরিনি! নিজের ওপর নিজের যে কি অখণ্ড শ্রদ্ধা হয় দিদি, বলবার নয়! রাত্রে শুয়ে কপালে পায়ের ধূলো ছুঁইয়ে নিজেই নিজের স্তব করি। বলি জ্যোতিভূষণ, তুমি অপরূপ, তুমি অসীম, অনেক লোভ জয় করেছো। গেলাসে-গেলাসে অমৃত উপেক্ষা করেছো! তোমার মনের বল অসাধারণ, তোমাকে প্রণাম করি।"

জ্যোতি বাবুর বলিবার ধরণে দিদি হাসিতে লাগিলেন। আমি কোনো মতে হাসি চাপিলাম।

আমাদের হাসিতে যোগ না দিয়া মিলি তীক্ষ্ণ কটাক্ষে জ্যোতি বাবুকে বিদ্ধ করিয়া কহিল, "আপনার মত এত অহঙ্কার এত গর্ব্ব আমি কোথাও দেখিনি। নিজের ওপর এতখানি বিশ্বাস না রেখে চার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখুন। যারা বিদেশে যায়, তাদের সবাই কিছু চরিত্র হারিয়ে মাতাল হয়ে ফিরে আসে না!"

"আসে না আবার! তুমি কিছু জানো না মিলি! পরিচিতের এক জন বিলাত-ফেরতের নাম করো,—যার মাতাল নাম রটেনি, চরিত্রহীন নাম রটেনি। ভালো থাকলেও স্থান-মাহাত্ম্যে কেউ তাকে ভালো বলে স্বীকার করে না। যাদের সাথের সাথী নিন্দা-কুৎসা, নিজেদের জয়-ঢাক তাদের আপনাকে বাজাতে হয়। সাধে আমি আমার ভেতরকার জ্যোতিভূষণকে নমস্কার করি!"

জ্যোতি বাবু হা-হা শব্দে হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার হাসির বাতাসে মিলির মনের মেঘ কাটিয়া গেল।

দিদি কহিলেন, "আহা, বেচারা জ্যোতিভূষণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! দিন-রাত কি কষ্টই না সইচে! মিথ্যা অপবাদ, অখ্যাতির বিষ গিলে নীলকণ্ঠ হয়েছে! সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কত নির্ম্মল শুদ্ধ হয়ে ফিরেছে, এ পোড়া দেশের পোড়া লোকগুলো তা বুঝতে পারে না! এদের নামে শুধু শুধু কলঙ্ক দেয়? যা রটে, তা ঠিক না ঘটলেও তিল থাকে! তিল থেকে তাল হয়, আম-কাঁটাল ফলে না জ্যোতি।"

মিলি সায় দিল, সত্যি কথা বলেছেন দিদি, সামান্য কিছু না থাকলে লোকে এমন বলে না। এই তো আমরা ছু'টি বোন একবাড়ীতে রয়েছি, সামনে না বলুক, আড়ালেও আমার নামে নানা জনে নানা কথা বলে। আমি খুব ভালো নই বলেই বলতে পারে। করুকে তো বলতে পারে না! পারবে কি করে? ও যে সত্যি ভালো।"

আমি মিলিকে থামাইয়া দিলাম, "বাজে বকিস্ নে মিলি, ভালো লোক হলেই প্রশংসা পায় না। অনেকে নিন্দার কাজ ক'রে প্রশংসা পায়, আবার প্রশংসার কাজেও মানুষের নিন্দা হয়। নিন্দা-প্রশংসা আসলে প্রবাদের মত! এবার পিসিমার এক ভাগ্নের সঙ্গে পরিচয় হলো। আমাদের বাড়ীতে তিনি এসেছিলেন। আশ্চর্য্য মানুষ, তিনি! বহু কাল আমেরিকায় থেকেও তিনি সিগারেট দূরের কথা, চা-পর্য্যন্ত অভ্যাস করেননি। তাঁর জীবন-যাত্রার প্রণালী আর্য্য-ঋষিদের মত, তাঁকে দেবতা বললেও বেশী বলা হয় না। তাঁকেও লোকে সন্দেহ করে!"

মিলির চোখে-মুখে বিদ্রূপের হাসি উথলিয়া উঠিল। বাঁকা ঠোঁট আরো একটু বাঁকাইয়া মিলি কহিল, "দেবতা বললেও যাঁকে বেশি বলা হয় না, কৈ, সারাদিনেও তাঁর কথা তো আমায় বলিসনি রুক্ন! কোথায় তিনি থাকেন? কি কাজে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, শুনি? কি তাঁর নাম?"

মিলির প্রশ্নে আমার রাগ হইল। তিক্ত স্বরে আমি জবাব দিলাম, "সারা দুপুর ঘুমিয়ে কাটালাম, বলবো কখন? আর তাঁর কথা তোমাদের মত শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বড়মানুষদের শোনবার যোগ্য নয় মিলি! তাঁর কাজ দীন-দুঃখীদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনাটন নিয়ে,—কি হবে তা শুনে? তোমরা বুঝবে না! তাই তাঁর কথা বলে তোমাদের কাছে তাঁকে হাস্যাস্পদ করতে চাই না।"

মিলি হাসিল, "এরি মধ্যে এমন দরদ! এত টান! অভয় দিচ্ছি, রুক্ন, তোর আদর্শ মহাপুরুষকে আমাদের তিন জনের বিরাট্ সভায় হাস্যাস্পদ করবো না। তুই নির্ভয়ে তাঁর নাম বল্, তাঁর কার্য্যতালিকা দাখিল কর্।"

দিদি সকৌতুকে বলিলেন, "বনফুল আমাদের পাগলি! যিনি বড়, তাঁকে নিয়ে হাসি-তামাসা চলে না বোন। তুমি যাঁকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করো, আমরা কি তাঁকে অসম্মান করতে পারি? কখনো না।"

জ্যোতি বাবু কহিলেন,—"নিশ্চয়। যিনি আপনার প্রীতিভাজন হয়েছেন, আমাদেরো তিনি তাই। আপনি তাঁর নাম বলুন, আমিও পাড়াগেঁয়ে লোক—হয়তো চিন্‌তে পারবো।"

অলক্ষ্যে আশ-পাশের তিনখানা মুখ নিরীক্ষণ করিলাম। কৌতুকে কৌতূহলে তিন-জোড়া চোখে যেন বিদ্যুতের দীপ্তি! আমারই ভুল,—চন্দ্রদার সম্বন্ধে এখনি এতখানি পক্ষপাতিতা-প্রকাশ আমার অন্যায়।

হইয়াছে। সকলের মনে আশু-সম্ভাবনার আভাস আমিই জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি।

লজ্জিত হইয়া আমি বলিলাম, "তাঁর নাম চন্দ্রচূড় রায় চৌধুরী। তিনি আমার দাদা হন।"

জ্যোতি বাবু সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "চন্দ্রচূড়! চন্দ্র যে আমার বাল্যবন্ধু। গায়ে-গায়ে লাগানো দু'খানা গাঁ হলেও আমরা এক-স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে এক-কলেজে ঢুকেছি, তার পরে হয়েছে আমাদের ছাড়াছাড়ি। সে আমার বন্ধু, এ গৌরব আমার সব চেয়ে বড়। আমি হতভাগা, তাই তার পথ ধরতে পারিনি। তার ত্যাগ—তার আদর্শকে মনে-মনে পূজো করেই আস্‌ছি শুধু। আপনি তাকে কোথায় দেখলেন? সে কেমন আছে? কত কাল তাকে দেখিনি!"

"চন্দরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনফুল? আমি ভাবছিলাম, না জানি কার নাম করবে! তোমাদের মত আমিও চন্দরের দিদি। তাকে আমি কত ভালোবাসি বলবার নয়। ছেলে, না, হীরার টুকরো! অমন ছেলে আর-একটি আমার চোখে পড়েনি। তুমি আমাদের কথা তাকে বলেছিলে কিছু? বলবেই বা কি করে? তাকে যে জানি আমরা, তা তো কখনো তোমায় বলিনি। চন্দ্র তোমাদের বাড়ীতে কেন এসেছিল?"

দিদি চুপ করিলেন। স্নেহে করুণায় তাঁহার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতে লাগিল।

বলিলাম, "তিনি আমার পিসিমার ভাগ্নে। পিসিমা ডেকেছিলেন, তাই দেখা করতে এসেছিলেন। আমি তো জানি না, তাঁর সঙ্গে আপনাদের জানা-শোনা আছে! তাঁকে আমি এই প্রথম দেখলাম। তিনি ভালোই আছেন।"

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "আপনি তাকে প্রথম দেখলেন করবী দেবি! দেখাবার মত অমন যে রূপ, তা আপনার পিসিমা এত দিন না দেখিয়ে এবার আপনি বাড়ী যাবা মাত্র চন্দ্রকে ডেকে দেখালেন কেন? আপনার পিসিমা সেকেলে মানুষ, পাকা বুদ্ধি, নিশ্চয় তাঁর কোন উদ্দেশ্য আছে।"

জ্যোতি বাবুর পরিহাসে দিদি খুশী হইলেন, বলিলেন, "ঠিক বলেছিস্‌ জ্যোতি, আমি যেন কি! এত দিন আর একটা ভাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, চন্দরের কথা আমার মনে এসেও আসেনি। আসেনি বলে মনকে দোষ দেওয়া যায় না,—সাধারণ ভাবে কেউ তাকে চাইতেই পারে না। পুণ্য না থাক্‌লে

ওকে পাওয়া যায় না। বনফুল যেমন লক্ষী মেয়ে, চন্দরও তেমনি সাক্ষাৎ চন্দ্রচূড়! দু'টি এক হলে মণিকাঞ্চন যোগ হবে।"

মৌন-মুখে মিলি আমাদের আলাপ-আলোচনা শুনিতেছিল, বলিল, "দিদির অন্য ভাইটি যে 'সন্তান', অনুমানে তা বুঝে নিয়েছি। কিন্তু বিদ্বান্ আর 'সন্তানের' মণিকাঞ্চন সংযোগ, জানতাম না।"

দিদির হইয়া জ্যোতি বাবু জবাব দিলেন, "চন্দ্র যথার্থ সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই। তার মত প্রকৃত সন্তান হাজারে একটা মেলে না। জীবানন্দের শান্তি ছিল, চন্দ্রচূড়েরও শান্তির প্রয়োজন আছে। কাল্কের ডাকে চন্দ্রকে আমি চিঠি লিখবো। পিসিমার ডাকে তাকে সাড়া দিতে হয়েছে, আমাদের ডাকে তাকে ধরা দিতে হবে। কি বলো দিদি, পারবে না তুমি তাকে বাঁধন পরাতে?"

"পারবো না আবার? আমিও কাল চিঠি লিখবো। বনফুলের মত মেয়ে কটা আছে?"

মিলি বলিল, "বেশি নেই দিদি, কিন্তু আপনার বনফুলের বিয়ের ঘটকালি সহজ নয়। ও পাহাড়ী নদী, ওর গতি আঁকা-বাঁকা। তবু আপনাদের আদর্শকে এক বার দেখান্. আমরাও চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করি।"

মিলি এ বলে কি! বাক্যে ব্যবহারে আমার মনের ভাব কখনো আমি কাহাকেও জানিতে দিই নাই। ফল্গুর ক্ষীণ ধারা জাগিয়া আমার মনের মধ্যে লুকাইয়া আছে! তাহার কলধ্বনি মিলির জানিবার কথা নয়! আমার পাপের মন,—সামান্য উপহাসকে তাই সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি না। কি জানি, কি কথায় মুখরা মিলি কি বলিয়া বসিবে! অথচ দিদির প্রস্তাবকেই বা মাথা পাতিয়া লই কি বলিয়া?

মরিয়া হইয়া আমি কহিলাম, "মিলির কথা শুনো না দিদি, গতি আমার ঠিকই আছে। তবে চন্দ্রদাকে আমি 'দাদা' বলে ডাকি, নিজের দাদার মতই মনে করি। তিনিও আমাকে তাঁর ছোট বোনের মত স্নেহ করেন। পিসিমার নিজের ভাগ্নে,—আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। আমার অনুরোধ, তাঁর নামের সঙ্গে তোমরা আমার নাম জড়িয়ো না।"

দিদি ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, "তাই তো, আমার ঘটকালি যে হলো না! মুল্লুকে এত মানুষ থাকতে চন্দ্রচূড়ের সঙ্গেই বা তোমার ভাই-বোন সম্বন্ধ

বেরুলো কেন? এখন আবার কোথায় খুঁজে বেড়াই! খুঁজলে আর যা মিলুক, চন্দ্রচূড় মিলবে না তো!”

“কেন মিলবে না দিদি? আগে হুজুরকে হাজির করিয়ে দিন, তার পরে পিসিমার ভাগ্নে, মাসিমার দেওর—আমরা দেখে নেবো। বিয়ের কনেদের দস্তুর ওজর-আপত্তি করা, তাতে কাণ দিলে কর্ম্ম-কর্ত্তাদের চলে না!” বলিয়া মিলি আমার দিকে চাহিয়া চোখ টিপিল।

দুই ভাই-বোন প্রসন্ন হইলেন।

আমার মনের মেঘ সরিয়া গেল! আমার অন্তরতম কথা তাহা হইলে এখনো মিলির অগোচর আছে!

৩৪

সেদিন শীতের স্বল্পায়ু অপরাহ্নে সবে চুল-বাঁধা শেষ করিয়াছি, এমন সময় মিলি আমাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল!

আজকাল মিলির অকারণ গল্প, ভানুর আব্দার, মাসিমার ফরমাস প্রায় বন্ধ হইয়াছে। মাসিমার কড়া শাসনে বাড়ীতে হাসি-কলরব থামিয়া গিয়াছে। আমাদের তিন ভাই-বোনের আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় তিনি অস্থির। গৃহে আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়া আগন্তুক অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভার তিনি নিজে লইয়াছেন।

মাসিমা আজ বাড়ী নাই। কি কাজে কোন্ বন্ধুর গৃহে গিয়াছেন, ফিরিতে রাত্রি হইবে। এমন সুযোগে মিলি হয়তো আড্ডা জমাইতে আমাকে ডাকিতেছে জানিয়া আমি হলে প্রবেশ করিলাম।

দেখি, পাশাপাশি দু'খানা সোফায় বসিয়া চন্দ্রদা এবং মিলি।

সবিস্ময়ে আমি বলিলাম, “চন্দ্রদা! আপনি এখানে?”

হাসিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, “হাঁ, আমি এখানে,—অবাক হচ্ছ করু! ক'মাস আগে তুমিই না আমাকে এখানে আসবার নেমন্তন্ন করে এসেছিলে! তাই এসেছি। আসবার পথে মামা বাবুকে দেখে এসেছি। তিনি ভালো আছেন।”

জিজ্ঞাসা করিলাম, “কবে আপনি এসেছেন? মিলির সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কেমন করে?”

“কাল এসেছি। জ্যোতির ওখানে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমি

নিজে এসে তোমাকে চম্‌কে দেবো বলে কাল আমার আসার খবর দিতে ওঁকে বারণ করেছিলাম। ক'মাস হলো যেমন জ্যোতির 'এসো-এসো' ডাকাডাকি, দিদিরও তেমনি তাড়া। অবশেষে কাজকর্ম্ম ফেলে আমাকে আসতে হলো। তোমার পরীক্ষাও তো এসে পড়লো, কেমন তৈরি হলো?"

"ভালো না চন্দ্রদা, গোড়ায় না পড়ে শেষকালে আরম্ভ করলে যা হয়! কিছু মনে থাকছে না। ভালোও লাগে না। কত দিন আপনি এখানে থাক্‌বেন?"

"কত দিন আর! এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এসেছি। তার অর্দ্ধেক কেটে গেল। আছি আর দিন তিন্‌-চার।"

মিলি কহিল, "আপনার আবার ছুটি কিসের? আপনি তো কারো গোলামী করেন না!"

"আমি কাজের গোলাম মল্লিকা দেবি,—কর্ম্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে হয়।"

ফুলদানি হইতে একটা পাতা লইয়া মিলি নীরবে ছিঁড়িতে লাগিল।

এতক্ষণ মিলিকে আমি তেমন লক্ষ্য করি নাই। তরুণ বয়স্ক পুরুষের সামনে মিলি চিরকাল রহস্যময়ী, কৌতুকময়ী। তার বাক্‌-চাতুরী, হাব-ভাব, লীলা-মাধুরী উৎকর্ষ লাভ করে। সর্ব্বোপরি মিলির প্রসাধন—দেখিবার বস্তু। তাহা যেমন রুচিসম্মত, তেমনি মোহময়।

সাধারণতঃ মিলি রঙ্‌ ভালোবাসে। রঙীণ বসন-ভূষণে বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি সাজিয়া সে সকলের চোখ ঝল্‌সাইয়া দিতে ভালোবাসে। আজ মিলি শুভ্রবেশে দেহশ্রী বিকশিত করিয়াছে। জরি-পাড়ের সাদা শাড়ী, হীরার বালা, কুচা হীরার কণ্ঠী, খোঁপায় জড়ানো কুন্দকলির মালা। জ্ঞানে গর্ব্বে সমুজ্জল আয়ত চোখ, প্রীতিপ্রসন্ন-মুখ। কিন্তু এ প্রয়াস কাহার জন্য? নামের মত যিনি নির্লিপ্ত, উদাস, নারীর রূপে—নারীর প্রসাধনে তাঁহাকে কেহ বিচলিত—বিমোহিত করিতে পারে কি?

আমি বলিলাম, "চন্দ্রদা আপনার কর্ম্মক্ষেত্র আর ছুটি—ও-সব জানি না, আমার পরীক্ষার আগে আপনি যেমন এসে পড়েছেন, আপনাকে ক'দিন না খাটিয়ে ছাড়ছি না! সাহায্য করতে হবে। ভাই হওয়া মুখের কথা নয়। বোনের দাবী মেটাতে হয়।"

মিলি প্রশ্ন করিল, "আপনার কি ফিলজফি ছিল?"

চন্দ্রদা বলিলেন, "অতীতে ছিল, সবাই জানে! কিন্তু বর্ত্তমানে আমি

সে সব ভুলে গেছি। এখন আমাকে দার্শনিক বললে ভালো লাগে না। চাষা বললে খুশী হই। আমার কাছে পড়া তোমার নিরাপদ নয় করু, ফিলজফির বদলে আমি হয়তো তোমাকে কৃষিতত্ত্ব পড়িয়ে তোমার পড়া মাটী করে দেবো। নাহলে বোনের দাবী মেটানো ভাইয়ের কর্ত্তব্য, নিশ্চয় সত্যি যদি তোমার উপকার হয়, তা হলে বই নিয়ে এসো, উল্টে-পাল্টে দেখি, কিছু মনে আছে কি না ?"

"আপনার আবার মনে নেই! খুব আছে। এখনি আমি বই আন্‌ছি। আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন চন্দ্রদা! বলুন, কি খাবেন ? নিয়ে আসি।"

মিলির পানে চাহিয়া চন্দ্রদা বলিলেন, "এখন আমার পক্ষে খাওয়া কত দূর অসম্ভব, তার সাক্ষী আছেন এই ইনি। এঁর সাম্‌নে দিদির আদেশ পালন করে আস্‌ছি। আজ আর পারবো না করু,—আছি তো ক'দিন, খেলেই হবে। মল্লিকা দেবি, আপনি আমাকে আনতে গিয়ে স্বচক্ষে চাষা-ভূষোর খাওয়ার বহর তো দেখে এলেন!"

মিলি কহিল, "যত বলছেন, তেমন কিছু খাননি! আজ না খেলেন, কাল কিন্তু আমাদের এখানে আপনাকে খেতে হবে। চা খান না, চায়ের নেমন্তন্ন চলবে না। দুপুরবেলা ভাতের নেমন্তন্ন রইলো। মা বাড়ী নেই, মার প্রতিনিধিদের অনুরোধ রাখতে বোধ হয় আপনার আপত্তি হবে না ?"

"কি যে বলেন মল্লিকা দেবি! আপত্তি আবার কিসের ? আপনি বললেন, এই যথেষ্ট। ভাত-তরকারী বেশি করে রাঁধবেন। বাঙ্গালের খাওয়া, শেষকালে আপনাদের ফাঁকিতে না পড়তে হয়!"

"আমরা ফাঁকিতে পড়ি না, আপনারা যে আমাদের নাম দিয়েছেন অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণার অক্ষয় ভাণ্ডার!"

"মিলির কথার উত্তর-স্বরূপ চন্দ্রদা একটু হাসিলেন। হাসিয়া আমাকে বলিলেন, "তুমি এখানেই পড়বে ? না, তোমার পড়ার ঘরে যাবে ? শুধু শুধু সময় নষ্ট করো না।"

মিলি সবিনয়ে বলিল, "সবে তো সন্ধ্যে, এ সময় করু কোন দিন পড়ে না। আজ না হয় পড়ানো থাক্, আপনি তৈরী হয়ে আসেননি!"

সামান্য বিষয়ে প্রস্তুত-অপ্রস্তুতের কিছু নেই। দেখুন, আমার একটা বদ অভ্যাস আছে, কোন কাজের কথা উঠলে তা না করা পর্য্যন্ত কেমন সুস্থির

হতে পারি না। যা করবো মনে করি, তখনি সেটা করা চাই।” বলিতে বলিতে ব্যস্তসমস্ত ভাবে চন্দ্রদা আসন পরিত্যাগ করিলেন।

মিলি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষে যেন প্রদীপ জ্বলিতেছে!

মিলির চোখের এ আলো অভিনব! এ বিমুগ্ধ, বিহ্বল ভাব নূতন। মিলি পুরুষ-বিদ্বেষী, পুরুষের কাজে তাহার চোখে বিদ্রূপের জ্বালাই বিকীর্ণ করে চিরদিন, তাহাতে প্রেম-প্রীতি শ্রদ্ধার জ্যোতি কখনো দেখি নাই।

সেই মিলির সলজ্জ, শঙ্কিত, আবেশ-ভরা দৃষ্টি দেখিয়া মনে মনে খুশী হইলাম। হ্যাঁ, বিধাতার রূপ-সৃষ্টি মিথ্যা হয় নাই! যে প্রদীপ এত দিন পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদ করিয়া আসিতেছে, এত দিনে ঘন আবরণের অন্তরালে কি তাহার আত্মগোপনের সময় উপস্থিত হইল? চন্দ্রচূড়ের চন্দ্রকান্ত মূর্তি প্রথম-দর্শনেই আমার মনে মিলির কথা জাগিয়াছিল। ভগবানের পরিকল্পনার নিদর্শন এত শীঘ্র মিলিকে দেখাইতে পারিব, ভাবি নাই! কায়মনোবাক্যে আমার কামনা, মিলি জ্যোতি বাবুর হৃদয়কে সরস সজীব করিয়া তাঁহার গৃহ আলো করিয়া রাখুক নিজের দর্প তেজ বিসর্জ্জন দিয়া। নারীর এত গর্ব্ব-অহঙ্কার সাজে না! আশ্চর্য্য হইলাম, আমার অগোচরে এত তাড়াতাড়ি মিলি চন্দ্রদার সঙ্গে শুধু আলাপ করে নাই, শ্রদ্ধাও করিয়াছে।

তাহার পর আমরা তিনটি প্রাণী আমার পড়ার ক্ষুদ্র টেবিল ঘিরিয়া বসিলাম। চন্দ্রদা পাঠক, আমরা দুই বোন শ্রোতা। সুরু হইল নীরস দর্শন-শাস্ত্রের সুচারু ব্যাখ্যা, গভীর গবেষণা।

চন্দ্রদা বলিয়াছিলেন, তিনি সব ভুলিয়া গিয়াছেন। ভোলা যদি ইহার নাম, তবে স্মরণ রাখা কাহাকে বলে? মন দিয়া আমি তাঁহার পঠিত বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। মিলি অনিমেষ নয়নে তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত, উগ্র সুন্দর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

মিলি ইংরেজী সাহিত্যের অনুরাগিণী, দর্শনে তাহার আগ্রহ নাই। কিন্তু বক্তার প্রকাশ-ভঙ্গিমায় আজ সে যেন তন্ময়!

অনেক রাত্রে চন্দ্রদার বিদায়-কালে মিলি বলিল, “এবার পরীক্ষা হয়ে গেলে আবার আমি ফিলজফি নিয়ে এম-এ পড়বো। তখন কিন্তু দয়া করে আমায় সাহায্য করতে হবে।”

হাসিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, “বেশ তো, যখন আমাকে দরকার হবে, ডাকবেন।”

৩৫

রান্না-বান্নার হাঙ্গামা মিলি ভালোবাসিত না! দুইএকটা নূতন তরকারী রাঁধিবার উৎসাহে ক্বচিৎ কখনো সে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়াছে। ভোর হইতে না হইতে সেই মিলি আজ কোমরে কাপড় জড়াইয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে!

গৃহকর্ম্মে বিমুখ, সৌখীন-প্রকৃতির মেয়েটির এ আচরণে মাসিমা অনুযোগ করিতে লাগিলেন, "আজ তোমার হলো কি, মিলি! সকালে উঠেই কালি-ঝুলি, হাতা-বেড়ি নিয়ে রইলে যে। ঠাকুরকে বলে-কয়ে তুমি পড়তে যাও। পড়া কামাই করে হাঁড়িঠেলা—ও আমি ভালোবাসি না!"

মিলি ঝঙ্কার দিল, "দিন-রাত বই মুখস্থ আমার ভালো লাগে না। বিদ্যার মধ্যে তো ঐ নিয়েই শুধু আছি। মেয়ে-জন্ম নিয়ে রান্না জানি না, লজ্জার কথা! আজ থেকে আমি রান্না শিখবো! এক জন ভদ্রলোককে খেতে বলেছি—তিনি মাছ-মাংস খান না, এ দিক্‌টা তো দেখতে হয় মা! রান্না আর খাওয়ানো-দাওয়ানোর পাট করু নেয় বলেই না নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়! এখন করুর সময় আমি নষ্ট হতে দিতে পারবো না।"

মেয়ের কর্ত্তব্যবোধে মা বিরক্ত হইলেন। আমিও আশ্চর্য্য হইলাম। অতিথি-অভ্যাগতদের চিত্তবিভ্রমের জন্য মিলি এতকাল সাজ-সজ্জাই করিয়া আসিয়াছে! রাঙা ঠোঁট আরো রাঙাইয়া হাসির তীর নিক্ষেপ করিয়াছে! বাছা বাছা সরস বাক্য কণ্ঠে জমাইয়া রসানায় শাণ দিয়াছে! ভূষণের ঝিকি-মিকি, বসনের ঝল-মল, নয়নের কটাক্ষ ছাড়া মিলির যে কাহারো জন্য করিবার কিছু আছে, তাহা জানিতাম না! এখন আর বেশী জানিবার অবকাশ ছিল না। চন্দ্রদা কতকগুলি লিখিতে দিয়াছিলেন, তাহা লইয়া বসিলাম। কোথা দিয়া যে শীতের স্বল্পায়ু বেলা মধ্যাহ্নের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, জানিতে পারিলাম না।

অকস্মাৎ চন্দ্রদার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আমার ধ্যান ভাঙ্গিল। খাবারঘরে ঢুকিয়া দেখি, চন্দ্রদা আর ভানু পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছে! মাসিমা বেতের মোড়ায় সমাসীন। প্রীতি-প্রফুল্ল হাস্যে মিলি পরিবেশন করিতেছে!

ভাত মাখিতে মাখিতে চন্দ্রদা বলিলেন, "বেলা ঢের হয়েছে, আপনারা সকলে খেতে বসুন, আর দেরী করবেন না।"

মিলির দিকে তাকাইয়া মাসিমা হুকুম দিলেন, "করুকে নিয়ে তুমি বসে

যাও মিলি। ঠাকুর দেওয়া-থোওয়া করুক। আমার আজ ভাত খাওয়া নেই, একাদশী। তোমাদের হয়ে গেলে জল খাবো।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া মিলি বলিল, "না, তা হয় না। আপনি ব্যস্ত হবেন না, চন্দ্র বাবু! ছুটির দিনে আমরা বেলাতেই খাই। বেলাও বেশী হয়নি। আপনাদের আগে হোক।"

"আমাদের হবে কেন? একসঙ্গে বসতে আপনাদের আপত্তি আছে না কি? আপনারা কারো সামনে খেতে ভালোবাসেন না বুঝি?"

"তা নয়, তবে একসঙ্গে বস্‌লে খাওয়ানোর আনন্দ পাওয়া যায় না। খায় তো মানুষ নিত্যই—তাতে রস নেই! কিন্তু খাওয়ানো দৈবাৎ,—কাজেই তাতে আনন্দ প্রচুর!" বলিয়া মিলি মোচার গরম 'চপ' আনিতে গেল।

মাসিমা বিদেশের গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। একাধিক লোকের কাছে একাধিক বার বিদেশের বার্ত্তা বলিয়া মাসিমা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। সুযোগ পাইয়া পুনরায় তিনি পুরাতন কথা বলিতে সুরু করিলেন।

নানা দেশের নানা আলোচনার মধ্য দিয়া আমাদের দ্বিপ্রহরের ভোজন-পর্ব্ব মিটিল।

আহারান্তে যাইবার সময় চন্দ্রদা বলিলেন—"সন্ধ্যার সময় আবার আসবো করু। যে দু'টো দিন আছি আবোল-তাবোল বকা যাবে, তাতে তোমার উপকার হোক্, আর নাই হোক্! কাছাকাছি থাক্‌লে তোমার পড়ার সঙ্গী হতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়।"

মিলি বলিল, "হবার নয় কেন? ইচ্ছা করলেই আপনি করুকে সাহায্য করতে পারেন।"

"কেমন করে পারি মল্লিকা দেবি? আমি যে রাজ্যের কাজ নিয়ে পড়েছি। ইচ্ছা থাক্‌লেও বেশী দিন কোথাও থাক্‌বার উপায় নেই। থাক্‌তে পারলে বোনের সঙ্গে আবার ভুলে-যাওয়া বিদ্যার অনুশীলন করতাম।"

কাহারো নিকট হইতে কোন প্রকার উপকার লইতে মাসিমার বাধে—সে কাজ তাঁর নীতিবিরুদ্ধ। সহানুভূতি বা দয়া-দাক্ষিণ্যে তাঁহার গর্ব্বকে আহত করে। মাসিমা মহা রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যাঁর এখানে থাক্‌বার উপায় নেই, কেন তাঁকে বিরক্ত করছো মিলি? আমি তো আগেই টিউটরের কথা বলেছিলাম, করু বারণ করলে বলেই শুধু ঠিক করি নি। প্রোফেসরের কাছে পড়ার দরকার বোধ করলে সে ব্যবস্থা আমি করবো,—লোকের অভাব কি!"

"অভাবের কথা হচ্ছে না মা! তুমি তো জানো, করু কক্‌খনো তোমার পয়সা খরচ করতে চায় না। 'প্রোফেসর' রাখবার মত অবস্থা ওদের নয়। আপনার লোকের কাছ থেকে ও যদি একটু স্থবিধা পায়, কেন তা নেবে না? তোমার-আমার জন্য বলছি নে চন্দ্র বাবুকে, বলছি ওঁর বোনের জন্য। শুনি, সকলের উপকার করে বেড়ানোই ওঁর কাজ। এত যিনি করেন, তাঁর কি উচিত নয় বোনের উপকার করা?"

"আপনি ঠিক বলেছেন মল্লিকা দেবি! ভাই হয়ে বোনের কোন কাজে না লাগলে চলবে কেন? কাল গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে আবার আমি ফিরে আসবো। ওর পরীক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত দুই-এক বার আসা-যাওয়া করলে আমার সব দিক্‌ বজায় থাকবে।"

মিলির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইল।

কুণ্ঠার সহিত আমি কহিলাম, "আপনার কত কাজ চন্দ্রদা, কাজের ক্ষতি করে কেন কষ্ট সইবেন আপনি? আমি নিজে-নিজেই পড়ে নেবো। ফল যা হবার, হবে!"

"আমি পড়ালেই যে ফল ভালো হবে, সে আশা আমি করি না করু, তবু চেষ্টা করবো। দাদা বলে স্বীকার করেছো—দাদার একটা কর্ত্তব্য আছে—সে কথা ভুলো না বোন।"

চন্দ্রদা সস্নেহে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মাসিমা সরিয়া গেলে মিলির উপর আমি খুব একচোট ঝাল ঝাড়িলাম। বলিলাম, "তোর এমন করে বলা অন্যায় মিলি। মাসিমার টাকা নেবো না, এমন কথা আমি কখনো বলিনি! শুধু শুধু অপব্যয় হবে, এই মনে করেই বারণ করেছিলাম। মাসিমা রাগ করলেন। তাঁর টাকা বাঁচিয়ে যাঁর কাছ থেকে অনুগ্রহ নেবার ব্যবস্থা হলো, তিনি আমার মাসিমার চেয়ে বেশী আপন-জন নন, নিশ্চয়! ছি ছি, আমার লজ্জা করছে। কি দরকার ছিল তোর এত কাণ্ড করবার?"

কিছু না বলিয়া আমার খোলা চুলে একটা টান দিয়া মিলি মনের খেয়ালে কীর্ত্তন ধরিল—

"সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম!
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ!"

৩৬

পরের দিন চন্দ্রদা চলিয়া গেলেন। আবার আসিয়া আবার গেলেন। তাঁহার এই আনা-গোনার মধ্যে আমার পরীক্ষার দিন আসন্ন হইল। বাহিরের সহিত আমার যোগাযোগ ক্রমে বিলীন হইয়া আসিল! চন্দ্রদা পড়ান্, আমি শুনিয়া বুঝিয়া লই। মিলি আমার পাশে নিঃশব্দে ছায়ার মত বসিয়া থাকে। চন্দ্রদার আসিতে দেরী হইলে সে গিয়া তাঁহার বাড়ী হইতে তাঁহাকে ধরিয়া আনে! তাহাকে সন্দেহ করিবার সময় আমার হয় না। তেমন লক্ষ্যও করিতে পারি না। তবু মনে হয়, মিলির মধ্যে কি যেন একটা ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপার চলিতেছে। বিদ্যুৎ ও ঝটিকার রঙ্গভূমিতে স্নিগ্ধ-শীতল বারিবিন্দুর আভাস ক্ষণে সূচিত হইয়া ক্ষণে মিলাইয়া যায়।

চন্দ্রদার সঙ্গে মিলি অবাধে মেশে, সাগ্রহে বাক্যালাপ করে, কিন্তু তাহার মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লেশও আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চন্দ্রদার আলোচ্য বিষয়ের প্রত্যুত্তরে মিলির কণ্ঠে শ্রদ্ধা-মিশ্রিত বিশ্বাসের সুর ধ্বনিয়া ওঠে।

এক দিন নিভৃতে মিলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "চন্দ্রদাকে তোর কেমন লাগছে মিলি,—কৈ, তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলছিস্ না কেন? চিরকাল তুই পুরুষের নিন্দায় পঞ্চমুখ, এবার নিয়ম-ভঙ্গ হলো কিসে?"

আমার প্রশ্ন এড়াইয়া মিলি আবৃত্তি করিতে লাগিল :—

"চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি,—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।"

রাগিয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু রাগই করি, আর বিরক্তই হই, মিলির প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। চন্দ্রদাকে সত্যই আমার প্রয়োজন ছিল। মিলি এমন সংযোগ না করিয়া দিলে আমি চন্দ্রদার নাগাল পাইতাম না। দিতে পারি কি না জানি না, লইবার ক্ষমতা আমার নাই!

দিন যায়,—অবশেষে আমার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিলাম।

সে-দিন পরীক্ষার গুরু-ভার নামাইয়া হাল্কা মনে বাড়ী ফিরিয়া দেখি, বহু দিনের পর আবার আমাদের পুরাতন সভা বসিয়াছে। দিদি আসিয়াছেন, জ্যোতি বাবু আসিয়াছেন,—সে সভায় চন্দ্রদাও উপস্থিত।

কথা ছিল, আজ রাত্রের গাড়ীতে চন্দ্রদা দেশে যাইবেন। দিদির ব্যবস্থায় আগামী কাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে থাকিয়া যাইতে হইবে! কাল সন্ধ্যায় দিদি আমাদের সকলকে খাইতে বলিয়াছেন। বাবা আমাকে অনতিবিলম্বে রওনা হইতে লিখিয়াছেন। প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, এখন ঝড়ের পাখীর নীড়ে ফিরিবার পালা।

দিদির প্রস্তাবে মাসিমা বলিলেন, "বেশ তো, ওরা যাবে। তবে ভানুর না যাওয়াই উচিত। ভারী অমনোযোগী ছেলে—একটা কিছু ছুতো পেলে বই আর ছুঁতে চায় না!"

দিদি কহিলেন, "ছেলে-মানুষদের স্বভাবই অম্‌নি! তা হোক্—তবু ভানু যাবে। আপনি সকলকে নিয়ে যাবেন। খাওয়া নামের, আসল হচ্ছে, সকলে একত্র হয়ে একটু আমোদ করা। চন্দ্রচূড় ভাইটিও একবার পালালে ওকে আবার ধরা মুস্কিল। করুও থাকবে না,—আবার কতকালে ওদের পাবো, কে জানে?"

মাসিমা বলিলেন, "তা ঠিক। এখন মিলিরও তৈরী হবার সময় হয়ে এলো। 'জুলাই'-য়ে ওর পরীক্ষা। মাঝখানে শুধু দু'টো মাস—মিলি এবার কিচ্ছু পড়্‌ছে না!"

"না পড়ুক মাসিমা, না পড়েই ও যা ফল করবে, অন্যে হাজার পড়েও ওর সমান হতে পারবে না। শ্রাবণের প্রথমে পরীক্ষা,—মা'র ইচ্ছা শেষের দিকে যেন দিন হয়! শ্রাবণে না হলে ভাদ্র আশ্বিন, কার্ত্তিক—ক' মাস আর বিয়ে হবে না। অগ্রহায়ণে আবার জ্যোতির জন্ম-মাস,—ও-মাসে মা বিয়ে দেবেন না। তারপর সেই মাঘ-ফাল্গুন—সে অনেক দিনের ধাক্কা। মার শরীরও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না বলে আমাদের ইচ্ছা, শ্রাবণেই দিন হোক্,—এতে আপনার বোধ হয় অমত হবে না!"

"না, আমার অমত কিসের? বিয়ে দিয়ে আমিও বেরিয়ে পড়তে চাই। কাল তোমার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা হবে।"

আমি জ্যোতি বাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি অনিমেষ নয়নে মিলিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, মিলির মুখ কিন্তু আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন!

চন্দ্রদা সোৎসাহে কহিলেন, "শুভস্য শীঘ্রং! শ্রাবণেই আইবুড়ো-নাম ঘুচিয়ে ইতর জনদের মিষ্টান্ন বিতরণ করো জ্যোতি! জ্যাঠাইমার শরীর ভালো নয়, দেরী করা উচিত নয়।"

চন্দ্রদার কথা শেষ হইতে না হইতে মিলি দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করিয়া চন্দ্রদাকে আক্রমণ করিল। বলিল, "উচিত-অনুচিত নিয়ে আপনার এত মাথা-ব্যথা কেন বলুন তো ? এতই যদি সখ, তবে আগে নিজের আইবুড়ো-নাম ঘোচান তো দেখি ! নিজের বেলায় দিব্যি আঁটিসুটি থেকে অন্যের পায়ে শেকল পরানোর জন্য এত উৎসাহ কেন ?"

এ আক্রোশের মর্ম্ম বেচারা চন্দ্রদা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিলেন।

দিদির হাসি-মুখ পলকে শ্রীহীন, পাণ্ডুর হইয়া গেল।

আশ্চর্য্যের বিষয়, মিলির এ উত্তাপ সর্ব্বাপেক্ষা যাঁহার লাগিবার কথা, তিনি লেশমাত্র বিচলিত হইলেন না।

আদুরে মেয়ের অর্থহীন আব্দারের মত মিলির ঝাঁজ হাসির বাতাসে উড়াইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু কহিলেন, "কারো অনিচ্ছায় কেউ কাকেও শেকল পরাতে পারে না, মিস গুপ্ত ! চন্দরের উৎসাহ বেশি, ওর পালাটাই আগে শেষ করা যাক, কি বলো দিদি ! তুমি উঠে-পড়ে লেগে যাও ভোজের জোগাড়ে। করবী দেবীর উপর ভার দেওয়া হোক, কনে-নির্ব্বাচনের। আমি কাজের লোক না হলেও একেবারে অকেজো নই, আমি খাট্‌বো তোমাদের ফাই-ফরমাশ !"

জ্যোতি বাবুর হাল্‌কা পরিহাসে দিদি আশ্বস্ত হইলেন, কহিলেন, "এর বাড়া আনন্দের আর কি আছে জ্যোতি ! চন্দরকে ধরে-বেঁধে সংসারে না ঢোকালে ওর সঙ্গে পারা যাবে না। তোরা ছেলেবেলাকার খেলার সাথী, সব কাজে সাথী হয়ে চলবি,—দেখে আমাদেরো চোখ জুড়োবে। এখনো সময় আছে, এর মধ্যে আমি ভালো মেয়ে খুঁজে বের করতে পারবো ! তার পর শ্রাবণের শেষের দিকে দু'টি শুভ কাজ শেষ করা যাবে।"

চন্দ্রদা অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে মাথা চুলকাইয়া কাশিয়া ঘাড় নাড়িলেন। "দোহাই তোমাদের দিদি, আমাকে রেহাই দাও। আমি এখন বিয়ে করতে পারবো না, তার সময়ও নেই। ভেবে-চিন্তে পরে তোমাদের জানাবো।"

জ্যোতি বাবু কহিলেন, এতে "ভাববার কিছু নেই চন্দর ! বিয়ের ব্যাপারে বেশি ভাবতে গেলে অনেক সমস্যা এসে দেখা দেয়। না ভেবে চটপট ও-কাজ সেরে ফেলাই সঙ্গত। তোমার কাজে এক জন সহকর্ম্মীও তো চাই। একের বদলে দোসর পেলে সব কাজের সুবিধা হয়। আর তোমাদের মত এমন সব ছেলেরা যদি সন্ন্যান-ব্রত নিয়ে থাকতে চাও, তা হলে সমাজ চলে না,

সংসারও চলে না। তুমি বাপ-মা'র প্রথম সন্তান—তোমার ওপর তাঁদের কতখানি আশা-ভরসা! শ্রাবণেই তোমার বিয়ে ঠিক থাকলো। মিথ্যা ওজর দেখিয়ো না ভাই।"

হাত-জোড় করিয়া চন্দ্রদা নীরবে মাথা নাড়িলেন।

স্পষ্ট স্বরে মাসিমা বলিয়া উঠিলেন, "এ যে তোমাদের জুলুম জ্যোতি, এক জনের মতের বিরুদ্ধে তোমাদের মত চালাবার এ চেষ্টা অন্যায়! সবাইকেই যে বিয়ে করতে হবে, তার কোনো মানে নেই!"

"অন্যের তাতে মানে নেই আর যত মানে আমার বেলায়? আমার মাথার উপর পরীক্ষা, এ সময় বিয়ে, বিয়ের দিন বল্‌তে তোমাদের বাধে না? সকলেরই ইচ্ছা-অনিচ্ছা আছে, আমার নিজের বুঝি তা থাকতে নেই? বিয়ে আমি করবো না,—করতে পারবো না। আমাকে তোমরা মুক্তি দাও।" —বলিতে বলিতে চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া মিলি উঠিয়া গেল।

মিলির ভাবান্তর যেমন আকস্মিক, তেমনি অভাবনীয়! কেহই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সকলে সচমকে মিলির পথের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

মিলির এই অহেতুক অশ্রু-বর্ষণ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। তাহার অশ্রু-সূচনায় মাসিমা বিমনা হইলেন। মিলির চক্ষে চিরদিন আমরা বিদ্যুৎই দেখিয়াছি! এ বর্ষার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নাই। মেয়ের স্বভাবের সহিত মাসিমার পরিচয় বাকী ছিল না। ছাত্রী-মহলে মাসিমার তেজস্বিতার খ্যাতি থাকিলেও মিলির কাছে তাহা মূল্যহীন। মেয়ের সংকল্প প্রতি পদে মা'র সংকল্পকে পরাভূত করিয়া রাখে।

সম্মুখে ভাবী জামাতা, ভাবী কুটুম্বিনী,—নিজেকে সামলাইয়া লইতে মাসিমার বিলম্ব হইল না। একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন, "মেয়ে লেখাপড়ায় ভালো হলে কি হবে, বড্ড ছেলে-মানুষ, পড়ার চাপে ওর মেজাজ ভালো নেই! তা আমি বলি কি, এখন দিনের কথা তুলে কাজ নেই। ভালোয়-ভালোয় পরীক্ষা হয়ে যাক্, তার পর যা হয় করা যাবে। ওর পরীক্ষার দিক্‌টাও তো আমাদের দেখতে হবে।"

"তা দেখতে হবে বৈ কি, মাসিমা। কিন্তু এর জন্য কান্নাকাটি, বিয়ে করবো না,—এ সব আমার ভালো লাগে না। মিলি যত ভালো হোক, আমার ভাইও ফেলনা নয়, তারো মান-সম্ভ্রম আছে। মার কাণে এ সব কথা গেলে তিনি কি ভাববেন, বলুন তো?"

"এ সব তুচ্ছ কথা তাঁর কানে যাবেই বা কেন? তাছাড়া ছেলে-মানুষের ছেলেমী কেন তোমরা ধরছো? আগে ওর পরীক্ষা হোক্, তার পরে দেখে নিয়ো, সব ঠিক হয়ে যাবে। জ্যোতি ফেলনা হবে কেন,—ভালো বলেই দশ জনের মধ্য থেকে না আমি ওকে বেছে রেখেছি!"

মাসিমার আশ্বাসেও দিদির প্রশান্ত আননের বিষণ্ণতা আজ তিরোহিত হইল না।

জ্যোতি বাবুর অধরে কিন্তু চাপা হাসি খেলিতে লাগিল।

৩৭

আমাদের আসর যেমন জমিয়া উঠিয়াছিল, মিলির প্রস্থানের পর তেমনি তাহা ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

মিলিকে ডাকিতে গিয়া রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখ হইতে আমি ফিরিয়া আসিলাম। মিলি সাড়া দিল না, দরজা খুলিল না।

নারী-চরিত্রে অনভিজ্ঞ চন্দ্রদা বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "ওঁর হলো কি? অমন করে চলে গেলেন কেন? শ্রাবণ মাসে বিয়ে যদি না করতে চান, বেশ তো, দিন পিছিয়ে দিলেই হবে।"

মাসিমা বলিলেন, "আমিও তাই বল্‌ছি।"

দিদি কোন কথা কহিলেন না। চন্দ্রদা চিন্তান্বিত ভাবে চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে লাগিলেন।

সহসা চন্দ্রদার পিঠে একটা চপেটাঘাত করিয়া জ্যোতি বাবু ডাকিলেন, "জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছো না কি চন্দর? চলো, 'লেক' ঘুরে বাড়ী ফেরা যাক্। দিদি, তুমি বসবে? না, বেড়াতে যাবে?"

"রাত হয়ে গেছে, আর বসবো না, বাড়ী যাবো। আমাকে নামিয়ে দিয়ে তোরা বেড়াতে যা।"

দিদি উঠিয়া মাসিমার নিকটে নিমন্ত্রণের পুনরাবৃত্তি করিয়া বিদায় লইলেন।

শ্রান্ত দেহে আমি বিছানায় লুটাইয়া পড়িলাম। অবসাদে আমার চোখ বুজিয়া আসিল। জলযোগের সময় মিলি আমাকে রাত্রের মত খাইতে দিয়াছিল, কাজেই আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হইল না।

* * *

"করু, ও করু,—মা গো, এ যে কুম্ভকর্ণের ঘুম! এক-রাতে কি হবে?

দিনে-রাতে পুষিয়ে নিতে হবে। উঠে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নে। খেয়ে-দেয়ে আবার না হয় ঘুমোস্!"

মিলির আহ্বানে আমার সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখি, বেলা হইয়াছে, রবিকরোজ্জ্বল ধরণীর চতুর্দ্দিকে কাজের সাড়া পড়িয়াছে। আমার বিছানার অনেকটায় প্রভাতের রৌদ্র ঝক্‌মক্ করিতেছে! সত্যই আমি কুম্ভকর্ণ হইয়াছি! এমন গভীর ঘুম আর কখনো ঘুমাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না!

লজ্জিত হইয়া কহিলাম, "আমি যেন মরে ছিলাম, মিলি! তুই আমায় আগে ডাকিস্‌নি কেন? ছি, ছি, মাসিমা কি ভাবছেন! তাঁর চা খাওয়া হয়ে গেছে? আজ চাটুকু তৈরি করে দিতে পারলুম না?"

"এক দিন পারিস্‌নি, তাতে কি হয়েছে? মাসীর বাড়ীতে এমন দাসত্ব করা আমি জন্মে দেখিনি করু! মা আবার ভাববেন কি? পরিশ্রমের পরে ক্লান্তি আসে, এ তাঁর জানা আছে। নে, চট্ করে মুখ ধুয়ে আয়, আমি তোর চা করে দিই।"

"তুই কেন করবি, বেয়ারাকে বলে দে।"

"আমাদের চা তো কোন দিন বেয়ারাকে করতে দিস্‌না। নিজের হাতে চা তৈরী করে দিয়ে আস্‌ছিস। এত সেবা-যত্ন আর কে করবে? আমরা কেবল তোর কাছ থেকে আদায়ই করছি। এবার নেয়া-দেয়া ফুরিয়ে এলো, করু! যে দু'টো দিন আছিস্, আমার কাছ থেকে কিছু নে।"

আমি চমকিত হইলাম! মিলির কণ্ঠে এমন করুণ স্বর এত দিন কোথায় ছিল? এ উচ্ছ্বাস তাহার ধাতের বাহিরে। মিলি কাহাকেও নরম করিয়া কিছু বলিতে পারে না, হৃদয়ের কোমল ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে চাহে না! তাহার মনের গহনে পাপিয়া, পিক, চন্দনার মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হয় কি না, জানি না! সাধারণতঃ সে কলভাষিণী, মুখরা সারিকা! সেই সারিকা আজ শ্যামার কূজন কোথায় শিখিল? যেখানেই শিখুক, আমার হৃদয় বিগলিত হইল। মনে পড়িল, এখানে আমার কাজ ফুরাইয়াছে। শান্ত সুন্দর সংযত পাঠ্য-জীবনের সমাপ্তি হইয়াছে। মিলির সহিত আমার অবিচ্ছিন্ন মিলনে বিচ্ছেদ আসিয়াছে!

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিলির একখানি হাত আমি চাপিয়া ধরিলাম।

আমার বালিসে হেলান দিয়া মিলি বলিল, "কি দুষ্টু মেয়ে! নিজেও

উঠবি না, আমাকেও উঠতে দিবি না! একা পড়ে থেকে তৃপ্তি হচ্ছে না, দোসর চাই? না বাপু, আমি এখন তোমার কাছে শুতে পারবো না, এই দণ্ডে স্নান করে এসেছি। ভিজে চুল শপ্-শপ্ করছে। ছোট বোনকে শয্যাসঙ্গী না করে শীগ্গির বিয়ে করে ফেল্ কল্প, বি-এ হলে বিয়ে করতে হয়।"

"নিশ্চয়! আর তার ব্যতিক্রমে মর্মাহত হয়েছি। বছর দুই আগে তোর যা করণীয় ছিল, তার স্বপ্ন অন্যকে দেখাচ্ছিস্ কেন?"

"আগে নিজের পালা সাঙ্গ কর্, তার পর পরের বিধান করিস?"

"করতে চেয়েছিলাম, তুই হতে দিস্নি। বড়র না হলে ছোটর বিয়ে শাস্ত্রে বাধে। এবার তুই তাড়াতাড়ি সেরে নে, আমি বরণডালা সাজাই!"

"বরণডালা যত সহজ, বর তত সহজ নয় মিলি! আমাদের মতন ধেড়ে মেয়ের বর জোটানো আকাশ-কুসুম। আকাশ-কুসুমের দুরাশায় আমি বরং কয়েক দিন জিরিয়ে নিই। তোর যখন বসন্ত 'জাগ্রত দ্বারে,' তুই তাকে বারেবারে ফিরিয়ে দিস্নে। বড় অনুমতি দিলে আটকায় না রে, আমি তোকে অনুমতি দিলুম। আমরা দিন-ক্ষণ স্থির করতে বস্লে তুই কিন্তু 'গোসা-ঘরে' বসে খিল দিতে পারবি নে!"

"সাধে খিল দিই? বড়র অব্যবস্থায় মনের দুঃখে দোরে খিল দিতে হয়। জ্যেষ্ঠার অনুমতি তো সব নয়, কনিষ্ঠারো কর্ত্তব্য আছে। হাতের কাছে যখন একটি মিলেছে, তখন সেটি বড়র প্রাপ্য হোক্। ছোটর ভাগ্যে নিতান্ত না মিললে দিদির প্রসাদ-স্বরূপ—"

আমি মিলির মুখ চাপিয়া ধরিলাম। হোক উপহাস, তবু মিলি এ বলে কি? বাধা না পাইলে মুখরার মুখের আগল খুলিয়া যাইবে! যাহা আমার ইষ্ট-মন্ত্রের ন্যায় গোপনীয়, তাহার এতটুকু আভাসও আমি সহিতে পারিব না! ইহা আমার—কবির ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

"লুকানো বিশাদ আঁধার অমায় মৃদুভাতি স্নিগ্ধ তারার মত,
সারাটি রজনী নীরবে নীরবে ঢালে সুমধুর বেদনা কত।"

মিলিকে আর একটি কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রায় ছুটিয়া আমি স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিলাম। কলের জলের ঝর-ঝর শব্দের সহিত মিশিয়া মিলির দূরাগত মধুর স্বর আমাকে উন্মনা করিয়া তুলিল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

মিলির গান শুনিতে শুনিতে আমি মনে মনে বলিলাম, 'ওগো গরবিনী সুন্দরী, তুমি বৈষ্ণব-পদাবলী গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতে পারো, কিন্তু তোমার কণ্ঠের ভাষণ প্রাণের নয়। হৃদয়ের তারের সঙ্গে তোমার স্বরের মিল নাই! থাকিলে ও-গান গাহিতে গাহিতে তুমি কাঁদিতে! হাসিতে পারিতে না! হাসিয়া লও সুহাসিনী, তোমার জীবন হাসির জীবন! কাঁদিবার জীবন পৃথক, তুমি তাহা জানো না। জগতের প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা লুণ্ঠন করিয়া তোমার ভাণ্ডার তুমি পূর্ণ করিয়া রাখো, অক্ষয় করিয়া রাখো! তোমার ও কৃপণ হস্ত হইতে করুণার এক কণাও তুমি বিতরণ করিয়ো না!'

৩৮

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, বিছানায় শুইয়া মাসিক-পত্রের ছবি দেখিতেছি, মিলি আসিয়া আপন-মনে আরম্ভ করিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
এক-সুরে বাঁধা এক-মন্ত্রে সাধা বাজিয়া উঠেছে যুগল প্রাণ।
হৃদয়ের ভাষা হিয়ার পিয়াসা, শুনিতে বুঝিতে পারে কি পরে!
কি জানি কি কয় নীরবে মলয় যুথিকা-কলিকে হরষ-ভরে!
সে অফুট কথা, নীরব ব্যথা জানে শুধু ওই কুহকী বাঁশী—
বাঁশীর সুস্বরে ভাসি ওঠে ধীরে, কত আঁখি-ধারা হাসির রাশি!"

ছবি রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও আবার কি মিলি? সারা দুপুর ওই কাজ হয়েছে না কি? আমার হাতে কাগজখানা দে তো, পড়ে দেখি।"

উত্তর না দিয়া মিলি তেমনি নত-নেত্রে পড়িতে লাগিল,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি কোমলে মিলায় মধুর তান,
ও অধীর ধ্বনি শুধু প্রতিধ্বনি, তরুণ প্রাণের করুণ গান।
ডাকিছে বাঁশরী, আয় কুলনারী, উছলে দু'হৃদি উথলে কূল,
আয় রে যতনে দু'কূল বাঁধনে বেঁধে দিতে দু'টি প্রাণের মূল।
থেকো নিরমল দুইটি কমল, পবিত্র প্রেমের হারেতে বাঁধা,
বাঁশীর নিক্কণে দুইটি পরাণে উঠুক সুচির প্রণয়-গাথা।"

বিছানা ছাড়িয়া মিলির হাত হইতে খাতার পাতাখানা কাড়িয়া লইলাম। হাতের লেখা মিলির নয়। বলিলাম, "এ তো তোর লেখা নয়! কার লেখা? কোথা থেকে আন্‌লি?"

মিলি কহিল, "আমার মাষ্টার-মশায় ললিত বাবু এসেছিলেন ; তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিলাম। উনি স্বভাব-কবি, ভেবে-চিন্তে উনি লেখেন না। কলম নিয়ে বসলেই হলো! বল্‌লাম, রুরুর বিয়েতে জরির সুতো দিয়ে মখমলের ওপর আমি একটা স্মরণ-চিহ্ন সেলাই করে দিতে চাই। বলবা মাত্র কল্পতরু মাষ্টার-মশায়ের কলমের ডগা থেকে খস্‌-খস্‌ করে এটা বেরিয়ে এলো। হাতে সময় রেখে সেলাই করতে হয়। চার-দিকে লতার বর্ডার দিয়ে মাঝখানে এতগুলি অক্ষর লিখতে সময় বড় কম লাগবে না! এটিতে সুর দিয়ে গাইবো, ইচ্ছা আছে। ভাবছি, তুই কীর্ত্তন ভালোবাসিস্‌, কীর্ত্তনের সুরই দেবো। ভালোবাসিস্‌ বলেই না আজ-কাল তোকে আমি কীর্ত্তন শোনাই। এর কথাগুলিতে বেশ কীর্ত্তনের টান রয়েছে,—

"বাজুক মুরলী সমীরে আকুলি, কোমলে মিলায় মধুর তান।"

মিলির পাগলামিতে রাগ করিব, কি হাসিব, ভাবিয়া পাইলাম না। সময়-সময় ও যেন সত্যই প্রহেলিকা হইয়া উঠে! মিলিকে জানিবার শক্তি আমি হারাইয়া ফেলি! আজ যেন মিলি আমাকে জ্বালাতন করিবার সংকল্প লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইয়াছে। প্রভাতে যাহার সূচনা হইয়াছিল, অপরাহ্নেও তাহার নিবৃত্তির আশা নাই বুঝিয়া বিরক্ত হইয়া আমি কহিলাম, "মাপ কর মিলি, আর আমায় ত্যক্ত করিস্‌ নে। মন দিয়ে শুনে রাখ্‌, বিয়ে আমি কখ্‌খনো করবো না। আমার মিলন-বাসরে কাকেও মিলন-গীত গাইতে হবে না! যদি মরণ বাসরে কিছু দেবার থাকে, তাহলে বরং দিস্‌। এ জন্মের মত আমার মিলন শেষ। এক আশা, তোদের মিলনে গান গাইবো, তোরা সুখী হলেই আমি সুখী হবো। এ ছাড়া আমার জন্য কামনা নেই।"

"তোর কামনা নেই, আর আমারি আছে রুরু? তোর ছল্‌-ছল্‌ চোখের আমি ধার ধারিনে আর। এত দিন চুপ করেই ছিলাম, আজ আমার বলবার দিন এসেছে। তুই কি জানিস্‌ না, বর্ণচোরা আমের উপরে রং না ধরলেও ভিতরের রংএর খবর কারো অজানা থাকে না। তোকে যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে, তার সঙ্গেও ছলনা! ছি রুরু, ভুলেও তুই আমাকে আপনার ভাবতে পারলি নে!"

মুহূর্ত্তে আমি বিচলিত হইলাম। এই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী প্রতিভাময়ী তরুণীর কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে আমি বিহ্বল হইলাম। অশান্ত হৃদয়কে শান্ত করিতে আমার খানিকটা সময় লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে কহিলাম, "তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে মিলি? কি তোকে গোপন করলাম? কিসেরই বা ছলনা? তুই যা-তা বলিস, আমি বারণ করি বলেই না এত কথার সৃষ্টি। আর বারণ করবো না, তোর যা খুশী তুই বল—হলো তো? এদিকে বাজে বকছিস্, ওদিকে বেলা যে গেল, সে-জ্ঞান আছে? নেমন্তন্ন যেতে হবে না? মাসিমা এখনি তাড়া দেবেন, তোর আবার তৈরি হতে দেরী হয়।"

"দেরীর ভয় নেই! তুই যা চাপা দিতে চাইছিস্, আমি তা চেপে গেলাম। শোন্ করু, আজ আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে। চিরকাল তোর পছন্দ-মত তুই সাজ করিস্, আজ কিন্তু আমি তোকে সাজিয়ে দেবো। নিজের রুচিতে খাওয়া, পরের রুচিতে পরা,—এক দিনের জন্য শুধু এ নীতি মেনে নে!"

নিষ্কৃতির সহজ উপায় বুঝিয়া আমার বুকের পাথর যেন নামিয়া গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, "এ নীতি মেনে নিলাম মিলি, তবে আমার মিনতি, বাড়াবাড়ি করিস্ নে। বেশী সেজে বেরুতে আমার লজ্জা করে। আমার সাজের আছেই বা কি? আমার মতে পরের হাতে মানুষের সাজের দিন জীবনে দু'টো,—এক বিয়েয়, আর শেষের দিন।"

"বেশ, আমি কথা দিলাম, তোর বিয়ের দিনে আমি সাজিয়ে দেবো আর তুই আমাকে সাজিয়ে দিবি মরণের পর শ্মশান-যাত্রার সাজে।"

ব্যথিত হইয়া আমি ডাকিলাম,—"মিলি!"

মিলি হাসিল, "এতে চোখ-রাঙ্গানোর কিছু নেই করু। জন্ম যখন নিয়েছি, তখন এক দিন না এক দিন সে-দিন আসবে। চল্, কাপড় ছাড়বার ঘরে যাই। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে, মা রাগ করবেন।"

নির্বিবাদে মিলির হাতে নিজেকে আমি সমর্পণ করিলাম।

নানা উপকরণে মিলি আমার অঙ্গ সুশোভিত করিতে লাগিল। তাহার হীরা-মুক্তার বাছা কয়েকটি গহনায় তাহারই গৈরিক রঙের 'বিষ্ণুপুরী' শাড়ীতে আমার দেহশ্রী বিলুপ্ত হইল কি বর্দ্ধিত হইল, তাহা সে বলিতে পারে! তাহার একাগ্রতায় নিপুণতায় আমার খোঁপায় মালা পর্য্যন্ত বাদ রহিল না।

এমন করিয়া কেহ কখনো আমাকে সাজায় নাই, আমিও সাজি নাই। অনভ্যস্ত বেশভূষায় আমার লজ্জার সীমা রহিল না। প্রতিবাদ করিতে

সাহস হইল না। এত দিন মিলিকে শুধু ভালোই বাসিতাম, সে ভালোবাসায় ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। মিলি আমাকে যেন জানে,—আমার যাহা গোপনীয়, ও যেন তাহার সন্ধান পাইয়াছে! অনায়াসে মিলি আজ আমার বিচারকের আসনে বসিতে পারে। লুকানো বস্তু প্রকাশ্য দিবালোকে পরিব্যাপ্ত করিতে পারে! মিলিকে জানিবার অহঙ্কার আমার চূর্ণ হইয়াছে। তাহাকে কেহ জানিতে পারে না, দূর হইতে সে দূরতম, সীমার উর্দ্ধে সে! আমাদের ক্ষুদ্র মাপ-কাঠিতে তাহাকে মাপা যায় না, আমাদের মনের সূক্ষ্ম সুতায় সে বাঁধা পড়ে না।

আমার সজ্জা-পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল। প্রতিমার অঙ্গরাগ করিয়া মালাকর যেমন নির্নিমেষে সে প্রতিমার পানে তাকাইয়া থাকে, মিলিও তেমনি মুগ্ধনেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

আমার প্রতি অঙ্গে দৃষ্টি বুলাইয়া মিলি কহিল, "সত্যি, কি সুন্দর দেখাচ্ছে! একটু এমন-তেমন করলে তোকে এত ভালো দেখায়, তা জানতাম না! কে বলে, তুই দেখতে ভালো নোস্? অনেকের চেয়ে, আমার চেয়ে ঢের ভালো। সবাই যে আমাকে সুন্দর বলে, তা শুধু তোর চেয়ে ফর্সা রংএর জন্য নয়, রাত-দিন আমি সেজে থাকি, তাই। তোর মুখের কাছে আমার মুখ? আয়নায় ছাখ, কি সুন্দর তোকে দেখাচ্ছে!"

আমার হাত ধরিয়া মিলি আমাকে বড় আয়নার সামনে দাঁড় করাইয়া দিল।

চোখ তুলিয়া আমি লজ্জিত হইলাম। মিলি এ কি করিয়াছে? আমি যাহা নই, তাহাই যে প্রতিপন্ন হইতেছে। নয়নের কাজল-রেখায়, অধরের রক্তিম আভায়, চিবুকের কৃষ্ণ তিলের তলে আমি যেন হারাইয়া গিয়াছি! কিন্তু এমন বেশে কেমন করিয়া আমি তাঁহার কাছে যাইব? তিনি কি ভাবিবেন? লজ্জায়, কুণ্ঠায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। আমার নব সজ্জা আমাকে আশ্বাস দিতে লাগিল, ভয় কি ভীরু! তোর ভয় নেই, মিলির দীপ্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে তোর এ সজ্জার আড়ালে তুই অনায়াসে লুকাইয়া থাকিতে পারিবি! কে তোকে লক্ষ্য করিবে? তোকে কার বা প্রয়োজন? এ জীবনের মত তোর বিবাহের বেশ তোলা রহিল, এক দিনের এ প্রসাধন অপরাধের নয়!

সরিয়া আসিয়া মিলিকে কহিলাম, "এখন তুই তৈরি হয়ে নে, তোর

দেরী হয়ে যাচ্ছে। তোর মত আমি অত-শত জানি না, তবু আয়, চুলটা বেঁধে দি, জামা-কাপড় বের করে দি !"

"আমার জামা-কাপড়ের আজ দরকার নেই করু, আমি নেমন্তন্ন যাবো না।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম ! "যাবি না ? তাঁরা অত করে বলে গেলেন ! তুই না গেলে দিদি দুঃখিত হবেন, জ্যোতি বাবু আঘাত পাবেন। তোর না যাবার কারণ কি, শুনি ? তুই না গেলে আমিও যাবো না,—যেতে আমি পারবো না।"

"আমি না যেতে পারলে তোর যাবার মানা কিসের ? ভানু যাবে, মা যাবেন, তাতে হবে না ? আমার শরীরটা আজ ভালো নেই, তাই যাবো না। এ কথা তাঁদের লিখে জানিয়েছি, তাঁরা দুঃখিত হবেন না, আঘাতও পাবেন না। তুই চলে যাবি, আমি তো এইখানেই থাক্‌বো, আমার আর-একদিন গেলেই হবে !"

"তা হয় না মিলি। তুই না গেলে আমি কখ্‌খনো যাবো না। বেশ তো, ভানুকে নিয়ে মাসিমা নেমন্তন্ন রক্ষা করে আসুন, তোতে-আমাতে বাড়ীতে থাকি। কিন্তু না, তোর শরীর আবার খারাপ কোথায় ? মিছে ছুতো করছিস তুই !"

"ছুতো নয় করু, সত্যি যেতে ইচ্ছা করছে না। তুই থাক্‌বি না বলেই ওঁরা খেতে বলেছেন, তোর জন্যই আজকের খাওয়া-দাওয়া, আমার জন্য নয়। আমি না যেতে পারলে বিশেষ দোষ হবে না। কত জায়গায় তো আমি গিয়েছি, তুই যাসনি, তুই গেছিস, আমি যাইনি ! তাতে কি হয়েছে ! আজ তোকে কিন্তু যেতেই হবে, করু।"

"যেতে হবে তা যেন মেনে নিলাম, কিন্তু আমরা সকলে একত্র হবো, তাই আরো ওঁরা বলেছেন। আমি চলে গেলেও আবার আসতে পারি। চন্দ্রদাকে আবার কত দিনে পাওয়া যাবে ! তুই না গেলে তিনিই বা ভাববেন কি ?"

"তাঁর বাড়ী নয়, তাঁর নেমন্তন্ন নয়, তিনি আবার কি ভাববেন ?"

৩৯

অনেক দিনের পর আবার সেই বাড়ী, সেই পুষ্পোদ্যান। আমরা গাড়ী

হইতে নামিবা মাত্র মা আমাকে সাদরে আহ্বান করিলেন, "এসো মা-লক্ষ্মি, ঘরে এসো !"

দিদি বলিলেন, "মাসিমাকে নিয়ে বসাওগে মা, আমি এদের বাগানে নিয়ে যাচ্ছি।"

ভানুকে প্রবীরের দলে ভিড়াইয়া দিদি আমাকে বাগানে লইয়া চলিলেন।

বাগানে বেতের চেয়ারে বসিয়া চন্দ্রদা ও জ্যোতি বাবু গল্প করিতেছিলেন। জ্যোতি বাবুর পাশের শূন্য আসনে আমাকে বসাইয়া দিদি সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বসন্তের রূপে, রসে, গন্ধে ধরণী রোমাঞ্চিত, বায়ু সুরভিময়। লেকের পর-পারের ঘনসন্নিবেশিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য হইতে থাকিয়া থাকিয়া কোকিল ডাকিতেছিল।

চন্দ্রদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনলাম, মল্লিকা দেবীর অসুখ করেছে! কি অসুখ করল?"

উত্তর দিলাম, "তেমন কিছু নয়, শরীরটা ভালো বোধ করছে না, তাই এলো না।"

"তাঁর যদি এখানে আসতে ভালো না লাগে, তাতে দুঃখের কি আছে চন্দ্র? আমি জানি, অসুখ তাঁর দেহের নয় মনের। তোমার না ডাক্তারী বিদ্যায় এত খ্যাতি, দাও না মল্লিকা দেবীর মনের অসুখ সারিয়ে! এত কাল কেবল শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসাই করেছো, এবার মানসিক রোগের চিকিৎসা ধরো।"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া চন্দ্রদা কহিলেন, "মানসিক রোগের ওষুধ আমি তো জানি না জ্যোতি,—ডাক্তারী বইয়ে লেখা থাকলে খুঁজে বের করবো।"

"খুঁজতে হবে না,—ভাবলেই পাবে, ভাই। এত দেশ-বিদেশ ঘুরে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে তবু এমন নিরেট হয়ে রইলে! অন্য বিষয় না হয় ছেড়ে দিলাম, কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা সকলেরই থাকে! তোমার—"

কথাটা জ্যোতি বাবু শেষ করিতে পারিলেন না। ব্যস্তসমস্ত ভাবে দিদি আসিয়া কোন কাজের জন্য যেন চন্দ্রদাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

সেই নির্জ্জন লতা-বিতানে, সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে জ্যোতি বাবুর পাশে আমি! কেহ কোথাও নাই! মাথার উপর অবারিত অনন্ত আকাশ, চারি

দিকে ফুলের সমারোহ। এ মায়া-বিভ্রমের মধ্যে কেহ কাহাকেও ভালোবাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে না! আমিও পারিলাম না,—অস্থির চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

সবিস্ময়ে জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনিও চললেন যে! ভিতরে যাবার আগে আমার ঘরে আপনাকে একবার যেতে হবে। মিলি আজ আমাকে একখানা চিঠি লিখেছে—সেটা আপনার দেখা দরকার। এখানে আলো নেই, আলোয় যেতে হবে।"

মৃদু কণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

আবার সেই গৃহ—যেখানে এক দিন অভিসারে আসিয়া আমার আকুল চুম্বন রাখিয়া গিয়াছি! যেখানে যে-জিনিষ সে-দিন দেখিয়াছিলাম, আজও সে-সব তেমনি আছে! সেই নিভৃত নিলয়, সে ঘন-নীল রঙের যবনিকা। সাদা পাথরের 'টিপয়ের' উপর তেমনি পুষ্পগুচ্ছ। আজ রজনীগন্ধা নয়, কুন্দ এবং শ্বেত করবীর তোড়া।

আমার দিকে চেয়ার সরাইয়া দিয়া জ্যোতি বাবু আমার সামনে বিছানায় বসিলেন।

মন্ত্রমুগ্ধের মত দুরু-দুরু কম্পিত বুকে তাঁহার হাত হইতে আমি চিঠি লইলাম,—কিন্তু কোন শব্দের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অক্ষরের পর অক্ষরের মালার পানে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলাম।

জ্যোতি বাবু বলিলেন, "এ কি, আপনার হাত এত কাঁপছে কেন? ভয় কি! মিলি ভয়ের কোন কথা লেখেনি। শান্ত হয়ে পড়ুন। জল খাবেন? বলুন? জল দেবো? না, দিদিকে ডাকবো?"

কি লজ্জা, কি ঘৃণা! এই কি আমার সংযম-শিক্ষা! নিজেকে সুদৃঢ় করিয়া জবাব দিলাম, "না, জল চাই নে, দিদিকেও ডাকতে হবে না।"

এবার মিলির লেখা আর ঝাপসা অস্পষ্ট রহিল না। মিলি লিখিয়াছে,—

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আজ আপনাদের উৎসবে যোগ দিতে পারবো না বলেই এ চিঠির অবতারণা। সাম্‌না-সাম্‌নি বলতে গেলে যে কথা বাধে, লেখায় তার বালাই থাকে না।

আমি যা বলতে চাই, তা জেনে অপরে আশ্চর্য্য হলেও আপনি হবেন না,

এ আমি জানি! তবু আপনার আর আমার মধ্যে সব পরিষ্কার হওয়া উচিত।

এক দিন দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে যে-সম্মতি দিয়েছিলাম, এত কাল মনে-মনে তার আলোচনা করে বুঝতে পেরেছি, সে সম্মতির কোনো দাম নেই!

সময় চেয়েছিলাম শুধু নিজেকে জানবার জন্য। পরীক্ষা একটা ছুতো মাত্র।

আশা ছিল, আমার মন ক্রমে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে, জগতের সব চেয়ে প্রিয়-জ্ঞানে আপনাকে আমার বলে মনে করবো! প্রেমশূন্য বিয়ে যে বিয়ে নয়, এটা আর-সকলের মত আমিও জানি। কিন্তু পারলাম না,— আপনি আমাকে মাপ করবেন।

আমি ভালো না হতে পারি, কিন্তু ছলনার ছদ্মবেশে আপনাকে আর ভুলিয়ে রাখতে চাই না। বিয়ে আমার মত মেয়ের জন্য নয়!

প্রথমে আপনি হয়তো অনেক আশা করে আমার সামনে আপনার মনের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন, আমি সেখানে প্রবেশ করতে পারিনি। এগিয়ে যাবার প্রেরণা না পেলে জোর করে কিছু করা যায় না। আমি আপনার অন্তরে না গেলেও আর এক জনের যে সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল, তা আপনার অগোচর নেই। গোঁজামিল দিয়ে আপনি তার নাম দিয়েছিলেন, 'শ্রদ্ধা'! আন্তরিক শ্রদ্ধাই যে প্রেমের গতি-পথ, তা কি আপনি জানেন না?

শ্রদ্ধা আপনি আমাকে কখনো দেননি—ধারণা করেছিলেন, ভালোবেসেছেন! আমি জানি, সে ভালোবাসা নয়, মোহ! কালে আপনার মোহ কি পরিণতি লাভ করতো, তা উপভোগ করবার অবকাশ আমার হলো না। কারণ, আমি চাই না আপনার মোহ-বিজড়িত দুর্ব্বল ভালোবাসা। আপনাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

যার ভালোবাসা, আত্মত্যাগ, নিষ্ঠা অতুলনীয়, সে আজ আপনার কাছে যাচ্ছে। তাকে পাওয়া আপনার কেন, অনেকের পক্ষেই সৌভাগ্য। আপনার মা এবং দিদি তাকেই একান্তে চেয়েছেন। আপনার সুপ্ত বাসনাও তাঁদের সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে!

ভ্রমেও আপনি ভাববেন না, রুক্ন আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে জেনে

আমি তার পথ থেকে স'রে যাচ্ছি! করুকে যতই ভালোবাসি, তবু এত উদার আমি নই।

আপনার আর আমার মধ্যে করুর পক্ষে আপত্তিকর কিছুই ঘটেনি। আত্মীয়-স্বজন যে-মিথ্যাকে গড়ে তুলতে গিয়েছিলেন, তা ভাঙতে পেরে আমি আনন্দ বোধ করছি।

আপনার আংটিটা এই লোকের হাতে ফেরত দিলাম। যে এর প্রকৃত অধিকারিণী, এটি তাকে দেবেন।

বিনীত

শ্রীমল্লিকা দেবী

৪০

হৃদয় যতই কঠিন, সংযত করিয়া মিলির চিঠি পড়ি না কেন, চিঠির শেষ অংশ আমাকে বিচলিত করিল। অবশেষে মিলি আমাকে ধরিয়া ফেলিল? শুধু ধরা নয়, ধরাইয়া দিল! এ লজ্জা কোথায় রাখিব? আমার কাম্য যে কিছুই ছিল না! দানের সংকল্প লইয়া আমি বাঁচিয়াছিলাম। আমার গোপন দুর্গ ভাঙ্গিয়া গেল! নগ্ন পৃথিবীর বুকে শত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে বিচরণ করিবার শক্তি আমার কোথায়? ভীরু মন কাঁপিয়া মরে,—সঙ্কোচে চোখের পাতা বুজিয়া আসে।

দেহ ঝিম্-ঝিম করিতে লাগিল,—চেয়ারের হাতলে আমি মাথা রাখিলাম।

ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া জ্যোতি বাবু প্রশ্ন করিলেন, "অসুখ বোধ হচ্ছে? বিছানায় শোবেন কি?"

কথার উত্তর না দিয়া আমি ঘাড় নাড়িলাম।

নীরবে কিছুক্ষণ কাটিল। সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জ্যোতি বাবু বলিতে লাগিলেন, "যা আমার আনন্দের, সুখের, তা জেনেছি বলে তোমার লজ্জা কিসের করু? তুমি তো লজ্জার কিছু করোনি! আমি অন্ধ ছিলাম—ভুল আমারি। দিদিকে মিলির চিঠি দেখাতে তিনি আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন!"

সর্ব্বনাশ! আমার কথা দিদিও তাহা হইলে জানিয়াছেন! মা জানিয়াছেন! এতক্ষণ মাসিমারও জানিতে বাকী নাই। তাই মা আমাকে ডাকিয়াছিলেন, "এসো মা, ঘরে এসো।" তাই আমাদিগকে সুযোগ দিতে ভানু ও চন্দ্রদাকে দিদি সরাইয়া লইয়াছিলেন? মিলি, তুই এ কি করিলি? আমি কোথায় যাইব? কোথায় আমার স্থান?

লুকাইবার অবলম্বন না পাইয়া দুই হাতে আমি মুখ ঢাকিলাম।

তিনি বলিলেন, "মুখ ঢাকলে কেন, করবী? শোনো, আমার সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। আমার যা বলার, মিলির চিঠিতে তা সহজ হয়েছে। মিলি লিখেছে, মোহ! আমি তা অস্বীকার করি না। কিন্তু মোহ হলেও মিলিকে এক দিন আমি ভালোবেসেছিলাম।"

হাত নামাইয়া কাঁপা গলায় কোনরূপে বলিলাম, তাতে কি হয়েছে? মিলিকে সবাই ভালোবাসে, আমিও বাসি। দেখুন, আমার মনে হয়, মিলি আমার জন্মেই এ-সব লিখেছে। দূরে না ঠেলে, আপনার ভালোবাসার জোরে তাকে কাছে নিয়ে আসুন।"

আমাকেই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। আমার কথায় তাঁহার মুখ লাল হইল। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন, "আমাকে এতখানি কাপুরুষ ভাববার তোমার কোন কারণ হয়নি, করু! যে আমাকে চায় না, অপরকে ভালোবাসে, জোর করে তার প্রাণহীন দেহ দখল করবার কল্পনা—আমার পৌরুষে বাধে। ভালোবাসাই ভালোবাসাকে টেনে আনে! অপর-পক্ষ যোগ না দিলে আদান প্রদান চলে না, আপনা-আপনি তার গতিবেগ থেমে যায়। আমার মনের ঘোর কেটে গেছে। তুমি মনেও ভেবো না, মিলি তোমার জন্ত এই সব করেছে! সে কাকে চায়, তা আমার জানা হয়ে গেছে।"

"কাকে সে চায়?"

"জানো না? নিজে গোপনে ভালোবাসতে শিখেছো, আর-এক জনের লুকানো কথা টের পাও না? তোমার মল্লিকা পাখী চন্দ্রচূড়ের শরজালে ধরা পড়েছেন।"

আমি চমকিত হইলাম! সামনের কালো পর্দ্দা সরিয়া গেল। প্রতি দিনের প্রতি ঘটনা যেন আমি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম!

মিলির জন্ত আমার হৃদয় বেদনায় বিগলিত হইল। চন্দ্রদা যে বিবাহ-বিমুখ! তিনি বিবাহ না করিলে, মিলির প্রেমের প্রতিদান না দিলে মিলি কি

করিবে? কি করিয়া হৃদয়-ভার বহন করিবে? এ মর্মান্তিক জ্বালার পরিচয় যে আমি জানি!

বলিলাম, "কিন্তু চন্দ্রদা বিয়ে করতে চান না যে! মিলির কি হবে?"

"শুনেছি, তুমিও বিয়ে করতে চাওনি! তোমার চন্দ্রদাও চায় না। তার চাওয়া-না-চাওয়ার ভার আমি নিলাম। ভয় নেই করু, তোমার ভগিনী-প্রেমের, সখী-প্রীতির অনেক পরিচয় পেয়েছি। কথা দিচ্ছি, মল্লিকা দেবীর জীবন মিথ্যা হবে না, যে যুগ মানুষকে বাইরে থেকে বিচার করে, চন্দ্র সে যুগের নয়। চন্দ্র মিলিকে ঠিক চিনতে পারবে। মিলির মত সহজ সাবলীল মন মেয়েদের মধ্যে কেন, ছেলেদের মধ্যেও দুর্লভ! মিলিকে তুমি সাধে ভালোবাসো? এক কালে আমিও বেসেছিলাম,—কিন্তু তাতে ভয় পেয়ো না। আমিই তার যোগ্য নয়। অমন বেগবতী নদীকে ধারণ করবার ক্ষমতা আমার নাই। ও নদীকে বাঁধতে পারে শুধু ঐ চন্দ্রচূড়।"

মিলির মৃগয়ার শর এত দিনে লক্ষ্য পাইল? শিকারী আজ নিজেই আহত, তাহার লক্ষ্য কিন্তু ব্যর্থ নয়। সারা জীবন প্রেমের ছায়ার পিছনে ঘুরিয়া, এত দিনে মিলি প্রেমের দেখা পাইয়াছে। তাহাকে তরল-চিত্ত ভাবিয়া তাহার উপর করুণাও করিয়াছি, তাহাকে চিনিতে পারি নাই। তাহাকে চিনিয়াছিল পুরুষ,—যে-পুরুষ চিরকাল এই ছলনাময়ী, শক্তিময়ী নারীর কাছে আত্মদান করিয়াছে। মিলির কৃত্রিম বেশভূষা, নির্লজ্জ প্রেমলীলা—সমস্তই তাহার অশান্ত চিত্তকে ভুলাইবার জন্য! বেশ-ভূষার হৃদয়হীন উপহাসের অন্তরালে এত কাল সে আপনার নীড় খুঁজিয়া ফিরিয়াছে!

"এত ভাবনা কিসের, করু? আমি তোমার মনের ইচ্ছা বুঝতে পেরেছি। মিলিকে রেখে তুমি এগিয়ে যেতে চাও না! সে ব্যবস্থা পঞ্জিকার পাতায় আছে। এক দিনে দু'টো লগ্ন,—কেমন? মুখ অত নামিয়ো না, চোখ তোলো। আমার ভারী মুস্কিল হয়েছে, একটা বোঝা সারা দিন বয়ে বেড়াচ্ছি—তাকে রাখবার জায়গা পাচ্ছি না।"

বলিতে বলিতে জ্যোতি বাবু পাঞ্জাবীর বুক-পকেট হইতে মিলির প্রত্যাখাত হীরক-অঙ্গুরী বাহির করিলেন। বিজলী-আলোর প্রভায় হীরক হাসিতে লাগিল!

সেই হীরকের মত উজ্জ্বল হাসি-মুখে আমার আরো কাছে আসিয়া তিনি বলিলেন, "মিলি লিখেছে, 'যে প্রকৃত অধিকারিণী, তাকে দেবেন'।

অধিকারিণীকে আমি পেয়েছি, কিন্তু তিনি অধিকার নেবেন কি না, তা এখনো জানা হয়নি!"

নীরবে আমি হাত বাড়াইয়া দিলাম। মিলির কর-ভ্রষ্ট হীরা আমার বাম-অনামিকায় জ্বলিতে লাগিল! ভ্রষ্ট-তারা এত দিনে যেন তার স্থান খুঁজিয়া পাইল!

—::—

গল্প

দিবাভিসার

পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের কাহিনী বলতে বসেছি। এ প্রখর রৌদ্রালোকে অতীতের সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির ক্ষীণ স্মৃতি এক একবার চোখের সামনে ভেসে আসে।

একালের মতন সেকালেও সুন্দর হাসিমাখা প্রভাত হয়েছিল।

চৌধুরী বাড়ীর সপ্তকন্যার সর্ব্বকনিষ্ঠা ঘেন্না বিহগকূজিত প্রভাতকে মুখর করে তারস্বরে ডেকে উঠলো "বড়দি, মেজদি, সেজদি, নদি, রাঙাদি, নতুনদি, তোমরা কি ঘুম থেকে উঠবে না গো? বেলা ঢের হয়েছে। দাদা যে আজ আসবে তা যেন কারোর মনে নেই?"

চকমিলানো কোঠা বাড়ীর মাঝের বড় ঘরখানায় মেয়েদের আড্ডা! সাতবছরের ঘেন্না কোলের সন্তান বলে আজো মার বিছানা ছাড়েনি। মা উঠে গেলে সে এসেছে দিদিদের সুখনিদ্রা ভঙ্গ করতে।

এদের সাতবোন চম্পার, একটিমাত্র ভাই প্রবীর কলিকাতায় কলেজে পড়ে। গ্রীষ্মের বন্ধে সে পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ ছুটি প্রায় শেষ করে আজ গ্রামে ফিরছে। সেই জন্য বাড়ীতে আনন্দের সীমা নেই। প্রবীরের তিন দিদি, বাকিগুলি ছোটবোন। সাতবোনের ভেতর চারিটি বিবাহিতা। বিত্তশালী বাপের মেয়ে বলে তারা তেমন শ্বশুরালয়ে যায় না। জামাইরাই মাঝে মাঝে শুভাগমন করে বিরহিনীদের বিরহের ব্যথা লাঘব করে।

সপ্তসমুদ্রের বৃদ্ধা ঠাকুরমা অদ্যাপি বিদ্যমান। তিনি আবার বিষম নারী-বিদ্বেষী। সেই জন্তেই বোধহয় 'বাঘের ঘরে ঘোঘের বাসার' মতন তার ভিটেয় সাত নাতনী ঘুঘু চরাতে উদ্যত হয়েছে।

যেমন হেলাফেলার জিনিস, তেমনি ঠাকুরমা অশ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের নাম করণ করেছেন, "অমুনা, ঝমুনা, নমুনা, সীমা, আন্না, ছিছি, ঘেন্না।"

নামের শ্রী যাই হোক না কেন, মেয়েরা যেন ক্ষ্যাপা নদীর উত্তাল তরঙ্গ, দিনরাত কলকল খলখল।

স্বচ্ছল সংসারের ঝিয়ারী মেয়েরা একটু বেশী বেলা পর্য্যন্ত ঘুমায়, তাতে কেউ দোষ ধরে না। কিন্তু দোষ না ধরলেও অসময়ে নিদ্রাভঙ্গে ঘেন্নার দিদিরা কেউ প্রীত হতে পারলো না।

বড় অমুনা নিদ্রাবিজড়িত চোখ মেলে বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলো, "আঃ মরণ, ছুঁড়িটা যেন কাক ডাকতে লেগেচে। দিলে ভোরের ঘুমটুকু ভেঙে, এখন দিন ভোর মাথার যন্ত্রণায় আমি দগ্ধে মরবো"।

ঝমুনা সায় দিলে—"যা বলেছিস দিদি, আমারো তোর দশা।"

নমুনা বল্লে, "দাদা আসবে বলে আমরা নাচবো নাকি? যা না নতুন বৌয়ের কাছে সে আহ্লাদে আটখানা হচ্ছে। কৈ আমরা শ্বশুর বাড়ী থেকে এলে এমন তো হৈ হল্লা দেখি না?"

সীমার বছরখানেক হল বিয়ে হয়েছে। হৃদয়ের ভরানদীতে এখনো ভাঁটার টান আসেনি, নয়ন আজো স্বপ্ন ভারাতুর। জীবনের নবীন পটভূমি হ'তে রঙীন ছবি মুছে যায় নি।

সীমা বিছানায় বসে দুহাতে শিথিল খোঁপা জড়াতে জড়াতে হাসলো, "আমাদের আবার শ্বশুর বাড়ী, বছরে একমাস তার আবার ব্যাখানা। তা জামাইরা এলে এরা কিন্তু কম সমারোহ করে না। আমাদের ভিতরে নতুন বৌকে টানচো কেন বল দেখি? অগ্রহায়ণ মাসে দাদা বিয়ে করে রেখে গেচে বেচারাকে, আর আসচে জ্যৈষ্ঠের শেষে। ওদের আলাপ পরিচয়ই ভাল করে হয়ে ওঠে নি। তার আবার আহ্লাদে আটখানা?"

কিশোরী আন্না কুমারী হলেও তার জানবার বুঝবার কিছুই বাকী ছিল না। সে চোখ বুজে টিপে টিপে বল্লে, "ভাইবোনের বিয়েয় বৌঠান এতদিন বাপের বাড়ীতে আটকা ছিল বলেই না দাদা রেগে আসেনি। যেমনি বৌঠান এখানে এসেছে, অমনি খবর পেয়ে ছুটে আসচে। তোমার কাছেই ওদের ভাবের অভাব শুনলাম।"

বালিকা ছিছি দিদিদের রসালাপে কান না দিয়ে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বিছানা ছেড়ে ঘেন্নাকে জিজ্ঞাসা করলো। "বাগানের কাঁচামিঠে আম কটার কথা মনে আছে তো? জাকড়া দিয়ে বেঁধে দাদার জন্যে যা রেখে গিয়েছিলাম, চল এখুনি গিয়ে পেড়ে নিয়ে আসিগে।"

"গাছের যত আম পেকে ফুরিয়ে গেল, দাদার এবার কিছু খাওয়া হ'ল না। কাঁচামিঠে আম কটা আমরা দুজনা দাদার হাতে দেব রাঙাদি।" বলতে বলতে ঘেন্না ছিছিকে বাহু বন্ধনে বেঁধে টেনে নিয়ে চল্ল।

দ্বিপ্রহরে প্রবীর এসে পৌছিল। বাড়ীর একটিমাত্র ছেলের শুভাগমনে গৃহে আনন্দের উচ্ছ্বাস বয়ে গেল। পরিজনেরা প্রবাসীকে ঘিরে আরম্ভ করলো কত কুশল প্রশ্ন, কত পথের বিবরণ। সে মিলন-মেলায় একটিমাত্র প্রাণী কেবল উপস্থিত হ'তে পারলো না, সে প্রবীরের নবপরিণীতা বধূ রাজবালা।

বিয়ের সময় রাজু উনিশবছরের তরুণ বরকে লজ্জা সঙ্কোচে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে পারেনি। তার নতনেত্র পথে যেটুকু প্রতিভাত হয়েছিল, তা এ কয়েক মাসের অদর্শনে মনের ভেতর হ'তে ঝাপসা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বাঁকা অক্ষরে সে তার কলেজে কাব্য পড়া বরকে গুটিকত চিঠি লিখেছে বটে, কিন্তু তাতে তার মুদ্রিত কমল হৃদয় বিকশিত হ'বার সময় পায়নি। তেরো বছরের বালিকার জীবনের গ্রন্থি এখনো খোলেনি, কোরক সবে ফুটি ফুটি করছে।

কলি না ফুটলেও পল্লীবালার কৌতুক ও কৌতূহল কম নয়।

রান্না ঘরে রাজু পুরাতন দাসী কুড়ানির মায়ের সাহায্যে কইমৌরী রাঁধছিল। মা গৃহ প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ শিলার ভোগ চড়িয়েছিলেন ভোগের ঘরে। তখনো পাড়াগাঁয়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারে অজ্ঞাতকুলশীল পাচক রাখার প্রচলন হয়নি। রন্ধন এবং নারিকেলের ও দুগ্ধের নানারূপ মিষ্টান্ন তৈরীর বাইরে যে আর একটা বৃহৎ জগত আছে মেয়েরা তার খবর রাখতো না।

ঠাকুমা বৃদ্ধা হয়ে কাজের বাইরে গিয়েছেন। পূজোর আয়োজন ও ভোগের ভার বর্তমান গৃহিণীর স্কন্ধে। তিনি আবার আমিষের ভার দিয়েছেন বধূকে। গোড়া থেকে না শিখলে শিখবে কবে? ছেলে বয়সই যে শিক্ষার সময়। কুড়ানী মার হিতোপদেশে রাজু রান্না করে, একদিন আলুনে, একদিন নুনে পোড়া, কখনো অর্ধসিদ্ধ, কোনদিন অসিদ্ধ।

মেয়েরা সহজে এদিকে ঘেঁষতে চায় না, নিত্য নিত্য হাতা বেড়ির ঠ্যালার ভয়েই নানা ছলছুতায় পিত্রালয়ে অবস্থান করা।

কুড়ানীর মা রান্না ঘর হ'তে বের হ'বা মাত্র রাজু আর স্থির থাকতে পারলো না। দ্বারান্তরালের ছিদ্রপথ দিয়ে তার চকিত চঞ্চল দৃষ্টি বাইরে প্রসারিত করে দিলে।

প্রবীর সামনের দালানের সিঁড়িতে বসে সমুদ্রের বর্ণনায় উন্মুখ। তার চারিদিকে বিস্মিত শ্রোতার দল।

কি বিরাট সমুদ্রের ঢেউ, কত বড় মাছ, জলচর জীবজন্তু, কড়ি শঙ্খ ঝিনুক শুনতে শুনতে রাজু তন্ময় হয়ে গেল। তার সুকুমার চিত্ত মুহূর্ত্তে উধাও হলো সেই সুনীল সিন্ধু সৈকতে—যেখানে তিমি হাঙ্গর ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে।

"ও বৌমা একি কাণ্ড, কইমাছ যে পুড়ে গেলো? শীগ্‌গির নাবিয়ে জলের ছিটে দাও। পোড়া গন্ধ বেরিয়েছে।" রাজু সচমকে ঘাড় ফিরিয়ে নিলে। ভয়ে লজ্জায় তার মুখ রাঙা হয়ে গেল। সত্যি সে টের পায় নি, পিছনের দরজা দিয়ে কখন কুড়ানীর মা ফিরে এসেছে।

কুড়ানীর মা বিরক্ত হয়ে রাজুকে ধিক্কার দিতে লাগলো—"দাদাবাবু কইমাছ ভালবাসে, তার ছিরি করলে বেশ। চলন-বিলে নোক ছুটিয়ে কত্তাবাবু ছেলের তরে মাছ আনিয়েছিল, গিন্নীমা পই পই করে আমারে কয়ে দিচে, তুই দাঁড়িয়ে থেকে মাছ রান্না করাবি। আমি মরতে কেনই বা বাইরে গিয়েছিনু মা, এখন দাদাবাবু মুখে দিতে পারলে হয়? ভাগ্যি কেউ এধারে আসে নি, দিনমানে লুকিয়ে তোমার স্বোয়ামীরে দেখন তাহ'লে বের করে দিতো। তুমি এমন কম্ম আর কখনো কোর না বৌমা, এ বড় নিন্দের। এখন কাজে মন দাও। রাতে যত ইচ্ছে পরাণভরে স্বোয়ামীরে দেখো।"

অপ্রতিভ রাজু মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে রন্ধনে মনোনিবেশ করলো।

রাত বারোটার পরে দেখা হ'ল দুজনার। নব বরবধূর গৃহে নিশীথে আলো জ্বালানো নিন্দনীয়। অতএব প্রদীপ নির্ব্বাপিত হ'ল। অন্ধকার হ'লেও কলেজে কাব্যপড়া প্রবীরের হৃদয়ে রংএর আলোর রসের আলোর অভাব ছিল না।

জ্যৈষ্ঠের শেষ কালবৈশাখীর ক্ষান্তবর্ষণ আকাশ নববর্ষার সজল মেঘমালায় প্রসাধন করছে। রজনী স্নিগ্ধ মধুগন্ধী।

ঘুমে ঢুলুঢুলু বধূর কানের পাশে মুখ নামিয়ে প্রবীর প্রথমেই আরম্ভ করে দিলে অনুযোগ অভিযোগের পালা, "তোমাদের ওখানকার বিয়েপর্ব্ব এত শীগ্‌গির মিটলো কেন? বৈশাখে দাদার বিয়ে, জ্যৈষ্ঠে মামার বিয়ে, আষাঢ়ে ছোট বোন শৈলির বিয়েটা একেবারে চুকিয়ে রাখলেই ভালো হোতো?"

বধূ চাপা স্বরে খিল খিল করে হেসে উঠলো, "কি বলছেন? শৈলি যে

ঘেন্না ঠাকুরঝির বয়েসী। তার বিয়ের এখনো ঢের দেরী। দাদার বিয়েয়, মামার বিয়েয় আপনি আসেননি বলে সকলেই কত দুঃখ করলেন।”

“দুঃখ করেছেন তাতে আমার স্বর্গলাভ হয়েছে। বেছে বেছে আমার ছুটির ভেতর সকলের বিয়ের তারিখ পড়েছিল। এত বড় লম্বা ছুটিটা একেবারে মাঠে মারা গেল। কদিনের জন্য আমি কখনো আসতাম না। মা কেঁদে কেটে চিঠি দিয়েছিল বলেই আসতে হোলো। যার নিজের বিয়ে পুরানো হয় নি, দিনের আলোয় বৌ দেখা হয় নি, তার কী পরের বিয়েতে পরের বাড়ী যেতে ভালো লাগে?”

অপরাধিনী রাজু ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, “পঞ্জিকায় বিয়ের দিন লেখা থাকলে ওঁরা কী করবেন বলুন? তবু সেখানে গেলে দিনের বেলায় আমাকে দেখতে পেতেন, এখানে তা হবার যো নেই?”

“কেন নেই? দুপুরবেলা, খাওয়া হয়ে গেলে তুমি এই ঘরে চলে আসবে। আমি আগেই এসে থাকবো। তা হলেই দেখা হবে।”

“না, তা হয় না, কেউ যদি টের পায়? এখানকার খাওয়া মিটতে দুপুর গড়িয়ে যায়। খেয়ে-দেয়ে দিদিরা বারান্দায় কড়ি খেলতে বসেন। আপনি আসবেন কি করে? ওরা দেখে ফেলবে যে?”

“সে ভাবনা তোমার নেই। কেউ টের না পেলেই তো হোলো। তুমি কবে আসতে পারবে তাই বলো?”

বিপন্ন রাজু ক্ষণেক ভেবে উত্তর করলো, “আজ সবে এসেছেন, কদিন পরে দিন ঠিক করে বলবেন। আমার কিন্তু বড় ভয় করচে। কেউ টের পেলে আমি কোথায় লুকোবো?”

সেদিন দিবাভিসারের জল্পনা কল্পনা সেই অবধি হয়ে রইলো; কদিন পরে দিন ঠিক হোলো ‘আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে’।

আষাঢ় আসতে দেরী হলো না।

সেদিন ভোর থেকে চারিদিকে অন্ধকার করে বারিবর্ষণ স্বরু হোলো’ রইয়ে রইয়ে মেঘ গর্জন করছিল গুরু গুরু করে। পল্লীগ্রামের বর্ষা—চারিদিক জল কাদায় থই থই করছে। মাটির আঙ্গিনায় দেখতে দেখতে বৃষ্টির জল জমে গেল। ভরা দ্বিপ্রহরে ডোবায় নালায় ব্যাঙ ডাকছিল ঘ্যাঁনর ঘ্যাঁন।

চৌধুরীদের নিয়ম—ছেলেদের খাবার পর মেয়েরা খেয়ে দেয়ে কড়ি খেলতে বসে। চাকররা খেঁয়ে বাহির মহলে চলে যায়। নিম্নশ্রেণীর ঝিরা দুবেলার

ভাত বেড়ে নিয়ে বাড়ী হতে খেয়ে আসে। সকলের শেষে খান—শাশুড়ী বধূকে নিয়ে আর রান্নাঘরের ঝি কুড়ানীর মা।

সবার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে ; বাকী তিনজনার ভাত বাড়া হয়েছে। কুড়ানীর মা পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে রেখেছে।

এমন সময় ভোগশালা হতে গৃহিণী ডাকলেন, "বৌমা ওবেলার ডালের গামলাখানা নিয়ে যাও। আমি যাচ্ছি ; আমার এদিকের কাজ সারা হয়ে গেছে।"

বালিকাবধূর হাতে গৃহিণী তুইবেলার ভাত তরকারী দিতে ভরসা পান না, তাই তুই ভাগে রেখে তুইবারে দিয়ে দেন।

বধূ আজ অন্যদিনের চেয়ে ক্ষিপ্রগামিনী হয়েছে। এক কাজ করতে গিয়ে পাঁচ কাজ সেরে রাখছে। লিচুকাটা চারগাছা মল অবিরত বেজে চলেছে রুণুঝুনু। তার চপল চোখ বারবার প্রসারিত হচ্ছে তাদের শয়ন গৃহের বাতায়নে। মৃতুমন্দ মেঘধ্বনির সঙ্গে কি এক অজানা আবেশে ভীত বিহ্বলা বালিকার হৃদয় কাঁপছে তুরুতুরু।

ভোগের ঘর উঠানের শেষ প্রান্তে।

বুকসমান ঘোমটা টেনে তুই হাতে ডালের গামলা ধরে আনতে মাঝপথে এসে এক বিপর্যয় ঘটে গেল।

ঘেন্না সুযোগ বুঝে ভাঁড়ার হ'তে খানিকটা আমের আচার চুরী করে দৌড়ে পালাবার সময় অতর্কিতে রাজুর ডালের গামলায় ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। শুধু পড়ে যাওয়া নয়, চীৎকার করে কেঁদে সারা বাড়ী কাঁপিয়ে তুলতে লাগলো।

নামে ঘেন্না হলেও সকলের ছোট বলে তার আদর খুব। তার কান্নায় কেউ থাকতে পারলো না। সবাই ছুটে এল। দাসদাসীরাও বাদ গেল না।

জলকাদায় ঘেন্না নেয়ে উঠেছে ; গামলার কানা লেগে কপাল রাঙা হয়েছে। গামলার ডালও ছলকিয়ে নষ্ট হয়েছে অনেকটা। অসাবধানী বধূর এত বড় অপরাধ ননদিনীরা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে পারলো না। "বৌ কেন লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে ঘোড়ার মত লাফিয়ে চলে ? কপালে কি চোখ নেই ? আহা ঘি সম্ভার দিয়ে রান্না, এতখানি ডালের কি অপচয়। বৌয়ের হাতে লক্ষ্মী, পায়ে লক্ষ্মী, কপালে রাজভাগ্যি। আর একটু হ'লে মেয়েটাকে যে শেষ করে দিতো ; বাছার কপালটা দেখতে দেখতে সুপুরির মত ফুলে উঠলো।" ইত্যাদি।

মা ও দিদিরা 'ষাট সোনা' করে ঘেন্নাকে তুলে নিয়ে গেল। এক দিদি চুল মুছে দিতে লাগলো, অন্য দিদি গায়ের কাদামাটি ধুতে বসে গেল। কপালের সুপুরিটির জন্যে একজন ছুটলো চূণ হলুদ গরম করতে।

কিন্তু কেউ ভ্রূক্ষেপ করলো না আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃতা এক অবলা জীবের প্রতি। রাজু তখনো তেমনি পথের মাঝখানে দুই হাতে শক্ত করে গামলা চেপে ধরে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো। সে যে কি করবে—কোথায় যাবে—তা যেন ঠাহর করতে পারছিল না।

সকলে সরে গেল কুড়ানীর মা কাছে এসে চুপে চুপে ডাকলে, "বৌমা চলো রান্নাঘরে যাই। পেছলে পড়ে যেয়ো না। পা টিপে টিপে চলো। কি আদিখ্যেতা মা ; দেখে বাঁচিনে ; মেয়ে নাফাতে নাফাতে এসে গুঁতো দেলে। তাতে দোষ হল নি , যত দোষ পরের মেয়ের।"

কুড়ানীর মা দাসী হলেও তার হৃদয়ে মমতার অভাব ছিল না। মেয়ের বয়েসী মেয়েটিকে সে প্রাণভরে ভালবাসতো। দোষত্রুটি ঢেকে রাখতো। আরো ভালো লাগতো তার রাজুর মুখে 'কুড়ানীর মা' শুনে।

রান্নাঘরে ঢুকে গামলা নামিয়ে রাজু মুখের কাপড় তুলতেই কুড়ানীর মা আর্তনাদ করে উঠলো, "তোমার থুতনি বেয়ে রক্ত যে পড়ছে বৌমা, পাতলা গামলার কানায় কেটে গেচে। আমি ওদের ডেকে আনি, ওষুদ-বিষুদ লাগিয়ে দিক।"

যা ঘটে গেছে তারই লজ্জায় রাজু মরমে মরে রয়েছে ; তার পরে আবার কাটাছেঁড়ার ব্যাপার নিয়ে সে আর তার লাঞ্ছনার সীমা বাড়াতে চায় না।

সে সবেগে ঘাড় নেড়ে মিনতি করতে লাগলো, "না কুড়ানীর মা, তোমার পায়ে পড়ি তুমি কারুকে কিছু বলো না। আমার তেমন লাগেনি, জলে ধুলে এখুনি সেরে যাবে ! ওরা জানতে পারলে আরো কত বকবে আমাকে।"

ব্রাহ্মণ কন্যার পায়ে ধরার উল্লেখে কুড়ানীর মা জিভ কেটে রাজুর উদ্দেশে ঢিব ঢিব করে মেঝেয় বার কতক মাথা ঠেকালো। তারপর সখেদে বলতে লাগলো, "তুমি একি করলে বৌমা, এমনি ধারার কথা কইলে আমার যে পাপ হয়। তুমি এবার একটুখানি স্থির হয়ে বোসো দেকি, আমি বাগান থেকে দু'টো গাঁদাফুলের পাতা নিয়ে আসি। গাঁদাপাতার রস দিলে ব্যথা বিষ একদণ্ডে নরম হবে।"

কুড়ানীর মা গাঁদার পাতার সন্ধানে বের হওয়া মাত্র রাজু বাঁ হাতের

তেলোয় চিবুক চেপে ধরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হ'ল। কেউ কোথাও নেই। ঘেন্নাকে নিয়ে তখনো সকলে ঘরের ভিতরে জটলা করছে। মধ্যাহ্নে ক্ষণকাল বিরতি দিয়ে আবার বৃষ্টি ঝরছে ঝরঝর করে। ভেজা কাক ছাতে বসে কর্কশ স্বরে বিলাপ করছে।

রাজু সভয়ে তার শয়নগৃহের দিকে চোখমেলে চেয়ে রইলো। বৃষ্টির ছাঁটের জন্য দরজা জানালা অধিকাংশ বন্ধ। দুই একটা যা খোলা রয়েছে তা দিয়ে ছায়ান্ধকার ঘরের ভিতর ভালো দেখা যায় না। তবু রাজুর মনে হ'ল কে যেন জানালার পাশ থেকে সরে গেল। আবার বোধ হ'ল একটি আবছা মূর্তি কোণের আয়নায় টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছোট মেয়ের পরিচর্য্যা সেরে তাকে শান্ত করে গৃহিণী যখন বধূকে নিয়ে খেতে বসলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মেঘান্ধকারের সঙ্গে সন্ধ্যার অন্ধকার গলাগলি ধরে মিতালি পাতাচ্ছে।

আহারান্তে কর্মরথের ক্ষণিক মন্থর গতির ফাঁকে রাজু কোন দিকে দৃকপাত না করে ছুটে গেল তার শোবার ঘরে।

ঘর শূন্য, সেখানে কেউ নেই। খাটের বিছানা ঈষৎ কুঞ্চিত। পাপোষের পাশে কাদার অস্পষ্ট চরণ চিহ্ন। চটিজুতো কটর-কটর করে কেউ যে অভিসারে আসে না, সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে রাজুর বিলম্ব হ'ল না। কিন্তু যে এসেছিল তার অঙ্গের সৌরভে সারাটি ঘর ভরে রয়েছে। এমন তীব্র মধুর সুবাস সে কেমন করে রেখে গিয়েছে।

রাজু সরে গেল শিয়রের আয়নায় টেবিলের কাছে। আমার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে বলে সে নিত্যনৈমিত্তিক স্নানান্তে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একবাটি চন্দন সর্ব্বঙ্গে মেখে থাকে। আজও মেখেছে ; চন্দনের শূন্য বাটি পড়ে রয়েছে। কিন্তু চন্দনের স্নিগ্ধ কোমল গন্ধের সঙ্গে এ উগ্র গন্ধের মিল নেই।

টেবিলের টানা টানতেই রাজুর চোখে পড়লো সেখানে রয়েছে কয়েকটা অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা। আর কিছু নেই।

কিন্তু আয়নার পেছনে কলাপাতায় লুকানো রয়েছে ও কি ?

সন্তর্পণে কলার পাতা হাতে নিয়ে খুলতেই তার ভেতর হ'তে বের হ'লো, কয়েকটা কেয়াফুল।

ফুলগুলো বুকের সামনে ধরে রাজু অনিমেষে সেদিকে চেয়ে রইলো।

অশেষ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও চিবুকের যন্ত্রণায় এতক্ষণ যে অশ্রুজল জমাট

তুষারের মতো হয়ে গিয়েছিল, কিসের উত্তাপে দুই গাল বেয়ে তাই পড়তে লাগলো ঝরঝর করে।

বালিকার আকুল অশ্রু দিবাভিসার ব্যর্থের জন্যে না সহসা স্মরণপথে ভেসে আসা মার করুণমাখা মুখ মনে পড়ায়—অথবা চিরসাথী ছোট বোন শৈলিকে মনে পড়ায়। তা কে জানে?

চোখ গেল

চোখ গেল, চোখ গেল। প্রভাতসূচনায় শিবানী দেবীর শয়নগৃহের পশ্চাৎ ভাগে ঘন অরণ্যে প্রাচীন জামগাছে নিবিড় পল্লবের ভেতরে লুকিয়ে দুটো পাখী তারস্বরে ডাকছিল—'চোখ গেল'। একটি থামা মাত্র আর একটি স্বর পঞ্চমে তুলছিল—'চোখ গেল'।

রাতে শিবানীর তেমন ঘুম হয় না। এটা বয়সের ধর্ম, বয়েস তাঁর যথেষ্ট হয়েছে। শরীরে সামর্থ্যও মন্দ নেই। কিন্তু জ্বালা হয়েছে চোখ নিয়ে। তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে তিনি, একদিন গৃহস্থ-ঘরের বধূ হয়ে এসেছিলেন। বাল্যকাল হতেই তাঁর সংসারের কাজ করবার অভ্যাস, কিন্তু চোখ নিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না।

শিবানীর তিন ছেলে। বড়টি বাড়িঘর জমিজমা দেখাশুনা করে। আর দুটি সপরিবারে প্রবাসে থাকে। ছুটিছাটায় তারা মার কাছে আসা-যাওয়া করে। মা কিন্তু শহরে তাদের কাছে থাকতে ভালবাসেন না। তাঁর শুচিতায় বাধে। চোখ দেখিয়ে চোখে চশমা নিতে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। এক মাসেই তিনি অতিষ্ঠ হয়ে যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরে এসেছেন।

স্বামীর স্মৃতিবিজড়িত চৌদ্দ পুরুষের ভিটা বনানীর শ্যামল ছায়া শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ রেখে নগরের কলকোলাহলে মুখরিত ইট-কাঠের পরিবেষ্টনের মধ্যে সাধ করে কোন্ চিরপল্লীবাসিনী থাকতে চায়?

শিবানীর বড় বধূটি শান্ত প্রকৃতির ভদ্র সন্তান। নিজে শৈশবে মাতৃহীন, তাই শাশুড়ীর প্রতি মমতায় বিগলিত। বড় ছেলে অনুগত। নাতি-নাতনীরা বাধ্য, স্নেহপরায়ণ। তাঁর দুঃখের কিছুই নেই, একমাত্র অসুবিধা চোখ নিয়ে।

গৃহে মান্ধাতার আমলের অষ্টধাতুনির্মিত গোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তাঁর

পূজা ও ভোগের ভার তিনি গ্রহণ করেছেন। বধূর অনুনয়-বিনয় উপেক্ষা করে তিনি সেটুকু নিজের হাতে রেখেছেন।

শিবানী বিছানা ছেড়ে বাইরে এলেন। হাত মুখ ধুয়ে তসরের থানখানা পরে বাগানে চললেন ফুল তুলতে। তখনও পাখীর কণ্ঠ বিরাম-বিহীন—'চোখ গেল'।

সহসা পথের বাঁক থেকে ভেসে এল উচ্চকণ্ঠের স্বর—"দাঁতের পোকা খসাই, গেঁটে বাত ভাল করি, সোয়ামি বশের ওষুধ জানি, মাঠানরা কে লেবে? কুলো ডালা চালুনি ধুচুনি আনিচি।"

বেদেনীরা গ্রামে বছরে দু-তিনবার বেচা-কেনা করতে আসে। গ্রামের শেষ প্রান্তে হিজল বিলের ধারে বুড়ো তেঁতুল গাছের তলায় তারা ক্ষণস্থায়ী সংসার পেতেছে।

পুরুষেরা গেছে সাপ খেলা দেখাতে ও সাপ ধরতে। মেয়েরা এসেছে পাড়ার ভেতরে।

শিবানী পুষ্পচয়ন স্থগিত রেখে এগিয়ে গেলেন পথের দিকে। দুটি বেদেনী এইদিকেই আসছে। একজনের কাঁকালে কুলো-ডালা, আর একজনের পিঠে ঝোলা। পাড়ার ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গে আসছে। তাদের অগ্রগামী হল শিবানীদের গরুর রাখাল। বছর পনর বয়স, 'নফ্রা'।

তাদের সঙ্গী ছেলেমেয়েরা আবদার করছে, 'একটু নাচন দেখাও, একটু গান শোনাও'। বয়স্কা বেদেনী হেসে বলে, 'দেখা না লো ময়না তোর নাচন, শোনায়ে দে গায়েন। গায়েন না শুনলে এরা ছাড়নের বান্দা না। চটর-পট শোনায়ে দে। এহন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতে হইবে।'

তরুণী বেদেনী পিঠের ঝোলা নিয়েই কোমর বাঁকিয়ে গান ধরে—

"বলুক বলুক দিদি, যার মনে যা লয় লো,
ভস্ম করিব যারে দিদি, বশ করেছি তায় লো,
তুলকি লাচা লা, তুলকি লাচা লা!"

বিজ্ঞের মত মুখে গম্ভীর নফ্রা বলে, "পচা পুরানা গায়েন আবার কইচিস্ ক্যা? লতুন গায়েন শোনা। বর্ষাকালেও ঐ গান গাইছিলি আবার খরালিকালেও এই গান গাইছিস।"

বড় বেদেনী বলে, "লতুন যেডা শিখিছিস সেইডা ক, ময়না।"

ময়না নফ্রার দিকে চোখ তুলে খিল্ খিল্ করে হেসে গান ধরে—

"যায় যাবে পরাণ, তবু তোরে ছাড়িব না,
এবার মরি সোনা হব, কানেতে ঝুম্‌কা হব,
অঙ্গেতে জড়্যায় রব, হব গলার চিক্‌দানা।"

শিবানী বড় বেদেনীর পাশে একটুখানি সরে গিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেন, "শোন্ মেয়ে, একটা কথা। তোরা এত ওষুধ জানিস, চোখে ঝাপসা দেখার ওষুধ জানিস নাকি ?"

বেদেনী মুচকি হেসে উত্তর দেয়, "মোরা তামাম রোগের দাওয়াই জানি তমু দেব্য লাগে। চোখের ভাল ওষুধ "চোখ গেল" পক্ষীর ডিমের নালা।"

শিবানী আগ্রহের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "চোখ গেল পাখীর ডিমের রস চোখে কেমন করে কদিন লাগাতে হয় ?"

"শনি-মঙ্গলবারে পক্ষীর বাসায় থাকি ডিম আনি, ভাঙ্গি কাজলের নাগাল বিয়ান-সাঁঝে তিন দিন লাগালেই চোখ ভাল হইবে।" বলে নাচগানের আসরে বেদেনী চলে গেল।

শিবানী ঢুকলেন ফুলবাগানে।

দ্বিপ্রহরের নিভৃতে শিবানী নফ্‌রাকে ডেকে বললেন, "তুই আমার একটা কাজ করে।দতে পারবি নফ্‌রা ? তোকে আমি মিষ্টি খাবার জন্য একটা টাকা দেব। 'চোখ গেল' পাখীর দুটো ডিম এনে দিতে পারবি ?"

সিকি নয়, আধুলি নয়, একটা আস্ত টাকার লোভে নফ্‌রার চোখ চকচক করতে লাগল। সে মহা আনন্দে উত্তর দেয়, "পারিব না আবার ? হাজার বার পারিব। আপনি ভাবন চিন্তা করিবা না, মাঠান। শনি-মঙ্গলবার বিয়ানে আমি ডিম আনি দিব। এখন তো পক্ষীর ডিম পাড়নের সময়, গাছে গাছে খুঁজি পাতি দেখন লাগিবে।"

শিবানী আশ্বস্ত হলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি কেটে সেইদিন কি ফিরে আসবে তাঁর ? একদা এ গ্রামে তাঁর মত সূচের কাজ কেউ জানত না। আলপনায়, কাঁথায় লতা পাতা ফুল পাখী, পাখা বোনায়, সেলাইতে তাঁর সমান ছিল না কেউ। আর এখন ফুল তুলতে গিয়ে কলি তুলে ডালা ভরান। উনুনের সামনে বসে গোপালের ভোগের এক তরকারী ভাত রান্না করতে হাতে সাতবার ছেঁকা লাগে।

ব্যবহারের জিনিস ছিঁড়ে গেলে নাতনীদের তোয়াজ করে সেলাই করাতে হয়। ইতিমধ্যে চিঠি এসেছে শিবানীর মেজ ছেলের মেয়ে একটি পুত্রসন্তান

প্রসব করেছে। তাঁর সাধ হচ্ছে নবজাত শিশুকে দুখানি কাঁথা সেলাই করে পাঠিয়ে দেবেন। কল্কা পাড় দিয়ে মাছের সারি হাতী ঘোড়া পাখী আঙুরলতা সেলাই করে দেবেন।

নগরবাসিনী একালের ইলিবিলি-পড়া মেয়েরা দেখে যেন মোহিত হয়ে যায়। ওষুধ ঠিকমত লাগাতে পারলেই তিনদিন পরেই তিনি দিব্যদৃষ্টি লাভ করবেন, এই আশায় শিবানীর হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হল। কিন্তু দিনের পর দিন যায়, নফ্‌রা তাঁর অভীষ্ট দ্রব্য আনে না।

সেদিনও 'চোখ গেল' বন থেকে পাখী ডাকছিল, বনবিতানে নয়, ঘরের চালের ওপর উঠোনে ছায়া ফেলে। শিবানী দ্বার খুলতেই নফ্‌রা হাসিমুখে বলে, "এই নাও মাঠান, পক্ষীর দু'ডা ডিম। খুঁজি খুঁজি হয়রান হয়্যা আনিছি। এখন চোখে লাগাও। আজ শনিবার।'

শিবানী হারানিধি যেন কুড়িয়ে পেলেন। বিছানার নীচে থেকে একটা টাকা নিয়ে নফ্‌রার হাত দিয়ে পাতার ঠোঙাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাবধানী নফ্‌রা পাতার ঠোঙায় গামছায় ঢিলে করে বেঁধে ডিম দুটো এনেছে।

দুটো পাখী চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ মনে পড়ল শিবানীর প্রথম জীবনের প্রথম মাতৃত্বের কথা। তাঁর মন ছিল অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী। মনে মনে কত রঙীন ছবি এঁকেছিলেন। ক্রমে দিন যায়, গৃহে আয়োজন শুরু হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে—

না ফুটিতে ফুল
ঝরিয়া পড়িল সাধের মুকুল,—

হঠাৎ স্নানের ঘাটে পা পিছলে আছাড় খেলেন শিবানী। আঘাত তেমন গুরুতর নয়, কিন্তু তাতেই বিপর্যয় ঘটে গেল। সেই রাতেই শিবানী একটি কন্যা প্রসব করেন। তার টানা টানা চোখ-নাক, মাথায় কালো কোঁকড়া চুল।

শিবানীর স্বামীর নাম ভূধর। তাই তাঁর স্বামী নিজের নামের আদ্য-অক্ষর দিয়ে দুটি নাম মনোনীত করেছিলেন, ছেলে হলে 'ভুবনমোহন', মেয়ে হলে 'ভুবনমোহিনী'।

তাঁদের স্নানের ঘাটের অদূরে, যেখানে শিমূল শিরীষ বাবলা বকুল জড়াজড়ি করে নদীর স্বচ্ছ জলে মুখ দেখে, তাদের নীচে ভাঁটির ফুলের আস্তরণ। সেইখানে মাটির তলায় ভুবনমোহিনী ঘুমিয়ে থাকল।

শোকে দুঃখে প্রথম জীবনের তার মাতৃত্ব সুকোমল বুকে একটি তীক্ষ্ণধার কাঁটার মত বিঁধে রয়েছে।

তারপরে তিনি তিনটি পুত্রের জননী হয়েছেন। কিন্তু ভুবনমোহিনী আর ফিরে আসেনি, প্রথমেই ভয়ে-ভীতির সঞ্চার হওয়াতে পরে শিবানীর নামের আদ্য-অক্ষর দিয়ে শিবানীর তিনটি ছেলের নামকরণ হয়েছিল—'শক্তিধর', 'শশধর', 'শশাঙ্ক'।

কতকাল পরে আজ আবার তাঁর মনে পড়ল প্রথম শোকের তীব্রতা। শোকে তিনি এতই অভিভূত হয়েছিলেন যে নববসন্ত সমাগমে যখন শিমূল ফুলের গাছ লালে লাল হয়ে যেত, বাবলা ও ভাঁটি বন ফুলে ফুলে ছেয়ে যেত, তখন শোক-বিহ্বলা জননীর মানসচক্ষে ভেসে আসত ভুবনমোহিনী যেন শিমূল ফুলের রাঙা চেলি পরে নাকে বাবলা ফুলের নাকছবি ও ভাঁটিফুলের নোলক দুলিয়ে পাকা শিরীষ ফুলের নূপুর পায়ে সন্ধ্যার আবছা আলোয় নদীতীরে নেচে বেড়াচ্ছে। দিনে দিনে সে স্বপ্ন কল্পনাচোখের সামনে থেকে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আজ আবার তারা যেন জাগ্রত হল চোখের সামনে।

জীবনের শেষ সীমায় এসে আর কি হবে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে। সূচীশিল্পের আর কি প্রয়োজন? একে বয়সের ভারে আনত, তারপর বৈধব্যজীবন সুখের নয়। দূরে সুদূর হতে খেয়া নৌকোয় ভেসে আসছে তার বৈঠার শব্দ, মত্ত পবনে শুনতে পাচ্ছেন। তীরে তরী ভিড়তে যা বিলম্ব।

হোক বনের পাখী, তাদেরও সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে। তাদেরও সন্তান-স্নেহের প্রবাহ বয়ে যায়। সন্তান-সম্ভাবনায় খড়কুটো সংগ্রহ করে কত যত্নে নীড় রচনা।

ওদের রক্ষিত দ্রব্য অপহরণ করে কি হবে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দিয়ে?

শিবানী বিগলিত হৃদয়ে ডাকেন, "এই নফ্‌রা, শোন্, ডিম দুটো কি আমাদের জামগাছ থেকে আনলি?"

নফ্‌রা তার আটহাতি মলিন বস্ত্রের খুঁটে টাকাটি সযত্নে বেঁধে গামছা দিয়ে গা ঝাড়তে ঝাড়তে চলে যাচ্ছিল। শিবানীর দিকে এগিয়ে এসে বলল, "না মাঠান, আমাদের জামগাছে এখনও ডিম পাড়েনি, দু-একদিনের মধ্যেই পাড়বে। আমি মল্লিক বাগানের বটগাছের বাসায় থেকে ডিম আনিছি। দুইটাই হইছিল। পক্ষী দুডো কি বজ্জাত। আমার সারা গায়ে ঠোকর দিয়ে দিয়ে চামড়া তুল্যা ফেলিছে, পিছু পিছু বাড়ি অবধি আসিছে।"

শিবানী ক্ষোভের হাসি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, বড় মন্দ পাখী দুটো। তারা চুপ করে না থেকে তোকে ঠোকর মারল কেন? তুই যেমন করে ডিম দুটো গামছা বেঁধে নিয়ে এসেছিলি, তেমনি আলগা করে রেখে দিয়ে আয় মল্লিক বাগানের গাছের বাসায়। আমি তোর সঙ্গে যাচ্ছি। এক টাকায় এনেছিলি, আর এক টাকা দেব, রেখে দিয়ে আয়।"

নফ্‌রা হতবুদ্ধি, মাঠান বলে কি! আর একটা টাকার প্রাপ্তির আনন্দও তার মনে উদয় হল না। যে ডিম ডিম করে অস্থির হচ্ছিলেন, তা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছেন কেন?

নফ্‌রা বলে, "আপুনি সে ধাঁতা বনে যাবা ক্যামন কর‍্যা?"

"তুই যেমন করে গিয়েছিলি, আমিও তেমনি করে যাব"—বলে শিবানী নফ্‌রার সঙ্গ নিলেন।

একনিষ্ঠ

স্নানের ঘাটে মহিলা মজলিস বসিয়াছে। অদ্যকার আলোচ্য বিষয় দক্ষবালার স্বামী বিলাসের নৈতিক চরিত্র। লোকটা তেমন ভাল নহে, তবে যতটা রটে, ততটা কিছু ঘটে নাই। গতরাত্রে জেলেপাড়ায় বাতাসীর ঘরের কাছে, কে নাকি তাহাকে ঘুরিতে দেখিয়াছিল।

পাড়ার মুকুটমণি ও প্রধানা কালা কাহারো অন্যায় অনাচার নির্বিচারে সহিতে পারে না। সামান্য তুচ্ছ ঘটনা তাহার সুতীব্র সমালোচনায় এবং কুৎসা প্রচারের কালিমায় বৃহৎ রূপ ধারণ করে। একে ক্ষুরধার রসনার অধিকারিণী তায় স্বচ্ছল গৃহের গৃহিণী বলিয়া পাড়ার মেয়েরা চিরদিনই তাহাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। কেহ তাহার মতের বিরুদ্ধে 'টুঁ' শব্দ করিতে সাহস পায় না।

নিতান্ত অবলা অখলা প্রকৃতির দক্ষবালা একঘাট লোকের মাঝখানে স্বামীর হীন স্বভাবের উল্লেখে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। একটা কথা না বলিয়া কাহারো দিকে না চাহিয়া নতনেত্রে পিতলের কলসীটা মাজিয়া মাজিয়া সোনার মত ঝকঝকে করিয়া তুলিতেছিল।

দক্ষবালার নীরবতায় প্রখর প্রগতিবাদিনী বগলা মনে মনে বিরক্ত হইতেছিল। মেয়েদের ঢাকা চাপা মিনমিনে ভাব সে দেখিতে পারে না। চুপ করিয়া থাকিলে কি পুরুষ মানুষকে কখনও সায়েস্তা করা যায়, তাহার গলার সঙ্গে গলা মিলাইয়া চারিদিকে বিষ ছড়াইতে না পারিলে ঘাড়ের পেত্নী সহজে নামে না।

দক্ষবালার নিকট হইতে উত্তরের প্রতীক্ষায় বগলা আর থাকিতে পারিল না, গলাজলে দাঁড়াইয়া ঝঙ্কার দিল, "কি লো দাক্ষি, মুখে যে তোর রা' নেই? সব জেনে শুনে অমন স্বোয়ামীর ভাত গিল্‌বি কোন লাজে? আমার অমনি

ধারা হলে, আমি ওর গোঁফ দাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতাম। ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বের করতাম। নয় নদীর জলে ডুবে মরতাম।"

একটি চপলনয়না কিশোরী গায়ে সাবান ঘষিতে ঘষিতে বলিয়া উঠিল, "তোমার কথা আলাদা ঠানদি, তুমি ভাগ্যি করে বাপের বিষয় পেয়েছো; ঠাকুর্দ্দার ব্যাড়ানোর বয়েস পার করে দিয়েচো। তোমার বুদ্ধি বিবেচনা আছে। তুমি যা পারবে বৌ তা পারবে ক্যাম্‌নে? ওর বাপ্‌ মা নেই, তিনকূলে দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ও যদি স্বামীর সাথে ঝগড়া বাধায়, সে যদি রেগে বাড়ী থেকে বের করে ত্থায় ওকে। তবে যাবে কোন চুলোয় বলতে পার? যাদের বিদ্যাবুদ্ধি নেই, তারা যে একেবারেই নিরুপায়, অসহায়। মুখ্যুস্থখ্যু মেয়েরা চিরকাল যেমন মুখ বুঁজে চোরের মতো কীল খেয়ে আস্‌বে। এখনো তেমনই খাবে। আমাদের আবার আলো, আমাদের আবার অন্ধকার।"

কালা সগর্জ্জনে কহিল, "ছোট হলে যে ছাগলে মুড়ে খায়, তা কি জানিস নে কুঁড়ি? গোড়া থেকে শাসন না করে মেয়েরাই যে পুরুষ জাতের আস্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে। বিষয় আশয় কিছু না। আসলে থাকা চাই বেঁধে রাখবার ক্ষমতা। আজই না ওঁর বয়েসে ভাটা পড়েচে, কিন্তু বলুক দেখি গাঁয়ের কেউ; কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে, বগলা বামুনীর স্বোয়ামীর নামে একটা কথা। আমি যা পেরেচি; অন্যেরই বা সে মুরোদ থাক্‌বে না কেন? বিয়ে করা বৌকে বের করে দেওয়া অত সোজা নয় লো, ঘাড় ধরতে এলে কাণে হাত বাড়ালেই ওরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ওর মরণ—ও যাবে অমন গুণের স্বোয়ামীর ভাত খেতে, সোহাগ করতে। আমি হ'লে ম'রে যেতাম।"

"তোমার ভাগ্যি ভাল ঠানদি, তুমি স্বামী সোহাগিনী। কিন্তু সবার পক্ষে কি প্রাণ দেওয়া সহজ? কয় জনা প্রাণ দেবে? কে না ডুবে ডুবে জল খায়? সমস্ত জেনে শুনে বৌরা না জানার ভাণ করে নিজেদের মান বজায় রাখে।"

রায়গৃহিণী গামছা চিপিতে চিপিতে ফোঁড়ন দিলেন "মা গো একরত্তি মেয়ে, কি বচনবাগীশ! জানা শোনার কোনটা বাকী নেই। এতই যদি জ্ঞানকাণ্ড,তা হ'লে স্বোয়ামীকে নজরের বাইরে রেখে বাপের বাড়ী হাওয়া খেতে এয়েচিস ক্যান লো? আঁচলের তলায় লুকিয়ে রেখে ডুবে ডুবে জল খাওয়া এখন থেকেই বন্ধ করে দে?"

"তার দরকার নেই দিদিমা, আজো আমি কুঁড়িমা ওর। স'বে এক বছর

বিয়ে হয়েচে, আগে পুরাণো হ'তে দাও। নতুন নতুন তেঁতুল বীচি, পুরাণো হ'লে বাতায় গুঁজি। আমার দোষ কি বল তো, তোমরাই তো আমাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে পাকা ঝানু করে তুলেচো।"

বলিতে বলিতে কুঁড়ি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নদীর কলকল ছলছল শব্দের সহিত সমবেত স্ত্রীকণ্ঠের খিলখিল হাস্যধ্বনি মিশিয়া গেল।

সেদিন অনেকক্ষণ জলে থাকিবার জন্যই হোক অথবা নবীন বর্ষা সমাগমেই হোক, সেই রাত্রে বগলার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। প্রথম কয়েকদিন কাটিয়া গেল আদার রস, তুলসী পাতার রসের উপর দিয়া। তাহার পরে ডাকিতে হইল কবিরাজকে।

কবিরাজ দেখিয়া শুনিয়া জানাইলেন "জ্বর সাধারণ হইলেও বুকে সর্দ্দি বসিয়াছে, অত্যন্ত সাবধান না হইলে গুরুতর হইবার আশঙ্কা আছে।"

বুকের সর্দ্দির কথায় বগলা ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল। জীবনে ঢের ভোগ হইয়াছে, কিন্তু এখনো ভোগের পিপাসার নিবৃত্তি হয় নাই। সোনার সংসার, অনুগত পুত্রকন্যা, একনিষ্ঠ স্নেহময় প্রেমময় স্বামী। এত সুখ রাখিয়া সাধ করিয়া কে মরিতে চায়? বগলা মরিতে চাহিল না। মৃত্যুভয়ে ভীতা হইয়া সে নিজের প্রতি অতিশয় যত্নশীল হইল।

স্বামী তারিণীচরণের বয়স হইয়াছে; তাহাকে দিয়া রোগের সেবা চলিতে পারে না। মেয়েরা শ্বশুরালয়ে, ছেলেটি প্রবাসে। আসন্নপ্রসবা বধূ নিকটে আছে বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা সেবাশুশ্রূষার আশা সুদূরপরাহত। পেটেরটির বোঝা বহিয়া কোলের অস্থিচর্ম্মসার এক বছরের শিশু লইয়া সে বিব্রত। অথচ—সেবার অভাবে বগলা মরিতে পারে না।

সেদিন তারিণীচরণ স্ত্রীর শিয়রে বসিয়া পাখা করিতেছিল। বগলা খপ করিয়া স্বামীর হাতখানা মুঠায় চাপিয়া কহিল "দেখ, বুকে সর্দ্দি জমলেই তো নিমোনিয়া হয়। নিমোনিয়া থেকে ডবল নিমোনিয়ায় দাঁড়ায়। আমার যদি তাই হয়? আমি যদি না বাঁচি?"

সজল নয়নে তারিণীচরণ উত্তর করিল "ছিঃ ছিঃ বৌ, অমন কথা বলতে নেই। তোমার ওসব ছাই ভস্ম হতে যাবে কেন। সামান্য সর্দ্দি দুই দিনেই সেরে যাবে। বৌমা এক্ষুণি বুকে ওষুধ মালিশ ক'রে দেবে। পায়ে গরম তেল দিয়ে দেবে। বল তো আমিও দিয়ে দিতে পারি।"

স্বামীর সেবার আগ্রহে বগলা পুলকিতা হইয়া কহিল, "না, তোমাকে দিয়ে

আর এ বয়েসে পদসেবা করাতে চাইনে। বৌমার কথা বল্‌বো, ও আমার সেক তাপ দেবে কখন? ছেলেটা অষ্টপ্রহর চামবাদুড়ের মতন কাঁখে ঝুলেই রয়েচে, দিনরাত ট্যাঁ ট্যাঁ করবে। ওকে দিয়ে কোন কিছু হবার নয়। এদিকে ঠিক মতন সেক তাপ না হলে, আমার অসুখ নিশ্চয় বেড়ে যাবে। এখন ভাবচি, কাল রোগ যখন বুকে এসে বাসাই বাঁধলো, বছর পাঁচেক আগে বাঁধলে তোমার তখন দর থাকতো। পাঁচ বছরে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েচি, বৌ ঘরে এনেচি। এখন এ বুড়ির বদলে সোন্দর, তাজা, টাট্‌কা একটি আনবার তোমার আর আশা নেই।"

তারিণীচরণ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "এ কি বৌ, তোমার মুখে এমন কথা? এতকাল সংসার করে আজো তুমি আমায় চিনতে পারলে না? পাঁচ বছর কি বলবো, বিশ বছর আগেও যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে তবু আমি অন্য স্ত্রীলোককে স্পর্শ করতাম না। অন্যের সঙ্গে যাবার আগে নদীর জলে প্রাণ বিসর্জন করতাম। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমার বুড়ীই ভাল। তাজা টাটকা যারা তারাই তাজার সন্ধানে থাকুক। যত্নের অভাবে আমি তোমার রোগ বাড়তে দেব না, সে ভয় করো না। এক্ষুনি আমি তোমার মালিস দেবার লোক আনচি।"

আনন্দে বগলার চোখ জলে ভরিয়া গেল, স্ত্রীলোকের স্বামী হইলে এমনিই তপস্যার নিধি হওয়া উচিত, যেমন একনিষ্ঠ, তেমনি হৃদয়বান।

লোকে কথায় বলে আলসের গঙ্গা নিকটে মিলিতে বিলম্ব হয় না। ভিন্ন গ্রাম হইতে বাড়ীর বৃদ্ধা দাসীর বিধবা বোনঝি সুখীর আসিতে দেরী হইল না। সুখী ঝিগিরি করিয়া খাইলেও দিব্য ফিট-ফাট, বয়সে পাক ধরিলেও প্রসাধন-পটু। কোমরে রূপার গোট, আঁচলে চাবি বাঁধা। ঠোঁট পান দোক্তায় রঞ্জিত। চুল পাতা কাটা।

নূতন ঝি যা হোক, তাহার কিন্তু পয় আছে। বাড়ীতে পা দিতে না দিতে, বগলার জ্বর কমিয়া গেল, বুকের দোষ আরাম হইল। স্বামী সঙ্গের আশায়, আদরের আশায় সে কিন্তু তাহা স্বীকার করিল না। কৃত্রিম রোগ বৃদ্ধির ভাণ করিয়া তারিণীচরণকে কাছে কাছে রাখিতে লাগিল।

তারিণীচরণের নির্দেশে সুখী রোগীর সেবা করে বটে কিন্তু সে সেবার মধ্যে কোথায়ো ফাঁকি নাই, শিথিলতা নাই। হাত টেপা শেষ করিয়াই পায়ে হাত দেয়, পা হইতে হাত আবার মাথায় যায়। ঔষধ দিতে ভুল হয় না, পথ্য

আনিতে বিলম্ব করে না। শুধু কি তাই, রোগীর বিছানা নিজের হাতে করিয়া দপদপে করিয়া রাখে, ঘরের মেঝে মুছিয়া তকতকে করে। তারিণীচরণও সুখীর নিপুণ হাতের সেবা হইতে বঞ্চিত থাকে না। ঝকঝকে ডিবায় পান সাজিয়া দেয়। পরিপাটি করিয়া বিছানা ঝাড়িয়া পাতে। হাতে হাতে কাপড় গামছা যোগায়।

দেখিয়া শুনিয়া বগলা একদিন সুখীকে ডাকিয়া কহিল "দেখ সুখি, তুই আর জন্মে বোধ হয় আমার কেউ ছিলি, নইলে পরের মেয়ের কাছ থেকে এত কেউ প্রত্যাশা করে না।"

সুখী ছল ছল চোখে জবাব করিল "যা কইলেন মা, তা তিন সত্যি, আগের জন্মে আপনি আমার মা ছিলেন; তা আমি টের পাইচি। আমি পোড়া কপালি, কত দুঃখু ধান্নার পরে আমার সাক্ষাৎ মার ছিচরণে আশ্রয় যে পাইচি। আপনি দয়া ধর্ম্ম করে আমারে ছিচরণে ঠাঁই দিয়ে রাখবেন মা, চরণ ছাড়া করবেন না।"

স্নেহে করুণায় বিগলিত হৃদয়ে বগলা বলিল "তোর ভয় নেই সুখী, তুই জন্ম জন্ম আমার মেয়ে হয়েই থাকিস, আমি তোকে কক্ষনো কাছ ছাড়া করবো না।"

সুখী আশ্বস্ত হইয়া বগলার পায়ে ঢিব ঢিব করিয়া প্রণাম করিল। রোগ-মুক্তির পর বগলার বিহ্বল নয়নে বিশ্ব যেন অলকার দ্বার খুলিয়া দিল। যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ হইতেছিল তাহাই মধুর হইতে মধুরতর লাগিতেছিল। বয়েস যেন অনেক—অনেক দূরে পিছাইয়া গিয়াছে, শুষ্ক প্রৌঢ় জীবনে জাগিতেছে নবীন বসন্তহিল্লোল। সংসারকে লাগিতেছে—শান্তির আবাসভূমি, প্রিয়জনেরা প্রিয়তর। স্বামী হইয়াছে তরুণ দেবতার মত সৌম্য সুন্দর।

সুজির রুটী পথ্যের পরে বগলা অনেকটা সবল অবস্থায় উন্নীতা হইল। পরের দিন অন্নপথ্য, সুদীর্ঘ একপক্ষ কাল পরে। ভেতো বাঙ্গালীর ভাতেই তৃপ্তি।

গ্রামের বাজার বেলায় বসে, তাই সহৃদয় স্বামী তারিণীচরণ পূর্বদিন বাজার হইতে বড় বড় কই মাছ আনিয়া দিলেন। বগলার পূর্ব জন্মের মেয়ে সুখী মাটির কলসীতে সযত্নে কইমাছ জিয়াইয়া রাখিয়া দিল। বাগান খুঁজিয়া পলতা-পাতা সংগ্রহ করিল, বগলা ভাতের সঙ্গে পলতার বড়া খাইতে চাহিয়াছে। পুরাতন চাল ঝাড়িয়া বাছিয়া রাখিল। কচি ঝিঙ্গা পটল ভাতে মুখরোচক

বলিয়া সুখী তাহা যোগাড় করিয়া রাখিতে ভুলিল না। ভুলিবে কিরূপে, জন্ম জন্মান্তরের সম্পর্কের টান কি এতটুকু কথা?

সেদিন রাতে ভারী গুমোট পড়িয়াছিল। আকাশে ভারে ভারে বর্ষার মেঘ জমিতেছিল, কিন্তু বর্ষণ হইল না, বাতাস স্তব্ধ।

ছোট্ট ফালি ঘরটিতে গরমে বগলা ঘুমাইতে পারিতেছিল না। বাড়ীর সব চেয়ে বড় ঘরখানা কর্তাগৃহিণীর। যোড়াখাটে চিরন্তন বিছানা পাতা। বাতাসের অত্যাচারে রোগবৃদ্ধির আশঙ্কায় বগলা সাধের শয়ন মন্দির ছাড়িয়া তাহারই সংলগ্ন ছোট ঘরে স্বেচ্ছায় রোগশয্যা পাতিয়াছিল। তারিণীচরণের আবার অন্ধকারে ঘুম হয় না, সারারাত আলো চাই। বগলারও সেই অভ্যাস, কিন্তু অসুখে আলোর প্রতি বিরাগ হইয়াছে। তাই মাঝের দরজাটা ঈষৎ ভেজানো থাকে।

বগলার ঘরের মেজেয় সুখী শয়ন করে। প্রতি দিনের মত সুখী মেজেয় অকাতরে ঘুমাইতেছিল। তারিণীচরণেরও সাড়া শব্দ নাই, গভীর নিদ্রায় মগ্ন। বাড়ীখানি নীরব নিঝুম, জগৎ নিস্তব্ধতার কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে। কেবল নিদ্ নাই বগলার আঁখি পাতে। বগলা রাতটাকে যেন দুই হাতে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচে। প্রভাতে ভাত খাইবার লোভে, না আরো কিছুর লোভে? প্রধান লোভ—তাহার যোড়াখাটের বিছানা।

তারিণীচরণ একদিন নিভৃতে কাণে কাণে কহিয়াছিল "তুমি শিগ্‌গীর সেরে ওঠো বৌ, আমি যে শূন্য বিছানায় থাকতে পারচি নে। রাতে আমার ঘুম হয় না। তোমার বিছানার দিকে চাইলে প্রাণের ভেতর খাঁ খাঁ করে। তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী, হৃদয়ের লক্ষ্মী, তুমি কাছে না থাকলে আমি আরাম পাই না।"

কথাগুলি তরুণের মুখ হইতে বাহির হইলেই শ্রুতিমধুর হইত; কিন্তু সবই যদি তরুণ তরুণী একচেটে করিয়া রাখে তা হইলে বুড়ো বুড়ী যায় কোথায়? মানুষের বয়স বাড়িলেই কি রসের সমুদ্র শুখাইয়া যাইবে। স্বামীর সেই কবিত্বের রেশ আজও বগলার হৃদয় তন্ত্রীতে রিনিঝিনি বাজিতেছিল। নিদ্রাহারা বগলা আপনার মনে কল্পনার জাল বুনিতে লাগিল—প্রভাত হইলেই সে গরম জলে সুগন্ধি সাবানে আরোগ্য স্নান সারিয়া লইবে। অপরাহ্ণে সুখীর সাহায্যে কেশ রচনা করিয়া গত পূজার শান্তিপুরী শাড়ীখানি পরিবে। সুখী চুলের পাট বেশ জানে। এই কয়েক দিনে তাহার সামনের পাকাচুল বাছিয়া জট

ছাড়াইয়া দিয়াছে। পান সাজে ভাল, স্বামী সুখীর সাজা পানের কত প্রশংসা করেন। বগলা সন্ধ্যায় সুখীকে দিয়াই এক ডিবা পান সাজাইয়া রাখিয়া দিবে। আর রাখিয়া দিবে কতকগুলি বকুল ও চাঁপা ফুল। মালা গাঁথা এখন শোভা পায় না, মালার পরিবর্ত্তে মাথার বালিসের পাশে বাটি করিয়া ফুল রাখাই ভাল।

হৃদয়ের পটভূমিকায় নানা রং-এর রঙ্গীন ছবি আঁকিতে আঁকিতে বগলা অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িল। এক চাপা হাসির মূর্চ্ছনায় সহসা বগলার সুপ্তির ঘোর যখন ভাঙ্গিয়া গেল তখন রাত প্রায় শেষ হইয়াছে। বিদায়গামী চন্দ্র মলিন পাণ্ডুর মুখে আকাশের কোণে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রাত্রের গুমোট কাটিয়া গেছে, ঝিরঝিরে বাতাস বহিতেছে। সুখীর বিছানা শূন্য, মাঝের ভেজানো দরজা অনেকটা খোলা। বগলার অত সাধের যোড়াখাটে তারিণীচরণ একাকী নাই।

অকস্মাৎ বগলার সমস্ত শরীরের মধ্যে দিয়া একটু তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহ বহিয়া গেল। সে উঠিয়া বসিতে পারিল না, দুই হস্তে চক্ষু মুদিয়া পুনরায় তাকাইল, না, বিভ্রম নহে, ভ্রান্তি নহে, প্রখর দিবালোকের মত অতি সুস্পষ্ট স্বচ্ছ। কোথায়ো ঝাপ্‌সা নাই, আবরণ নাই। বগলা চিৎকার করিয়া কি যেন বলিতে যাইয়া পারিল না। তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ ভেদ করিয়া এক অব্যক্ত ধ্বনি মাত্র বাহির হইল। দুর্বল মস্তিস্ক ঝিমঝিম করিতে লাগিল, সে সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

প্রভাতে বধূ আসিয়া হাসি মুখে ডাকিল "মা, আজ এখনো যে আপনি মুখ ধুলেন না ? আপনার দুধ জাল দিয়ে রেখেচি। এইবার আপনার রান্না চড়িয়ে দেব। কই মাছের ঝোল, পলতার বড়া সাথে একটু সুক্তোও রেঁধে দেব। কতদিন খান না ?"

বগলা চোখ মেলিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। প্রভাতের রৌদ্রে ভুবন ভরিয়া গেচে। গাছে গাছে পাখী ডাকিতেছে। কেহ কোথায়ো নেই। তাহার আঁধারের বিভীষিকা আঁধারে মিলাইয়া গিয়াছে।

বগলা আস্তে আস্তে বিছানায় উঠিয়া বসিল। তাহার পর আবেগের স্বরে কহিল "আমার মুখ ধোবার দেরী আছে বৌমা, রান্নাবান্না পরে হবে। তুমি আমার হাতবাক্স থেকে গোটাকয়েক টাকা নিয়ে, তাই দিয়ে নতুন ঝিটাকে বের ক'রে দিয়ে এসো। এক্ষুনি এই দণ্ডে বের করে দাও।"

বধূ শ্বাশুড়ীর দিকে চকিত কটাক্ষে চাহিয়া বিস্মিত হইল। বগলার সদা অপ্রসন্ন রুক্ষ মুখের উপরে রোগ যে একটি সকরুণ কোমল আভা মাখিয়া দিয়াছিল, আজ তাহা মুছিয়া গিয়াছে। বগলা কি করিতে পারে? ইহার বেশি ক্ষমতা তাহার কোথায়? অপরকে বিধান দিলেও সে এখন তাহার স্বামীর গোঁফ দাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিতে পারিল না। নদীর শীতল জলে ডুবিয়া মরিবার কথাও মনে পড়িল না।

মঞ্জরী—

হিসাবের খাতা

ইলা আজ ভারী ব্যস্ত, 'মুক্তি সঙ্ঘের' অধিবেশন নিয়ে। অনেক দিন থেকে তাদের নাচ-গানের মহড়া চলেছে। সহরের মান্যগণ্য অতিথিদের আমন্ত্রণ-লিপি বিতরণ করা হোয়েছে। মুক্তি সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাত্রী এবং প্রধানা বলে এর সমস্ত দায়িত্ব ইলার।

অদ্য সন্ধ্যায় উৎসব। বেলা আর বেশী নাই। উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করে তারই ফাঁকে ইলা এসেছে নিজের প্রসাধন সারতে। সুগন্ধী সাবান মেখে গোলাপ জলে মুখ ধুয়ে সে প্রসাধন কক্ষে ঢোকামাত্র অকস্মাৎ আবির্ভূত হলেন ইলার দিদি লীলা। তাঁর বয়েস বেশি নয়, ইলা অপেক্ষা পাঁচ ছ'বছরের বড়। কিন্তু ধরণ-ধারণ প্রাচীনা গৃহিণীদের মতন। শান্ত সরল স্বভাব, ফোটা পদ্মদলের মতন চক্ষু কোমলতায় সরসতায় ঢলঢলে। বর্ণ শ্যাম। কিন্তু সারা মুখে এক অপার্থিব করুণামাখা।

কোন সাড়া শব্দ না দিয়ে পর্দা সরিয়ে সন্তর্পণে কেউ যে কারও কাপড় ছাড়বার ঘরে ঢুকতে পারে, ইলার এ ধারণা ছিল না।

সে আয়নার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে লীলাকে স্বাগত সম্ভাষণ করলো, "কি দিদি, বেড়াতে এলে দিন বুঝে? আজকে তোমার আবার সময় হোল? আমি এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি সন্ধ্যে সাতটায় আমাদের ক্লাবে জলসা সুরু হবে। আর একটা কথা শোন, রাগ না ক'রে শিখে রাখো, কারও পোষাক কামরায় না বলে কয়ে হুট করে ঢুকতে নেই।"

লীলা বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হোয়ে জানালার গরাদের ওপরে বসে মুখ টিপে হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, "তুই একলা ছিলি বলেই ঢুকেছি, দোকলা থাকলে আসতাম সরে। তোর সভা-সমিতি, তুই চলে যা, আমার জন্যে দেরী করিস নে। কতদিন তোদের সঙ্গে দেখা হয় না, তাই একটুখানি দেখতে

এলাম। তোর দর্শন পেলাম, এইবার চন্দনকে দেখে চলে যাই। সে বাড়ী আছে তো?

ইলা সর্বাঙ্গে ক্রীম ঘষতে ঘষতে ঘাড় নাড়লো, "না, দিন তিনেক হোলো মামলা করতে পাটনায় গেছে। ফেরবার কথা কাল ভোরে। মাত্র ক'ঘণ্টার জন্যে আমার এবারের শো'তে ওর যোগ দেওয়া হল না দিদি। অনেক করে বারণ করেছিলাম, এখন কাজ নিও না, তা শোনা হল না। টাকাটাই ওর হোল সবচেয়ে বড়।"

"টাকা বড় না হোলে চলবে কিসে ইলা? দিনরাত তোর হৈ-চৈ অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান। ভাগ্যে চন্দনের বাবা সবেধন নীলমণি এক ছেলের জন্যে বাড়ী, গাড়ী, ব্যাঙ্কের পাশবই রেখে গেছেন, নইলে তোর নিত্যি নূতন রাজসূয় যজ্ঞের কি দশা হতো?"

"হবে আবার কি? স্ত্রী পোষবার সংস্থান না থাকলে আমি কখনো চন্দনকে বিয়েই করতাম না। তোমাদের মত বিয়ে করে হাতা, বেড়ি, খুন্তি নিয়ে আমার একদিনও চলতো না দিদি। এতে তোমরা আমাকে যত মন্দ বল না কেন, আমার বাপু স্পষ্ট কথা। আমাকে পেতে হলে যা দাম দেওয়া উচিত, সেটা জেনে-শুনেই না ও আমাকে বিয়ে করেছিল।" বলে ইলা মুখে গলায় গোলাপী পাউডারের প্রলেপ দিতে লাগলো।

মূল্যবান টিস্যুর শাড়ী-জামায়, হীরা-মুক্তোর আভরণে ইলা যেন মুহূর্তে ঝলমলে হয়ে উঠলো।

সুসজ্জিতা বোনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে অপার স্নেহে গৌরবে লীলার সুকোমল হৃদয় ভরে গেল।

সহোদরা হলেও উভয়ের আকৃতি প্রকৃতি অবস্থায় অনেক প্রভেদ। একজনা জীবনের সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ ভাগ্যবিধাতার বিধান ভেবে সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়ে পরিতৃপ্ত, প্রসন্ন। কোন বিষয়ে ক্ষোভ নেই, উত্তাপ নেই। লীলা যেন স্ফটিকস্বচ্ছ সরোবর, তাতে বাসনার খরস্রোত উদ্দাম বেগে প্রবাহিত হয় না। অভাবের তরঙ্গ হৃদয়ের তটভূমিতে আঘাত করে না। ক্ষুদ্র জলাশয় আপনার ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ।

ইলা ক্ষ্যাপা পাহাড়ী নদী। প্রবল তার গতিভঙ্গি। দুর্নিবার বেগে বাধা-বিঘ্নের উপলখণ্ড ঠেলে ফেলে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

টুলো পণ্ডিত ঠাকুরদাদার কাছে লীলার মুকুলিত জীবনের প্রথম উন্মেষ হয়েছিল। তারপর তাকে বিকশিত করেছিল স্কুল-শিক্ষক স্বামী শঙ্কর।

ঠাকুরদাদা টুলো হলেও তাঁর ছেলে অর্থাৎ লীলা, ইলার বাবা হয়েছিলেন নব্যপন্থী। বড় মেয়ের শিক্ষা সংস্কৃতির সুযোগ সুবিধার আক্ষেপ মেটালেন ছোটকে দিয়ে।

ইলা সাত বছর বয়সে এসেছিল নগরীর ছাত্রী-নিবাসে। নবযুগের নবীন আলোকে উজ্জ্বল ঝকঝকে হতে তার সময় লাগেনি। বি-এ পাশ করবার পর ইলার নূতন নীড় রচনা হোয়েছিল তরুণ ব্যারিস্টার চন্দনকে নিয়ে। বিবাহ ব্যাপারে ইলার বাবাকে কোন বেগ পেতে হয়নি। বিয়ে স্থির করেছিল স্বয়ং পাত্র-পাত্রী। বাবা অবশ্য সম্প্রদান করে আশাতীত আনন্দ লাভ করেছিলেন।

অধরোষ্ঠ রঞ্জিত করে নিপুণ তুলির টানে বঙ্কিম ভ্রূ দুটি আরও বাঁকিয়ে ইলা তার সাজ পর্ব শেষ করে ডাকলে, "দিদি চুপ করে রয়েছ যে? তোমার ভালবাসার চন্দনের দিকে টেনে কথা বলিনি বলে কি রাগ করেছ? আমার হয়ে গিয়েছে। চল এখন রাগে গরগর করে গাড়ীতে গিয়ে বসি গে। যাবার পথে তোমাকে ঢাকুরিয়ায় নাবিয়ে দিয়ে যাব।"

লীলা মাথা নাড়লেন, "না রে, রাগ করবো কেন? রাগের তুই কি বলেছিস? সত্যি তো চন্দন তোর মত এমন রূপ গুণের বউ কোথায় পেতো? তোর দুজনাই দুজনার তপস্যার ধন। বর কনের এমন রাজযোটক সচরাচর মেলে না।"

ইলা খিল খিল করে হেসে অস্থির, "দিদি, তোমার উন্নতির কোন আশা নেই। যুগ যত এগিয়ে আসছে, তুমি তত পেছিয়ে যাচ্ছো। আমাদের বিয়ে হয়েছে পাঁচ বৎসর, এখনো তোমার বর কনের উপমা, যোটকের বিচার। তোমার মিল হবে চন্দনের সঙ্গে। সে তোমার যোটকের মীমাংসা করে দেবে। আজকাল এই সবে তার ভারী আগ্রহ। রাজ্যের আজে বাজে বই নিয়ে মত্ত হয়ে রয়েছে। কোনদিন বা সংস্কৃতের ব্যাখ্যা নিয়ে তোমার কাছে ছুটে যাবে। ছল ছুতোয় তোমার প্রশংসা হয়েছে যেন ওর জপের মালা। 'আমাদের লীলা-দিদির মতন মহীয়সী মহিলা ভূভারতে দুটি নেই'।"

আত্মপ্রশংসায় লীলার মুখে পলকে যেন আবির খেলে গেল, সলজ্জে, সাগ্রহে লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, "চন্দন আমাদের আদি ভাষার উপাসক হয়ে উঠেছে শুনেছিলাম বটে। খুব পড়ছে বুঝি? কার কাছে পড়ে?"

"কি জানি, আমি তার খবর রাখি না। আমার সময় কোথা? চারিদিকের লোক যা কিছু করবে, সবার আগে ডাক পড়ে আমার। মুল্লুকের কাজ নিয়ে আমাকে কেবলি বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়।"

"সবাই আদর করে সাধে? চাঁদা দিতে ইলাদেবীর সমতুল্যা কে আছে? শোন ইলা, আমার একটা কথা, সর্বস্ব এমনি ভাবে উড়িয়ে দিলে তোর ছেলে মেয়ের জন্যে থাকবে কি?"

ইলার সুগঠিত নাসা কুঞ্চিত হল। সে ঝাঁঝের সঙ্গে উত্তর দিলে, "ছিঃ তোমার কথায় গা আমার ঘিন ঘিন করছে দিদি, তোমরা সন্তানের মা হওয়াটাকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ ভেবে নিয়েছ। আমরা তা ভাবতে পারি না। আমাদের জীবনের কত উদ্দেশ্য সার্থকতা প্রত্যেক মিনিটে। এর ভেতরে ছেলেমেয়ের জায়গা নেই। আমি এ জন্মে নোংরা জিনিসের প্রত্যাশী হব না।"

"তোর প্রত্যাশায় কি যায় আসে ইলা? তুই নেবার মালিক, দেবার মালিকের মরজি হলে মাথা পেতে নিতেই হবে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ভগবানের বিধানে।"

"দিদি, ভগবান তোমাদের মত মানুষকেই গাছের ফলের মত ফল সৃষ্টি করে ধন্য হোয়েছেন। বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের দেবার বাহাদুরী তাঁর নেই। বিয়ে, জন্ম এ দুটো মানুষ আয়ত্তে এনেছে। কিন্তু মৃত্যুর রহস্য এখনও ভেদ হয়নি, হবে ধীরে ধীরে। না, দিদি, আর নয়, আমার সময় নেই। আমি চলি, তোমার নড়বার লক্ষণ নেই। যাবে নাকি আমাদের ক্লাবে? কতবার কার্ড পাঠিয়েছি, তোমরা যাও না বলে এখন দেই না।

"না, ইলা, আমি যাব না। তোদের আধুনিক সমাজে আমার যেতে সঙ্কোচ হয়। আমি গেঁয়ো লোক, তারপর তেমন লেখাপড়া শিখিনি। কি বলতে কি বলে ফেলবো, কি করতে কি করে বসবো তাই আড়ালে থাকি।"

"তোমার কথা শুনে বাঁচিনে দিদি। সকলের সঙ্গে মেলামেশা করবার শিক্ষা তোমার হওয়া দরকার। ঘরের কোণে বসে থাকলে শিখবে কি করে? লেখাপড়ায় তুমি যে কাঁচা নও সেটা আমি বিলক্ষণ জানি। জামাইবাবুর পেশা গাধা পিটে ঘোড়া বানানো, তোমার পেছনে তাঁর কম সময় যায়নি। তারপরে দাদুর বিদ্যে তো আকণ্ঠ গিলে রয়েছ। তবু তোমার ভীত স্বভাব গেল না। জড়তা কাটলো না।"

"উগ্র ভাষার আরাধনা না করলে তেজী হওয়া যায় না ইলা, তার প্রমাণ

তুই। থাক, ঢের ঝগড়া হলো, তোর সময় নষ্ট করতে চাইনে। তুই চলে যা, তোর গাড়ীতে আমার যাওয়া হবে না। এ পাড়ায় এলাম যখন, তখন আমার ভাগ্নিটার একবার খোঁজ করে যাই।

ইলা পর্দা সরিয়ে বাইরে পা দিলে। দুই বোন পাশাপাশি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ইলা বললো, "নিজেকে আর অন্ধকারে রেখো না দিদি। জীবন আনন্দের, উপভোগের, তাকে বিড়ম্বিত ব্যর্থ করে লাভ কি? মুক্ত আত্মাকে অহরহই বেঁধে রেখে কি সুখ আছে?"

"সকলের সুখ শান্তির মূল এক নয় ইলা। প্রত্যেকে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। তা না হলে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখবেন কেন—

"আপন দীনতা নিয়ে আছি আমি ভালো।
কি হবে চির আঁধারে নিমেষের আলো॥'

তোর দিকে তুই সুখী, আমার দিকে আমিও সুখী।" বলে লীলা স্নেহভরে বোনের সুরঞ্জিত চিবুক টিপে দিলেন।

॥ ২ ॥

পরের দিন প্রভাতে চন্দন ফিরলো পাটনা হতে ইলা তখনও বিছানায়। রাত্রি একটার পরে শয্যা নিয়ে ভোরে কার ওঠবার দায়? অবশ্য যার প্রয়োজন থাকে, তার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু ইলার কিসের প্রয়োজন? বার মাস ত্রিশ দিন ঝি চাকর আয়া বাবুর্চি গৃহস্বামী এবং গৃহস্বামিণীর পরিচর্যায় সজাগ হোয়ে রয়েছে। দুটি প্রাণীর সংসার, তাতে দুজনাই টো টো কোম্পানীর ম্যানেজার। এ বাড়ীর ভৃত্য সম্প্রদায়ই কর্তা গৃহিণী। রামরাজ্যের অধিবাসী। কাজেই স্বামী আসছে জেনেও ইলা নিশ্চিন্ত হোয়ে শুয়ে থাকতে পেরেছিল। না থেকে তার উপায়ও ছিল না। এক মাসের ওপর সে যা পরিশ্রম করেছে তার সীমা পরিসীমা নেই।

একালে আনাড়ি মেয়েকে গড়ে পিঠে নিয়ে এত বড় অনুষ্ঠান নির্বাহ দেওয়া সহজ কাণ্ড কি? এ ব্যাপারে যেমন পরিশ্রম তেমনি অর্থব্যয়। ইলা তার যত্ন চেষ্টার সাফল্যলাভ করেছে যথেষ্ট। গত রজনীতে দর্শক দল তার নৃত্য গীত অভিনয় পরিকল্পনার সুখ্যাতি করেছেন অজস্র। ভ্রমর গুঞ্জনের মতন সে স্তবস্তুতির রেশ ইলার কর্ণমূলে গুণ গুণ করছে। হৃদয় অভিভূত হয়ে রয়েছে অপার আনন্দে।

চন্দন দ্বিতলে এসে পোশাক না বদলে প্রথমেই উপনীত হল স্ত্রীর শয্যাপাশে।

খাটের এক অংশ অধিকার করে মুদিত নয়না ইলার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে চন্দন সাদরে ডাকলে, "চন্দনচর্চিতা, এখনো শুয়ে কেন? অসুখ বিসুখ করেনি তো? ও ভুলে গিয়েছিলাম, কাল যে তোমার শো' ছিল। জাগরণে গেছে বিভাবরী?"

ইলা তাকিয়ে অভিমানে ঠোঁট ফুলালো—"সেই তো এলে, ক'ঘণ্টা আগে এলে চমৎকার জিনিসটি দেখতে পেতে। আমি অনেকবার অনেক কিছু করেছি, কিন্তু এবারের মতন এমন সুন্দর কখনো হয়নি। সবাই আমাকে ধন্য ধন্য করলো। অনেকে তোমার কথাও জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি লজ্জায় জবাব দিতে পারিনি। আমার এত আয়োজন সমারোহের ভেতর থেকে তুমি যে বাইরে যেতে পারো তা আমি বলি কি করে? সত্যি, তোমার উচিত হয়নি, লোকের কাছে আমাকে ছোট করা!"

"ছোট বড়র প্রশ্ন আসে না ইলা। কাল কিছু তোমার একটা নতুন ব্যাপার ঘটেনি। আকাশের রামধনুর মতন তোমার উৎসবের উদয় যেমন, অস্তও তেমনি। কবে আমি তোমার কিসে যোগ দিইনি বলতে পারো? হঠাৎ কাজ জুটে গেল, আমার মত মক্কেলশূন্য জাঁদরেল বার-এট্-ল'-এর পক্ষে এতগুলো টাকা ছেড়ে দেওয়া কি ঠিক হতো? অফুরন্ত আনন্দের অফুরন্ত মাশুল চাই যে।"

ইলা সচকিত হোল। দিদি যা উল্লেখ করেছিলেন, স্বামীও যে তারই আভাস দিচ্ছে। সে এদিকটা ভ্রমেও দেখেনি। নিত্য নব প্রমোদ প্রবাহে সে এতকাল নিরন্তর ভেসে চলেছে। তার বিশ্বাস হয়েছিল কোথাও তার আসক্তি নেই, বন্ধন নেই। মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত আনন্দের উদার নীলাকাশের তলে উড়ে বেড়ানই তার কাম্য। কিন্তু তারও যে আবার মূল্যের প্রসঙ্গ উঠতে পারে এটা ধারণা ছিল না। এই প্রথম তার স্মরণপথে ভেসে এলো তাদের আয়-ব্যয়ের হিসাবের খাতাখানা। বহুকাল সেখানা খুলে দেখা হয়নি। যখনই প্রয়োজন তখনই ব্যাঙ্কের দ্বার খুলে গেছে। স্বামীর যা সঞ্চয় সমস্তই ইলার হস্তগত। চন্দন কখনো তার খবর নেয়নি। অর্থের বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে শৈশব কৈশোর অতিবাহিত করে যৌবনেও সে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতি লক্ষ্যহারা।

অনুরাগের অঞ্জন আঁখিতে অঙ্কন করে একদিন সে কামনা করেছিল শোভাময়ী ইলাকে।

আকাঙ্ক্ষিত বস্তু করতলে পেয়ে চন্দন তার যথাসর্বস্ব পত্নীকে সমর্পণ করে পরম পুলকে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ করে নিয়েছিল। ইচ্ছাময়ীকে কখনো বাধা দেয়নি, তার বিঘ্নস্বরূপ হয়নি। অযাচিত প্রাপ্তিতে ইলা কিন্তু মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, হোয়ে গেছে সাধারণের বাইরে, কেমন যেন ছন্নছাড়া। ক্ষণবসন্তের প্রায় কোথা দিয়ে কেটে গেছে তাদের বিবাহিত জীবনের পাঁচটি বছর! বসন্তের স্মৃতি হৃদয়ে জাগে কি জাগে না, কিন্তু খাতার পাতায় রেখে গেছে তার বিদায়-বেদনা।

স্ত্রীর বিমনাভাবে চন্দন ধরে নিল তার অভিমান। এই অসামান্য মেয়েটির অভিমানও অসাধারণ। অভিমানের মেঘে গর্জন নেই বর্ষণ নেই। অখণ্ড নীরবতা।

ইলার মৌনব্রত ভঙ্গের আশায় চন্দন তার এলায়িত একখানা বাহু মুঠোয় চেপে স্নিগ্ধ কোমলস্বরে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, "যা আমার দেখা হোল না, তার জন্য দুঃখ কিসের ইলা? কাল যা যা হোয়েছিল সেইটে আমাদের বাড়ীতে করে আমাকে দেখিয়ে দাও না? অনেকদিন বাড়ীতে পার্টি দিচ্ছ না, এই উপলক্ষে সবাইকে পার্টিতে ডাকো। তৈরী জিনিষ আর একদিন করতে অসুবিধা হবে না।"

ইলা দারুণ উল্লাসে উঠে বসলো। তার ম্লান মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে গেল। স্বামীর গায়ে হেলে ইলা কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিলে, "তোমার কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি চন্দন, সাধে কি দু'বছরেই ব্যারিষ্টার হয়ে বেরিয়েছিলে? আমার অসাধ্য সাধনার ফল একরাতেই ফুরিয়ে যাবে মনে করে কি যে কষ্ট হচ্ছিল, তা তোমায় বোঝাতে পারবো না। ভাগ্যে তোমার মাথায় খেলে গেল। তাই আমি বেঁচে গেলাম। বাইরের ঝঞ্ঝাটের জন্য সত্যি অনেকদিন বাড়ীতে বন্ধু-বান্ধবকে ডাকা হয়নি। তারা ভেবেছে আমি বুঝি নিবে গেছি। তা কবে তুমি পার্টির যোগাড় করতে বল?"

"যেদিন তোমার খুসী। তবে আমার মনে হয় একটা স্মরণীয় দিন বেছে নিলে যেন ভাল হয়। ধর যেমন পয়লা আষাঢ়। দিনটা বেশ কাব্যগন্ধী।"

ইলা উত্তেজনায় স্বামীর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে সায় দিলে "কি সুন্দর তোমার আইডিয়া চন্দন, এমন আর কারও নেই। আমি চিনে নিয়েই না

তোমার গলায় বরমাল্য দিয়েছিলাম। হাঁ, আজকে বাংলা মাসের কত তারিখ? আমার আবার বাংলা তারিখ-মাস ঠিক থাকে না।"

"আমার বেঠিক হয়নি। আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের পঁচিশ দিন। আষাঢ়ের মোটে পাঁচ দিন বাকী।"

ইলা মহা চিন্তান্বিত হলো—"পাঁচ দিন! এর ভেতরে ষ্টেজ বাঁধা আলোর ব্যবস্থা হওয়া কঠিন। পার্টির জন্য ভাবনা নেই। হোটেলে খাবারের অর্ডার দেব। বোকামী আমারই চন্দন, আমাদের এত বড় লন, হল রয়েছে, অথচ এতদিন আমার খেয়াল হয়নি বাড়ীটাকে অভিনয়ের উপযোগী করে রাখতে। পয়লা আষাঢ় বাদ দিয়ে, আষাঢ়ের মাঝামাঝি তুমি অন্য আরেক দিন বেছে নাও।"

চন্দন অনেক চিন্তার পর বললে, "আষাঢ়ের অন্য দিন তো আমার মনে পড়ছে না হরিণনয়না। তবে শ্রাবণ, ভাদ্রে কি যেন সব পঞ্জিকাতে লেখা থাকে। রাধা অষ্টমী, নন্দোৎসব ওই ধরনের।"

ইলা হাসির উচ্ছ্বাসে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো, "আমি কোথায় যাব? একি তোমার কথার ছিরি। দেখ চন্দন, তুমি দিন দিন বড্ড সেকেলে হয়ে যাচ্ছো। নন্দোৎসব, রাধা অষ্টমী, একালের রুচির বাইরে। আর তোমার ওই 'হরিণ-নয়না, চন্দন-চর্চিতা' সম্বোধনগুলি। তোমার বন্ধুরা তোমাকে 'রসিক-প্রবর' নাম দিয়েছেন। আমার কাছে তুমি হোয়েছ রৌদ্ররস। তোমার সেকেলে পচা শব্দ শুনে আমার কান রী রী করে, গায়ে জ্বালা ধরে। এখন তোমাদের ক্লাবে ঐসব গবেষণা চলছে নাকি? তাই ফিরতে রাত হোয়ে যায়?"

"রাত কি এমনি হয় অমৃতভাষিণি, তাস পাশা কাব্যের কচকচি ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে করবো কি? অন্তরীক্ষে তোমাকে ধ্যান করে গলা ফাটিয়ে কি গান ধরবো—

'এ ভরা বাদর, মহাভাদর, শূন্য মন্দির মোর—'

বিমুখ বিধাতা গানের গলা যেমন দেননি, তখন আমার আড্ডাখানাই ভাল। আমাদের ক্লাবের বদনাম দিও না বরাঙ্গনে। মামলাহীন দিন কাটে আমার বার লাইব্রেরীতে, তোমার পচা পুরোন বই নিয়ে। কালিদাস, ভবভূতি, কাদম্বরী, জয়দেবের রসের আস্বাদ পেলে ডার্লিং ডিয়ার শোনামাত্র তোমার কান রিমিঝিমি করতো কিন্তু। আমাকে রসিক আখ্যা দেওয়া মিছে, তবে কাব্য রসিক বললে আপত্তি নেই।"

বলতে বলতে চন্দন কোটের পকেট হ'তে এক তাড়া নোট বের করে ইলার গায়ে ছুঁড়ে দিলে।

একবার চুলে হাত দিয়ে রুমালে মুখ মুছে পুনরপি বললে, "আমার অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ দিলাম কনকচাঁপাবরণি, আমার চেয়ে যা তোমার বেশী দরকারী, বেশী কাজের। আমি উঠলাম—কাপড় ছেড়ে স্নান সেরে নেই। তুমিও স্নান করতে যাও। তোমার আয়া বাবুর্চি চায়ের টেবিলে দেখা দিয়েছে।

চন্দন বেরিয়ে গেলেও ইলা তার অনুসরণ করতে পারলো না। নোটের গোছা হাতে নিয়ে পাষাণমূর্তির মত স্তব্ধ হোয়ে বসে রইল। ফুলে ঢাকা কাঁটার মত স্বামীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত খচ্‌খচ্‌ করে বিঁধছিল তার বুকে। পুষ্পস্তবকের ক্ষুদ্র কণ্টক হলেও তার তীক্ষ্ণতা সামান্য নয়। স্বামীপেক্ষা তার অর্থ যে তার অধিক বাঞ্ছনীয়, চন্দন কেমন করে তা ব্যক্ত করতে পারলো? বলতে তার বাধলো না কেন? কিন্তু ইলাই যে তাকে এতকাল ভরে বলার সুযোগ দিয়ে এসেছে।

বিবাহের পর তাদের যাত্রা সুরু হোয়েছিল একই পথে। কবে যেন সে পথরেখা দুই ভাগে বিভক্ত হলো। দেখতে দেখতে হাজির হোল ইলার অসংখ্য স্তাবকের দল, কেউ তার ধনমুগ্ধ, কেউ খ্যাতিমুগ্ধ, কেউ বা রূপমুগ্ধ। এত মুগ্ধের মোহে তরলমতি তরুণী স্থির থাকতে পারলো না। ঝাঁপ দিয়ে পড়লো প্রমোদ-সাগরে। সে উত্তাল সমুদ্রের তীরে নীরে কি সম্মান, প্রতিপত্তি, অনাবিল আনন্দের হিল্লোল। ধীরে ধীরে শিথিল হোয়ে এলো ঘরের বন্ধন।

দোষ কি শুধু ইলার? চন্দন তাকে কম প্রশ্রয় দেয়নি। চন্দন কোর্টে যাতায়াত করে টু-সিটারে। ইলার জন্য দ্বারে অপেক্ষা করে হাম্বার 'সুপারস্নাইফ', শিখ ড্রাইভার। কিছুতে বিরক্তি নেই, নিষেধ নেই। অবাধ স্বাধীনতার পথ কুসুম-কোমল। চলতে গেলে পায়ে ব্যথা বাজে না।

কিন্তু ছাইয়ের মধ্যেও আগুন চাপা থাকে, হাসির আবরণে লুকানো থাকে কত বিরাগ বিস্বাদ। না থাকলে চন্দন পরিহাসচ্ছলে তাকে হুলবিদ্ধ করতে পারতো না। আজ জীবনে প্রথম ইলার সন্দেহ হলো স্বামী বোধহয় তার আচার আচরণ তেমন প্রীতির চোখে দেখে না। রাত্রে বিলম্বে ফেরা পছন্দ করে না।

হঠাৎ তার মনে পড়লো দিদির হিতোপদেশ। গল্পচ্ছলে লীলা একদিন বলেছিলেন, "মেয়েরা তিন জাতি, পুরুষরাও তাই। একজাত পুরুষ ভালবাসে স্ত্রীর স্নেহময়ী মাতৃরূপ। কারোর পছন্দ কন্যারূপা সেবাপরায়ণা। অনেকের আবার প্রিয়সখি-লীলা-সঙ্গিনী।" এই তিনরূপার মধ্যে কোনটি যে চন্দনের মানসী ইলা তা জানে না। জানবার অবকাশ পায়নি।

দিদি সেদিন বলেছিলেন, "প্রেম পেলেই তা অক্ষয় হয় না, যত্নে চেষ্টায় সাবধানে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বন্যার জল যেমন আসে, আবার শুকিয়ে যেতেও সময় লাগে না।"

॥ ৩ ॥

কয়েকদিন পরে ইলা গেল তার বাল্যসখী পদ্মাসনার বাড়ী বেড়াতে। কতদিন দেখাসাক্ষাৎ নেই। এ অদর্শন পূর্বে তারা কল্পনা করতে পারেনি। স্কুলেই তাদের ভালবাসার সূচনা। কলেজে পৌছে সে ভালবাসা গভীরতা লাভ করেছিল। ইলাদের দলের ভেতরে পদ্মা ছিল নাম-করা মেয়ে। পদ্মার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙ্গীন চিত্র ইলা তার হৃদয়ের পটভূমিকায় সযত্নে এঁকে রেখেছিল। সেই পদ্মা এম-এ পাশ করে স্বেচ্ছায় সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল একটি সাধারণ সাহিত্যসেবীকে। পদ্মার স্বামী দেবলবাবুর পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য ছিল না। অথচ পদ্মাকে কে-না চেয়েছিল, সোনার পাতের ওপরে পদ্মাকে পদ্মাসন পেতে দিতে কত তরুণ-হৃদয় উন্মুখ হয়েছিল।

যে সম্পদ সে একদিন অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করেছিল অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তারই প্রয়োজনে পদ্মাকে নিতে হোয়েছে মেয়ে-কলেজের অধ্যাপিকার কাজ।

নিতে সে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্থানের দাঙ্গায় পদ্মার ননদিনী বাড়ীঘর-স্বামী হারিয়ে পাঁচটি শিশু কন্যা-পুত্র সহ আশ্রয় নিয়েছেন ভাইয়ের আশ্রয়ে। পদ্মারও একটি ছেলে হোয়েছে। এতগুলি প্রাণীর খাওয়া, পরা, শিক্ষা—স্বামীর আয়ের উপর নির্ভর না করে পদ্মা হোয়েছে স্বামীর আয় ও পরিশ্রমের অংশভাগিনী।

তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। বর্ষার নবলীল মেঘের ছায়া ধরণীকে স্নিগ্ধশ্যামল রূপ দিয়েছে।

ইলার সাড়া পেয়ে পদ্মা ছুটে এসে দুই ব্যাকুল বাহুর বন্ধনে সখীকে বেঁধে

ঘরে নিয়ে বসালো। তারপরে আরম্ভ হ'ল তাদের অনুযোগ-অভিযোগের পালা, "এতকালে মনে পড়লো ইলা? এ যে গরীবের কুঁড়েয় হাতীর পা!"

"তবু তো পা দিলাম, কিন্তু তোর যে পা বাড়ানোর কোন লক্ষণ নেই?"

"বাজে বকিসনে ভাই, এখন তুই মস্ত লোক, চারিদিকে তোর কি নাম ডাক। আমার মতন সামান্য ব্যক্তি তোর পাত্তা পায় না। নইলে পর পর তিন দিন তোর বাড়ী গিয়েও দেখা পাইনি। বার বার তিনবারের পর মানুষের ধৈর্যের সীমা লঙ্ঘন করে। তারপরে সময়ও আমার কম। কাজ ঘরের, বাইরের। তবু দিদি এসে পিকুর ভার নিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। বুড়ো বয়েসে কচি মানুষ-করা ভারী ঝামেলা। তুই এখনও নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছিস, ছেলে হবে কবে? তোদের এত ধনসম্পদ ভোগ করবার বংশধর না হ'লে আর মানায় না। এই তো সময়, এর পরে সময় কিন্তু বয়ে যাবে!"

ইলা মনে মনে বিরক্ত হয়ে তিক্তস্বরে উত্তর দিলে, "ছেলেমেয়ের আমার দরকার নেই। আমি এ জন্মে ও আপদ চাইনে, ভালও বাসিনে। বংশধর হয়ে স্বর্গে আমার বাতি দিতে হবে না। যা আছে আমরা নিজেরা খেয়ে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিতে পারবো। ছেলে পেয়ে তোর কি স্বর্গলাভ হয়েছে বলতে পারিস? তুই ছিলি কোথায়, নেমে এসেছিস স্বখাতসলিলে। কোথায় তলিয়ে গেছে তোর আনন্দের বর্তমান? সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ।"

পদ্মার নিবিড় বাহুবন্ধন সহসা শিথিল হলো। গম্ভীর হলো হাসিমুখ। পদ্মা বললে, "তুই কি বলছিস ইলা? আমার সম্বন্ধে তোর একটা ভুল ধারণা হোয়েছে। আমি কোনকালেও স্বর্গে ছিলাম না। এখনো নরকবাসিনী হইনি। আমাদের দেশ ত্যাগের, ভোগের নয়। ছেলেবেলায় ভারী ইচ্ছে হোয়েছিল দেশের কাজ করতে। কিন্তু দেশ যে কখনও আমাকে ডাকবে তা কল্পনা করিনি। একটু দেরীতে ডাকলেও দেশ আমাদের দু'জনকে সেবাভার দিয়ে জীবন সফল করেছে। আমার সামান্য জ্ঞান যাদের বিতরণ করছি, তারাই যে আমার ভবিষ্যৎ ভাই। কলেজের একগাদা, দিদির পাঁচটি, আমার একটি। এর মধ্যে একটিও কি প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে না? একজনাও যদি হয়, সেই আমার ভবিষ্যৎ।"

ইলা জবাব দিতে ভুলে গিয়ে সবিস্ময়ে পদ্মার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

এমন সময় রন্ধনশালা হ'তে এক বিষাদপ্রতিমা বিধবা বেরিয়ে এলেন।

তাঁর এক হাতে কাঁসার রেকাবীতে কতকগুলো পিঠে অন্য হাতে জলের গেলাস।

তিনি মেঝেয় আসন পেতে মমতায় বিগলিত কণ্ঠে বললেন, "এস ইলা, খাবে। পদ্মার কাছে তোমার গল্প শুনে শুনে তোমাকে এতদিন না দেখলেও আমার চেনা হয়ে গিয়েছে। আমি দেবল ও পদ্মার দিদি, তোমারও তাই। ছেলেদের জলখাবারের জন্যে দুপুরে ক'টা পিঠে করে রেখেছিলাম। তুমি খেয়ে বল দেখি কেমন হয়েছে?"

ইলা পদ্মার ননদকে আশা করেনি, অপরিচিতার গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠতা তার ভাল লাগে না। সে অপ্রতিভ হয়ে জবাব দিলে, "আমাকে আবার কেন? ছোটদের খেতে দিন। আমি এ সময় চা ছাড়া আর অন্য কিছু খাইনে, অভ্যেস নেই।"

"দিদির কাছে এলে অনভ্যাসকে অভ্যাস করতে হয়। তুমি খাও, আমি চা নিয়ে আসি।"

পদ্মাসনার ননদিনী ঘরের বের হোয়ে গেলে, পদ্মার বিশেষ অনুরোধে ইলাকে পিঠে নিয়ে বসতে হ'ল। কিন্তু খাবার স্পৃহা তার এতটুকু রইল না। বারংবার মনে পড়তে লাগলো চন্দনকে। সে পিঠে খেতে খুব ভালবাসে। ইলা জানে না বলে কোনদিন তাকে পিঠে করে দেয়নি। যারা জানে তাদের কাছে শিখে নিতেও কোনদিন চেষ্টা করেনি। দানের পাত্র তার শূন্যই রয়েছে। গ্রহণের পাত্র তার কানায় কানায় ভরে উপছে পড়ছে। কিন্তু এতদিন সেটা তার অনুভূতির বাইরে ছিল। ইলার সবল বলিষ্ঠ হৃদয়ে অকস্মাৎ দ্বিধা সংশয় জাগিয়ে তুলেছে তাদের হিসাবের খাতাখানি। এখনও চন্দনকে জানানো হয়নি, ভরা কলসীর জল কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। কেন ইলা ব্যথিত, ম্রিয়মান।

চা খেয়ে ইলা বিদায় নিতে যাচ্ছিল, তখনই ঝিয়ের কোলে বেড়িয়ে ফিরলো পদ্মার দেড় বছরের শিশুপুত্র পিকু। হাতে তার ছিন্নকোর একটি কদম ফুল। মুখে সুধাহাসি, কাজল কালো আঁখিপল্লবে স্বপ্নজড়িমা।

পদ্মা ছেলের দিকে অগ্রসর হয়ে বললে, "এই যে তোর রাঙ্গামাসি পিকু। তোর ওই ফুলটা দিয়ে সুন্দর মাসিকে নমস্কার কর।"

পিকু নমস্কারের পরিবর্তে ফুলের হাসি হেসে, ফুলের হাত বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ইলার বুকে।

এ অতর্কিত আক্রমণের জন্য ইলা প্রস্তুত ছিল না। সুসজ্জিতা ইলা বেশ-বাস নষ্ট হবার ভয়ে কখনও শিশুদের ছোঁয় না, আদর করে না।

মায়ের সামনে, মায়ের শিশুর পতনের আশঙ্কায় আজ কিন্তু সে নির্লিপ্ত হোয়ে থাকতে পারলো না। ভদ্রতার খাতিরে পিকুকে জড়িয়ে ধরতে হোল।

প্রথম শিশুর স্পর্শে নিমেষে তার সারা দেহ মনে কিসের যেন একটা রোমাঞ্চ লাগলো। নিদাঘের পর শুষ্ক তৃষিতা ধরিত্রি নব বর্ষার বারি বিন্দু যেমন করে শুষে নেয়, ইলার হৃদয় তেমনি করে গ্রহণ করতে লাগলো শিশুর স্পর্শ, অঙ্গের আঘ্রাণ।

পদ্মাসনা ছেলের দিকে হাত মেলে ডাকলে, "আয় পিকু, আমার কোলে আয়। আর না মাসিকে ঢের সোহাগ করা হয়েছে। এমন দামী সিফনের সাড়ীটা নষ্ট করা বাকী রয়েছে।"

দুষ্টুছেলে মা'র আদরে না গলে মাসির গালে গাল লাগিয়ে কৃতিত্বের হাসি হাসতে লাগলো।

ইলা বললে, "তুই ব্যস্ত হচ্ছিস কেন পদ্মা, সাড়ী আমার নষ্ট হবে না। ও রয়েছে থাকুক না একটু, এখুনি তো আমি চলে যাব।"

পদ্মা নিরুত্তরে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল ওদের হাসিখেলায়।

॥ ৪ ॥

পথে বেরিয়ে ইলার খেয়াল হলো দিদির কাছে যেতে। কোথাও না গেলে সময় কাটে না। রাত দশটার আগে চন্দন ক্লাব থেকে ফেরে না। তাকে শিগ্‌গির ফেরার কথা বলবার মুখ ইলার নেই। সে নিজেই নিশাচরী হয়ে স্বামীকে নিশাচরে পরিণত করেছে। আজ ক'দিন হোল কিছুই ভাল লাগে না। ভক্তবৃন্দের স্তবগান নিছক খোশামোদ বলে মনে হয়। স্ত্রী পুরুষের জনতায় তেমন মাদকতা নেই। দিবানিশি চোখের সামনে জল জল করে হিসাবের খাতা।

লীলার বাড়ীতে ইলা গাড়ী থেকে নামলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ম্লান চন্দ্র উদয় হয়েছেন। সজল ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে।

লীলা নিরাভরণা হয়ে অনেক দুঃখে কষ্টে একটি নীড় রচনা করেছেন। মেহেদীর প্রাচীর ঘেরা অনেকটা জমির মধ্যে ক'খানা টালির ঘর। কাঠের গেট,

দুই পাশে দুটি লেবু গাছ। একটা কাগজী, অন্যটা বাতাবী। বর্ষা সমাগমে লেবু গাছে থোকা থোকা ফুল ফুটেছে। লেবু ফুলের সুগন্ধে অঙ্গন সৌরভাকুল। উঠোনে টুকরো টুকরো ক্ষেত। কোয়াশে কনক নটে শাক, কোনখানে লঙ্কার ঝাড়। বেগুনের চারা, লাউ কুমড়োর বাঁশের মাচা। মাঝে মাঝে ফুলের বন।

বারান্দায় মাদুরে শঙ্কর দশ বছরের ছেলে হীরক ও অষ্টমী অরুণাকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। তাঁর পেছনে দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে লীলা আস্তে আস্তে পাখা নাড়ছেন।

ইলার আগমনে ক্ষুদ্র গৃহ আনন্দে মুখর হলো। শঙ্কর ইলাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন, "ইলা যে, এস এস।"

হীরক ছুটে গেল চেয়ার আনতে। অরু একখানা তালপাতার পাখা হাতে নিলে। ইলা এদের ভিতরে বিশেষ আসে না। এই আড়ম্বরহীন গ্রাম্য পরিবেশ তার ভাল লাগে না। সে বেশী না এলেও এখানে তার আদর যত্ন ভালবাসা জমা হোয়ে থাকে।

লীলা হাসিমুখে বলেন, "চন্দন কেমন আছে রে?"

শঙ্কর বলেন, "চন্দন এলো না কেন ইলা? অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয় না।"

ইলা মাদুরের এক কোণে আসন নিয়ে উত্তর করলো, "হ্যাঁ দিদি, ওর শরীর ভাল আছে। আপনার সঙ্গে তার দেখা হয় না বলেও তো একদিন আমাদের ওখানে যান না জামাইবাবু? আপনি ভীষণ পর্দানশিন হয়েছেন।"

শঙ্কর হাসলেন, "সত্যি বলেছ ইলা, স্কুল মাষ্টারদের অবস্থা পর্দানশিন বই কি? সকালবেলা ছেলে পড়িয়ে স্কুলে দৌড়ান। দশটা চারটার পরেও যা ছিল, তোমার দিদির শাসনে সেটা ছেড়ে দিয়েছি। রবিবারটুকু তোমার দিদির জন্য হাতে রেখেছি ভাই। এক এক রবিবারে এদের নিয়ে এক এক দিকে ঘুরিয়ে আনি। ওঁর এত খাটুনী, মাঠে, গঙ্গার ধারে ফাঁকায় সপ্তাহে একদিন না নিয়ে গেলে বাঁচবেন কি করে? সেইজন্য তোমাদের কাছে যাওয়া হয় না।"

লীলা অস্থির হয়ে উঠলেন, "ও কি ইলা, তুই মাদুরে বসেছিস কেন? মেঘলা দিন বলে মাদুর ক'দিন ধুতে পারিনি, বালি কিচ কিচ করছে। তোর শাড়ীতে ধূলো লাগবে। তুই চেয়ারে উঠে বোস্। আমি তোর চা করে আনি।"

"আমি বেশ বসেছি দিদি, তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এইমাত্র পদ্মার ওখানে চা খেয়ে এসেছি। আর খাব না। এখনো তোমার রান্না চড়েনি?"

অরুণ আট বছরের হলে কি হবে, মেয়ের জাত কিনা এরই ভেতরে দিব্যি পাকা কথা বলতে শিখেছে, মাসীর সূক্ষ্ম শাড়ীর অঞ্চলে সসম্ভ্রমে আঙুল ছুঁয়ে কলকল করে উঠলো, "মা তো রোজ বেলাবেলি রান্না সেরে উনুনের আঁচে বসিয়ে রাখেন। তুমি বুঝি তা জাননা মাসী? আজ আমাদের কত রকমের রান্না হয়েছে, রুটির বদলে সরুচাকলী, ডিমের ডালনা, বাঁধাকপির বড়ির ঝোল, মান ভাজা। আমের কাসুন্দি তো করাই আছে, মা এত বড় হাঁড়ি ভরে কাসুন্দি করে রেখেছেন। মটরের ডাল বাটার সঙ্গে বাঁধাকপি মিশিয়ে এক টিন ভর্তি বড়ি করা রয়েছে। মান আমাদের বাগানের, কেটে কুটে শুকিয়ে নিয়ে আমরা ভাজা করে খাই। ডিম বাড়ীর হাঁসের, চারটে হাঁসে ডিম দেয়, কত ডিম, আমরা অত খেতে পারিনে, পাড়ায় বিলিয়ে দেই। মার রান্না খুব ভাল। তুমি চেখে দেখোনা একটু, আমি মিছে বলছিনে।"

কন্যার বাচালতায় লীলা ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে ধমক দিলেন, "থাম দেখি অরু, ভারী সামগ্রী রান্না হয়েছে কিনা তাই খেতে মাসীকে সমাদর করা হচ্ছে। ওদের পোলাও মাংসের ছড়াছড়ি ও চাইবে তোদের বড়ির ঝোল, ডিমের ডালনা?"

শঙ্কর আদরিণী কন্যার পক্ষ নিলেন, "আহা, ওকে বকোনা, ওদের যা আছে, ভালবেসে খাওয়াতে চাচ্ছে। তাতে দোষ কি? যারা রোজ কালিয়া পোলাও চপ কাটলেট খায়, তাদের মুখে বেশী ভাল লাগে তোমাদের শাক ডাঁটা ঝাল।"

হীরক বই খাতা পেন্সিল গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, "মাসীদের রান্না তো আবদুল করে, সে কি আবার মার মতন রাঁধতে জানে? মার রান্না কি সুন্দর, তুমি খেয়ে দেখ না মাসী?"

ইলা অরুকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, "তোদের রান্না কেবল চেখেই আমি যাচ্ছি না অরু, যা কিছু হয়েছে সব খেয়ে তবেই নড়বো। তোর মার ভাগ ফুরিয়ে যাবার ভয়ে আমাকে খেতে দিতে চাচ্ছে না।"

ইলার বলার ভঙ্গীতে হাসির রোল পড়ে গেল। লীলা হাসতে লাগলেন।

"মাগো, তুই এত কথা শিখলি কবে ইলা? এক চা ভিন্ন কবে আমি

তোকে কি খাওয়াতে পেরেছি ? দিন রাত এটা সেটা কত কি করি, তোদের দিতে প্রাণ কাঁদে, সাহেব মেমের বাড়ী বলে পাঠাইনে।"

"পোড়ার দশা সাহেব মেমের। বাবুর্চির পিণ্ডিতে ওর অরুচি ধরে গেছে। আমি চুপচাপ করে গিলি। কি করবো রান্না যখন জানি না। ও কিন্তু তোমাদের এসমস্ত খেতে বড্ড ভালবাসে দিদি।"

শঙ্কর বললেন, "আমাদের খাড়া বড়ি থোড় খেতে চন্দন যদি এতই ভালবাসে তাহলে প্রত্যেক রবিবারে তাকে নিয়ে খেয়ে গেলেই পার ইলা। দিদির কাছে খাবে তাতে দোষ কি ? উনি তো তোমাদের পর নন! ও, সে যে আমারই ত্রুটি, আমি গিয়ে নিমন্ত্রণ না করে এলে তোমরা খাবে কেন ? আসছে রবিবার দুপুরবেলা তোমরা দু'জনা এখানে খেয়ো। আমি চন্দনকে বলে আসবো। রবিবারে তোমার আবার সভাসমিতি তো নেই ?"

"না জামাইবাবু, আমি ক'দিন বিশ্রাম করছি, ওসবে যাচ্ছি না। আমরা আসবো রবিবার, ওকে আমিই বলে দেব, আপনার আর যাবার দরকার নেই।"

মাসী খেয়ে যাবে, শুধু আজ নয়, আবার আসবে এই উল্লাসে সুকুমারচিত্ত হীরক, অরু আনন্দে উৎফুল্ল হলো।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই চন্দন আজ ফিরেছিল। ইলা এসে দেখলো স্বামী হাত-মুখ ধুয়ে খানা-টেবিলে তার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রাতঃকালীন চা-পান ও দুইবেলার ভোজন-পর্ব এখনও তাদের যৌথ অবস্থাতেই আছে। বৈকালিক চা, খাবার যার যেখানে সুবিধা খেয়ে নেয়।

স্বামীকে ক্ষুধার্ত মনে করে ইলা লজ্জিত হয়ে হাঁক দিলে, "আবদুল"।

ওরা কেতাদুরস্ত চাকর-বাকর, মনিবকে একেবারের বেশী দু'বার ডাকতে হয় না।

আবদুল খাবার সাজিয়ে দিয়ে চলে গেলে ইলা স্বামীর পাশের চেয়ার অধিকার করে বললে, "তুমি খেয়ে নাও, আমি খাব না। দিদি খাইয়ে দিয়েছেন। রবিবার দুপুরে আমাদের দু'জনাকেই খেতে বলেছেন।"

চন্দন পুলকিত হয়ে উত্তর দিলে, "কি সুখবর দিলে তৃপ্তিদায়িনি, রসনা আমার রসসিক্ত হোল। অন্ততঃ একবেলাও আবদুলের আবদুল মার্কা অমৃত হতে অব্যাহতি পাব। দিদি তোমাকে কি দিয়েছিল খেতে ?"

"কেবল দিদির কাছেই নয়। বিকেলে পদ্মার কাছে পিঠে খেয়ে দিদির

ওখানে গিয়েছিলাম। কি আর খাওয়াবেন? ওদের :যা হোয়েছিল, বড়ির ঝোল, সরুচাকলী, আমের কাসুন্দী।"

চন্দন মাংসের হাড় বাছতে বাছতে গুণ গুণ করতে লাগলো,

'সখি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম,
কানের ভিতর দিয়া মরম পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।'

ভোজন বিলাসিনী, যা পরিপাক করে এলে তার সবগুলোই যে আমার লোভনীয় বস্তু। নিজে তো ভাল-মন্দ কিছু খেতে দাও না, সামনে পেলেও আমার জন্যে দুটো রুমালে বেঁধে আনো না। আমিও ও-জিনিষ খেয়েছি গো, অনেক খেয়েছি। আঠারো বছর অবধি মা জুগিয়েছেন, মা চলে যাবার পর পিসিমা বিধবা হোয়ে এলেন। পিসিমা মার ধারা বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়। আমার হোয়েছিল সেই দশা। ছেলের মায়ায় আবদ্ধ হোয়ে বাবাও থাকলেন না বেশীদিন। বাবার পর সংসার হোয়ে গেল ছিন্নভিন্ন। পিসিমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি দিলাম সমুদ্রে পাড়ি। কার বাড়ি, কাসুন্দী, শুক্তো কোথায় গেল।"

চন্দনের গলায় শেষের দিকে যেন কি এক অব্যক্ত বেদনা ঝরে পড়তে লাগলো।

ইলার শান্ত হৃদয় সহসা উদ্বেলিত হলো। যা কখনও তার হয় না, সেই অশ্রুজলের আভাসে সে বিচলিত হয়ে ধরা গলায় বললে, "আমি কাপড় বদলে আসি। গরম লাগছে।"

রাত্রে আহারের পরে চন্দন খানিকটা পড়াশুনা না করে ঘুমোতে পারে না। কোনদিন বই পড়ে, কোনদিন বা কোর্টের কাগজপত্র।

চন্দনের শয়নগৃহে খাটের পাশে একটি ছোট টেবিল পাতা। মুখোমুখি দুইখানি চেয়ার।

মুখোমুখি চেয়ার থাকলেও একখানা প্রায় খালি থাকে। ইলার অভ্যাস খাবারের পর বিছানা নেওয়া। একঘরে একজনা আলোর সামনে তন্ময় হোয়ে বসে থাকলে, অপরের ঘুম হয় না। সেইজন্য ইলা তাদের শয়নগৃহ করেছে স্বতন্ত্র। পাশাপাশি দুটি ঘর, মাঝখানে দরজা। তাতে ঘন নীল পর্দা।

বিবাহান্তে কিছুকাল তাদের অর্ধেক রাত্রি অতিবাহিত হোত তাস খেলায়। চন্দনের বন্ধুরাও যোগ দিয়েছিলেন সে খেলায়।

ইলাই সে খেলার হাট ভেঙ্গে দিয়ে বেছে নিয়েছিল বাইরের বিচরণ ক্ষেত্র। এখন গৃহ হোয়েছে উভয়ের বিশ্রামাগার। হাসি খেলা ফুরিয়ে গিয়েছে।

নিত্যকার মতন চন্দন বই খুলে বসেছিল। ইলা এসে অনেক দিনের পর তার মুখোমুখি হলো।

বই হতে মুখ তুলে চন্দন জিজ্ঞাসা করলো, "নিদ্রাকাতরা, এখনও শোওনি? পার্টির কথা বলবে কিছু? কবে দেবে?

ইলা সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করলো, 'বিয়ের সময় পিসিমাকে এনে, ফের ফেরৎ পাঠিয়েছিলে কেন? তাঁর দেওরের কাছে তিনি কি অবস্থায় আছেন?"

চন্দন অবাক হোয়ে উত্তর দিল, "এতদিন বাদে সে কথা কেন ইলা? আমাদের দেশের পতিপুত্রহীনারা পরাশ্রয়ে যে অবস্থায় থাকেন, পিসিমা তার ব্যতিক্রম করেননি। ঝি রাধুনীর ওপরে আমার দেওয়া ত্রিশ টাকা মাসোহারা পেয়ে তারা বোধহয় বিধবার একবেলা একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা রেখেছে। ফেরৎ দিয়েছিলাম কেন? পরিণয় হার গলায় পরে আমরা গেলাম সিমলায় শৈলবিহারে। খালি বাড়ী। তারপর আমার আরো একটা ভয় হোয়েছিল আধুনিকা, হয়তো পুরাতনকে আমল দেবে না।"

ইলার দুই ঘন কৃষ্ণ আঁখি তারকায় বিদ্যুৎ ঝলকিত হতে লাগলো। সে নতমুখ উর্দ্ধে তুলে তীব্রস্বরে বললে, "কেন একালে জন্ম নেবার অপরাধে আমরা কি মনুষ্যত্বহীন হোয়েছি? আমরা কাউকে কি সইতে পারিনা, পছন্দ করিনা? যত দোষ মেয়েদের। কিন্তু তোমরা যে কতদূর অধঃপাতে গেছ টের পাও না? মাসী, পিসি, মা বোনকে বাদ দিয়ে একলা বৌ নিয়ে থাকার ওস্তাদ তো তোমরাই? আমি চাই আর দেরী না করে, কাল সকালবেলায় পিসিমাকে আনতে লোক পাঠিয়ে দাও। আরো শোন, আয়া বাবুর্চিতে আমার দরকার নেই। উড়ে ঠাকুর আর সাধারণ ঝি-চাকরে আমার বেশ চলে যাবে। হাঁ বড় গাড়ীটার কি দরকার? হাতীর খোরাক। ওটা আমি বেচে দেব। ছোটটাতেই আমাদের দু'জনার দিব্যি কুলিয়ে যাবে।"

চন্দন চমকে উঠলো। ইলা বলে কি? তার তেমন উপার্জন হচ্ছে না ব'লে ইলা কি খরচ কমাবার প্রয়াসী হয়েছে!

চন্দন ক্ষুণ্ন হোল। "শোন ইলা, এ তোমার কি পাগলামী হচ্ছে? কেন

আমরা এত কাট ছাঁট করবো? তুমি আধুনিকা, সন্তানের বিরোধী। আমরা টাকা বাঁচাবো কার জন্যে কার আশায় সঞ্চয় করবো?"

কি এক অদমনীয় ভাবোচ্ছ্বাসে ইলা যেন ভেঙ্গে পড়লো। মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে সতেজে উত্তর দিলে, "আমি আধুনিকা নই। আমাকে ও বলো না। আমি প্রগতিশীলা আধুনিকা হতে পারবো না। তাদের সাহস, শক্তি, শিক্ষা, কর্মক্ষমতা আমার ভেতরে নেই। আমি আমার ঠাকুমা, মা, দিদির রক্তে তৈরী। এ পাঁচ বছরে আমি যে তোমার কত অপচয় করেছি চন্দন, তা তুমি জানো না। হিসাবের খাতা—"

চন্দন বাধা দিলে, "থাকুক তোমার হিসাব ইলা, আমি কিছু জানতে চাই না। কেন এমন উতলা হলে? যা হবার তা হোয়েছে। এখন তুমি কি পেলে শান্ত হও? আমার কাছে কি চাও?"

"আমি চাই আমার ভাঙ্গা সংসারকে আমাদের মায়ের ধারায় আবার নূতন করে গড়ে নিতে। আর গুরুজনদের স্নেহের শাসন। মুক্তিতে আমার দরকার নেই। আমি চাই বন্ধন। আর—আর"

"আর কি ইলা? বলতে গিয়ে থামলে কেন? আমাকে তোমার লজ্জা কিসের?"

ইলা টেবিলে মাথা নামিয়ে চুপে চুপে বললে, "না, তোমাকে লজ্জা করবো না। আমি চাই, আমি চাই মা হ'তে।"

চন্দনের মুখ চোখ পুলকে উদ্ভাসিত হ'ল। সে কিছু না বলে সস্নেহে স্ত্রীর ললাট হ'তে অবাধ্য চুলগুলি সরিয়ে দিতে লাগলো।

মঞ্জরী—

সরম

পল্লীগ্রামের রাত্রি গভীর না হইলেও ইহারই মধ্যে চারি দিক নীরব নিঝুম হইয়াছে। কোথায়ও আলোর রেখা নাই। গোটা গ্রামখানা যেন জমাট অন্ধকারের কোলে সভয়ে মুখ ঢাকিয়াছে।

বাঁশ বনের সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া পরাণ মণ্ডল তার ভাঙা ঘরের ধ্বসিয়া পড়া বারান্দায় উঠিয়া ডাকিতে ডাকিল, "সরম ও সরম, সরম আমি এসেছি, দোর খুলে দে।" পরাণ-পত্নী মানদা জ্বরতপ্ত দেহে কাঁথার তলায় কাঁপিতেছিল। শীর্ণ হাত বাড়াইয়া মেয়ে দু'টির গায়ে ঠেলা দিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সাড়া দিল "দাঁড়াও, ক্ষিদের জ্বালায় ওরা নেতিয়ে পড়েছে, তুলে দিচ্ছি।" মাকে আর তুলিয়া দিতে হইল না, বড় মেয়ে সরম সচমকে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যা মা, বাবা কি ফিরেছে? আমি ছাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"পেটে দানা নেই, ঘুমের দোষ কি? দোর খুলে ছাখ্ তো শালাই এনেছে কিনা। রোগের জ্বালার চেয়ে—ক্ষিদের জ্বালার চেয়ে—আবার বেশী হোয়েছে আঁধারের জ্বালা। পারচিনে থাকতে, হাঁফিয়ে মরচি।"

"শালাই পেয়ে এক্ষুণি প্যাকাটি জ্বালচি মা, প্যাকাটি গুছিয়েই রেখেছি।" বলিতে বলিতে সরম ভগ্নদ্বার উন্মুক্ত করিল। বাহিরের স্নিগ্ধ শীতল এক ঝলক বাতাস আসিয়া বদ্ধ ঘরের উষ্ণতা জুড়াইয়া দিল। পরাণ মেয়ের হাতে সযত্নে আনা কাগজে জড়ানো একটি দিয়াশলাই দিয়া কহিল, "এর দাম দুই আনা; এ দিকে না পেয়ে সেই বেনুপুরের বন্দর থেকে আনলাম। হরিশদা আধ সের খুদও দিয়েছে। কচুর ডাঁটা কুটে রেখেছিস্ তো? ডাঁটার সঙ্গে লঙ্কা মরিচ দিয়ে খুদ রেঁধে নে, চমৎকার হবে।"

সরম সন্তর্পণে প্যাকাটি জ্বালাইয়া দেখিল, খুদের নাম শুনিয়া মানদা বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে। পরমের তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়াছে। সে শিকারী

বাজের মত তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুদের পুঁটলির পানে চাহিয়া আছে। পরম সরমের তিন বছরের ছোট, বছর বারো বয়স, কটিতটে ঝুলিতেছে একটু ছেঁড়া চট। মা কাঁথায় লজ্জা নিবারণ করিয়াছে। বাপ বাহির হইয়াছিল সরমের শততালিযুক্ত জরাজীর্ণ শাড়ীটি পরিয়া, সরম গা ঢাকিয়াছিল শতরঞ্চির জীর্ণ অংশে। পরাণ খুদ নামাইয়া তাড়াতাড়ি একটি নেংটি পরিধান করিয়া শাড়ীখানা সরমের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল।

বারান্দা হইতে সরম পরিধান পরিবর্তন করিয়া উৎসাহের সহিত রান্না চড়াইল। আয়োজন উপকরণের ক্রটি ছিল না। মাটির কলসীতে জল, ভাতের হাঁড়ি উনুনে বসানো, কানাভাঙা পাথর ক'খানা পরিষ্কার, জ্বালানি কাঠ শুকনো পাতা স্তূপীকৃত। ক্ষেত খামার, গরু বাছুর, কাঁসা পিতলের তৈজস পত্রের সহিত পালা দিয়া টিনের রন্ধনশালাও গিয়াছে। বারটি সন্তানসন্ততির মধ্যে দুইটি মহানিদ্রায় মগ্ন। তবু পরাণের পাষাণ প্রাণ যায় নাই। ক্ষুধার জ্বালাও যায় নাই।

পোয়াটেক খুদ ঝাড়িয়া বাছিয়া মাটির গামলায় ঢালিতেই পরম ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "ওই ক'টা তো খুদ, তার আবার অদ্দেকটা রেখে দিয়ে তোর গিন্নিপনা করতে হবেনা দিদি, সবগুলো ঢেলে নে, শীগ্‌গীর ঢেলে নে বলছি!"

সরম ভয়ে ভয়ে কহিল, "শাক মেশালে এই এক হাঁড়ি হবে পরম, কত খাবি? থাক্ ও ক'টি, কাল সকালে রান্না হবে।"

পরম চীৎকার করিয়া ভেংচাইতে লাগিল, "কাল সকালে রান্না হবে, না, তোর মুণ্ডু হবে পুঁটেগিন্নি! নিত্যি নিত্যি উপোস দেব, যেদিন কিছু থাকবে সেদিনও উপোস দেব, কথ্‌খনো না! সবগুলো ঢেলে দে হাঁড়িতে, না ঢাল্‌লে পর এক দানাও আমি রাখবো না, এক্ষুণি চিবিয়ে খেয়ে ফেলবো।"

মানদা ক্ষুধিত দৃষ্টি ভাতের হাঁড়িতে নিবদ্ধ করিয়া সায় দিল, "সত্যিই তো সরম, ওই ক'টা খুদ—তা আবার রাখচিস্ কেন? তোর কচু ঘেঁচু আজ রেখে দিয়ে খুদের ভাত ক'রে দে, কাল কচু সেদ্ধ খেতে দিস্।"

অপরাধিনী সরম কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। আড়চক্ষে একবার বাপের দিকে তাকাইয়া হেঁটমুখে অবশিষ্ট খুদ কুলায় ঝাড়িতে লাগিল।

এ ভাগ্যবিড়ম্বনায় সরমের যেন অপরাধের সীমা নাই। ইহাদের দুঃখের অন্নে ভাগ বসাইতে সে মরমে মরিয়া যাইতেছিল। তার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। শ্বশুর খাশুড়ী ক্ষেত খামার গরু বাছুর। বাল্যের আধ-জাগা আধ-

স্বপ্নময় জীবন অতিক্রম করিতে না করিতেই পরাণ কিশোর বয়স্ক নবীন দাসের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিল। সুখে শান্তিতে আশায় উৎসাহে ধীরে ধীরে তাহাদের বাল্য কৈশোর কাটিয়া আনন্দময় যৌবন আসিল। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতি রঙ্গীন হইয়া হাসিতে লাগিল।

সেই রঙ্গীন বসন্তে অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে কোথা হইতে আসিল মহাকালের আহ্বান। বন্যারাক্ষসীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, সেই ক্ষুধার অনলে পৃথিবী পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ধন, প্রাণ, খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়—কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না।

মাতা পিতার মৃত্যুর পরে নিরুপায় নবীন পরাণের আশ্রয়ে সরমকে রাখিয়া অনাহারে শীর্ণ শরীর লইয়া কাজের অনুসন্ধানে সহরের দিকে ছুটিল। যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া গেল, সে সহরে কাজ ঠিক করিয়া সকলকে লইয়া যাইবে। সহরে অন্ন মিলিবে, বস্ত্র মিলিবে, আশ্রয় মিলিবে।

সেই আশার আশ্বাসে সরম এক বৎসরের উপরে পথের পানে তাকাইয়া আছে। কোন্ সহরে নবীন গিয়াছে কেহ তাহার নাম জানেনা, সন্ধান জানেনা, না জানলেও আশার শেষ নাই, আশাপথে চাহিয়া থাকার বিরাম নাই।

আহারান্তে পরাণ বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়া পরম তৃপ্তির সহিত তামাক টানিতেছিল। হরিশ সা আজ তাহাকে কেবল খুদই দান করে নাই দয়া করিয়া কয়েক ছিলিম তামাকও দিয়াছে।

রান্না খাওয়ার কাজ সারিয়া সরম আসিয়া বসিল পিতার শ'নের টেকো লইয়া। সূতা কাটিয়া হাটে বিক্রী করিলে কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু শ'ন মেলানো কঠিন। নহিলে সরম দিনভোর রাতভোর সূতা কাটিতে পারিত। অন্ধকারে সূতা কাটা মুস্কিল, তবু হাতের আন্দাজে সরমের অভ্যাস হইয়াছে।

পরাণ তামাকের ধুঁয়া নাক মুখ দিয়া বাহির করিয়া কহিল, "আজ হাট থেকে শুনে এলাম সহরের-কলকারখানায় মেলাই নাকি লোক নিচ্ছে, মেয়ে পুরুষের বাছবিচার নেই। পয়সাও দিচ্ছে অঢেল। হরিশ সা বল্লে—ঘরে পড়ে শুকিয়ে মরছিস্ কেন, বেরিয়ে যেয়ে মানুষ হ'য়ে আয়,—তাই ভাব্ছি একবার যেতে পারলে হ'তো।"

সরম সচকিত হইল, তাহার অন্ধকার হৃদয়ে আশার ক্ষীণ আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। আহা, এতদিন একথা কেন মনে জাগে নাই, বাপকে স্মরণ করাইয়া দেয় নাই! সহর, সহর, যে সহরে নবীন রহিয়াছে সেখানে। একবার সহরে

যাইতে পারিলে হয়, তাহার পর নবীনকে খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য হইবে না।

সরম টেকো নাড়া বন্ধ করিয়া উৎসাহের সহিত উত্তর করিল, "তাই চলো বাবা, আর একদিনও দেরী ক'রো না। এত দুঃখ কষ্টে আমাদের সহরের কথা মনেই ছিল না। সব্বাই গেছে আমরাই কেবল মরতে পড়ে রয়েছি।"

"ইচ্ছে করে' পড়ে রইনি মা, মনে ছিল, ভুলে রইনি। রামু শ্যামুকে রোগে ধরলো, বিদেশ বিভুঁইতে তাদের নিয়ে বেরুতে সাহস হোল না। গেল তারা বুকখানা ভেঙ্গে দিয়ে। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম, ভেতরে শুকিয়ে গেল সহরের কাজকর্ম্মের তাড়া। তারপর ধরাশয্যা নিলে তোর মা,"—বলিতে বলিতে পরাণ পঞ্জরভেদী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল।

ভাই দু'টির প্রসঙ্গে সরমের চক্ষু দু'টি জলে ভরিয়া গেল। সে চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ পর ধরা গলায় কহিল, "তারা তো জন্মের মতন গেচে বাবা, আর ফিরবে না। এখন তুমি বেঁচে থেকে মাকে পরমকে বাঁচাও। চল সহরে যাই। ঠাই নাড়া হ'লে মা সেরে উঠ্‌বে। তার তরে তুমি ভেবোনা বাবা, মাকে আমি বুকে জড়িয়ে ঠিক নিয়ে যেতে পারবো। সহরে যেয়ে তুমি আমি কল-কারখানায় কাজে লাগ্‌বো, পরম ঘরে থাক্‌বে মার কাছে।"

পরাণ ক্ষোভের হাসি হাসিয়া কহিল, "রেলভাড়া না হোলে যাবি কেমন করে? খালি রেলভাড়া নয়, কাপড় না হোলে পথে বার হওয়া যাবে না মা।"

সরমের আশার আলো বাতাসে নিভিয়া গেল। সহরে যাইতে চাহিলেই যাওয়া নয়, পাথেয় চাই। লজ্জানিবারণের পরিধেয় চাই। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সরম কহিল, "তুমি হরিশ কাকাকে চেপে ধ'রে রেলভাড়ার টাকা কয়েকটা ধার নাও বাবা, ভিটেটুকু তার কাছেই বাঁধা আছে। সে দয়া ক'রে আর কিছু দিলেই আমাদের যাওয়া হবে। কল-কারখানায় ঢুকে সকলের আগেই আমরা তাকে টাকা পাঠিয়ে দেব। আর একটা কথা—এতদিন তোমাকে বলিনি। তোমাদের শুকিয়ে মেরেও যা বের ক'রে দেইনি, তুমি তাই বেচে ক'খানা আটহাতি কাপড় কিনে এনো।"

অন্ধকারে পরাণের চক্ষু জ্বলিতে লাগিল। সরমের নিকটে এমন কি আছে যাহার বিনিময়ে কাপড় পাওয়া যাইবে! পরাণ উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি আছে রে সরম, এত দুঃখকষ্টে যা তুই লুকিয়ে রেখেছিস্?"

সরম নীরবে উঠিয়া গেল।

ক্ষণপরে ফিরিয়া বাপের হস্তে যে জিনিষটি অর্পণ করিল সে আর কিছুই নহে, খোঁপায় পরিবার একটি রূপার প্রজাপতি।

এ সামান্য তুচ্ছ অমূল্য সম্পদটুকু সরমের কত যে প্রিয় তাহা বলিবার নহে। স্বামীপ্রদত্ত প্রথম প্রণয়োপহার। প্রিয়র সহিত মিলিত হইবার আশায় সরম তাহার প্রিয়বস্তু অবলীলাক্রমে বাপের হাতে তুলিয়া দিল। তুলিয়া দিলেও রাত্রে তাহার ঘুম হইল না। কেবল মনে পড়িতে লাগিল নবীনের সরল শান্ত মুখখানি। বাপ মাকে লুকাইয়া রথের মেলা হইতে আনীত রূপার অলঙ্কারটি খোঁপায় গুঁজিয়া দিবার স্মৃতি!—

পরের দিন প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত পরাণ অনেক খুঁজিয়াও সামান্য একখানা কাপড়ের সন্ধান পাইল না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের প্রভাবে যেন হাট বাজার বস্ত্রশূন্য। রূপার জিনিষটা কিন্তু অতি অনায়াসেই পাঁচ টাকায় বিক্রী হইয়া গেল। এক টাকার চাউল কিনিয়া পরাণ ঘরে ফিরিয়া মেয়েকে ডাকিয়া কহিল, "কোথাও কাপড় নেই সরম, হরিশ সা খবর দিলে ছোটবাবু নাকি এক গাঁইট শাড়ী এনে গাঁয়ের মেয়েদের ভেতরে বিক্রী করছে। ব্যাটাছেলেকে দেয় না। তুই পরমকে নিয়ে একবার চেষ্টা ক'রে দেখে আয়। তোর গয়না বেচে পাঁচ টাকা পেয়েছি, কি ক'রবো মা, প্রাণের দায়ে এক টাকার চাল আনতে হ'লো। এই বাকী চার টাকা নিয়ে যা।"

বাপের অপ্রতিভ কুণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া সরমের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে কষ্টে নিজেকে সংবরণ করিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিল, "চাল কিনে ভালই ক'রেছ বাবা, আগে প্রাণ বাঁচানো, পরে কাপড়। তা টাকা এখন তোমার কাছেই থাকুক, টাকা নিয়ে পথে বের হ'তে সাহস হয় না। আগে শুনে আসি চার টাকায় ক'খানা কাপড় দেবে, পরে না হয় হবে।"

পরাণ ইতস্ততঃ করিয়া মেয়েকে সাবধান করিতে লাগিল, "দেখ সরম, একটা কথা, এ কিন্তু বুড়ো জমীদার কর্তার আমোল নয়, তাঁর ছেলে ছোটবাবুর আমোল, সমীহ ক'রে কথাবার্তা বলিস্। উনি এখানে না থাকলেও গাঁয়ে কিন্তু সুনাম নেই, নানান্ লোকে নানান্ কথা বলে।"

সরম বাপের ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইল, "তোমার ভয় নেই বাবা, আমরা চাষার মেয়ে, কাউকে ডরাইনে; পরমকে নিয়ে নীল দীঘির পাড় দিয়ে এক্ষুণি জেনে আসছি, কাপড় দেবে কিনা। উনুনে ভাত চড়িয়ে দিয়ে যাই, তুমি জ্বাল দাও। মা চালের কথা শুনে ভাতের তরে ছট্‌ফট্ করছে।"

গ্রামের জমীদার গ্রামে বাস করেন না। জমীদারপুত্র ছোটবাবু কিছুদিন হইতে মাঝে মাঝে আসা যাওয়া করিতেছেন। নীল দীঘির নিকটে জমীদার ভবন, অযত্নে অবহেলায় ভগ্নপ্রায়। আগাছার জঙ্গলে বনাকীর্ণ। ছোট বোনের হাত ধরিয়া সরম জমীদার ভবনে উপনীত হইল।

ছোটবাবু তখন দিবানিদ্রা সারিয়া সিগারেট ধরাইয়াছেন। মেয়ে দু'টি তাঁহাকে আভূমিনত প্রণাম করিয়া হাত জোড় করিয়া রহিল। অনাচারে অত্যাচারে নিষ্প্রভ ছোটবাবুর সামনে আসিয়া চাষার মেয়ের সে দর্প তেজের চিহ্নও রহিল না। ছোটবাবুর চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুখের কদর্য ভঙ্গিমায় সরমের কণ্ঠ ফুটি ফুটি করিয়াও ফুটিল না। বিশেষতঃ জীবনে প্রথম এই সে প্রার্থী হইয়া আসিয়াছে। এতকাল বাহিরের সহিত তাহাদের যোগ ছিল না। পুরুষের বলিষ্ঠ বাহুর অন্তরালে নিরাপদ নীড়ে তাহারা শান্তির সংসার রচনা করিয়াছিল। পুরুষের পৌরুষ আজ পথের ধূলায় পদদলিত, নারীর মান সম্ভ্রম কে আর রক্ষা করিবে!

সরমের কোমল আনত মুখের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ছোটবাবু নিজেই প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোদের নাম কি? কার মেয়ে? কি চাস্?"

"আমরা পরাণ মণ্ডলের মেয়ে, আমার নাম পরম, দিদির নাম সরম। আমরা কাপড় নিতে এসেছি। একখানা কাপড়ও আমাদের নেই। কাপড় বিনে মা উঠ্‌তে পারে না, কাঁথার নীচে শুয়ে থাকে, বাবা নেংটি পরে রয়।" নিজেদের দুঃখের কাহিনী বলিতে বলিতে দুঃখিনী বালিকা ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ছোটবাবু প্রচণ্ড বেগে ধমক দিলেন, "কোথাকার ছিচ্‌কাঁদুনে এখানে কাঁদ্‌তে এসেছে, যা যা বেরিয়ে যা। হ্যাঁ সরম, তোমার কি চাই তুমিই বলো, মাথায় সিঁদুর দেখ্‌ছি যে, বিয়ে হোয়েছে তোমার? স্বামী কি কাজ করে?"

সরম পরমকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া নত নেত্রে আস্তে আস্তে কহিল, "বনগাঁয়ে বিয়ে হোয়েছিল, দুর্ভিক্ষে শ্বশুরবাড়ীর কেউ নেই, সে—সে সহরে গেছে কাজের চেষ্টায়, আমি বাবার কাছে আছি। আমাদের কারুর কাপড় নেই। চার টাকায় যে ক'খানা কাপড় হয় তাই আমাকে দেন।"

ছোটবাবু হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন, "চার টাকায় যে ক'খানা কাপড় হয়? তা তোমার কাপড়ের জন্য চিন্তা নাই, নিশ্চয় দেব।' যে কাপড়

এনেছিলাম সব ফুরিয়ে গেছে। সরকারকে কাপড় আন্‌তে পাঠিয়েছি। বৈকালে এসে কাপড় নিয়ে যেয়ো। তোমাকে এখন দাম দিতে হবে না, পরে বাকী শোধ দিও। দেখো আর একটা কথা, দল বেঁধে কিন্তু কাপড় নিতে এসোনা, তা'হলে দিতে পারবো না, একলা এসে নিয়ে যাবে।"

সরম পুনরায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া আসিল। সরলা কৃষকবালার হৃদয়ে কোন সন্দেহ জাগিল না, কোন সংশয় উদয় হইল না। কাপড পাইয়া সহরে রওয়ানা হইবার আনন্দে তাহার হৃদয় উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিল। মানস নয়নের সাম্‌নে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল অজানা সহরের রঙ্গীন ছবি, গাড়ী, ঘোড়া, দোকান, পসার, ষ্টেশনে নামিয়াই নবীনের সহিত সাক্ষাতের চিত্র হৃদয়ের পটভূমিকায় জ্বল্ জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে বেশভূষায় সে কি সুন্দরই না হইয়াছে, দেখিলে চক্ষু ফিরান যায় না। তবু চক্ষু ফিরাইতেই হইবে, সরমের রাগ কি কম? অভিমান কি কম? বেশী টাকা না হইলে ঘরে না ফেরা কি অন্যায় নহে? সরম কি কেবল তাহার টাকাই চাহে, তাহাকে কি চাহে না?—

সন্ধ্যার পূর্বেই সরম জমীদারভবনে পদার্পণ করিয়া কহিল "আমি এসেছি কাপড় নিতে।"

ছোটবাবু সরমের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, হাসিমুখে ডাকিলেন, "এস, সরম, ঘরে এসে বোসো। সরকার এই এল বলে। এলেই কাপড় পাবে। তা সরম, তুমি মাথায় তেল মাখ না কেন? একে তালি দেওয়া কাপড় তার উপর এত ময়লা কেন? সাফ্ করতে পার না?"

সরম শরমে সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিল, "আমাদের বাড়ীতে তেল সাবান নেই। কাপড় আসতে দেরী থাকলে আজ আমি যাই কাল আবার আস্‌বো।"

"না, না, এই এক্ষুনি আস্‌বে, দেরী নেই। কাপড় এসেছে শোনা মাত্র রাজ্যের লোক এসে লুট ক'রে নিয়ে যাবে। তোমাকে দিতে পারবো না। তুমি একটুখানি ব'সো, এলেই পাবে। ভয় কি? রাত হোলে আমার লোক লণ্ঠন ধ'রে তোমায় বাড়ী দিয়ে আস্‌বে। আচ্ছা, তোমার স্বামী কতদিন হোল সহরে গেছে? খোঁজ খবর নিচ্ছে তো? ও, নেয় না? এক বছর হোল সহরে গেছে? বুঝেছি, সেখানে নূতন জুটিয়ে নিয়েছে। সেই জন্যই মনে পড়ছে না।"

সহসা সরমের বক্ষ উদ্বেলিত হইয়া চোখে জল আসিল। কি নিষ্ঠুর কথা, সে তাহাকে ভুলিয়াছে ইহাও শুনিতে হইল? না, সে পারে না, সরমকে ভুলিতে পারে না। এই বিশ্বাসের বলেই না তার দুঃখময় জীবন যাপন করা! এ বিশ্বাস চূর্ণ হইলে সে কী লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? কী তাহার অবলম্বন? কিন্তু ভদ্রলোক কি মিছেকথা বলিতে পারেন? ইহাদের কত জ্ঞান বুদ্ধি, কত জানা শোনা!

আন্‌মনা সরমের গা স্পর্শ করিয়া ছোটবাবু বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? তুমি এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? তোমাকে ভুলে গেছে শুনে কষ্ট হ'চ্ছে নাকি? ভুলেছে তো ভুলেছে, তাতে কি হোয়েছে? যে চিরকাল মনে করে রাখ্‌বে, রাণীর সাজে সাজাবে, তুমি তার কাছেই থাকনা কেন? কাপড ভিক্ষা করতে এসেছ, কত কাপড় নেবে? শাড়ীতে শাড়ীতে তোমাকে আমি ঢেকে দেব। তোমাদের কোন অভাব রাখবো না।"

সরম সভয়ে পিছু হটিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। কখন দিনের আলো নিভিয়া আঁধার নামিয়াছে। নিকটে লোক নাই, লোকালয় নাই। এ জঙ্গলাকীর্ণ নির্জনে এ লোকটা কি বলিতেছে? ইহারাই না শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত প্রজাপালক জমীদার?

সরমের নীরবতায় ছোটবাবু মনে মনে হাসিলেন। প্রথম ইহারা এম্‌নি ভীতা হরিণীর মত পালাই পালাই ভাব দেখায়। জোর যার মুল্লুক তার! বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া ছোটবাবু দুইখানি প্রসারিত বাহুর মধ্যে হঠাৎ সরমকে চাপিয়া ধরিলেন।

ঘনকৃষ্ণ মেঘরেখায় বিদ্যুৎ ঝল্‌সিয়া উঠিল। এক প্রবল ধাক্কায় ছোটবাবুকে ভূতলশায়ী করিয়া সরম উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া বাহির হইল।

তাহার গতিবেগ থামিল দীঘির পাড়ের মরা নারিকেল গাছের সহিত আঘাত পাইয়া। অনাহারে দুর্বল, অত্যাচারে ক্ষিপ্তা সরমের মনে পড়িল সংসারের নগ্ন চিত্র। সে কোথায় যাইতেছে, তার স্থান কোথায়? বাবা, মা, বোন কেহই থাকিবে না। সে থাকিবে কাহার আশায়? যে তাহাকে ভুলিয়াছে সে কি আবার আসিবে? কিসের বিনিময়ে সরম যাইবে তাহার সন্ধানে? না, সরম যাইবে না। তাহার কাপড়ের প্রয়োজন নাই; অর্থের প্রয়োজন নাই। যে বিশ্ব নিষ্ঠুর পাষাণ হইয়াছে, বিশ্বনাথ পাষাণ হইয়াছে সে বিশ্বে নারীর শরম কে রক্ষা করিবে?

দীঘির নীল জলে সাঁঝের তারা ঝলিতেছে, গাছের ছায়া দুলিতেছে। ওই অতলস্পর্শী শীতল জল লোকালয় হইতে অনেক নিরাপদ।—

সরম তাহার শরম রাখিতে দীঘির নীল জলে ধীরে ধীরে নামিতে লাগিল।

পূর্ণিমা—

দুধমা

আমিনা বিবির মনটা আজ ভাল না। স্বামী কছির শেখকে সে ভাল করে ভোরের নাস্তা দিতে পারে নি। রাতে নিজে না খেয়ে যে দুটো ভাত সে পান্তা করে রেখেছিল, সেই একমুঠো ভাত এক জামবাটি জল ভোরবেলা স্বামীর সামনে ধরে দিতে হয়েছিল। যে মানুষটা দিনভোর মাঠে চাষ আবাদের কাজ করে তাদের তিনবেলা পেটভরে খাবার না দিলে পারবে কেন? খাবার তো খাবারই, চাষীদের ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। অভাব অনটন লেগেই থাকে। তবু আমিনার পোষ্য কম।

ছেলে দুজন প্রায় লায়েক হয়ে উঠেছে। সরকার বাড়ীর গোরুর রাখালী করে। সেইখানে থাকে খায়। মাস গেলে দুটো টাকা এনে মার হাতে দেয়। বড মেয়ে সাকীর বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে। এক বছর তাকে ঘরে পুষে বার বছরে পা দিতে না দিতেই আমিনা তাকে শ্বশুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। গরীব চাষার ছেলে মেয়েদের ধিঙ্গিপনা করে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ালে চলে না। যাদের বলং বলং বাহুবলং তাদের ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা দিতে হয়।

আমিনার সন্তান সংখ্যা বেশী নয়। মাত্র তিনটি হয়েছিল। ছোট মেয়েটা অসময়ে সাতদিনের হয়ে চলে গেছে। কিন্তু তার প্রতিনিধি রেখে গেছে। তাকে ভাত কাপড় দিয়ে পুষতে না হলেও এটা সেটা দিতে প্রাণ চায়।

ঘরের কোণে ধামায় রক্ষিত আধধামা শুকনো ঝরঝরে ধানের দিকে চোখ পড়তেই আমিনার বিষাদখিন্ন হৃদয়ে একটু পুলকের বাতাস বয়ে গেল।

গত রাতে এই ধানগুলো জুড়ান এনে দিয়ে গেছে। সে দুপুরে এসে দেখে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডার শূন্য।

রাতে খেতে বসে ছেলেটা কেঁদে উঠেছিল হাঁউমাউ করে। সমৃদ্ধিশালিনী সরকার গৃহিণীর বড় দয়ার শরীর। তিনি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে বালকের কাছ

থেকে জানতে পেরেছিলেন, যে ভাত সামনে নিয়ে না খেয়ে কাঁদছে কেন? মা বাবার উপবাসক্লিষ্ট মুখচ্ছবি তাকে ভোজনের প্রবৃত্তি দিচ্ছে না।

সরকার গৃহিণী জুড়ানকে খাইয়ে শান্ত করে তাকে দিয়েই আমিনাকে ধান পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অত রাতে তা ভানা হয় নি।

আমিনা সংসারের সমস্ত কাজ ফেলে রেখে আগে গেল ঢেঁকিশালায়!

সংসার ছোট হলেও কাজ কম নয়। সারা বাড়ীতে গোবর জলের ছড়া দেয়া। ঘর বারান্দা লেপে চক্‌চকে করে রাখা। নদী থেকে খাবার জল আনা মাটির কলসীতে। ডোবার জলে বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা। পাড়ার মজা পুকুরটা ছোট নয়, জল বেশি না থাকলেও শুখিয়ে যায় না। ছোট ছোট চুনো পুঁটি মাছেভরা কৃষক মেয়েরা কাদা ঘেঁটে ঘেঁটে খালুই করে মাছ ধরে এনে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। সে ব্যবস্থা অবশ্য বরাবরের জন্য নয়। ধান কাটা হলে কৃষক কুটিরে ইলিশ মাছের আমদানী হয় প্রচুর। তখন দীন দরিদ্র চাষা হয় নবাব বাদশা। ভবিষ্যতের সঞ্চয় করতে জানে না। বর্তমান নিয়েই আনন্দে আটখানা হয়ে থাকে।

চান করে বাসী কাজ সারতেই বেলা হল। খর রৌদ্রে ভরে গেল চারিদিক। আমিনার আর মাছ ধরার সময় হল না।

স্নান সেরে সে নদী থেকে খাবার জল আনে মাটির হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে দিল উনুনে। স্বামীর আজ নামমাত্র নাস্তা খাওয়া হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালায় যদি আগেই আসে মাঠ থেকে।

শয়নগৃহের পেছনে ওদের একফালি জমিতে এতটুক্ একটু ক্ষেত আছে। সেইটুকু নেড়েচেড়ে সময় সময় রান্না খাওয়া চলে।

গ্রীষ্মকালে বেগুন গাছকটা শুকিয়ে এসেছে, পোকাধরা গাছে ঝুলছে কটা বেগুন। মূলো ক্ষেত উজার। প্যাজকলি পেকে গেছে। লঙ্কাগাছ কটা ঠিক আছে। ঝম্ ঝম্ করছে সবুজ লঙ্কায়। ছোট বাঁশের মাচায় নতুন লাউগাছে একটা লাউ বড় হয়েছে। কিন্তু ওতো নতুন গাছের নতুন ফল। ওকে তুলে এনে নিজেদের উদরে দিলে চলবে না!

হিন্দুরা যেমন প্রথম গাছের ফল তরকারি দেব-দ্বিজকে দান না করে নিজেরা খায় না এদেরও তেমনি ধারা নিয়ম। এরা দেয় পীরের দরগায় সাধু সজ্জন ফকিরকে।

এই স্নেহপ্রবণা আমিনার মনে একটা সংকল্প ওই নধরকান্তি নব লতিকার

নব ফলটি সে দরগায় ও সাধু ফকিরকে দেবে না। সে যাকে পীর প্যাগম্বরের চেয়ে বেশি ভালবাসে তারই হাতে তুলে দিয়ে আসবে।

গাছ ভরে ফুল ফুটেছে লাউয়ের কচি জালি ঝুলছে। তারা বড় হলে যথাস্থানে নিবেদন করলেই চলবে। তাদের কদু বা হিন্দুদের লাউটির দিকে তাকিয়ে আমিনা আঁচল ভরে বেগুন মূলো সংগ্রহ করতে লাগল।

ভরা দুপুর প্রখর রৌদ্রতাপে চারিদিক থম্থম্ করছে। মাঠ থেকে ফেরার পথে কছির নেয়ে এসেছে নদী থেকে।

উঠোনে মাটির গামলায় হাত পা ধোবার জল থাকে। গামলাটার পাশে জল তুলে নেবার মাটির ঘট।

কছির পরণের ভেজা গামছা ছেড়ে রঙীন ডুরে লুঙ্গিখানা কোমরে জড়াতে জড়াতে ডাকে, "বৌ, ধান বানিচ্ছিস নাকি?"

আমিনা রান্নার চালা হতে বেরিয়ে হাসিমুখে উত্তর দেয়, "হ, হইবে না ক্যা? ধান বলে চাল হইয়া ভাত হইছে তোমাগো লেগে। তুমি এহন বইস্যা যাও খাওনে। ভাত আনি দেই।"

আমিনা ভাত আনতে চলে যায়।

শয়ন কুটিরের চওড়া তকৃতকে করে লেপাপোঁছা বারান্দায় চাটাইয়ের ওপরে একখানা নক্সাকাটা ছোট কাঁথা পেতে আমিনা স্বামীর আহারের ঠাঁই করে রেখেছে। পাশে ঝক্ঝকে করে মাজা বদনায় পানীয় জল, অদূরে খুঁটির গায়ে কড়ি-বাঁধা থেলো হুঁকোর মাথায় কল্কেয় তামাক সাজা রয়েচে। কল্কেয় আগুন দেওয়া হয়নি, তামাক পুড়ে যাবে বলে।

একখানা কানাতোলা পিতলের থালা ভরে এক থালা মোটা আউশ ধানের লাল চালের ভাত এনে আমিনা রেখে দিল কাঁথার ওপরে। পেঁয়াজ লঙ্কা সংযোগে রান্না বুড়ো বেগুন মূলোর ছালুন। মাটির খোরায় তেঁতুলের খাটা। নারিকেলের মালায় খানিকটা লবণ।

কছির প্রসন্ন হয়ে বসলে, কাছে বসে আমিনা বলতে লাগল, "আইজ কিস্তুক মাছ ধরিতে পারি নাই। ধান বানিতেই ব্যালা হইয়া গিইছেল। ডর লাগছেল তুমি আইস্যা ভাতের লেগে বস্যা থাকিবা। তহন নাস্তা খাওন হয় নাই।"

কছির গ্রাসের পর গ্রাস নরম ভাত মুখে তুলতে তুলতে বলে, "এতো দিয়াও তহনকার নাস্তার শোগ যায় না, বৌ, তপ্ত ভাতের লগে মাছ লাগে না।

ছাগুলেন বাস বাড়াইচে ভর্ ভর্ করি। তর নানান কাম ভাবি মুই ধীরিসুস্থের হইয়া আচার্যবাড়ী ঘুরি আইলাম। আজ হাটবার ধান কিনিতে হইবে। ট্যাকার যোগাড় চাই।"

আমিনা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, "পাইচ? কয় ট্যাকা দিইচে আচার্য দোস্তে? দেহ, আর একটা কথা, আইজ কয়ডা রোজ হইল আমাগো ফুলজান ফুলি আইসে না ক্যা? তারে দেখি আইলা তো?"

"দেখি আইচি। ম্যায়াডার জ্বর, গায়ে বার হইচে গোটা।"

আমিনা আতঙ্কে শিউরে ওঠে, "কি কও বাড়ীওয়ালা? আমাগো ফুলিমার গোটা হইচে, জ্বর হইচে। মুই কনে যামু? আচাযিরা শনিবারে পালপাড়ায় বটতলায় বাত্থিভাণ্ড বাজায়ে শেতলা ঠাকুরে পূজ্যা করিল? পূজ্যা খাইয়া শেতলা আমাগো ফুলির করিল এই দশা?"

"বৌ, তুই শুনিমাত্তর ক্ষ্যাপি উঠ্‌লি ক্যা? এতো ভয় কিসের? যাঁহা মুস্কিল, তাঁহা আসান। রোগ হইচে, সারি যাবে। পূজ্যা খাইয়া ওলাঠাকুর ত চলি গেইচে গেরাম থাকে। শেতলাও যাওনের পথে। আমাগো খাওন হইল, এহন তুই ভাত লয়ে প্যাটে দে। আচ থাকে একদানা ত দাঁতে কাটিস্ নাই?"

আমিনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, "ভাতের সান্‌কি লয়া এডা আমাগো কি বসনের সময়? তারে না দেখি একদানাও মুই মুকে দিতি পারিব না। ও যে আমাগো কি তা কারে কমু? সাত দিনের সোনারে যহন কবর দিয়া বুকের দুখের বানে ভাস্তি যাইছিলাম তহন আচাযি মাঠান আসি ডাকি কইছেল, 'ও বৌ উঠি আয় আমাগো থনে। ছিদামের একডা ম্যায়া হইচে। বৌমা যায়, জ্ঞান গম্মি হারাইচে। তুই ম্যায়াডাকে বাঁচা, ওরে তোরেই দিলাম।' মাঠানের পাছে পাছে যায়া আমাগো জানের জান কলিজার কলিজারে তুলি নিলাম বুকে। শরীলডা আমাগো জুড়াইয়া গ্যাল। মনে হইল যারে কবরে দিইছিলাম, সেই উঠি আইচে।"

কছিরের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সে বদনার নলে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লে "তামান বিত্তান্ত জানি বৌ, তুই আমারে আর কত কইবি? আইজ অষ্ট বছর থেকে ও ম্যায়া যে তোরেই হইয়া রইচে সেডা আচাযি দোস্তও জানে, বৌঠানও জানে, মাঠানও জানে। মুই কইচি কি ম্যায়ার কাছে যাবি যা, প্যাটে দুইডা দানাপানি দিয়া যা।"

আমিনা বাসন, বদনা রন্ধনের চালায় তুলে তামাকে আগুন ধরিয়ে বলে,

"নাইয়া ধুইয়া মুই আঁজলা চাল দিয়া পানি খাইচি। আমাগো নাগি দিল অস্থির করিবা না।" বলতে বলতে আমিনা পথে বের হয়ে গেল।

মজাপুকুরের পাড়ে একটা ঘন লম্বা বাঁশের বন, তার পরেই আচার্যবাড়ী। এই দুই প্রতিবেশী এখানকার বেশীদিনের বাসিন্দা নয়। পদ্মা নদীর ভাঙ্গনে কছিরের পিতা ও ছিদামের পিতা দুটি শিশুপুত্র সহ এ গ্রামে নীড় রচনা করে আশ্রয় নিয়েছিল। তাঁদের দুইজন ছিলেন বাল্যের খেলার সাথী।

সাধারণতঃ হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের ভিতরে চালে চালে বসতি করতে চায় না। তাদের পাড়া স্বতন্ত্র, গণ্ডী ভিন্ন। মুসলমানরাও তাই। কিন্তু আমিনার শ্বশুররা পদ্মা নদীর তাণ্ডব লীলায় ভিটে মাটি হারিয়ে এপাড়ে এসে বিশেষ দূরত্ব বজায় রেখে গৃহনির্মাণ করতে পারেন নি; সামনে যে জমি পেয়েছিলেন তাই যথেষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

ছিদাম আচার্যের বাবার আচারপরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতি মনে মনে একটা অভিমান ছিল, তাঁরা অগ্রদানী পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। সৎব্রাহ্মণ সমাজে অপাংক্তেয়, তাদের থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল। তাই দুটি গৃহ পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি না হ'লেও ব্যবধান মাত্র একটা মজা পুকুর ও বাঁশের বন। দুজনের পিতারা ছেলেদের স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে পরলোকে প্রস্থান করেছেন। কছিরের মাও চলে গেছেন, ছিদামের মা এখনো পথ খুঁজে পান নি। তাঁর আবার একটুখানি আচার বিচার, ছোঁয়াছুঁই বাতিক আছে। পাড়ার বুড়িরা মুখ বাঁকিয়ে তাঁর সম্বন্ধে ছড়া কাটে :—

আচারী বামুনী বচনে মিঠা,
এক কাঠা চালের দুই কাঠা পিঠা।

আড়ালে-আবডালে ছড়া কাটলেও দরিদ্র গ্রামবাসিরা আচার্য গৃহিণীকে একটু সমীহ করে সামনে। তার কারণ ছিদামের উপার্জনের বিরতি নাই। অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, গাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর সকল হিন্দুর বাড়ীতেই তাঁর দ্বার খোলা। বারমেসে পূজো পাঠ বাদেও মানুষের মরণ আছে, শ্রাদ্ধশান্তি আছে, অল্পবিস্তর যাই হোক ছিদামের কাজকর্মের বিরতি হয় না।

সময়ে অসময়ে প্রতিবেশিনীরা আচার্য গৃহিণীর কাছ থেকে ধার পায় চালটা, তেল লবণ ইত্যাদি। নইলে যার নাতনিটা দিনরাত পড়ে থাকে মুসলমান বাড়ীতে, যবনীর স্তন-দুগ্ধে যার 'নাতনির জীবন' তাকে আবার খাতির কিসের?

বুড়িটার এদিক নেই, সেদিক আছে। কোন জন্মে কবি কঙ্কনের গল্প শুনে নাতনির নাম রেখেছে ফুল্লরা। তার থেকে মুসলমানীটা মেয়ের দুদুমা হয়ে নাম দিয়েছে 'ফুলজান'। প্রতিবেশীরা 'ফুলি' নাম প্রচলিত করে কট্‌মটে 'ফুল্লরা' নাম হতে অব্যাহতি পেয়েছে।

কয়েকখানা মাটির কুটির ঘেরা ক্ষুদ্র অঙ্গনে উপস্থিত হয়ে আধঘোমটার মধ্য হতে আমিনা মৃদু স্বরে ডাকে, "ফুলজান, বৌঠান!"

আচার্য গৃহিণী শোবার ঘর থেকে বের হয়ে প্রশ্ন করেন, "কে রে, শেখবৌ নাকি?"

আমিনা পৈঠার দিকে অগ্রসর হয়ে উত্তর দেয়, "হ, মাঠান, মুই আইচি, বাড়ীওয়ালার থনে শুনিলাম আমাগো ম্যায়াডার নাকি ব্যামো ধরিচে। বৌঠান কনে?"

"ফুলিকে নিয়ে বিছানায় বসে আছে। শীতলা মা'র দয়া হয়েছে। মেয়ে অজ্ঞান অচৈতন্য. দুইদিনের মধ্যে চোখ মেলে তাকাল না, কথা বলে না। কি যে বিপদ আমার তা বলার নয়। তুই পৈঠার ওপরে বোস, বৌ।"

আমিনা পৈঠায় বসে না। আকুল নয়নে চেয়ে রইল ঘরের ভিতরে।

শোবার বড় ঘরখানার কোণের দিকে জোড়া তক্তপোষে ফুলির রোগশয্যা পাতা, আচ্ছন্ন অভিভূত হয়ে পড়েছিল পীড়িতা বালিকা। মা শিয়রে বসে পাখার বাতাস দিচ্ছিল।

পৈঠায় দাঁড়িয়ে আমিনা ভাল করে ফুলিকে দেখতে পেল না। কিন্তু বারান্দায় ওঠবার তার শক্তি কোথায়? যেখানে পথের কুকুর-বেড়াল অবাধে বিচরণ করে সেখানে যবন কন্যার দাঁড়াবার অধিকার নেই। গৃহিণীর সংস্কারে আঘাত লাগে।

আমিনা বারকতক গলা বাড়িয়ে ফুলিকে সুস্পষ্ট ভাবে দেখতে না পেয়ে অনুনয়ে কাতর স্বরে বলে, "মাঠান, এহান থাকি ফুলিমাডারে দেহন যাইচে না। বারিন্দায় থেকে ভাল দেখন যাইত।"

মাঠান ঘাড় নাড়েন, "শীতলামার ঘট বসেছে যে ঘরে, বারান্দায় তোর ওঠা চলে না বৌ। এ রোগে রোগীকে আচার নিয়মে রাখতে হয়। ধূপ ধুনো পুড়িয়ে সারাক্ষণ শুদ্ধাচারে রাখবার নিয়ম। এমনি অদৃষ্টে আমার কি আছে, কে জানে তারপরে আবার অনাচার।"

আমিনা সঙ্কুচিত হয়ে রৌদ্রভরা পৈঠার ওপরে বসে পড়ল। মনে মনে

প্রার্থনা করতে লাগল, "মা শেতলা ঠাকুর, আমাগো ফুলিমারে রক্ষা করো, আরাম করি দেও।"

ধীরে ধীরে মধ্যাহ্ন গড়িয়ে বেলাশেষের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া নেমে এলো ভুবনে।

ফুলির মা একবার ঘরের বের হয়ে সবিস্ময়ে বলে, "তুমি তখন থেকেই কি পৈঠায় রোদে পুড়ে যাচ্ছ আমিনাদি? উঠোনের কাঁঠালতলায় ছায়ায় গিয়েও তো বসতে পারতে? আমি অনেকক্ষণ আগেই তোমার গলা শুনেছিলাম। খালি বিছানায় মেয়ে রেখে বেরোতে পারিনি। এহন মা গেলেন ওর কাছে তাই বাইরে এয়েছি একটুখানি। এতদিন তুমিই ওকে বাঁচিয়েছিলে আমিনাদি, এবার আমি কি বাঁচাতে পারব তোমার মেয়েকে?"

বধূর দুই চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগল ঝরঝর করে।

আমিনা মুহূর্তে ভুলে গেল জাতের বিচার, বিভিন্ন ধর্মের গোঁড়ামী, উদ্বেলিকা উৎকণ্ঠিতা এক জননী আর এক জননীর হাত মুঠোয় চেপে ধরে সান্ত্বনা দিতে লাগল, "আল্লার ডাক দিঠান, তেনার দোয়ায় ম্যায়া আমাগো সারি চারি যাইবে। শেতলা ঠাকুর রক্ষে করিবে। মায়ের চোখের পানি ফেলিতে নাই। চোক মুছি ফ্যাল দিঠান।"

"আমি ইচ্ছে করে চোখের জল ফেলছি আমিনাদি? ফুলির অবস্থা দেখে জল যে আপনিই আসে চোখে। ক' দিনের মধ্যে মা আমার তাকায় না, কথা বলে না, খায় না। এই একটু আগে ক'দিনের ভেতর দু'বার বলেছিল দুধুমা, আমার কাছে আয়, গায়ে হাত বুলিয়ে দে।"

"কি কইলে দিঠান, ফুলজান আমাগো ডাকিছেল, গায়ে হাত দিতি কইছেল? মুই কনে যামু, কি করমু?" বলতে বলতে আর এক জননী পৈঠায় মাথা রেখে ফুলে ফুলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

সন্ধ্যার পরে হাট-ফেরতা কছির ডাকে, "বৌ, চল্ ঘরে যাই, আইজ দিনমানে তর খাওন হয় নাই, আতেও উপাস রইছিস? খাইয়া লইয়া সুস্থির হোস্‌গা। খোদা ফুলিরে ভাল করি দিবে।"

গৃহিণী কাছেই ছিলেন ক্ষুণ্ণ স্বরে বলে ওঠেন, "আমার পোড়াকপাল, মাথার ঠিক নেই! সারাদিন বৌ খায়নি; রাত থেকে উপোসী, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম, তোকে দুটো চিঁড়ে গুড় এনে দেই! তাই মুখে দিয়ে দিয়ে জল খা, বৌ?"

বৌ পৈঠার আসন পরিত্যাগ করে সবেগে মাথা নাড়ে ; "না, মাঠান' মুঞি বাসী মুকে থাকি নাই। বিহানে চাল পানি খাইয়া লয়াছি। এহন আমাগো খাওনের ইচ্ছা নাই। পীরের দরগার চেরাগ দিতি হইব।"

আমিনা স্বামীর সঙ্গে বাড়ী ফিরে একখানা দা নিয়ে ছুটে গেল লাউ মাচার পাশে।

নূতন গাছের প্রথম ফল নধরকান্তি লাউটি বাতাসে দুলছে।

আমিনা লাউয়ের বোঁটা কেটে আঁচলের তলায় ঢেকে চুপে চুপে বল্লে, "খোদা, তোমাগো দেব, মুনিষ্যকে দিতি চাইয়া তোমাগো দরবারে কসুর করিছি। তুমি আমাগো ফুলজানরে পরাণে বাঁচাও।"

নদীর পথেই একখানা টিনের চৌরীঘর পীরের দরগা। স্থানটি বট গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশ। প্রাচীন গাছ শাখায় শাখায় ঝুরি নেমেছে। বটের শিকড় এঁকে বেঁকে খানিকটা জায়গায় আসন রচনা করে রেখেছে। সেই আসনের ওপরে স্তূপীকৃত মাটির ছোট ছোট হাতী ঘোড়া পুতুল। কোনও কোনটা সিঁদুর মাখা।

গৃহের মাটির বেদি শুভ্র আচ্ছাদনে আবৃত। বেদির নীচে এক বৃদ্ধ ফকির কোরাণ সরিফ পাঠ করছিলেন।

আমিনা ধীরপদে সেখানে গিয়ে ফকিরকে আভূমি নত সেলাম করে তাঁর মাদুরের আসনের কাছে রেখে দিল কাগজের ঠোঙ্গায় নফর ময়রার দোকান হতে সদ্য আনা সিন্নীর দুই পয়সার বাতাসা, সেই লাউটা আর প্রজ্জ্বলিত একটি মাটির প্রদীপ।

ফকির পাঠ বন্ধ করে মুখ তুললেন। ক্ষণকাল আমিনার মুখপানে চেয়ে পাশের রূপোর বাঁটের চামর তুলে নিয়ে ওর মস্তক স্পর্শ করিয়ে পিতলের থালা থেকে কয়েকখানা সিন্নীর বাতাসা ও গোটা দুই সাদা টগর ফুল হাতে নিয়ে স্নেহবিগলিত স্বরে বল্লেন, "এই নাও মা, খোদাতাল্লা তোমার মুস্কিলের আসান করবেন।"

আমিনার মনে পড়ল তার স্বামীও এই আশ্বাস দিয়েছিল তাকে।

আমিনা ভক্তিভরে প্রসারিত হস্তে প্রসাদ গ্রহণ করে ফকিরের পদতলে ফের নত হয়ে নেমে এল বন পথে।

রাতে আমিনা ভাত নিয়ে বসেও কিছুই মুখে দিতে পারল না। ক্ষুধা নাই, পিপাসাও নাই। তার দুই কর্ণমূলে নিশীথের অরণ্য মর্মরে এক

যন্ত্রণাকাতর কচিকণ্ঠের আর্তনাদ কেবলি ভেসে আসছিল, "ফুফুমা ফুফুমা"!

একথা শোনার পরে কে ঘরে থাকতে পারে ? সংসারের কাজে কি মন দিতে পারে ? আমিনাও পারল না।

কছির ভোরে জেগে আশ্চর্য, "একি বৌ, তর যে বেবাক কাম কাজ সারাতারা! এই আতে গাঙে গেইছিলি নাকি ? নাইয়া আলি কনে থাকি ?"

বেড়ার গায়ে আমিনা ভেজা কাপড় মেলে দিতে দিতে উত্তর দেয়, "পুকুর থেক্যাই ছুডা ডুব দিইয়া আইলাম। মাঠান কইছেল লোগের বাড়ীতে যাওন কালে শুদ্ধ হইয়া যাওন লাগে। তোমাগো লাগি পাতিল ভইর্য়া ভাত রাঁধি থুইয়া গেইলাম। কদু বাগুন ভর্‌তা করি থুইচি। প্যাঁজ রশুন মরিচ পোড়াইয়া থুইচি হুনের খালুই ভরি। তুমি লয়া থুইয়া খাইয়া লইও। মাটির কলসে খাওনের পানি রইচে।"

কছির বল্লে, "এই বিহানেই তুই ওহানে যাইয়া করিবি কি বৌ, না পারিবি ওয়াগরে ঘরকে যাইতে, না পারিবি ম্যায়াডারে নাড়িতে চাড়িতে। বৈঠায় বসি রোদ্দুরে পুড়ি মরিতে যাইবি ক্যা ? নতুন গাছের কদু ভর্‌তা করিলি যে, পীরের দরগায় দিলি না ?"

"দিইচি, বড়ডা। ছোট একডা আনি তোমাগো লেগে ভর্তা করি থুইচি। পৈঠায় বসি থাকলেও আমাগো শান্তি। পরাণ কিছুবিছু করিচে, মুই চলি যাই, আমাগো ফুলির থনে।"

"যাওনের আগে মুখে দু'ডা দানাপানি দিয়া যা, বৌ।"

"আল্লা দেওনওয়ালা, দিইলে সেইখেনেই আমাগো দানাপানি জুটিবে।" বলতে বলতে আমিনা বাড়ীর বের হয়ে গেল।

রোগী নিয়ে সারারাত গেছে বিষম দুঃশ্চিন্তায়। ফুলির গায়ের গুটিগুলো পেকে উঠেছে। বালিকার আহার নাই, নিদ্রা নাই। শুধু এক বুলি, "ফুফুমা, তুই আমার কাছে আয়, আমাকে কোলে নে।"

প্রভাতেই বসন্তের চিকিৎসক এসে বসেছেন গৃহের সামনে। সকলের মুখই মলিন-চিন্তাক্লিষ্ট।

আমিনা ঘোমটায় মুখ ঢেকে অচল অনড় হয়ে আশ্রয় নিয়েছে পৈঠায়।

ছিদাম বারেক তার দিকে চোখ তুলে চুপে চুপে ডাকে, "কবরাজ কাকা, যেমন করেই হোক ওকে আপনার বাঁচাতেই হবে। যদি বলেন হরিরামপুর

থেকে বসন্ত রোগের বড় কবিরাজ মাখন চক্রবর্তীকে আনতে এখুনি লোক পাঠিয়ে দেই ?"

কবিরাজ মশায় ক্ষণেক ভেবে বল্লেন, 'এবেলাটা দেখা যাক, ছিদাম। তিনি এখন বিশেষ বের হতে পারেন না, বুড়ো হয়ে অশক্ত হয়েছেন। আমি যে ওষুধ দিচ্ছি, এ তাঁরই ওষুধ। তিনিই আমার গুরু। তাঁর আদেশ রোগী যাতে শান্ত থাকে তাই করবে। তাঁর প্রলাপের বস্তু সম্ভব হলে কাছে এনে দেবে। আমি ত আগাগোড়া দেখচি রোগিনীর এক কথা, 'দুদুমা দুদুমা'। এর কি কোন প্রতিকার নেই, ছিদাম ?"

ছিদাম উদাস স্বরে বলে ওঠে, "সে আপনারাই জানেন, কবরেজ কাকা। আমি পতিত বামুন, জেলে চাঁড়াল, মুচীর দোরে দোরে ঘুরে পেট চালাই। লেখাপড়া শিখিনি, শিক্ষে দীক্ষে নেই। জানি সব মানুষই এক। বাবার দোস্ত ছিলেন কছিরের বাবা, সেই সুবাদে কছির আমার বন্ধু। যে আমিনা বৌয়ের বুকের দুধে ফুলির জীবন, সে একবার তার কাছে গেলে কিসের অপরাধ সেটা আমি জানিনা। মা রয়েছেন তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।"

মা কাছেই ছিলেন, তাঁকে আর জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না। আসলে তাঁর আচার বিচার নিষ্ঠার তেমন জোর ছিল না। সেটা নিতান্ত লোক দেখানো বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। পতিত ব্রাহ্মণদের সমাজে কি না চলে, তা কেনা জানে ?

গৃহিণী আঁচলে চোখ মুছে ভাঙ্গা গলায় বলেন, "তুমি যদি বল, কবরেজ ঠাকুরপো, তাহলে মা শীতলার ঘট পুজোর ঘরে সরিয়ে রেখে আমিনাবৌকে একবার ফুলির ঘরে যেতে দেই। ওর জীবনের চেয়ে আমার আচার ত বড় নয়। ফুল্লরা যে আমার একমাত্তর শিবরাত্রির সলতে। কিন্তু ও রোগে যে শুদ্ধাচারে থাকবার নিয়ম। মুসলমানী ছুঁলে অকল্যাণ ত হবে ?"

কবিরাজ সহাস্যে মাথা নাড়েন, "না, রোগী এমন করে যাকে চাইছে, তাকে কাছে পেলে তার কল্যাণ হবারই সম্ভাবনা। তাছাড়া কে যে কি বেশে আসে, আমরা তার কি জানি ? শীতলার মার দয়া হলে তিনি কত রূপ ধারণ করেন।"

গৃহিণীর আদেশে বধূ ফুলির মাথার নিকট থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল আম্রপল্লব ও সিঁদূরে ভূষিত শীতলার তামার ঘট।

আমিনা এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে এদের বাক্যালাপ শুনছিল, এরপরে তাকে আর কারোর কিছু বলতে হল না। বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতন সে ছুটে গেল ঘরের

মধ্যে। দুই ব্যগ্র বাহু মেলে বুকে জড়িয়ে ধরল ফুলির পীড়িত দেহ। অপার স্নেহে করুণায় বিগলিত কণ্ঠে ডাক দিল, "ফুলজান, ফুলি মা আমাগো, চাহি ছ্যাখ এই যে মুই আইচি, আর তোর ডর নাই, মুই পাড়ি মুছি দিমু সকল আপদ বালাই।"

ফুলি চোখ মেলে সহর্ষে আস্তে আস্তে বলে, "দুদুমা, তুই আমার কাছে এসেছিস? তোর ঠাণ্ডা হাত আমার গায়ে বুলিয়ে দে, এবার আমি ভাল হয়ে যাব।" হ্যাঁ, ঠাকুমার ফুল্লরা, আমিনার ফুলজান, সাধারণের ফুলি এবার ভাল হয়ে যাবে। আর ভয় নেই।

নবজাতক

জগাই

আমার চার বছর বয়সের ছেলে মুটুকে আমি এক মুহূর্তও চোখের অন্তরাল করিতে ভালবাসিতাম না। কত বিনিদ্র রজনী আকুল দীর্ঘশ্বাসে কাটাইয়া হৃদয়ের নীরব বেদনা হৃদয়ে লুকাইয়া—মুটুকে পাইয়াছিলাম ; তাই 'হারাই হারাই' ভয়ে আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া রহিত।

মুটুর ক্ষীণ সুকুমার দেহ, অম্লান মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিয়া মনে হইত ; মুটু বুঝি এ জগতের নয়। শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালি বৃন্তচ্যুত হইয়া আমার কোলে যে আশ্রয় লইয়াছে—সংসারের খর দৃষ্টিপাতে আমার হৃদয়ানন্দ শেফালিগুচ্ছ কখন বা ম্লান হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় আমি ব্যগ্র হইয়া থাকিতাম।

যেখানে অপরিসীম উদ্বেগ, অদম্য উৎকণ্ঠা, সেখানে নানারূপ বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। এত সাবধানতা, সতর্কতার মধ্যেও মুটুর একদিন সামান্য একটু জ্বরভাব হইল। প্রথমে সর্দি জ্বর ভাবিয়া উপেক্ষা করিলেও, জ্বর কিন্তু উপেক্ষণীয় হইয়া রহিল না।

ডাক্তারের পরিবর্তে ডাক্তার আসিলেন, ঔষধেরপর ঔষধ আসিতে লাগিল ; কিন্তু কিছুতেই জ্বরের বিরাম হইল না। মুটুর হাস্যালোকে আমার সমুজ্জ্বল অন্তরাকাশ, চিন্তার কালো মেঘ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

চিকিৎসকগণ চিকিৎসা শাস্ত্র আলোড়িত করিয়া রায় দিলেন মুটুর ম্যালোরিয়া, স্থান পরিবর্তনই ম্যালোরিয়ার একমাত্র মহৌষধ।

নটুর বাবা কহিলেন, "মুটুকে নিয়ে আমরা কুসুমপুরেই যাই বীণা, পদ্মার ধারে কিছুদিন থাক্‌লেই মুটু সেরে উঠ্‌বে। নীরদরা সবাই পশ্চিমে বেড়াতে গেচে, খালি বাড়ী পড়ে রয়েচে, থাক্‌বারও অসুবিধা হবে না।"

কুসুমপুরে আমার স্বামীর বাল্যবন্ধু নীরদ বাবুর বাড়ী। নীরদ বাবু বহুদিন

বহু চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইতে সমর্থ হন নাই। কারণ, আমি সহরের মেয়ে, আমার সুখের শৈশব, হাসিভরা কৈশোর, স্বপ্নময় যৌবনের প্রারম্ভ সহরেই অতিবাহিত হইয়াছে, আমার অপরিচিত, অজ্ঞাত পল্লীর যে চিত্রটি কল্পনার বলে আমি হৃদয় ফলকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলাম—সেটা মোটেই আশাপ্রদ নহে। কাজেই স্বামীর প্রস্তাবে সহজে সম্মত হইতে পারিলাম না।

তিনি আমার মনোভাব বুঝিয়া সহাস্যে কহিলেন, "কুসুমপুর যেতে চাচ্চি শুনে তোমার মুখ যে শুকিয়ে গেল ; সেটা নিতান্ত বনবাস নয় বীণা ; সেখানে তোমার মত, আমার মত, মুটুর মতও ঢের লোক আছে।"

বলিলাম, "আছে বটে, কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তারা চাষা, তাদের আবার সুখ দুঃখ, তাদের আবার ভাল মন্দ! চাষাদের আমি টেবী কুকুরের চেয়েও অধম মনে করি। চাষাদের ভিতর আমার যেতে ইচ্ছে করে না।"

স্বামী বলিলেন, "মানুষকে এত ঘৃণা করা ভাল নয় বীণা, চাষাদের মধ্যেও কত উদার মহৎ প্রাণ আছে,—যা শিক্ষিত সমাজে, সভ্য সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি আর আপত্তি করো না। পাড়াগাঁয়ে কৃষকদের মধ্যে তোমাকে একটিবার নিয়ে যেতে আমার বড্ড সাধ হয়েচে। তুমি রাজী হলে আমার সাধও পূর্ণ হবে, মুটুও সেরে আস্‌বে।"

মুটু সারিয়া আসিবে, সুস্থ সবল হইবে একথা ভাবিতেই আমার অন্তস্থল পুলক-প্লাবনে প্লাবিত হইল। মনের মধ্য হইতে অজানা স্থানের ভীতি, গ্রামের বিভীষিকা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "মুটু ভাল হবে বুঝলে কুসুমপুরে যেতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু সাবধান হয়ে, অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যেতে হবে। ছেলে সারাতে গিয়ে সাপ, বাঘের মুখে তোমাদের তুলে না দিতে হয়!"

তাঁহার চোখ দুটি সকৌতুক হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি হাস্য-তরল কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি বীরজায়া, বীরেন্দ্রাণী বীণা, এখন আবার বীর জননীও হয়েচ ; কাজেই প্রতিপদক্ষেপে অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে বৈ কি! তাই বলে কুসুমপুরে তোমার সমর সাজে যেতে হবে না। সেটা সুন্দরবনও নয়, সাঁওতাল পরগণাও নয়, সাদা কথায় ছোট্ট একটি পাড়াগাঁ ; ঝি ভজার মাদের মত মানুষ সেখানকার অধিবাসী।"

ভজার মা মুটুকে কোলে করিয়া এই দিকেই আসিতেছিল, তাহার নাম উল্লেখে সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে ডেকেছিলেন কি বাবু ?"

স্বামী কহিলেন, "তুমি কুসুমপুর দেখেচ ভজার মা ? সে জায়গাটা কেমন ? পদ্মার ধারের কুসুমপুরের কথা কিন্তু আমি বলচি।"

ভজার মা প্রফুল্ল হইয়া, হাত নাড়িয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কুসুমপুর আবার দেখিনি ? খুব দেখেচি বাবু ! সেখানে আমার বোনঝিরা ঘর করেচে। বড্ড ভাল গাঁ ঠিক যেন ইন্দিরের অমরাপুরী, কিবে ফলের বাগিচা, কিবে ধানের ক্ষেত ; পদ্মার জল যেন থই থই করচে, ঢেউগুলিই বা কি তারিপের—চারদণ্ড তাকিয়ে দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়।"

আমি উৎসুক হইয়া কহিলাম, "কেবল ভাল ভালই তো করছো ভজার মা ! সেখানে কত বড় লম্বা সাপ আছে, কত বড় বাঘ আছে তা তো বল্‌ছ না ?"

ভজার মা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "এমন আজগ্‌বি মিছে কথা তোমায় কে বলেচে মা ? স্বয়ং মা পদ্মা যেখানে, সেখানে নাকি সাপ বাঘ আসতে পারে ! আসুক না, এগুক না, এক ঢেউতেই বাছাধনদের পটল তুল্‌তে হবে।"

ভজার মায়ের পটল তোলার ভঙ্গীতে মুটু খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাঁহারও অধরোষ্ঠে মৃদুহাস্য রেখা খেলিয়া গেল ; আমিও না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্বামীর একান্ত ইচ্ছায়, ভজার মার সরস বর্ণনায় আমি কুসুমপুর যাইতে স্বীকৃত হইলাম। কয়েক দিন পর বোঁচকা বাঁধিয়া, বাক্স সাজাইয়া আমরা কুসুমপুর রওনা হইলাম। ঝি ভজার মা ও চাকর যদু আমাদের সঙ্গী হইল।

॥ ২ ॥

দূর হইতে যে স্থান মানব বর্জিত বন্য জন্তুর আবাসস্থল ভাবিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলাম, কাছে আসিয়া কুসুমপুরের নয়নাভিরাম দৃশ্যে স্নিগ্ধ-শ্যামল শোভা সম্পদে মুগ্ধ হইয়া গেলাম। গ্রামের অধিকাংশই কৃষক, চারিদিকেই খড়ের কুটীর, ধানের মরাই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নীরদ বাবুর গৃহ পদ্মা হইতে বেশী দূর নহে। বাড়ীর দক্ষিণে বিস্তৃত প্রান্তর, প্রান্তরের শেষে অগণিত বৃক্ষশ্রেণী তাহারই ফাঁকে কৃষক পল্লী, বামে দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্র, কোনখানি স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত, কোনখানি বা শ্যাম শোভায় শোভমান। সম্মুখে তৃণশূন্য বালির চর,

তাহারই শেষ প্রান্তে দুগ্ধ ধবলিত কাশের বন ধৌত করিয়া সীমাহারা আপনহারা তরঙ্গময়ী পদ্মা প্রবাহিতা।

পদ্মার তীর নীরের অপূর্ব লহরী লীলা দর্শন করিয়া, কৃষকদের মেঠো সুরের উচ্ছ্বলিত গান শুনিয়া অনির্বচনীয় আনন্দের মধ্য দিয়া আমাদের কয়েকটা দিন অতিবাহিত হইল। কিন্তু সে আনন্দ অধিক কাল স্থায়ী হইল না। সেদিন মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় মুটুর অল্প জ্বর প্রবলভাব ধারণ করিল। স্বামী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ডাক্তারের অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, এটা চিকিৎসকশূন্য গ্রাম, গ্রামের দুই ক্রোশ দূরে মহকুমায় ভিন্ন ডাক্তার নাই; ঔষধ নাই। মহকুমার ডাক্তারও রাত্রে গ্রামান্তরে যান না। সমস্ত শুনিয়া স্বামীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ চিন্তার ছায়ায় ম্লান হইয়া গেল। দুঃখে ক্ষোভে আমি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারিলাম না, অকস্মাৎ আমার দুটি চক্ষে বরষার ধারা ছুটিল।

তিনি সস্নেহে আমার অশ্রুসিক্ত মুখ মুছাইয়া দিয়া সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "ভয় নেই বীণা; কাল সকালেই আমি মহকুমা থেকে ডাক্তার আনাব। যেখানে উপায় নেই সেখানে ব্যাকুল হয়ে লাভ কি? এখানেও লোকের ছেলেপিলে আছে, তাদের কথা মনে করে শান্ত হও।"

তাঁহার সান্ত্বনায় আমার বিক্ষিপ্ত চিত্ত শান্ত হইল না। আমার সহিত চাষার তুলনায় আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, "চাষার সঙ্গে ভদ্রলোকের তুলনা হ'তে পারে না; তাদের আবার সুখ, দুঃখ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা! আমি তখনি এখানে আসতে চাইনি, তোমার বুদ্ধির দোষে আজ আমার এত বিড়ম্বনা, এত কষ্ট!"

তিনি কি যেন বলিবার জন্য মুখ তুলিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠের ভাষা পরিস্ফুট হইল না। মুটু জ্বরের প্রাবল্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জগাই দাদা, আমায় ধরে নিয়ে যাও, আমি চান করব, তোমার সঙ্গে জলে নেমে চান করব।"

আমি মুটুর জ্বরতপ্ত দেহটি বক্ষে জড়াইয়া ডাকিলাম, "মুটু কি বলছ মণি, জগাইদাদা কে?" মুটু আমার কথার প্রত্যুত্তর করিল না। অস্ফুট কণ্ঠে কয়েকবার 'জগাই দাদা জগাই দাদা' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল।

ভজার মা বারান্দায় বসিয়া বাতি সাজাইতেছিল, মুটুর চিৎকারে সচকিত হইয়া শয্যাপ্রান্তে ছুটিয়া আসিল। কিয়ৎকাল মুটুর পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "আপনি ভয় পেয়োনা মা; খোকাবাবু ভাল হবেন; রাতের ভিতর মা রক্ষাকালী জ্বর ছাড়িয়ে দেবেন। ডাক্তার কি করবে? যে দ্রব্য ওর শরীলে"—

বলিতে বলিতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া যোড়করে গলবস্ত্রে ভজার মা রক্ষাকালীর উদ্দেশ্যে মাটিতে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

আমরা এ কালের শিক্ষাপ্রাপ্তা ; শ্মশানকালী রক্ষাকালী, মূর্খদের কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা উপহাস করিতেই শিখিয়াছি ; তাই ভজার মায়ের ভক্তি-উচ্ছ্বাসে আমার অপ্রসন্ন চিত্ত আদৌ প্রসন্ন হইল না ; আমি বিরক্ত হইয়া তিক্তকণ্ঠে কহিলাম, "এখানে গোলমাল করো না ভজার মা ; এটা আমার গোলমালের সময় নয় ; আমি কালী টালি কিছু মানি না ; আমার ছেলের জন্যে তোমাকে কাউকে ডাকতে হবে না।"

ভজার মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

স্বামী হুটুর মাথায় পাখার বাতাস দিতে দিতে কহিলেন, "ভজার মা বড্ড দুঃখিত হয়ে গেল বীণা, বিশ্বাসীর বিশ্বাসে, ভক্তের ভক্তিতে সন্দেহ করতে নেই। ভজার মা হুটুকে তোমার চেয়ে আমায় চেয়ে কম ভালবাসে না।"

আমি রুক্ষস্বরে কহিলাম, "ছোটলোকের আবার ভালবাসা, তাদের স্নেহ মমতা! তারা টাকা ভালবাসে, অর্থের প্রত্যাশায় ভালবাসা দেখাতে আসে। আমি ওদের স্নেহ কখনো বিশ্বাস করি না, করবও না।"

তিনি কথা কহিলেন না, নিরুত্তরে ব্যথিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর মেলিয়া দিলেন।

॥ ৩ ॥

ভজার মায়ের রক্ষাকালীর কৃপাতেই হউক্ অথবা অন্য কারণেই হউক্, পরদিন প্রভাতেই হুটুর জ্বর ছাড়িয়া গেল। হুটু কচিমুখে হাসির লহর তুলিয়া ভজার মার কোলে চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার বায়না ধরিল। এখানে আসিয়া হুটু আমার স্নেহাঞ্চল হইতে অনেকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া বনে প্রান্তরে বেড়াইতেই ভালবাসিত। হুটুর এ পরিবর্তনে আমি খুসী না হইয়া একটু দুঃখিতই হইয়াছিলাম। মায়ের সুনিশ্চিত সুনিরাপদ স্নেহের কোল ভিন্ন ছেলের আকর্ষণের আবার কি থাকিতে পারে?

আমি হুটুকে বক্ষে চাপিয়া কহিলাম, "এখন বেড়াতে যায় না মণি, তোমার যে বড্ড অসুখ করেছে। অসুখ ভাল হলে ভজার মার সঙ্গে যেয়ো।"

কুসুম-পেলব বাহু দুটিতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের স্বরে হুটু কহিল, "অসুখ আমার ভাল হয়েছে মা, আমি এখুনি জগাই দাদার কাছে যাব।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম, এ ত মুটুর জ্বরের প্রলাপ নহে, স্বপ্নের জড়িমা নহে, জগাই দাদা কে? কোন্ অপরিচিত অনাত্মীয় আমার চক্ষের অন্তরাল হইতে এমন করিয়া শিশু হৃদয়টি জয় করিয়া লইয়াছে?

আমি ভজার মাকে ডাকিয়া এ রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলাম, কারণ এখানে আসিয়া মুটু ভজার মার অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সহজে যদুর নিকটে ঘেঁসিতে চাহিত না। তাহার প্রসাধন, ভ্রমণ, স্নান, ভজার মা না হইলে সুসম্পন্ন হইত না।

আমার প্রশ্নে ভজার মা ম্লানমুখে সংক্ষেপে জানাইল, গ্রামের একটা আধ পাগলা লোককে বালচপলতা বশতঃ খোকাবাবু জগাই দাদা বলে। শিশুচরিত্র বালকের খেয়াল, তাহার মূল্য নাই। স্বামী ভজার মার কথাটা সমর্থন করিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "মুটুর আবোল-তাবোলে মানুষ আবার কাণ দেয়! ও বেড়াতে যেতে চাচ্চে—মোটা কাপড় দিয়ে বেশ করে গা ঢেকে, ভজার মার কাছে দাও একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসুক। আজ আর ডাক্তার ডেকে দরকার নেই, আমার মনে হচ্ছে এখন এম্নিই মুটু ভাল হ'য়ে যাবে।"

আমি স্বামীর আদেশ অবহেলা করিতে পারিলাম না। মুটু ভজার মার সহিত বেড়াইতে গেল; কিন্তু আমার মনের মেঘ কাটিল না। যে জগাই আমার মুটুর হৃদয়-আসন অধিকার করিয়া লইয়াছে—তাহার সংবাদ জানিবার জন্য আমি উৎসুক হইয়া রহিলাম।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, স্বামীর অনুমান মিথ্যা হইল না। সেই দিনের প্রবল জ্বরের পর মুটু ক্রমেই সুস্থ হইতে লাগিল। তাহার চোখের কোল দুটি ভরিয়া উঠিল, শ্বেত অধরোষ্ঠ রক্তিমাভা ধারণ করিল। তাহার পরিবর্তনে আমার কুসুমপুরের প্রতি বিতৃষ্ণা বিমুখতা কোন্ যাদুমন্ত্রে যেন অন্তর্হিত হইল। প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত, আনন্দে আমার হৃদয়টুকু ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সেদিন ভজার মা পদ্মার জল আনিতে গিয়াছিল, আমি মুটুকে স্নান করাইবার জন্য তাহার গায়ের জামাটি খুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলাম—মুটুর দক্ষিণ বাহুতে রাঙা সূতার সহিত একটি তামার মাদুলী বাঁধা রহিয়াছে। যাহা কখনও বিশ্বাস করি না, যে দ্রব্য সভ্য-সমাজে অতি হেয়, হাস্যকর—আমার পুত্র আমারই অজ্ঞাতে সে জিনিষ শরীরে ধারণ করিয়াছে! লজ্জায় ঘৃণায় আমার

গর্বোজ্জ্বল হৃদয় ধূলি-শয্যায় লুটাইয়া পড়িল, আমি ক্রোধভরে একটানে সূতা খুলিয়া মাতুলীটা প্রাঙ্গণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলাম।

হুটু দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "আমার লাল গয়না ফেলে দিলে কেন মা? জগাই দাদা আমার লাল গয়না পরিয়ে দিয়েচে।"

বলিলাম, "জগাই দাদা কে হুটু? সে কোথায় থাকে?"

ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে হুটু কহিল, "জগাই দাদা জলের ধারে থাকে মা, আমাকে আদর করে গয়না পরিয়ে দেয়, জগাই দাদার গয়না আমার হাত বেঁধে দাও।" বলিতে বলিতে হুটু ছুটিয়া গিয়া প্রাঙ্গণ হইতে মাতুলীটি কুড়াইয়া আনিল।

আমি বিহ্বলের মত ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া যদুকে ডাকিয়া মাতুলীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। যদু বলিল, সে কিছুই জানে না, খোকাবাবু সর্বদা ভজার মার কাছেই থাকে, তাহার সহিতই বেড়াইতে যায়। একদিন দূর হইতে একটা ভিখারী গোছের বুড়ার কোলে সে খোকাবাবুকে দেখিয়াছিল।

আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। সে বৃদ্ধ কে? সেই কি হুটুর জগাই দাদা? হুটুর সহিত তাহার এত বন্ধুত্বের কারণই বা কি? হুটু যদি তাহার স্নেহের পাত্রই হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে স্নেহ ভালবাসা সঙ্গোপন রাখিবার এত প্রয়াস কেন? ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ একটি কথা সুস্পষ্ট দিবালোকের মত আমার স্মৃতির দর্পণে ফুটিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পর দিন একটি কৃষকপত্নীর নিকট শুনিয়াছিলাম, অনেক কাল পূর্বে এদেশে একবার ছেলেধরার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। পদ্মার বাঁকে নৌকা রাখিয়া ছোট ছোট ছেলে মেয়ের সন্ধানে তস্করগণ চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। অতিরঞ্জিত জনশ্রুতি ভাবিয়া সেদিন কৃষকপত্নীর কথায় কর্ণপাত করি নাই, কিন্তু আজ তাহার সেই মুখরোচক বাক্যবিন্যাস মিথ্যা বলিয়া অবহেলা করিবার ক্ষমতা আমার রহিল না। আমি যেন বিনা সংশয়ে ভজার মার হাতে হুটুকে সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু অশিক্ষিতা নিরক্ষরা ভজার মা অর্থের প্রলোভনে হুটুর যে অপকার করিতে পারে তাহা একবারও স্মরণ হয় নাই। মা বোধ হয় ছেলেধরাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া হুটুকে বশীভূত করিয়া লইতেছে, তাই এত গোপনতা, এত লুকোচুরি।

হুটুর হাসিভরা মুখপানে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। মাথার মধ্যে

ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, আমি স্পন্দিত বক্ষে মুটুকে কোলে লইয়া শয্যায় আশ্রয় লইলাম।

॥ ৪ ॥

প্রতিদিনের মত যথানিয়মে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর বক্ষে অপরাহ্নের স্নিগ্ধ ছায়া ঘনাইয়া আসিল। লক্ষ ফুলের পরিমল বহিয়া মন্দ সমীরণ আসন্ন সন্ধ্যার বারতা বিশ্বের দ্বারে জানাইতে লাগিল।

মুটু তাহার জামা জুতা হাতে লইয়া ডাকিল, 'ভজুমা, আমার জামা পরিয়ে আমায় জগাই দাদার কাছে নিয়ে চল্। শীগ্‌গির করে নিয়ে চল্।'

ভজার মা তাড়াতাড়ি আরব্ধকার্য শেষ করিয়া মুটুর কাছে আসিতেই আমি বলিলাম, "মুটু আজ বেড়াতে যাবে না ; জলো হাওয়ায় ওর সর্দির মত হয়েচে। তুমি যাও কাজ কর গে।"

ভজার মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া আস্তে আস্তে কহিল, "খোকাবাবু কি ঘরে থাকবে মা? ও যে কেঁদে কেঁদে অনর্থ করবে, পদ্মার ধারে না গিয়ে মাঠের দিক থেকে বেড়িয়ে আনলে হয় না?"

একবার সাধ হইল ভজার মাকে মুটুর জগাই দাদার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এ সমস্যার সমাধান করি, কিন্তু সাহস হইল না। আমি সব জানিতে পারিয়াছি জানিলে হয়ত উহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে। এখন যাহা কৌশলে আয়ত্ত করিতে যত্নবান হইয়াছে, ভয় ভাঙ্গিলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। এই আত্মীয়শূন্য, বান্ধবশূন্য স্থানে আততায়ীর হস্ত হইতে কে আমাদের রক্ষা করিবে। কাহার মাথা ব্যথা! আমি ধীরে ধীরে কহিলাম, "একটু কাঁদে কাঁদবে, আমি ভুলিয়ে রাখব ভজার মা, তোমার ইচ্ছে হয় তুমি বেড়াতে যাও গে।"

ভজার মা বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে আমার পানে চাহিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

মুটু হাতের জুতা ফেলিয়া দিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল—"আমি তোমার কাছে থাকব না মা, ভজু মার কোলে চড়ে জগাই দাদার কাছে যাব।" আমি আদর করিয়া, চুমো খাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে শান্ত হইল না, আমার স্নেহ বেষ্টনের মধ্যে ধরা দিল না।

মুটুর চিৎকারে স্বামী আমার নিকটে আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হুটু কাঁদে কেন? ওকে বেড়াতে পাঠিয়ে দাও না। পদ্মার বাতাসে ওর কিছু অসুখ করবে না, এখানকার বাতাসই ওষুধের কাজ করে।"

তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার অব্যক্ত বেদনা, অন্তরের উদ্বেগ সহসা উচ্ছ্বসিত হইল। তবু আজ আমি হৃদয়ের দ্বার তাঁহার কাছে খুলিতে পারিলাম না। আমার বিলক্ষণরূপে জানা ছিল, তিনি আমার সন্দেহ আমার অনুমান একটুও বিশ্বাস করিবেন না; ভ্রান্ত বলিয়া, আগাগোড়া ঘটনাবলী উপহাসের সহিত উপেক্ষা করিবেন। সমস্ত শুনিয়া ভজার-মা ত্বরায় নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করিবে। তাহার চেয়ে কাহাকে কিছু না জানাইয়া, অবিলম্বে এস্থান পরিত্যাগের সংকল্প করিয়া আমি ছলনারই আশ্রয় লইলাম। তাঁহার কথার প্রত্যুত্তরে কহিলাম, "হুটুর সর্দির মত হয়েচে, দুপুরে গা একটু গরম হয়েছিল, আজ আর বেড়াতে যেতে দেব না। আমার শরীটাও ভাল লাগছে না, চল কাল ভোরের গাড়ীতেই আমরা কলকাতা চলে যাই। এখানে আর একমুহূর্তও মন টিক্‌ছে না।"

তিনি পরিহাসের স্বরে বলিলেন, "আসা যত সোঝা, ফেরা তেমন সহজ নয় বীণা! তোমার শরীরটা ভাল নয় বলচ, শরীরের দিকে চেয়ে দেখে বলচ, না, না দেখেই বলচ? হুটুর সর্দি, গা গরম, এটাও তোমার উৎকট কল্পনা বীণা! হুটু যে সারা দুপুর আমার কাছেই শুয়ে ছিল, সর্দি হলে, গা গরম হলে আমি কি টের পেতাম না? আজ বোধ হয় কেউ তোমার কাছে বাঘের গল্প করেচে, তাই ঘরে ছিপি আঁটার ব্যবস্থা করচ।"

আমি বলিলাম, "বাঘের ভয়ে নয়, আমার এখানে ভাল লাগছে না, আমি আর থাক্‌তে পারচি না, এখানে থাকলে আমি মারা যাব। তুমি বাঁচবে না, হুটু শেষ হয়ে যাবে। চল কালই আমরা চলে যাই।" বলিতে বলিতে আমার অশ্রুজল ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

তাঁহার আগমনের সঙ্গেই হুটুর কান্না থামিয়া গিয়াছিল। হুটু জুতার মধ্যে পা ঢুকাইতে ঢুকাইতে আমার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা, মা কাঁদে, মাকে বকো না।"

তিনি বিস্মিত হইলেন, ব্যথিত হইলেন। আমার হাতখানি হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কান্না কেন বীণা, কি হয়েছে আমায় বল্‌বে না? সত্যি তোমার এ জায়গায় থাক্‌তে ভয় করচে, কিসের ভয় বীণা?"

"কিসের ভয় জানি না, আমি এখানে আর থাকতে পারব না, আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি কহিলেন, "আজ নীরদের চিঠি পেলাম, আমরা এখানে এসেচি শুনে তারা বড় খুসী হয়েচে; আমাদের সঙ্গে দেখা করতেই তারা সস্ত্রীক শীগ্‌গির আসছে লিখেচে। আর তিন চার দিন অপেক্ষা ক'রে তাদের সঙ্গে দেখাটা না ক'রে যাওয়া কি ভাল হয় বীণা?

বলিলাম, "তিন চার দিন আমি এখানে থাকব, তার বেশী থাকতে পারব না। মুটুকে আমি বাড়ীর বের হতে দেব না, ভজার মার সঙ্গেও নয়, যতুর সঙ্গেও নয়। এমন কি তোমার সঙ্গেও নয়।"

তিনি আমার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "কিসে এত ভয় পেলে বীণা তা আমাকে গোপন কর কেন? আগে তো তুমি এমন ছিলে না। তোমার যা খুসী তাই কর, আমি কিছু জান্‌তে চাইব না।"

তিনি অভিমানে আমার নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। তাঁহার অভিমান, আর্দ্র কণ্ঠস্বর, ছল ছল চক্ষু আমার অন্তরে পীড়া দিতে লাগিল। মুটুর কল্যাণ কামনায় আমি তাঁহাকে ডাকিতে পারিলাম না, আমার মর্মোচ্ছ্বাস তাঁহাকে জানাইতে পারিলাম না, নীরবে রহিলাম।

॥ ৫ ॥

সে দিন দ্বিপ্রহর বেলা, স্বামী গৃহে ছিলেন না। স্নানাহারের পর মহকুমা দেখিতে গিয়াছিলেন। ভজার মা তাহার বোনঝির বাড়ী যাইবার নিমিত্ত আমার নিকট হইতে ছুটি লইয়াছিল। শয়ন কক্ষে মুটুকে লইয়া আমি শুইয়াছিলাম। বাহিরে যতু তাহার নবীন বন্ধু কালু চৌকিদারের সহিত বোধ হয় গঞ্জিকা দেবীর উপাসনা করিতেছিল।

এতক্ষণ বিছানায় শুইয়া মায়ের মুখে তেপান্তর মাঠের গল্প শুনিতে মুটুর ভাল লাগিল না; মুটু বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া দূরের বনরাজীর দিকে মুখ করিয়া আপন মনে বকিতে লাগিল। কখনও বা ঘুঘুর করুণস্বর অনুকরণ করিয়া মধুর কণ্ঠে ঘুঘু শব্দে নির্জন গৃহ মুখরিত করিয়া তুলিল।

গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তরু পল্লবের মর্মর ধ্বনি, পাখীর সকরুণ বিলাপ, এবং পদ্মার কুলু কুলু কলোচ্ছ্বাস শুনিতে শুনিতে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাসে আমার চক্ষু দুটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া মুদিয়া আসিল। ক্ষণকালের জন্য আমি সংসার

ভুলিয়া; সুটুকে ভুলিয়া নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিলাম।

"জগাই দাদা, ও জগাই দাদা!"

"দাদামণি, দাদু আমার।" এ সম্বোধনে আমার সুপ্তির ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল। আমি বজ্রাহতের মত চমকিয়া কি দেখিলাম! সুটু জানলার মধ্য দিয়া হাত দুইখানি বাহিরে প্রসারিত করিয়া কাহাকে যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে, বাহির হইতেও দুইটি বাহুর বন্ধনে সুটুকে বন্দী করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মাঝখানে জানলার গরাদগুলি তেমনি অক্ষয় অটল হইয়া দুইটি হৃদয়ের মাঝখানে একটি ব্যবধানের বাঁধ নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে।

যে সুটুকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে তাহার প্রতি চাহিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমার শরীর বেতস পত্রের মত কম্পিত হইতে লাগিল।

লোকটির বয়স বোধ হয় পঞ্চাশ বছরের অধিক হইবে না। রুক্ষ চুলগুলির অধিকাংশই সাদা হইয়া গিয়াছে। পরণে শতছিন্ন মলিন বস্ত্র। চোখের দৃষ্টিটা যেন ভারী উদ্‌ভ্রান্ত, কাতরতাময়। ও যে সুটুর জগাই দাদা, ভজার মা যে উহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। আমি ভাল করিয়া লোকটাকে নিরীক্ষণ করিতে সবিস্ময়ে দেখিলাম, বাতায়ন পার্শ্ববর্তী টেবিলের উপর আমার সোণার হাত ঘড়িটা নাই। যে ঘড়ি লইয়াছে, সেই সুটুকে অপহরণ করিবে এই আশঙ্কায় বিহ্বলের মত চিৎকার করিতে লাগিলাম, "চোর! কে কোথায় আছ রক্ষা কর! চোর।"

কিসের একটা উন্মাদনায়, কিসের আবেশে কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। আমার চিৎকারে কে যে আসিয়াছিল, কে যে চোর ধরিয়াছিল আমি তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি নাই। যখন শান্ত হইলাম; লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন কালু চৌকিদার জগাইকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে; দূর বনপথ হইতে কেবল একটি আর্তনাদ আমার কর্ণমূলে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিতে লাগিল—"আমায় মেরো না, আর মেরো না ভাই, আমি চোর নই।" সেই আর্দ্র স্বরের সহিত যেন স্বর মিলাইয়া সুটু কাঁদিতে লাগিল—"আমার জগাই দাদাকে মেরে ফেল্লে রে, আমি জগাই দাদার কাছে যাব।" বেণুবনের শীর্ষ দুলাইয়া বাঁশ ঝাড়ের কম্পন তুলিয়া একটি বৃদ্ধ এবং একটি শিশুর ক্রন্দনের

প্রতিধ্বনির মত বাতাস হা-হা করিয়া বহিয়া গেল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে গুরু গুরু মেঘ ডাকিতে লাগিল। আমি রোরুদ্যমান বালকের সম্মুখে পাষাণ মূর্তির মত বসিয়া রহিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামী গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন, "বীণা, যদুর কাছে আমি সব শুনলাম। এত কাণ্ড হবে জানলে আমি কখ্‌খনো বাড়ী ছেড়ে যেতাম না। তুমি অমন হয়ে বসে আছ কেন? হুটু মাটিতে ঘুমিয়েছে, ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও।"

অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আমাকে যেন কেমন বিবশা করিয়া ফেলিয়াছিল। হুটু কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল আমি তাহা লক্ষ্যও করি নাই। স্বামীর আহ্বানে আমার চমক ভাঙ্গিল। আমি হুটুকে বিছানায় রাখিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িলাম। আজ অশ্রুজলের মধ্য দিয়া আমার আতঙ্ক, হুটুর জগাই দাদার প্রতি প্রাণের টান, ভজার মার গোপনতার প্রয়াস সমস্তই তাঁহার নিকটে ব্যক্ত করিলাম। তিনি একটু চিন্তা করিয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিলেন, "আমার মনে হচ্ছে তোমার অনুমান একটাও সত্যি নয়, সবটাই ভুল। তোমার মহাভুলে হয় তো একটি নির্দোষ প্রাণীর ভয়ানক যন্ত্রণা পেতে হবে। অনাত্মীয় অপরিচিত একটি ছেলেকে যে এত ভালবাসতে পারে, সে কখ্‌খনো ছেলেধরা নয় বীণা, চোরও নয়।"

আমি বলিলাম, "সে যদি সাধুপ্রকৃতি হবে তাহলে সে কি উদ্দেশ্যে দুপুর বেলা এখানে এসেছিল? আর তার আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়িটা কেন অন্তর্ধান হ'ল?"

"ঘড়ি তো তার কাছে পাওয়া যায়নি, হুটু হয় তো কেউ কোথাও রেখেছে। কি উদ্দেশ্যে এসেছিল তাও কি বুঝতে পারছো না বীণা? সে হুটুকে স্নেহ করে, হয়তো খুবই স্নেহ করে। তুমি এখন হুটুকে ঘরের বের হ'তে দাও না তাই জগাই লুকিয়ে হুটুকে একবার দেখ্‌তে এসেছিল।"

কি নতুন কথা, কি অভাবনীয় কল্পনা! এমন কি হইতে পারে? নিম্ন শ্রেণীর চাষা, তারা কি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া এমন নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে জানে? ভ্রম—স্বামীর মহাভ্রম, ভজার মাকে কঠোর শাস্তি দিয়া তাঁহার মন হইতে এ ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে।

আমি তখনই ভজার মাকে তার বোনঝির বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতে যদুকে পাঠাইয়া দিলাম।

॥ ৬ ॥

সন্ধ্যার পর বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া আমি তাঁহার নিকটে বসিয়া ছিলাম। বর্ষার মেঘান্ধকারে ধরণী আবৃত হইয়া গিয়াছিল। গগনপট চন্দ্রমা শূন্য, নক্ষত্র শূন্য, মেঘে মেঘে মেঘময়।

শৃগালেরা সন্ধ্যা ঘোষণা করিয়া সেইমাত্র থামিয়াছে, কিন্তু ঝিল্লীর ঐকতান তখনও নীরব হয় নাই। ঝোপে ঝোপে জোনাকীর মৃদু আলো এক একবার জ্বলিয়া উঠিতেছিল, পরক্ষণে নির্বাপিত হইতেছিল।

এমন সময় যদুর সহিত ভজার মা আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িয়া সে ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিল— "আমি যদুর কাছে সব শুন্‌লাম মা। তোমরা যাকে ছেলেধরা ভেবে, চোর ভেবে থানায় পাঠালে,—তার কোন দোষ নেই, যত দোষ আমার। তোমরা কিছু বিশ্বাস কর না, ছোটলোককে ঘেন্না কর বলেই আমি এতদিন জগাইয়ের কথা তোমাদের বলিনি। তার কয়েদ হলে আমার কি দশা হবে গো, আমি যে পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরবো।"

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "জগাই কে? তার সঙ্গে হুটুর এত ভাব হল কি করে, আর মাদুলীই বা কোথায় থেকে এল।"

ভজার মা বলিল, "জগাই এই গাঁয়েরই চাষা, ওর কেউ নেই। সেবার ওলাওঠায় জগাইয়ের ছেলে, বৌ, মেয়ে সব মরে গেছে বাবু, কেবল একটি নাতী ছিল। সেই নাতিটিকে জগাই বড্‌ড ভালবাসতো—বুকে করে মানুষ করেছিল, একদণ্ড চোকের আড় করতে পারে নি। সেই নাতীটি চার বছর বয়েসে, আজ চার বছর হ'ল মা বাপের কাছে চলে গেছে। তারই শোকে জগাই ঘরে থাকৃতে পারে না, কাজ-কর্মে মন দেয় না, পথে পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। আমাদের খোকাবাবু দেখতে নাকি জগাইয়ের নাতীর মত, বয়সও তাই। জগাইয়ের বিশ্বাস—তার নাতীই খোকাবাবু হ'য়ে আপনার ঘরে জন্ম নিয়েচে, মায়া কাটাতে না পেয়ে তার ঠাকুরদাদাকে দেখা দিতে এসেচে।"

আমার বক্ষ আন্দোলিত হইতেছিল। আমিও ব্যথিত হইয়া কহিলাম, "একথা আগে জানাও নি কেন ভজার মা?"

ভজার মা অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ক্ষোভের হাসি হাসিয়া বলিল, "ছোট নোকের ভালবাসা তুমি ভালবাসতে না মা, হয়তো জগাইয়ের কাছে

খোকাবাবুকে যেতে দিতে না। সেই জন্যে মাদুলীর কথাও আমি তোমাকে বলিনি। খোকাবাবুর জর ছাড়ে না শুনে জগাই সমস্ত দিন উপোষ ক'রে, অমাবস্যার নিশীথ রাতে মোহনপুরের শশ্মানে গিয়ে রক্ষাকালী মায়ের চরণ পূজোর বেলপাতা এনে খোকাবাবুর মাদুলী করে দিয়েছিল। মাদুলী অবিশ্বাস করলে ফলে না বলেই তোমায় বলিনি মা।—ক'দিন খোকাবাবুকে না দেখে জগাই অস্থির হ'য়ে আজ তাকে দেখতেই এখানে এসেছিল। ঘড়ি চুরির জন্যে নয়, খোকাবাবু তখন ঘড়িটা ভাঙ্গতে গিয়েছিল বলে আমি সেটাকে সাবানের বাক্সের মধ্যে তুলে রেখেচি।"

ভজার মা উঠিয়া গিয়া গৃহ হইতে ঘড়িটি আনিয়া আমাদের সম্মুখে রাখিল।

অকস্মাৎ আমার শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। দেহের অভ্যন্তরে কর্ণ-কুহরের মধ্যে মৃত্যু রজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। হায়, কি করিয়াছি, শিক্ষাভিমানে বংশ-গৌরবে স্ফীত হইয়া কাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, সন্দেহ করিয়াছি। একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, একটিবার অনুসন্ধান করাও দরকার বোধ করি নাই, অম্লান বদনে চোর অপবাদে তাহার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি! ভগবান তুমি কি আমার এ অন্যায়, এ অপরাধ মাপ করিতে পারিবে?

অনুশোচনার তীব্র আগুনে পুড়িতে পুড়িতে আমি তাঁহার পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম "তাকে ফিরিয়ে আন, আমার সর্বস্ব-বিনিময়ে তাকে ফিরিয়ে আন।"

তিনি স্নেহভরে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "শান্ত হও বীণা, ছিঃ এমন কি করে! আমি এখুনি থানায় যাওয়ার ব্যবস্থা করচি। থানা এখান থেকে ঢের দূর, আমার পথ ঘাটও চেনা নেই, যদুকে দিয়ে একখানা গোরুর গাড়ীর খোঁজ করাচ্ছি। যদুকে নিয়েই আমার যেতে হবে, কিন্তু তুমি কি ভজার মাকে নিয়ে খালি বাড়ীতে থাকৃতে পারবে?"

বলিলাম, "পারবো, আর আমার ভয় নেই। তাকে শীগ্‌গির করে আমার কাছে ফিরিয়ে এনো।"

"আনতেই তো যাচ্চি বীণা। পুলিশের হাত থেকে তাকে মুক্ত করতে পারব কিনা তা ভগবান জানেন।" বলিতে বলিতে তিনি বাহিরে যাইবার বেশভূষা করিতে লাগিলেন।

ভজার মা আসিয়া কহিল, "মা, বাবু যে এখন যাচ্ছেন, রান্না হয়নি, বাবুর খাবার কি হবে ?"

"রাতে যদি ফিরতে পারি, ফিরে এসেই খাব। এখন আর দেরী করবার সময় নেই, পথ থেকেই গোরুর গাড়ী ঠিক ক'রে নেব, তোমরা সাবধান হ'য়ে থেকো ভজার মা।"—বলিয়া বাক্সের মধ্য হইতে একটা নোটের তাড়া লইয়া তিনি যদুর সহিত প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে ভজার মা আমাকে শয়ন করিবার জন্য ডাকিয়া গেল ; কিন্তু আমি উঠিলাম না। আহার ভুলিয়া, নিদ্রা ভুলিয়া, শ্যামল সুন্দর বসুন্ধরার পানে চাহিয়া রহিলাম।

ক্রমে মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। কাশ-শ্রেণীর প্রান্তে শান্ত পদ্মাবক্ষে শত চন্দ্রের প্রতিবিম্ব ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। তরুতল হইতে ঝিল্লিরব শ্রান্ত হইয়া আসিল। বর্ষাসিক্ত বনের মৃদু গন্ধোচ্ছ্বাস গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিল।

* * * *

প্রভাতে স্বামী ফিরিয়া আসিলেন। আশঙ্কায় আতঙ্কে আমি তাঁহাকে একটি প্রশ্নও করিতে পারিলাম না। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন, "তোমার ভয় নেই বীণা। দারোগাকে দুশো টাকা ঘুষ দিয়ে জগাইকে নিয়ে এসেচি। কিন্তু চুরি স্বীকার করবার জন্যে পুলিশের লোক মারতে মারতে তার ডান হাতখানা একেবারেই ভেঙ্গে দিয়েছে। আমি ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে এনেছি। ডাক্তার বল্লেন, এত বয়সে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগবার আশা নেই। একটু ওষুধ দিয়ে হাতখানা বেঁধে দিয়েছেন।"

আমি তাঁহার সহিত স্বপ্নচালিতের মত বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিলাম, ধূলার উপর জগাই বসিয়া রহিয়াছে, হুটু তাহার কোলে উঠিয়া ভাঙ্গা হাতখানায় ফুঁ দিয়া দিতেছে।

সেই প্রহারে জর্জরিত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর উৎপীড়িত চাষার নিকটে সরিয়া গিয়া আমি অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলিলাম, "জগাই, আমিই তোমার এত দুঃখ কষ্টের কারণ। হুটুর মুখের দিকে চেয়ে তুমি আমায় মাপ কর।"

জগাই মর্মভেদী কাতর দৃষ্টি আমার পানে প্রসারিত করিয়া, আমার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। একটু হাসিয়া অত্যন্ত সহজ স্বরে বলিল, "আমার নিজের পাপেই আমি কষ্ট পেয়েছি মা, আপনি ও কথা বলে আমার অপরাধ

বাড়াইও না! এখন আমার কোন যাতনা নাই ; আমার দাদামণিকে কোলে করে সকল দুঃখু শীতল হয়ে গেছে।"

বলিলাম, "যাকে পেয়ে তোমার এত কষ্টের অবসান হল জগাই, আজ থেকে তাকে আমি তোমার হাতেই দিলাম। এখন মুটুর ঘর, তোমার ঘর হল, মুটুর মা তোমার মা হল।"

জগাইয়ের মলিন মুখে আনন্দের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞতাভরা সরল নেত্র আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া জগাই আমার পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

রচনাকাল—১৩৩১

হীরক

ঘড়িতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিয়া গেল।

স্বামী আসিয়া তাড়া দিলেন, "সাতটায় ট্রেন, ষ্টেশনে যাবে কখন? ঈস্, আজ যে ভারী সাজের ঘটা দেখ্ছি?"

স্বামীর প্রীতি-উপহার মুক্তার মালাগাছি গলায় পরিয়া কহিলাম, "সাজ তো তোমাদেরই জন্য। তোমাদের ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপন আমাদের বইতে হয়, নইলে সাজ আবার কিসের?"

তিনি কহিলেন, "আহা কি বিড়ম্বনা! তোমরা একেবারে নির্লিপ্ত উদাসী, কিছু চাও না; কিছু জানো না?"

"সত্যি জানি না। তোমরা সাজাতে ভালবাস বলে সাজি, তোমরা দাও আমরা নিই। তোমরা হাসালে হাসি, কাঁদালে কাঁদি। তোমাদের ছায়ার প্রতিচ্ছায়া আমরা; ধ্বনির প্রতিধ্বনি।" বলিয়া আমি পাউডারের কৌটা খুলিলাম।

স্বামী বলিলেন, "সব স্বীকার করে নিলাম। কথার বাক্সে এখনকার মত চাবি দিয়ে চল গাড়ীতে বসিগে। শেয়ালদা এখান থেকে পুরো সাত মাইল, যেতে যেতে বাক্যবাণের আঘাতে আহত করতে যথেষ্ট সময় পাবে।"

বলিলাম, "সময় পেলে কি হ'বে? বেছে বেছে বাঙ্গালী ড্রাইভার রেখে সে রাস্তা বন্ধ ক'রে দিয়েছ? চল যাই, হয়ে গেছে। দেখো ত আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?"

স্বামী চোখ তুলিয়া হাসিলেন, "সাক্ষাৎ উর্ব্বশী, তিলোত্তমা। গালে এক পোঁছ রং মাখলে সোণায় সোহাগা হবে। সেটুকু বাকী রাখলে কেন? চটপট সেরে নাও।"

মেয়েদের প্রসাধন নিজের জন্য নহে। পরের চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত, সেই পরের মুখের খোঁচা খাইয়া লজ্জায় আবার মাথা নত হইল।

আমি পাণের রসে ঠোঁট রাঙ্গা করিয়া চুপে চুপে কহিলাম, "কিবা বেশভূষা করেছি, যাতে এত শোনাচ্ছ? হীরক আমায় প্রথম দেখবে। সে সুন্দর, তাকে আন্‌তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েই যেতে হয়।"

"নিশ্চয়, ঘরেরটির জন্যে কিন্তু কখনো তোমায় এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে দেখিনি? বাইরের নামে ভাণ্ডার উজাড়; নতুনের নাম যেমন মিষ্টি, গায়ের বাতাসও তেমনি মধুর?"

কথার ঢংএ গা জ্বলিয়া যায়। আমি রাগিয়া উত্তর দিলাম, "সেটা আমাদের নয়; তোমাদেরই। পরিষ্কার অপরিষ্কারের খবর জানবে কি করে? ঘরের বৌ-এর রূপ গুণ তোমরা কোন জন্মে দেখে থাকো? যাদের নজর পরের দিকে, তারা আবার আসে আমাদের সমালোচনা করতে?"

"সমালোচনার স্পর্দ্ধা রাখি না; এত সাহস নেই। আত্মবেদনার আভাস দিতে গিয়েই এত লাঞ্ছনা। ঘরের চেয়ে পরের দিকে লক্ষ্য তোমার অনেক বেশী। তার প্রমাণ আয়নায় আর একবার নিজেকে দেখে নাও?" বলিতে বলিতে তিনি নীচে নামিয়া গাড়ীতে বসিলেন।

মনের আক্রোশ মনে চাপিয়া আমাকেও তাঁহার পাশে বসিতে হইল। স্বামীর পরিহাস আমি আজ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে জানিতে আমার বাকী নাই। সন্দেহ, সংশয়, ক্ষুদ্রতা তাঁহার মধ্যে স্থান পায় না। রসপ্রবণ স্বভাবের নিমিত্ত তিনি অনেক সময় অনেক অবান্তর কথা বলিয়া থাকেন; কিন্তু আজিকার কথাগুলির ভিতর হইতে প্রচ্ছন্ন ঈর্ষার হুল ফুলে ঢাকা কাঁটার মত প্রকাশ পাইতেছিল। হীরক তাঁহারই প্রিয় অপেক্ষা প্রিয়তর নহে কি? মাস দুই পূর্ব্বে তিনি নিজে যাইয়া হীরককে আমাদের গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার আসার আশায় অধীর প্রতীক্ষায় দিন গণিতেছিলেন। হীরক স্বামীর প্রিয়, প্রিয়তম জানিয়াই না আমি তাঁহার প্রিয় প্রসাধন করিয়াছি; ইহা বুঝিবার যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারা আবার আসে আমাদের নিকটে বিদ্যাজাহির করিতে!

* * *

আমরা ষ্টেশনে পৌছামাত্র ট্রেন আসিয়া থামিল। হীরককে খুঁজিয়া বাহিরে আনিতে স্বামীর বিলম্ব হইল না। তিনি প্রীতি প্রফুল্ল হাস্যে হীরকের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন।

হীরক আমার মুখের পানে তাহার উজ্জ্বল আঁখিপল্লব মেলিয়া হাসিতে

লাগিল। সে হাসি যেন হাসি নয়, রাশি রাশি ফুটন্ত ফুল ; ফুটিতেছে, ঝরিতেছে।

আমি মুগ্ধ-বিস্ময়ে হীরককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, স্বামীর উক্তি মিথ্যা নহে, অতিভাষণ নহে ; সত্যই হীরক হীরার মত ভাস্বর, হীরার মত মনোহর। ছেলেটির নবীন সৌন্দর্য্যে চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, হৃদয়ে রেখাপাত করে।

আমার কিশোরের আধজাগন্ত আধঘুমন্ত স্বপ্নালস নয়নের সম্মুখে কল্পনার রঙ্গীন তুলিকা একদিন যাহার দিব্যশ্রী, দিব্যমূর্ত্তি চকিতে আঁকিয়া চকিতে মুছিয়া লইয়াছিল ; কে জানিত, এতকাল পরে সে রূপকথার রাজপুত্র হইয়া আমার কুটীরে অতিথি হইয়া আসিবে ! এ কি আগমন, না, আবির্ভাব ?

আমি নিমেষহারা নেত্রে তাকাইয়া রহিলাম। আবার সম্মুখের যাহা কিছু ছিল, সবই বিলুপ্ত হইয়া গেল। ভোরের শুকতারার মত কেবল উজ্জ্বল, অম্লান হইয়া রহিল হীরক।

স্বামী বলিলেন, "তুমি একটুখানি সরে বোসো, হীরক বসুক মাঝখানে।"

হীরক হাসিতে হাসিতে আমাদের দুইজনের মাঝে বসিয়া আমার ডান-হাতখানি চাপিয়া ধরিল। আমি হীরকের বন্ধুপত্নী, আবার বাহু ধারণের অধিকার তাহার অনধিকার চর্চ্চা নহে। কিন্তু সে স্পর্শে আবার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তস্রোতঃ বহিতে লাগিল। স্পর্শের এমন মাদকতা আমি জানিতাম না। বসন্তের দক্ষিণা সমীরণের উতলা পরশ আজ যেন মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ আমার হৃদয়-মালঞ্চের শুষ্ক মুকুল মুঞ্জরিত হইল।

তাহার হাতে হাত জড়াইয়া আমি নীরবে রহিলাম ; স্বামীর দিকে চাহিতে পারিলাম না। আমার কোথায় কত বড় একটা অপরাধের সূচনা হইল কি ? যিনি আমাকে গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিভৃতে হৃদয়লক্ষ্মী বলিয়া আদর করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইতে আমি মরমে মরিয়া গেলাম।

আমার লজ্জা, আমার সঙ্কোচ, নিতান্ত আমারই, কেহ তাহার ধার ধারিল না। দুই বন্ধু হাসি-গল্পে সারাপথ মুখরিত করিয়া চলিলেন।

পুরাতন চাকর সোফারের পার্শ্বে বসিল।

* * *

হীরকের আগমনে আমাদের নির্জ্জন গৃহে সমারোহ পড়িয়া গেল। স্বামীর

মান্য অতিথির জন্য আমি অনেক যত্নে তাহার শয়নকক্ষ সাজাইয়া রাখিয়াছিলাম। পঙ্খের কাজ করা দেয়ালে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলাম। মধ্যস্থলে ঝুলান হইয়াছিল বেলোয়ারী ঝাড়, তাহার অভ্যন্তর হইতে লাল-নীল দীপের আভা ফুলপাতা-বিমণ্ডিত মেঝের গালিচার বুকে বিচ্ছুরিত হইতেছিল। নূতন মেহগনি খাট, সাটিনের বিছানা, শিয়রে শাদা পাথরের টিপয়ের উপর একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যে ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত মনোমুগ্ধকর, তাহার বাসস্থানে ফুল না রাখিলে মানাইবে কেন?

গৃহে প্রবেশ করিয়া হীরক আনন্দে উৎফুল্ল হইল। প্রতি দ্রব্যে চক্ষু বুলাইয়া পরিতৃপ্তির হাসি হাসিতে লাগিল। হীরক বেশী কথা বলিতে পারে না, হাসির দ্বারা মৌন ভাষাকে মুখর করিয়া রাখে। হীরকের বন্ধু কিন্তু উল্টা, দিন-রাত বকর্-বকর্। বাক্যের ডিপো, পেশা ওকালতি, কথা বেচিয়া খাইতে হয়। কাণ ঝালপালা ব্যাপার। আমি ভালবাসি না। আমার ভাল লাগে অল্প কথা, অনেক-অনেক হাসি।

হীরকের সঙ্গে আমার স্বল্প আলাপটাকে আরও একটুখানি বিস্তৃত করিবার আগ্রহে সবে কাছাকাছি হইয়াছি, এমন সময় স্বামী পঞ্চমস্বরে হাঁকিলেন, "ওগো, হীরককে খেতে দাও আগে, ওর ক্ষিদে পেয়েছে, খেয়ে নিয়ে হীরক এখন বিশ্রাম করুক, অনেক দূর থেকে এসেছে।" আমি লজ্জিত হইলাম, যথার্থ হীরক বহুদূর হইতে আসিয়াছে। কত বন-বনান্তর নদী-নালা অতিক্রম করিয়া তাহাকে আমাদের কাছে আসিতে হইয়াছে। তাহার খাবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম, বিশ্রামের কথা মনে ছিল না। উনি আবোল তাবোল বকিলেও কাজের বিষয় টনটনে। হইবে না কেন? ব্যবসা যে কথা বেচা।

আহারান্তে হীরক বন্ধুর আজ্ঞায় বিছানায় আশ্রয় লইল। শুধু আশ্রয় লওয়া নয়, অল্প সময়ের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঝাড়ের আলো নিবাইয়া, একটি মৃদু নীল আলো জ্বালিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। যেমন করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রি সুপ্ত ধরণীর পানে চাহিয়া থাকে—যেমন করিয়া কুমুদ চাহিয়া থাকে সুদূরের চন্দ্রমণ্ডলের পানে, আমিও তেমনই নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম।

অনেক রাত্রে দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ঝি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আজ কি খাবে না, ঠাকুর ভাত নিয়ে বোসে রয়েছে।"

তাহাকে কহিলাম, "বাবুর ভাত দিতে বলগে, তাঁর খাওয়া না হলে কবে আমি আগে খেয়ে থাকি?"

"বাবুর খাওয়া কোন্ কালে হোয়ে গেছে, মা। তিনি শুয়ে পড়েছেন। রাত এগারটা বেজে গেছে।" বলিয়া ঝি মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দাস দাসীর নিকটে মান বাঁচাইতে আমি খাবারের সম্মুখে বসিলাম বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলাম না। স্বামীর পাতের কাছে আমি না বসিলে তাঁহার যে খাওয়াই হয় না। আজ তাহার ব্যতিক্রমে আমার বুকের ভিতর খচ্-খচ্ করিতে লাগিল। মানুষের মন এমনই অপদার্থ। রূপের মোহ এতই উন্মাদকর, মুহূর্ত্তে বিশ্ব ভুলাইয়া দেয়; নিজেকে ভুলাইয়া দেয়। কোথায় ভাসিয়া যায় চরিত্রের একনিষ্ঠতা—হৃদয়ের একাগ্রতা।

পাশাপাশি তুইটি ঘর, সম্মুখে দালান। আমি স্বামীর ঘরে যাইতে মনস্থ করিয়া আপনার অজ্ঞতাসারে হীরকের ঘরে ঢুকিলাম।

ধব্ধবে নেটের মশারির ভিতর হীরক অঘোরে ঘুমাইতেছে। আলোর নীল রশ্মি তাহার সুন্দর সুকুমার মুখে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ধূপের মৃদু গন্ধের সহিত রজনীগন্ধার স্নিগ্ধ সুবাস মিশিয়া কক্ষ সৌরভাকুল করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে কৃষ্ণা রাত্রি নিস্তব্ধতার শেষ সীমায় উপনীত হইয়া থম্থম্ করিতেছে। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বাতাস তরু পত্র দোলাইয়া ফিস্ফাস্ শব্দে লুকোচুরী খেলিতেছে। তারায় তারায় চলিতেছে ইশারা-কাণাকাণি। দূর দূরান্তরের রাতজাগা পাখীটা পিক্পিক্ রবে কিসের যেন ইঙ্গিত করিয়া মরিতেছে। এ সঙ্কেত অভিসারের—এ রজনী অভিসারের। আমি অভিসারের যাত্রী, আমার বাধা নাই, বন্ধন নাই, সংসার নাই; সমাজ নাই। আমার তুর্নিবার হৃদয়াবেগ স্রোতস্বিনী নদীর মত প্রিয়-অভিমুখে ধাবিত হইতেছে—ছুটিয়া যাইতেছে।

আমি সন্তর্পণে মশারি তুলিয়া হীরকের শুভ্র, সৌম্য ললাটে একটি চুম্বন-রেখা মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

হীরক নড়িয়া উঠিল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নিজের জায়গায় পলাইয়া আসিলাম।

আমাদের ঘর এক হইলেও বিছানা তুইটি। স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। আমি শয্যাতলে অঙ্গ ঢালিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এ আমার কি হইল? প্রথম দর্শনে মুগ্ধ-বিহ্বলতা এতকাল গল্পে উপন্যাসেই পড়িয়া আসিয়াছি।

কে জানিত, ফল্গুর প্রচ্ছন্ন ক্ষীণ ধারার মত উদ্দাম অপরিমেয় প্রেমধারা আমার অন্তরে লুকাইয়া ছিল, স্বপ্নেও আমি ইহার আস্বাদ পাই নাই। মা গো, এ লজ্জা, পরিতাপ আমি কেমন করিয়া রাখিব ? কি রূপে বলিব,—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

ভোরবেলা স্বামী আমার গা ঠেলিয়া বলিতেছিলেন, "ওগো, ওঠো, কত ঘুমাবে ? হীরক ত চা খায় না, তাকে এক কাপ গরম দুধের যোগাড় করে দাও। কাল এসে বেচারা বন্দী হ'য়ে রয়েছে, দুধ খেয়ে মাঠ থেকে একটু বেড়িয়ে আসুক।"

আমি চোখ বুজিয়া উত্তর দিলাম, "এত সকালে আমি উঠতে পারবো না। এমন কচি খোকা কেউ আসেনি যে, এখুনি দুধ না খেলে গলা শুকিয়ে যাবে। নূতন লোক মাঠে পাঠালেই চলবে কিনা, সঙ্গে লোক দিতে হবে না ?

স্বামী সহাস্যে বলিলেন, "সে লোক ত তুমি আছ ? সময়ের অপব্যয় হবে ভেবে কালকের সাজ-পোষাক এখনো ছাড়নি দেখছি ?"

আমি চমকিয়া চোখ খুলিলাম, পরণে আবার রেশমী শাড়ী, গায়ে মখমলের ব্লাউজ, গলায় মুক্তার মালা। মরণ! কি ভূতে আমাকে পাইয়াছে ? এ আপদগুলি বদলাইবার কথাও ভুলিয়া গিয়াছি।

আমি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া বসিলাম।

স্বামী বলিলেন, "ভালবাসায় পড়েছ তাতে লজ্জার কি ? ভালকে সকলেই ভালবাসে, আমিও হীরককে ভালবাসি, কিন্তু তোমার ভালবাসার গভীরতা বেশী, তাই সমস্ত ভুলে যাচ্ছ।"

অনুতাপে আবার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। স্বামী সমস্তই জানিতে পারিয়াছেন। আবার শোচনীয় অবনতি তাঁহার নিকটে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে। যিনি এত মহৎ উদার, আমি বিশ্ব ভুলিলেও তাঁহাকে ভুলিব না। উত্থান-পতনে সুখে-দুঃখে মনে রাখিব।

খোলা দরজার দিকে চাহিয়া দেখি, হীরক হাসিমুখে উঁকিঝুঁকি দিতেছে। বয়স কম নহে! তবু কাণ্ডজ্ঞানের লেশও নাই। ভদ্রমহিলার নিরালা শয়ন-গৃহের দিকে অমন লোলুপ দৃষ্টিতে কোন ভদ্রলোক যে তাকাইতে পারে, এটা আমার ধারণা ছিল না। রূপ থাকিলেই হয় না, মার্জ্জিত সংযত শিষ্টাচার শিখিতে হয়।

না শিখিলে আমার কি? মান-সম্ভ্রমের বালাই কি-ই বা আমার অবশিষ্ট আছে? ওগো, আমি যে রসাতলে তলাইয়া গিয়াছি। ভদ্র, শিষ্ট, সংযত শব্দ-বিন্যাস আমার মুখে শোভা পায় না। আমি আমাকে হারাইয়াছি—বিকাইয়াছি।

দুঃখে ক্ষোভে শিথিল কেশ-বেশ লইয়া আমি আড়ালে সরিয়া আসিলাম।

সরিয়া থাকিলেই কি নিস্তার আছে? স্বামীর হাঁক-ডাকে অতিষ্ঠ হইয়া মুখ হাত ধুইয়া, ধোয়া শাড়ী পরিয়া আবার ছুটিতে হইল দুই বন্ধুর সম্মিলিত সভায়।

বন্ধুদ্বয়ের চা-পান, দুগ্ধপান সমাধা হইয়াছে। একজন খবরের কাগজ খুলিয়া বসিয়াছেন, আর একজন ভ্রমণের উপযোগী পরিপাটি বেশভূষা করিয়া মৃদুমন্দ হাসিতেছে।

আমি স্বামীর নিকটস্থ হইয়া ধীরে বলিলাম, "এখন বেড়ানো আমার সম্ভব নয়। সৃষ্টির কাজ পড়ে আছে। দরোয়ানকে বলে দিই, হীরককে বেড়াতে নিয়ে যাক?

স্বামী বলিলেন, "দরোয়ানের সঙ্গে তুমিও যাও, ঝি চাকররা কাজকর্ম সেরে নেবে। আমিও যেতে পারতাম, কিন্তু কোর্টে আজ আবার মোকর্দ্দমা আছে। কাগজপত্র ঠিক করে নিতে হবে। হীরক এখানে নূতন এলো, যা কিছু দেখাবার তুমিই দেখিয়ে শুনিয়ে নিও। ক'দিনই বা আমাদের কাছে থাকবে? শিগ্‌গীরই ত পাটনায় চলে যাবে।"

হীরকের বাবা পাটনা কলেজের অধ্যাপক, জানি হীরক বরাবর এখানে থাকিবে না। ফাল্গুনের দম্‌কা হাওয়া কুঞ্জকাননে একটু হিল্লোল তুলিয়াই মিলাইয়া যাইবে। বর্ষার নব ঘন মেঘ বর্ষণের পূর্ব্বেই অজানা অলকার উদ্দেশে উধাও হইবে। শরতের শেফালি ফুটিতে না ফুটিতে ঝরিয়া পড়িবে। হেমন্তের শিশির দুষ্টাদলে মুক্তা ছড়াইবে না।

হীরক একদিন চলিয়া যাইবে পূর্ব্ব হইতে জানিলেও, এখন স্বামীর কথায় আমার বক্ষ ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। প্রভাতের আলোকে আলোকময় ভুবন সহসা কালো হইয়া গেল।

আমি সজল-নয়নে মিনতি করিতে লাগিলাম, "তুমি কত লোকের কত কাজ জুটিয়ে দাও, হীরকের বাবার এখানে কি কোন একটা কাজের জোগাড় ক'রে দিতে পারো না? হীরকের বাবা এদেশে কাজ পেলে ওকে আর পাটনায় যেতে হোত না?"

স্বামী কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইলেন, "তা জানি, চেষ্টা করলে একটা কেন, অনেক কাজ আমি হীরকের বাপকে দিতে পারি। তবে কেন তা করবো? কিসের জন্য? চোরকে কেউ তার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করতে ডাকে না। চুরি যাবার ভয়ে তাড়িয়ে দেয়। আমিও চোর তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হবো।"

অপমানে, অভিমানে আমার অধরোষ্ঠ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠ রোধ হইয়া গেল, কথা কহিতে পারিলাম না। এই আমার স্বামী, যাহার প্রতি আমার অখণ্ড বিশ্বাস, অচলা ভক্তি, তিনি এত নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন।

স্বামীর নিকটে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না। হীরককে লইয়া বাহির হইলাম।

* * * *

এ অঞ্চলের নূতন মাঠটি দিগন্ত প্রসারিত হইলেও প্রকৃতির স্বহস্তে নির্ম্মিত নহে। মানুষ মানুষের আরামের নিমিত্ত স্থানে স্থানে বৃক্ষের শীতল ছায়া রচনা করিয়া রাখিয়াছে। আশে পাশে সাজাইয়া দিয়াছে বন বিতান। দর্শনীয় কিছু না থাকিলেও এখানে উপভোগের বস্তুর অভাব নাই। মাঠে আসিয়া হীরকের উল্লাসের অন্ত রহিল না। কোন কিছু তাহার দৃষ্টির বাহিরে যাইতে পারে না। টিয়া পাখীর কলগুঞ্জন, ভ্রমরের গুণ গুণ শুনিয়া মহা উৎসাহে হীরক গান ধরিল। হাঁ, গলা বটে, যেন শত বেণু-বীণার ঝঙ্কার, হীরকের গানে-গল্পে আমি তন্ময়-অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বেলার দিকে লক্ষ্য ছিল না।

প্রভাতের রৌদ্র প্রখর হইয়া, পায়ের তলায় ঘাস যখন উত্তপ্ত হইল, তখন আমরা বাড়ী ফিরিলাম।

স্বামী কোর্টে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের বেড়ানর জন্য গাড়ী ফেরৎ পাঠাইয়াছেন। তাঁহার এ সদয় ব্যবহারে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইল না—হৃদয়ের মেঘভার অপসারিত হইল না। তাঁহার তখনকার চড়া স্বরের কড়া কথাগুলি আমার কাণে বারম্বার বাজিতেছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই হীরকের বাবাকে এখানে আনিতে পারেন; হীরককে রাখিতে পারেন স্ত্রীর জন্য। এটুকু কে না করে? কে না সহে? আমাদের অন্যায় আবদার সহিবেন বলিয়াই না স্বামী। পতিতা পাতকিনীর আশ্রয়দাতার জন্যই আমরা পতি নামে ডাকিয়া থাকি। স্ত্রীর প্রতি দয়া যুগে যুগে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই আশাতেই উঁহাদের নামকরণ হইয়াছে দয়িত।

মনের ক্ষোভে তাঁহার উদ্দেশে যত ঝাল ঝাড়িনা কেন, তবু আমার হৃদয়

সহসা ভারাক্রান্ত হইয়া চোখে জল আসিল। তিনি কি দিয়া খাইয়া গেলেন, কোন পোষাক পরিলেন; ঝির হাতের সাজা পাণ তাঁহার মুখে রোচে না। সঙ্গে টিফিন দেওয়া হয় নাই। নূতন বেয়ারাটা বড়ই অলস, হয়তো জুতা ব্রাশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। আজ মোজা ও কলার বদলানোর দিন। তিনি যে আপন-ভোলা ভোলানাথ, হাতে মুখে তুলিয়া না দিলে পরা হয় না, খাওয়া হয় না। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি, জিজ্ঞাসা করিলে ওরা ভাবিবে কি?

জিজ্ঞাসা করিবার আর সময় হইল না। হীরক সম্মুখে উপস্থিত; তাহার চোখে মুখে হাসির ঝরণা, গলায় গানের সুর।

* * * *

কয়েকদিন পর স্বামী কোর্ট হইতে ফিরিয়া আমাকে ডাকিলেন। আজ-কাল তাঁহার অবসর সময়টা হীরকের সঙ্গেই আলাপ-আলোচনায় কাটিয়া যায়। আমার সহিত বাক্যালাপ নাই বলিলেই চলে। আমি ইচ্ছা করিয়া অন্তরালে সরিয়া থাকি। যিনি আমার ব্যথা বোঝেন না, তাঁহার কাছে যাচিয়া সোহাগ কাড়িতে আমাব প্রবৃত্তি হয় না। না হইলেও ডাকিলে যাইতে হয়।

স্বামী শোবার ঘরেই ছিলেন, তখনও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। আবছা অন্ধকার কোণে কোণে কেবল নিবিড়তার জাল বোনা আরম্ভ করিয়াছে।

আমি স্বামীর গা ঘেষিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় ডেকেছ কেন?"

তিনি আস্তে আস্তে কহিলেন, "না ডাকলে পাইনে, তাই ডেকেছি।"

"কি দরকার?"

"দরকার হীরকের বাবার বন্ধু বিমল কাল পাটনায় যাচ্ছে, তার সঙ্গে হীরককে পাঠাতে হবে ঠিক করে এলাম। সকাল দশটায় গাড়ী, এখুনি জিনিষপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে রাখো। আমি কাজের ঝঞ্ঝাটে নড়তে পারছি না। অনিলের ছুটি নেই, এ সুযোগে না পাঠালে পরে সুবিধা হবে না।"

অকস্মাৎ আমার শরীর বেতসপাতার মত কাঁপিতে লাগিল। বুকের ভিতর টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। আমি নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলাম না। স্বামীর পদতলে বসিয়া পড়িলাম। আমার দুই চোখে অশ্রুর ধারা ছুটিল।

তিনি সাদরে সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "হীরককে ছেড়ে দিতে হবে শুনে এমন করচ কেন? তা, এক কাজ করলে বেশ হয়, তুমিও ওদের সঙ্গে যাও? পারবে না, বুঝেছি দু নৌকায় পা দিয়েছ। হ্যাঁ, আমি পারি দুই দিক বজায় রাখতে, তুমি যদি আমায় পুরস্কার দাও?"

আমি দুই হাতে তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, "তুমি যা চাইবে, তাই আমি দেব, তিন সত্যি করছি। তুমি হীরককে যেতে দিও না, ও গেলে আমি বাঁচবো না, মরে যাব।"

স্বামী হাসিলেন, "উঃ এতখানি, আমি জানতাম না? আর কেঁদো না লক্ষ্মী, কাঁদতে হবে না, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করছি। আমি এখানেই অনিলের কাজ ঠিক করে তাকে চলে আসতে আজ টেলিগ্রাম করে দিয়েছি। এখন হোল তো? এইবার আমার পুরস্কার দাও?"

এক চোখে জল এক চোখে হাসি লইয়া আমি সতেজে উত্তর দিলাম, "বুড়ো বয়সে রঙ্গ দেখে বাঁচি না! তোমার কি লজ্জা সরম নেই?"

"লজ্জা মেয়েদের ভূষণ, পুরুষের কাপুরুষতা। এক রত্তি একটা ছেলের সঙ্গে এত ঢলাঢলি করতে তোমার যদি লজ্জা না হয়; পুরস্কার চাইতে আমারি বা লজ্জা হবে কেন?" বলিয়া তিনি আমার মুখখানি কোলে টানিয়া লইলেন।

স্বামী আমাকে মাপ করিলেন; তোমরাও করিও। আমি ভাল না হইলেও একেবারে মন্দ নই। আসল কথাটা খুলিয়া বলা ভাল। অনিল আমাদের একমাত্র পুত্র, তস্য পুত্র হীরক। তাহার বয়সটা কাঁচা, রং ধরার বিলম্ব আছে। সবে পাঁচ বছরে পড়িয়াছে।

রচনাকাল—১৩৪৫

পল্লীর-দোলযাত্রা

"শ্যাম-কুণ্ড রাধা-কুণ্ড গিরি-গোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে এই তো বৃন্দাবন।"

ভোর হতে না হতে ঢোল-কাঁসী-সানাই মৈত্র-বাড়ীতে তান ধরেছিল। গত সন্ধ্যায় রাধাগোবিন্দের চাঁচর অধিবাস হয়ে গেছে। আজ তাঁর দোলযাত্রার সমারোহ। ফাগের মহোৎসব।

মাধবের মধুমাসের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ভুবনও সেজেছে অভিনব বেশে। বন বনান্তরে নব পত্রপুষ্প বিকশিত। শিমূল, পলাশ লালে লাল হয়ে গেছে। সঙ্গতি-সম্পন্ন মৈত্র-বাড়ীতে তাঁদের কুলদেবতা জাগ্রত রাধাগোবিন্দের দোলযাত্রায় খুব ধূম হয়। ইতর, ভদ্র সমস্ত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসীদের তাঁরা সাদরে আমন্ত্রণ করেন। সকলেই পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পায় ও হোলি খেলায় সকলেই যোগ দেয়।

একটু বেলা হলে পুরোহিত পূজোয় বসলে ছেলের দল থলে ভরে আবির নিয়ে পথে বের হবে। তার পরে শুরু হবে উল্লাস ও মাতামাতি।

মেয়েরা থাকে আড়ালে। তাদের হাতেও কাপড়ের থলেয় আবির। ছোট ছোট বালতিতে গোলা রং, টিনের ও বাঁশের তৈরী পিচকারী, তারাও পথ ঘাট মুখর করে তোলে আনন্দে, হাসিতে।

মৈত্র-বাড়ীর বাঁশবনের পেছনে বিনোদিনীদের পর্ণ-কুটীর। বিনোদিনীর বাবা আধ-পাগলা বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী কীর্তনীয়া ছিলেন। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে পাড়ায় পাড়ায় কীর্তন গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর স্ত্রী একমাত্র সন্তান বিনিকে নিয়ে কায়কষ্টে সংসার নির্বাহ করতেন, কিন্তু মেয়ের বিবাহের কোন সুরাহা করতে পারতেন না। বিনির যখন পঁচিশ বৎসর বয়স তখন বিনির মামার কুটুম্বের কুটুম্ব বর্মা থেকে হাজির করে ঘনশ্যাম মুখুজ্যেকে। সে বর্মায় তখন কাঠের ব্যবসা করছিল—তার তখন টাকার বিশেষ প্রয়োজন হয়েছিল। নগদ

পাঁচশো টাকা পণ নিয়ে ঘনশ্যামের সঙ্গে বিনির বিয়ে হয়। ছেলেটির বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। দেখতে শ্যাম ও সুঠাম দেহ। অপূর্ব মুখশ্রী। নামের মিলে ও ঘনশ্যামের রূপে বিনোদিনী মোহিত, অভিভূত। বিনির ভক্তিমতী মাও রাধাগোবিন্দের মন্দিরে মানত করে জামাতা লাভে রাধাগোবিন্দের প্রতি কৃতজ্ঞ।

মাসখানেক শ্বশুরালয় থেকে ঘনশ্যাম পাঁচ শো টাকা পণ নিয়ে, দোলের সময় আসবে বলে সেই যে সাগর পারে চলে যায় আর ফেরে নাই। কন্যাদান করার কিছুদিন পরেই বৈকুণ্ঠ চক্রবর্তী বৈকুণ্ঠ লাভ করেন। তাঁর পত্নী বিনির মাও বছর খানেক হল তাঁর অনুসরণ করেছেন। তিনি মহাযাত্রার পূর্বে বর্মা-ফেরত তার ভ্রাতার কুটুম্বের কুটুম্বদের কাছ থেকে জেনে গেছেন ঘনশ্যাম ওখানকার ব্যবসা গুটিয়ে দেশে এসে ব্যবসা করতে মনস্থ করেছেন। তাঁরা গোপনে আরও একটি খবর দিয়েছিলেন যে, সেখানে একটি বর্মী মেয়ে ঘনশ্যামের ঘরণী হয়ে রয়েছে। সেই গোপন তথ্যটি মা প্রাণে ধরে মেয়েকে না জানিয়ে গোপনেই রেখে গেছেন।

বিনি জানে ঘনশ্যাম প্রচুর অর্থ উপার্জন করে, সে তার কাছে আসবে। দোলের সময় সে আসতে চেয়েছিল কাজেই আসন্ন দোলে বিনি চঞ্চল হয়ে ওঠে। বিনি সরলা গ্রামের মেয়ে, তার দৃঢ় বিশ্বাস যে যার অপরূপ সুন্দর মুখচ্ছবি, শ্যামল চিকন দেহ-সৌষ্ঠব, তার কথা মিছে হতে পারে না। সেই আশার কুহকে বিনি দিন গুনছে।

রাধাগোবিন্দ অতি জাগ্রত দেবতা—রাধাগোবিন্দ জগতে দুর্বলের বল, নিরুপায়ের উপায়। তাই তিনি বিনিরও একটা উপায় করে দিলেন। আধাবয়সী কামার-বৌ'এর অনেকগুলি সন্তান নষ্ট হবার পর কড়ি দিয়ে সে প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সদ্যোজাতকে কিনেছিল। সেই কড়ি বড় হয়ে মাকে বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে দেয়। ছেলে-বৌয়ের সংসারে কড়ির মা বাড়ী বাড়ী বাসন মেজে খেয়েছে। বিনির চালাঘরে আশ্রয় পেয়েও তাই করছে।

'লাল তমালতল, লাল যমুনা জল।
লালে লাল শ্যাম প্যারী'।

ছেলের দল ঢোলক বাজিয়ে পথে বের হয়েছে। ধূলোর মতো আবির উড়ছে বায়ু হিল্লোলে। ঢোলক বাজছে ধিন্ ধিন্ করে। সঙ্গীতের গুঞ্জন হচ্ছে, 'লাল ফুলে লাল ভ্রমর লাল মধু খায়' বিনি আনমনে তাই শুনছে।

পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তার গায়ে আবির দিতে আসে। এমন দিনে কারুর অরঞ্জিত হয়ে থাকবার উপায় নাই। বিনির মায়ের ছিল একটি পিতলের গোপাল ঠাকুর। সেই নাড়ু গোপালকে তিনি কাঠের চৌদলে বসিয়ে স্নানান্তে দুটো ফুল-তুলসী দিতেন। তাঁকে সন্ধ্যায় ধূপধুনো দেবারও ব্যবস্থা ছিল। তার প্রসারিত হাতে যেদিন যা ঘরে থাকতো, বাতাসা, মিছরির টুকরো কিংবা একটু গুড় দিয়ে রাখতেন। দোলে, রাসে, ঝুলনে এবং জন্মাষ্টমীর দিনে ভোগ দিতেন —তার ঘরে যা থাকত তাই দিয়ে।

মা যাবার পর গোপাল পড়ল বিনির স্কন্ধে। তার প্রতি বিনির তেমন ভক্তি বিশ্বাস না থাকলেও মায়ের করণীয় যা ছিল তা থেকে বিনি গোপালকে বঞ্চিত করে না। মৈত্র-বাড়ীর গৃহিণী কর্তামা এই অনাথা মেয়েটিকে অতিশয় স্নেহ করতেন। ছলছুতোয় তার অভাব মোচনের চেষ্টা করতেন। তিনি কাল বিনিকে তার ঠাকুরকে দেবার জন্য দিয়েছিলেন গুড়ের বড় বড় ফেণী বাতাসা, চিনির ছাঁচ আর এক ঠোঙ্গা আবির।

বিনি ছেলেমেয়েদের কপালে আবিরের টিপ দিল পরিয়ে। ছাঁচ বাতাসা হাতে দিল। হাতে দিলে তারা আনন্দিত হয়ে অন্য বাড়ীতে চলে গেল। আজ তারও ঘরে অনেক কাজ। পূজোর জলপান ও ভোগের আয়োজন করতে হবে। মৈত্র-বাড়ীতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু সে যাবে না—এখন যেন ভীড়ের ভেতর যেতে তার লজ্জা ও কুণ্ঠা বোধ হয়। অথচ এ লজ্জা কুণ্ঠা পূর্বে বাবা-মা থাকতে ছিল না। স্নানান্তে কর্তামা প্রদত্ত লালপেড়ে কোরা শাড়ী পরে সে ফুল তুলতে গেল।

কর্তামা দোলে পূজোয় রাসে ঝুলনে তাকে যে শাড়ী দেন তাতেই তার চলে যায়।

বাবা ও মায়ের হাতে রোপিত ফুলগাছগুলি এখনও প্রচুর ফুল দানে বিরত হয় নাই। মনে পড়লো বাবার মধুর কণ্ঠস্বর—

'চন্দন চর্চিত নীল কলেবর,
পীতবসন বনমালী······।'

তার দুঃখ হতে লাগল, বাবার সুধাকণ্ঠ পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে, সে কেন বাবার কাছে গান শেখেনি।

পূজোর আয়োজন করে জলপানি শশা-কলা-ক্ষীরের নাড়ু সাজিয়ে দিতে দিতে বেলা দ্বিপ্রহর হয়। ধূপ দীপ আবির দিয়ে গোপালের পূজো সেরে

ভোগের আয়োজন করে। মটর ডালের খিচুড়ি, নারকেল দিয়ে কচুর শাক, বাগানের কাঁচকলা ভাজা, গাছের টোপাকুলের অম্বল, গুড় দিয়ে এক বাটি পায়েস। বিনির ভোগ দেওয়া যখন শেষ হল, বেলাও তখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। পল্লীর বনপথে হোলীর তাণ্ডবলীলা প্রায় থেমে এসেছে। সকলে ছুটেছে নদীর ঘাটে স্নান করতে। দূরে কাছে থেকে তখনও সঙ্গীতের রেশ বসন্তের উতলা বাতাসে ভেসে আসছে।

'নব ঘন শ্যাম মুরতী মনোহর—
আমার হিয়াপরে রাজে।
শতবিধু-নিন্দিত চারুমুখ-পঙ্কজ,
সিথিপাখা শোভে শিরঃ তাজে।'

নব ঘন শ্যামনাম শোনামাত্র বিনি আবার আনমনা হয়। মনে পড়ে স্বামী ঘনশ্যামকে। বিনি লেখাপড়া জানে না—দেখতেও তেমন ভাল নয়—বাবারও অর্থবল ছিল না, তবু ঘনশ্যাম তাকে আদরে সোহাগে একমাসকাল মুগ্ধ করে রেখেছিল। সেই ঘনশ্যামকে বিনি কি ভুলতে পারে নিমেষের জন্য? সে এখনও ফিরে আসে না কেন? ওরা ওইরকমই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নইলে যে শ্রীচৈতন্যের মহোৎসবে আজ দিকে দিকে আনন্দ প্রবাহ বইছে তিনি প্রিয়তমা বিষ্ণুপ্রিয়াকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে ছিলেন কেন? যে গোবিন্দ-শ্রীরাধাকে নিয়ে দোললীলায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন তিনি তাকে ত্যাগ করে মথুরায় গেলেন কেন?

যে প্রজানুরঞ্জক রাম। তিনি সীতাদেবীকে এত দুঃখ দিলেন কেন? এঁরা সব স্বয়ং ভগবান অবতার হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এঁদের যেসব দেবলীলা, মানুষের বেলায় তাতে দোষ দিলে চলবে কেন? ঘনশ্যাম নিশ্চয়ই আসবে।

মৈত্র-বাড়ীতে রাধাগোবিন্দের আরতি হচ্ছে। আরতি শেষে বিরাট আঙিনায় সামিয়ানার নীচে কীর্তনীয়াদের আসর বসবে। বিনি তার ক্ষুদ্র গোপালের ক্ষুদ্রতম আরতি সমাপন করে রাখল। সারাদিন সে কিছুই খায় নি। তখন ছেলেমেয়েগুলোকে বৈকালে প্রসাদ নেবার কথা বলতে ভুল হয়ে গেছিল। তাদের হাতে প্রসাদ বিতরণ না করে সে খাদ্যগ্রহণ করে কি রূপে।

তার গোপালের ঘর ভরে গেছে চন্দন ও ফুলের গন্ধে।

সুমার্জিত গোপালঠাকুরের কটিতটে নীল বসনের একখানা ফালি জড়ানো। ফুলের মালা আবিরে চন্দনে সুসজ্জিত। হাতে তাঁর ক্ষীরের নাড়ু।

উপবাসী শ্রান্ত ক্লান্ত বিনি একাকী বসে থাকতে পারে না। প্রসাদের থালা ঢাকা দিয়ে মাটির শীতল মেঝেয় সে শয়ন করে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ রজতধারা বর্ষণ করছে। কাননে কুঞ্জে তরু মর্মরে 'মধুর মধুর বংশী' বাজছে। আজ বিশ্বভুবন বৃন্দাবন হয়ে গেছে। বিনি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তন্দ্রার ঘোরে সে অনুভব করছিল—আসতে বিলম্ব হবার জন্য ঘনশ্যাম তার পায়ের কাছে বসে মানভঞ্জন করছে তার বাবার গলার সেই শোনা গান—

'স্মরগরলখণ্ডনং মম
শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লবমুদারম্।

'বিনিদিদি, ও বিনিদিদি, ঘুমিয়ে পড়েছ ক্যানে? সব ঢাকাঢুকি দিয়ে থুইছ, এখনও প্রসাদ খাওনি?'

কাজ শেষ করে কড়ির মা ফিরে এসে প্রশ্ন করে।

বিনি সচকিত হয়ে উঠে বসে। তার নতুন কোরা শাড়ীর আঁচল শিথিল হয়ে পায়ে লোটাচ্ছিল। কোথায় ঘনশ্যাম কোথায় 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'?

কড়ির মা ফের তাড়া দেয়, 'সারাটা দিন উপাসী থাকলে, এ কেমন ধারা দিদি? ও বাড়ী তুমি গেলে না, কর্তা-মা তোমায় কাল যেতে বলেছেন, কাল অত ভীড় থাকবে না। সারাটা দিন গেল, একটা লোক নেই যে মেয়েটাকে দেখে। অমন সোনার চাঁদ স্বামী সেও পড়ে রয়েছে মগের মুলুকে। আমিও কাজের তাড়ায় আসতে পারিনি।'

বিনি গায়ের আঁচল গায়ে জড়াতে জড়াতে বলে, 'কারোর হাতে ভোগের জিনিষ না দিয়ে খেতে নেই—তুমিও ছিলে না—তাই খাইনি। তখন যারা আবির দিয়ে গেছে তাদের বলতে ভুলে গেছি।'

'আমি এক্ষুনি কানু, বলাই, সুভাষী আর বিশাখাকে ডেকে আনছি, তুমি বারান্দায় পাতা পেতে ঠাঁই করে রাখো—' বলতে বলতে পতি-পরিত্যক্তা এক নারীর দুঃখে বিগলিত হয়ে পুত্র-বিতাড়িতা আরেক নারী পাড়ার দিকে চলে গেল। তখন রাধাগোবিন্দের আঙিনায় খোল করতালের সাথে কীর্তন আরম্ভ হয়েছে—

'কি কহব রে সখী আনন্দ ওর,
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।'

উৎসবের সেই দিনগুলি

চৈত্র প্রায় শেষ। উত্তপ্ত চৈতী হাওয়া দিনরাত বয়ে যাচ্ছে ধূলো উড়িয়ে।

প্রাচীন বসতিঘন গ্রাম নীলকণ্ঠপুরে নীলকণ্ঠ শিবের পূজোয় বড় ধূম বর্ষশেষে। নীলের পূজা, চড়ক ও নববর্ষের উৎসব তিনটি একসূত্রে গাঁথা।

নদীর ধারে শিমূল, বট, পাকুড় ও বেলগাছের ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে মন্দিরের চারদিক ঘিরে চড়কের মেলা বসে জঁাকিয়ে। পর্বদিন নাগরদোলা এসেছে। মাটির হাঁড়ি কলসীর নৌকা এসে ভিড়েছে ঘাটে। খোলের ভেতর মাটীর হাতি, ঘোড়া, পুতুল, খেলার ছোট ছোট মাটির পাত্র, সোলার কাকাতুয়া, টিয়াপাখী, বাঁশের বাঁশী, ঝুড়ি ভরে এসেছে চিনির সাঁচ, ফেণী বাতাসা, গুড়ের খাজা। আয়নাবসানো কাঁচের চুড়ি, বালা, রাঙা সুতো, কাঠের মালা, কাঁকই-বারকোষের সঙ্গে আছে বেতের ধামা-কাঠা, শাড়ীধুতি গামছা কত কি। ডালা-কুলোর বেসাতি নিয়ে সাপ নাচাতে এসেছে বেদেনী। এবারে একটা চিতা বাঘও এসেছে। পুতুলনাচও আছে। মেলায় লোকে লোকারণ্য। ঝুড়িভাজা, গুড়ের জিবেগজা ও জিলিপির দোকানের সামনে ভিড়ের সীমাসংখ্যা নেই। মাছি ভনভন করছে, ছেলেমেয়েরা কলকল করছে। থেকে থেকে চড়কতলা থেকে ধ্বনি উঠছে 'জয় মহাদেবের জয়, জয় পাটঠাকুরের জয়।'

মন্দিরের কাছেই তিনখানা বাড়ী। একখানা নীলকণ্ঠ শিবের পূজারী ত্রিলোচন ভট্টাচার্যের। মাঝেরটা জমিদারের নায়েব ভূতনাথ চৌধুরীর। শেষ বাড়ীখানায় বাস করে মহেশ মণ্ডল গাজনের প্রধান সন্ন্যাসী পরম শিবভক্ত। তাঁর স্ত্রী সর্বমঙ্গলা নীলকণ্ঠপুরের নামকরা ধাত্রী হাতে কদাচ শিশু বা প্রসূতি নষ্ট হয় না। বৃহৎ গ্রামের একদিকে তিনখানা গৃহ দুঃখেসুখে রোগেশোকে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেঁচে আছে।

নায়েব পত্নী মুক্তকেশী হাবাগোবা নিতান্ত ভালমানুষ। লোকে তাকে হ্যাকাবোকা বলে থাকে। মুক্তকেশীর চিত্তে সুখ নাই সন্তান অভাবে। স্বামীর বংশ নায়েবের বংশ' দাদাশ্বশুর, শ্বশুরের পরে স্বামী নায়েব হয়ে খ্যাতি অর্জন

করেছেন। এদের আবার বংশাবলির ধারা এক পুরুষ নিয়ে। স্বামীর পরে নায়েব পদের কেউ নেই। মুক্তকেশীর সর্বাঙ্গে সন্তান কামনায় সোনাতামার মাদুলী। শিবভক্ত মহেশ মণ্ডলের দেওয়া শিবের ত্রিশূলধোয়া জল খেয়ে ও প্রসাদী বিল্বদল নিত্য চিবিয়ে ফল হচ্ছে না। এধারে স্বামী ও স্ত্রীর বয়স বেড়ে যাচ্ছে। ছেলে আর কবে হবে ?

ভাবনা ও দুঃখে মুক্তকেশীর শরীরটা বর্তমানে ভেঙে পড়েছে। আহারে রুচি নেই, রক্তশূন্যতা। কবিরাজ অম্বলের ঔষধ দিচ্ছেন।

শিবের মন্দিরে নিকট প্রতিবেশিনী ধাত্রীপ্রধানা মঙ্গলা মুক্তকেশীকে নিত্য নিয়ে গিয়ে পুজো দেয়, কাঁচা দুধে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে মানত করায়। শিব প্রসন্ন হলে কি না হয় ? অসম্ভবও সম্ভবপর। মুক্তকেশীর এক জ্বালা পূজারী পত্নীর আবার অন্য জ্বালা।

ত্রিলোচন পত্নী যোগমায়ার সন্তানের বিরতি নেই। পরপর পাঁচটি ছেলের পরে আবার সে আসন্নপ্রসবা।

চৈত্র মাস শেষ হয়ে আসছে, নীলের পূজো আগতপ্রায়।

মঙ্গলার বিষম অশান্তি হয়েছে এই সময়টা তাকে যদি যোগমায়ার কাছে থাকতে হয়, তাহলে সংসারের খবর কে রাখে ? তার ধারণা যোগমায়া এবার যমজ সন্তানের মা হবে। স্বামী ও ত্রিলোচন পূজারী ভিন্ন এ সম্ভাবনার কথা মঙ্গলা কাউকে জানায়নি অবশ্য।

দুই শিবসেবক বাল্যবন্ধু। এক ব্যবসায়ে ও একত্রে বাসের ফলে বাল্যবন্ধুত্ব আরও নিবিড় হয়েছে। যোগমায়ার জন্যে দুই বন্ধুই চিন্তান্বিত। যেকটি রয়েছে তাদের পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই। শুধু নীলকণ্ঠ জানেন কত দুঃখে দিন কাটে তাদের।

এই মন্দিরে প্রতিদিন পূজা-আরতি, আর গ্রামের মধ্যে ষষ্ঠী-লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ, একখানা দুর্গাপূজা, একখানা কালী পূজোয় এতগুলি প্রাণীর গোটাবছর চালানো যায় না কি ? দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা একখানার বেশী তো হয় না।

নীলকণ্ঠের মন্দিরের চত্বরে বসে দুই বন্ধু অভাব-অনটনের আলোচনা করে। মঙ্গলা মাঝে মাঝে কল্কের ছিলিম বদলে দেয়। মঙ্গলাও খুশী নয়। তার তিনটি মেয়ের বড় বিধবা অবলা। অবলা সুযোগসুবিধা পেয়ে শহরের হাসপাতালে বছর দুই আয়ার কাজ শিখে মায়ের হাতে হাত মিলিয়েছে।

দ্বিতীয় সবলা শ্বশুরালয় থেকে নববর্ষ উপলক্ষ্যে এসেছে। ছোটটি কুমারী, কমলা। তার বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

চড়কপূজোর আগেরদিন নীলের পূজো। ইতরভদ্র সব শ্রেণীর বয়স্কা স্ত্রীলোকেরা নীলের উপোষ করেন। দিবাভাগে গৃহে গৃহে মৃত্তিকা নির্মিত শিবলিঙ্গের পূজা হয়। সন্ধ্যাবেলায় ভোজ্য ও ফলমিষ্টান্ন ঘিয়ের প্রদীপ নিয়ে মেয়েরা চড়কতলায় নীলকণ্ঠের পূজা দিতে যায়। স্বামী পুত্র সকলের নামে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে আসে। রাত্রে ফলমূল ভোজন করে ব্রত উদযাপন করে।

প্রভাত থেকেই মঙ্গলা মন্দিরের দরজায় হাজির হয়েছে। এই দুইদিনের রোজগার তাদের বেশ কিছু পাথেয়। রাতশেষে মূল সন্ন্যাসী মহেশ ও ত্রিলোচন সমানভাগে জিনিসপত্র ভাগ করে নেয়।

সারাদিন পল্লীর আঙিনায় আঙিনায় গাজন সন্ন্যাসীরা হাত দুই লম্বা সামনে সরু পেছনে চওড়া পাটঠাকুর কাঁধে সন্ন্যাস খেটেছে। ধামা ধামা আতপ চাল, মটরের ডাল, কাঁচকলা, রাঙাআলু ও গব্যঘৃত সিধা দিয়ে গৃহিণীরা নৃত্যগীত উপভোগ করেছেন ওদের—

'শিবঠাকুর ভাই, শিবঠাকুর ভাই
এবার বড় খরা,
আর বছর তুলে দিব ভ্যান্না গাছতলা।
ভান্না গাছ কুটি কুটি রক্ত পড়ে ধারে
সেই রক্ত তুলে দেব মহাদেবের ঘাড়ে।'

সন্ধ্যাবেলায় মুক্তকেশী নীলকণ্ঠ মন্দিরে এল পূজাসম্ভার নিয়ে। সন্তানহীনার একটি মাত্র প্রদীপ জ্বাললে স্বামীর উদ্দেশে।

মঙ্গলা জিজ্ঞাসা করে, 'এত রাত করলে কেন দিঠান? জ্বর গায়ে উপোষ না করলেই পারতে। নায়েববাবু বুঝি এখনও ফেরে নি?'

মুক্তকেশী শ্রান্ত স্বরে জবাব দেয়, 'না, কাল হয়তো ফিরতে পারেন। বছরের শেষ, কালকেই বকেয়া খাজনা জমা দেবার শেষ দিন। জ্বরের গায়ে এমনিই উপোষ, তাই বাবার নামে রয়েছি।'

মঙ্গলা ধামায় ভোজ্যের চাল তুলতে তুলতে বলে, 'ফল জল দিলে তো শিবের মাথায়। খই দুধ খেয়ে নাও গে। একলার সংসার, দেবার তো কেউ নেই।'

'যেমন ভাগ্য করেছি,' বলতে বলতে মুক্তকেশী আবার শিব প্রণামান্তে ধীর পায়ে বেড়িয়ে যায়।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা গাঁয়ে শুরু হল চড়ক পূজার উৎসব। পূর্ব-পুরুষের নামে নামে কলসী উৎসর্গ, বস্ত্র, চামর, পাখা, পাদুকা, ফল, মিষ্টান্ন ভোজ্য দানের ঘটা কত।

মেলার কোলাহল, বাজনা, সন্ন্যাসীদের গাজনের নৃত্য গীতে, ঢাক-ঢোল কাঁসির বাজনায় চৈত্রের আকুল বাতাস মুখর হয়ে উঠল।

চড়ক গাছের মাথায় কপিকলের সাহায্যে জিহ্বায় বাণ ও পিঠে বঁড়শীবিদ্ধ সন্ন্যাসী শূন্যে সাত পাক ঘুরছে। কাতারে কাতারে লোক উল্লাসে জিগির দিচ্ছে, 'জয়, জয় শিবশঙ্কর নীলকণ্ঠে জয়।'

সেই চরম মুহূর্তে যোগমায়ার ঘরে ডাক পড়ল ধাত্রী মঙ্গলার। দিনভোর বড় মেয়ে অবলা মুক্তকেশীকে নিয়ে আটকে আছে। সে-ই মুক্তকেশীর দেখাশোনা করে। মুক্তকেশী জ্বরে অজ্ঞান অচৈতন্য। নায়েববাবু সদর থেকে এখনও ফেরেন নি।

অগত্যা মেজ মেয়ে সবলাকে নিয়ে মঙ্গলাকে যোগমায়ার প্রসবাগারে যেতে হল। পূজারী ও মহেশ অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করছে।

পুনঃপুনঃ সন্তান জন্ম দিতে অভ্যস্ত হলেও এবার যোগমায়া অস্থির হয়ে ক্ষণকালের জন্য চেতনা হারিয়েছিল।

চড়ক উৎসবের ভীষণ মধুর রূপের অন্তে নববর্ষের হাসি মুখ দেখা দিল। জমিদার বাড়ী উৎসবের ঘটা প্রচুর। গৃহদেবতার বিশেষ পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হয়। বহু লোকজন খায়। পূজা ও ভোগের অন্তে বিরাট এক তাম্রপাত্রে নারায়ণশিলাকে গোটা বৈশাখ মাসের ধারা স্নানের জন্য বসানো হবে। মাথায় সহস্র ধারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। শত ছিদ্র মাটির পাত্রের প্রতি ছিদ্রে কুশ। প্রকৃত পক্ষে নববর্ষের সূচনা চৈত্র সংক্রান্তি থেকে। সেদিন তুলসী গাছে নারা বাঁধা হয় ও ব্রাহ্মণ ভোজন করানো হয়।

ঠাকুর ঘরে কাঠের বড় বড় বারকোষে তরমুজ, ফুটি, শসা, কলা, বেল ইত্যাদি কেটে রাখা হয়েছে। পাথরের থালায় ঘরে তৈরি নাড়ু, নারকেলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, সরভাজা, বাতাসা, চিনির ছাঁচ। যবের ছাতু-গুড়-দই কলা আজ থেকে নিত্য নারায়ণের জলপানিতে যোগান দিতে হয়।

মেয়েরা আজ পুণ্য পুকুর ব্রতের আয়োজন করছে। সাধ্য মত নববস্ত্র পরে

ছোট ছেলেমেয়েরা পথে বার হয়েছে। ছিদাম বৈরাগী ভাঙা মোটা গলায় একতারার গুব্-গুবাক ধ্বনির সঙ্গে পথে পথে হরিনাম বিলিয়ে ফিরছে চৈত্র-সংক্রান্তি থেকে।

এই পরিপূর্ণ উৎসবের স্বর্ণের সোনা-ঝরা দিনটিতে গ্রামবাসীরা চমকিত পুলকিত হয়ে তুইটি শুভ সংবাদ শুনল।

পর পর পাঁচটি ছেলের পরে পূজারীর ঘরে একটি কন্যা এসেছে। আর অনুবরা নায়েব গৃহিণীর এতদিনে এক পুত্র হয়েছে।

জমিদার গৃহিণী বিশ্বস্ত নায়েবের বাড়ী বিরাট সিধা পাঠিয়েছেন আনন্দে। নায়েববাবু রাত্রে বাড়ী ফিরে মেলার যাবতীয় মিষ্টান্ন কিনে বিতরণ করেছেন।

হাসপাতালের শিক্ষিত আয়া অবলা মুক্তকেশীর ছেলের লালনপালনের ভার নিয়েছে। কোলের কাছে নবজাতককে নিয়ে মুক্তকেশী আনন্দে অভিভূত, দিশাহারা। তার জ্বর ছেড়ে গেছে।

অবলা জোর গলায় ঘোষণা করেছে যে, মুক্তকেশীর মত ছেলে কতশত হয়। সব সময় লোকে আগে টের পায় না। সে হাসপাতালে হাজার হাজার দেখে এসেছে। নায়েব বংশের ধারা নীলকণ্ঠের দয়ায় এবার বজায় রইল।

বহু প্রসবিনী যোগমায়ারও মুখে হাসি। মায়াদয়া শূন্য ছেলের পালের মধ্যে মা-জননী শিবঘরণী তাকে দয়া করে মমতাময়ী মেয়েকে পাঠিয়েছেন।

অর্ধ শিক্ষিত সরল চাষা-প্রধান গাঁয়ের লোক আসল রহস্য জানল না। তারা তো শরৎকুমারী চৌধুরাণীর উপন্যাস 'সোনার ঝিনুক' বা সীতাদেবীর 'পরভৃতিকা' পড়ে নি। যমজ সন্তান পুত্র কন্যার রহস্য শুধু মঙ্গলা ও তুই তিনটি লোক জানল মাত্র। গত রাত্রের মেলা ফেরৎ ঢোল-কাঁসি নায়েব বাড়ী তোলপাড় করে। ঘন ঘন নীলকণ্ঠের জয়ধ্বনি এখনও আমের মুকুল মাখা বাতাস বইছে নববর্ষের প্রস্তুতি শেষ করে। নূতন দিনের সূর্য ওঠে।

নীলকণ্ঠপুরে আজ সে সূর্য বড় সুখের সূর্য।

আম ষষ্ঠী

পাবনা জেলায় জামাই ষষ্ঠীর নাম আম ষষ্ঠী। অন্যান্য জেলার মত ওখানে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে জামাতা অর্চনার প্রচলন ছিল না। সেই জন্য জামাই ষষ্ঠী নাম না দিয়ে আম ষষ্ঠী নাম দিয়েছে।

তখনকার দিনে আম ষষ্ঠীতে পল্লীগ্রামে ঘটা মন্দ হোত না। জ্যৈষ্ঠ মাস ফল পাকার সময়, গাঁয়ে সকল গৃহেই ফলবান বৃক্ষ বিরাজিত। আম জাম কাঁটাল পেয়ারা লিচু জামরুল বেল কলা ধনী দরিদ্র সবার ভিটাতেই কিছু না কিছু থাকতই।

সেকালে পাশাপাশি গ্রামগুলিতে পরিচিত লোকেদের মধ্যেই ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিতে সকলে পছন্দ করতেন। অচেনা অজানা দূরে কেউ মেয়ে দিতেন না, মেয়েও আনতেন না। তাঁদের অভিমত ছিল, জানার মন্দও ভাল, অজানার ভালও মন্দ। নদীমাতৃক দেশ, কাছাকাছি হলেও অধিকাংশ মানুষকে নদীপথ ধরতেই হতো।

ঘাটে ঘাটে নৌকা বাঁধা, মাঝিমল্লারা হাজির। তাদের সকলেই জেলে গঙ্গাপুত্র নয়। নমঃশূদ্র ও মুসলমান মাঝিরাও ছিল প্রচুর।

আম ষষ্ঠী আসন্ন হলে অনেকে গাছের ফল ঝাঁকাভরে কুটুমবাড়ীতে পাঠিয়ে দিতেন। যিনি পারতেন তিনি ফলের সঙ্গে স্বহস্তে প্রস্তুত কিছু নারকেল কিম্বা দুধের খাবার পাঠিয়ে দিতেন। কুটুম্বরা দ্রব্যসম্ভার পেয়ে খুসী হতেন, না পেলেও নিন্দা করতেন না। আম ষষ্ঠীতে নববস্ত্র পরিধান করবার প্রথা ছিল না পাবনা জেলায়। দুর্গা পূজোয় ভাল হোক মন্দ হোক সকলেই নূতন কাপড় পরতেই হোত। জামাই মেয়েকেও দিতে হোত। দরিদ্রের দেশে আড়ম্বর ও বিলাসিতা ছিল না। তাদের বিলাস ছিল ভোজনে। মাছ ও দুধ না হোলে খাওয়াই হোত না।

চক্রবর্তী বাড়ীর গৃহিণী দুর্গাদেবী মহা ব্যস্ত। কাল আম ষষ্ঠী। ঘটা না থাকলেও ন্যাঠা কম নয়। আজকেই সমস্ত আয়োজন করে রাখতে হবে।

দুর্গা দেবীর ছোট মেয়ে চারুবালা এসেছে মার কাছে তার দুই ছেলে। দুই বধূর গণ্ডাখানেক ছেলেমেয়ে। বাড়ীতে গোলমাল ও কলরবের আদি অন্ত নেই।

সন্তানের জননীদের ষষ্ঠী পূজা করা অবশ্য করণীয়। এখানে ব্রতী চারজন। মা দুই বৌ এক মেয়ে। চার ভাগে ষষ্ঠী পূজার ডালা সাজাতে হবে।

তিলের নাড়ু, নারকোলের নাড়ু তক্তি সরের নাড়ু ক্ষীরের সাতটি করে নোটন তৈরী করে চার ভাগে রাখা হোয়েছে। চার ভাগে ষাট গাছা করে দুর্বা বড় বড় করে বেছে বেঁধে রাখা হোয়েছে। নূতন তাল পাতার পাখার উপর এক জোড়া সিন্দুর মণ্ডিত আম ও এক আঁটি দূর্বা নিয়ে স্নানান্তে কোমর জলে দাঁড়িয়ে জল সইতে হয়। গৃহিণী বসেছেন কার্পাস তূলো হলুদ চুনে রং করে ষষ্ঠীর কঙ্কন ও ডোর তৈরী করতে।

মেহের আলির বৌ জুড়ানের মা এবাড়ীর পুরাতন দাসী। শিশু জুড়ানকে কোলে নিয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর এ বাড়ীতে ঢুকেছিল। তাদের সমাজে নিকা থাকলেও ছেলের কষ্ট হবে বলে সে তা করেনি। এখানে কাজ করে জুড়ানকে বড় করে এই বাড়ীতেই তাকে গরুর রাখাল করে রেখেছে।

চারু মায়ের দিকে চোখ তুলে বল্লে, 'শোন মা একটা কথা বলি, তোমাদের ষষ্ঠীতে এবার আমি এখানে আছি। আমি কিন্তু পাকা আম দূর্বো নিয়ে নদীর ঘাটে কোমর জলে দাঁড়িয়ে 'হেনা ছ্যাখ, ত্যানা ছ্যাখ' বলতে পারব না। আমার হোয়ে ওসব তুমিই করো।'

ছোট বৌ বসে বলে, 'আপনি করলেই আমাদের হবে। আমরা ওসব করতে পারব না।'

বড়বৌ বেড়িয়ে এসে আবদার করে, 'আমারো ঐ কথা মা, আপনি থাকতে আমরা কেন ঐ সব করতে যাবো? আপনি করলেই সকলের হবে।'

এদের আপত্তি ওজরে দুর্গা দেবী মনে মনে প্রসন্ন হলেন। তা হলে এখনো তিনি বাতিল হয়ে যাননি। তিনি নিয়ম রক্ষা করলে সবারই হবে, বড় মিষ্টি কথাটা। বাইরে তিনি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, 'তোমরা সকলে ষষ্ঠীর ব্রত নিয়েছ, ছেলের মা হয়েছ, এখন আবার ওসব করতে লজ্জা কিসের? চারজনার চার পাখা, বার আঁটি দূর্বো, চার জোড়া আম নিয়ে আমার মুস্কিল হবে যে।'

মুস্কিল কিসের মা, চারখানা পাখা, চার আঁটি দূর্বো আটটা আম তা তুমি নিতে পারবে না? আমি এখুনি তোমার কাক ডিমে আম আটটা বেছে রাখছি।' চারু আম বাছতে উঠে চলে গেল।

গোলাঘরের মাচার নীচে ঝাঁকা ঝাঁকা আম পেড়ে আমের পাতা বিছিয়ে জাগ দিয়ে রাখা হোয়েছে। একপাশে কাঁঠাল জামরুল লিচু বেল আনারস স্তুপীকৃত রাখা হয়েছে। আষাঢ় মাসে জাম পাকবে, তবু বেছে বেছে ষষ্ঠী পুজোর জন্যে কিছু জাম ও পেয়ারা কলা পেড়ে রাখা হয়েছে।

জুড়ানের মা উঠোন ঝাড় দিচ্ছিল, সে বলে উঠলো, 'মাঠান ঠাকুরঝি, বৌমাগরে লজ্জা করে তুমি যতদিন বাঁচি রইবে ততদিন তাগরে কিছুই করতে লাগিবি না। তুমি হলে সকলের মা, সকলের বড় তোমার সামিল আর কে আছে?'

গৃহিণী প্রীত হয়ে বল্লেন, 'তা ত বুঝি তবু ওদের অভ্যাস হওয়া দরকার। হ্যাঁরে, আমি তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আম ষষ্ঠীতে আমাদের ভাত খেতে নেই। আটার জন্যে চারটি গম ভাঙ্গানো হয়নি।'

'তুমি বলতে ভুলে গেলেও আমার মনে ছিল মাঠান, কাল সাঁঝে তোমরা যখন হবিষ্যাঘরে নাড়ু বড়ি করছিলা তখন আমি চার কাঠা গম যাঁতায় ভাঙ্গিয়ে রাখিচি। উয়াতেই হইবে না আরো ভাঙ্গাতে হইবে?'

'না জুড়ানের মা, আর আটা দিয়ে কি হবে? ভাত রেখে এখানে কেউ রুটি খেতে চায় না। আমরা চারজনা একবেলা খাব, আর তোরা সকলে প্রসাদ পাবি। এ বাড়ীর খুঁটিনাটি তোর এত মনেও থাকে!'

জুড়ানের মা পুলকিত হোয়ে জবাব দেয়, 'তা যা কইছো মাঠান আমি তো আজ আসি নাই তেগরে বাড়ী, বারোটা বছর কাটি গেছে। দুই বচ্ছরের জুড়ানকে নিয়া আইচিলাম, সে এখন লায়েক হইয়া গেইচে।' বলতে বলতে জুড়ানের মা আপন মনেই হাসে।

ষষ্ঠীর প্রভাত হতে না হতেই বৌঝিদের স্নানের ধূম পড়ে গেল। দুই বৌ স্নান সেরে ঢুকলে নিয়মের ঘরে, পূজার আয়োজন করতে। চারু ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কুয়োতলায় স্নান করাতে গেল। আজ তাদের তাড়াতাড়ি, এতোগুলোকে নদীর ঘাটে স্নান করানো সম্ভব নয়। আজ ছেলেদের তেল মাখা নিষেধ। বাংলার চির অবহেলিত মেয়েদের কোন নিয়ম না থাকলেও ছেলেদের দেখাদেখি তারাও তেল মাখে না। বালকবালিকাদের নববস্ত্র পরিধানের প্রথা না থাকলেও সকলকেই স্নান করিয়ে ভাল জামাকাপড় পরানো হয়। চুল আঁচড়ে কপালে হলুদের ফোঁটা দেওয়া হয়।

আম ষষ্ঠীর পূজা জলাশয়ের তীরে করার নিয়ম। ভোর বেলা গৃহিণী পাখা

দূর্বা ও আম নিয়ে চলে গেছেন নদীর ঘাটে। নদী এঁদের বাড়ীর কাছেই। তাঁর পিছু নিয়েছে ঝাঁটা হাতে জুড়ানের মা। জুড়ানের মা ঘটি ঘটি জল ঢেলে ঝাঁটা বুলিয়ে ঘাট পরিষ্কার করতে লাগলো। দুর্গা দেবী নেমে গেলেন জলে। কয়েকটা ডুব দিয়ে কোমর জলে দাঁড়িয়ে সিন্দুরে রঞ্জিত পাখা ও আম দূর্বা নিয়ে বিড় বিড় করে অনুচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, 'দেখো মঙ্গল দেখো, নতুন দেখো পুরান দেখো, দুর্গোৎসব দেখো দোল দেখো, অমুক ছেলের ভাত দেখো তমুক ছেলের পৈতা দেখো, মেয়ের বিয়ে দেখো ছেলের পরীক্ষা দেখো' ইত্যাদি।

ঘণ্টাখানেক জলে দাঁড়িয়ে বিশ্বের যাবতীয় দ্রব্য দেখার প্রার্থনা সেরে তিনি বাড়ীর পথ ধরলেন। তখন জুড়নের মাও স্নান সেরে চলে গেছে।

গৃহিণী বাড়ীতে ঢুকেই ভেজা কাপড়ে জলে ভরা পাখার বাতাস দিতে লাগলেন সকলের গায়ে, তারও আবার বচন আছে, 'ষাটের পুত গোবিন্দ, ষাট ষাট।'

এইবার সুরু হল ঘাটে পূজার উপকরণ নেবার পালা। সে কি একটু আধটু জিনিষ? পূজার সাজ নৈবিদ্য আমানী জলপানি ইত্যাদি।

পুরোহিত এসে তটভূমির বালির ওপরে কুশাসনে বসেছেন। আজ তাঁর ব্যস্ততার সীমা নাই, কোনরূপে এক ঘাট সেরে পূজার দক্ষিণা ট্যাঁকে গুঁজে ছুটতে হবে অন্য ঘাটে। তাঁর প্রাপ্য জলপাণি ফলমূল সকলে পাঠিয়ে দেবে তাঁর গৃহে।

বেলা অনেক হয়েছে, জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে চারিদিক ভরে গেছে। এক বৃহৎ বটগাছ ছায়া বিস্তার করে হেলে রয়েছে জলের উপর।

নদীর পরপারে শ্যাম শস্যক্ষেত্র বাতাসে ঢেউ তুলেছে। নদীর বুকে ভেসে যাচ্ছে দু' একটা ডিঙ্গি নৌকা। ছেলেমেয়েরা বটের ছায়ায় বালির আসনে বসে পূজা দেখতে লাগলো।

জুড়ানও স্নান করে খারের কাচা ধুতি পরে মায়ের সঙ্গে অদূরে বসেছিল পূজা দেখতে। পূজান্তে দক্ষিণা নিয়ে পুরোহিত চলে গেলেন আর এক ঘাটে পূজা করতে।

এবার মেয়েলি অনুষ্ঠান সুরু হোল। দুর্গা দেবী সমবেত ছোট বড় সকলের হাতে হাতে একটি করে ফুল দিলেন। ফুল হাতে নিয়ে কথা শুনতে হয়। সুরু হোল তার কাহিনী—ষাটের পুত গোবিন্দ, যে আম ষষ্ঠীর কেন্দ্র।—

এক ব্রাহ্মণের এক ব্রাহ্মণী ছিলেন। তাঁর একটিও ছেলে হয়নি। তিনি রাতদিন মা ষষ্ঠীকে ডাকতেন ছেলে দিতে। মা ষষ্ঠীর হাতে তখন ছেলে ছিল না, ছিল তাঁর নিজের একমাত্র ছেলে গোবিন্দ। মা ষষ্ঠী তাঁকেই পাঠিয়ে দিয়ে বল্লেন, 'অন্নপ্রাশন অথবা পৈতা কিংবা বিয়ের সময় তুমি একটা ছুতো ধরে আমার কাছে ফিরে এসো। কেও তোমাকে কটু কথা বললে আর থেকো না।'

ছেলে পেয়ে ব্রাহ্মণীর খুব আনন্দ। সারাদিন ছেলেকে আদর করে ষাটের পুত গোবিন্দ, ষাট ষাট বলেন।

ছেলের অন্নপ্রাশনের সময় হ'ল। ছেলের পিসি মূল্যবান একখানা সাড়ী পরে ছেলে কোলে নিয়ে বসলেন নাপিতের কাছে ছেলের নোক কাটতে। ছেলে একটা অপকর্ম করে পিসির কাপড় চোপড় ভিজিয়ে দিলে। পিসি বিরক্ত না হোয়ে বলে উঠলেন, 'ষাটের পুত গোবিন্দ ষাট ষাট।'

অন্নপ্রাশনের সময় ফিরে যাওয়া হোল না। পৈতার সময় এলো, নাপিত যেমনি কামাতে বসেছে, ওমনি তার গালে গোবিন্দ বিরাশি ওজনের এক চড মারলে। নাপিত নিজের গালে হাত বুলিয়ে বল্লে, 'ষাটের পুত গোবিন্দ, ষাট ষাট।' পৈতার সময়ও মার কাছে যাওয়া হোল না।

ক্রমে ছেলের বিয়ের সময় এল। বিয়ের পর বাসবে গোবিন্দ নূতন বৌয়ের চুলের মুঠি ধরে এমন একটা ঝাঁকানি দিলে যে বৌয়ের চোখে জল এসে গেল। যন্ত্রণায়। সে একটুকুও রাগ না করে বলে উঠলো, 'ষাটের পুত গোবিন্দ, ষাট ষাট।' বার বার তিন বার চেষ্টা করেও গোবিন্দর মা ষষ্ঠীর কাছে যাওয়া হোল না। তবুও সে নিরস্ত না হোয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলো।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আম ষষ্ঠী এসে গেল। ব্রাহ্মণী ছেলের মনোভাব টের পেয়ে বাড়ীর সমস্ত তেল সরিয়ে ফেললেন। কলুর ঘর থেকে ভাঁড় ভরা তেল কিনে নিয়ে সমস্ত ভাঁড় জঙ্গলে ভেঙ্গে ফেললেন।

আম ষষ্ঠীর দিন গোবিন্দ পাগলের মত তেল খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কোথাও তেল পায় না। অবশেষে জঙ্গলে ঢুকে ভাঁড়ের গা থেকে তেল নিয়ে মেখে ব্রাহ্মণীর কাছে এসে বললে, 'এই দেখ মা আমি জঙ্গলে তেল পেয়ে তেল মেখেছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি মা ষষ্ঠীর কাছে।'

মার প্রাণ ব্যাকুল হোল, অশ্রু সম্বরণ করে বল্লেন, 'মা ষষ্ঠীর জন্য ডোর ও কঙ্কণ তৈরী করে রেখেছি তাঁকে দিও।'

গোবিন্দ ডোর ও কঙ্কণ নিয়ে মা ষষ্ঠীর কাছে চলে গেল। মা ষষ্ঠী ডোর ও কঙ্কণ পেয়ে মহা খুশী। ডোর গলায় দিয়ে, কঙ্কণ হাতে দিয়ে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন।

তারপর আদেশ দিলেন, গোবিন্দ তুমি মার কাছে ফিরে যাও! আমার গলায় ডোর ও হাতে কঙ্কণ যেমন শোভা হয়েছে তুমিও তেমনি মার কোলে শোভা হয়ে থাক। চিরদিন সেখানেই থেকো আমার কাছে আসতে হবে না।'

গোবিন্দ মার কাছে ফিরে এলো। ব্রাহ্মণীর মহা আনন্দ।'—

ব্রতকথা সমাপ্ত হোল। সকলে হাতের ফুল জলে নিক্ষেপ করে মা ষষ্ঠীকে প্রণাম করলেন। এরপর পূজারিণীরা মা ষষ্ঠীর উদ্দেশে কলার পাতায় ডোর ও কঙ্কণ জলে ভাসিয়ে দিলেন।

দুর্গাদেবী ছেলে মেয়ে বৌদের হাতে ষষ্ঠীর ডোর বেঁধে দিলেন।

বটের ছায়ায় বসে পূজো দেখছিল জুড়ান ও তাঁর মা। গৃহিণী তাদের দু'টি ডোর দিয়ে বল্লেন, 'জুড়ানের ডান হাতে বেঁধে দে, তুই বাঁ হাতে বেঁধে নে।'

মেয়েদের বাঁ হাতে ষষ্ঠীর সুতো বাঁধতে হয় ও ছেলেদের ডান হাতে বাঁধতে হয়।

এ বছরের মত আম ষষ্ঠী হয়ে গেল। এখন ঘরে ফেরার পালা, তারপর ওই প্রসাদ বণ্টন। জুড়ান সমানভাবে পেল। আমার দেশে পাল-পার্বণে হিন্দু মুসলমান এক সূত্রে গাঁথা ছিল।

নববর্ষের প্রথম দিন

"হরিনাম কোথায় ছিল, কে আনিল রে ?
হরিনাম স্বর্গে ছিল, মর্ত্ত্যে এলো রে।"

ভোরের স্নিগ্ধ কোমল বনপথে ছিদাম বৈরাগীর ভাঙ্গা-মোটা গলা একতারার গুব্-গুবাক্ বাজনার সঙ্গে বাতাসে ভেসে আসছিল। চৈত্র সংক্রান্তি হতে আরম্ভ করে গোটা বৈশাখ মাস সে নাম বিতরণ করবে পাড়ায় পাড়ায়, পথে পথে। নতুন বছরে ধর্ম্মমাসে মধুর হরিনাম শোনানোর চেয়ে অক্ষয় পুণ্যের আর কি আছে ?

গোঁসাইবাড়ীর দুটি ছেলে মেয়ে তিলু আর নীলু চড়কের-মেলা থেকে একটু রাত করেই ফিরে এসেছিল। তারা শয়ন করে ঠাকুমার বিছানায়। মাঝখানে ঠাকুমা, দুপাশে দুই ভাইবোন। শোবার সময় কথা হ'য়েছিল ঠাকুমা ওদের জাগিয়ে দেবেন রাত্রি-শেষে।

ছিদামের একতারার শব্দেই হোক, হরিনামের গুণেই হোক, তিলুর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় ঠাকুমা নেই। কখন শয্যাত্যাগ করেছেন। আট বছরের নীলু গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

তিলু নীলুর চেয়ে মাত্র দুই বছরের বড়, কিন্তু মেয়ের জাত বলেই বোধহয় জ্ঞানে বুদ্ধিতে দিব্য পরিপক্ক হয়ে উঠেছে।

তিলু শিথিল খোঁপাটা মাথায় জড়াতে জড়াতে ডাকে, "নীলু ও নীলু, উঠে আয়, এখুনি সূর্য্য উদয় হবে। সূর্য্য উঠলে প্রাতঃস্নানের ফল হয় না। আর ঘুমোয় না। আজ কত কাজ, ভুলে গেছিস নাকি ? আগে নারায়ণকে প্রণাম করে সকলের পায়ের ধূলো নিতে হবে না ?"

নীলুর সাড়া মেলে না ; ঘুম ভাঙ্গে না।

তিলু মহা ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে বিছানা ছেড়ে দ্বারে দাঁড়ায়। চারিদিক ফর্সা হয়ে গেছে, সূর্য্য উঠ্‌বার আর দেরী নেই। মা এরই মধ্যে স্নানান্তে পুজোর

ঘরে কাজে লিপ্ত। ঠাকুমাও স্নান সেরে নিয়ে আঙ্গিনার কোণে তুলসীমঞ্চে জল দিচ্ছেন। তুলসী গাছে ঝারা বাঁধা হয়েছে। ছিদ্রযুক্ত একটি মাটির ঘট, ছিদ্রমুখের কুশ বেয়ে জল ঝরে পড়ছে তুলসী গাছে। কুশ অতি পবিত্র, কুশধৌত জল গঙ্গাজল হয়ে যায়। এ পুণ্য বৈশাখ মাসে নিত্যই তুলসী ধারা-স্নান করবে।

তিলু সকলকে প্রণামপর্ব্বটা সেরে নিতে এক পা এগিয়ে তখনই দুই পা পিছিয়ে এলো। মনে পড়ল গত সন্ধ্যায় সে ছোট ভাইটিকে আশ্বাস দিয়েছিল —এবারের শুভ নববর্ষের সব পুণ্য কাজের অংশ দেবে নীলুকে। এতদিন তিলু একা করে এসেছে, এবার নীলু হবে তার দোসর। সে এখন বড় হয়েছে। তাকে ফেলে তিলু কিছু করতে চায় না। আহা, অবুঝ ছোট ভাইটি দিদির ওপরে নির্ভরশীল।

করুণায় বিগলিত হয়ে এবার তিলু নীলুর গায়ে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বললে, "আমি চান করতে যাচ্ছি। তুই ঘুমিয়ে থাক, তোর কিচ্ছু হবে না। রোদ এখুনি উঠ্‌বে।"

বাইরে দিনের আলো দেখা দিলেও ঘরে আব্‌ছা-আব্‌ছা অন্ধকার। নীলুর দুচোখে এখনো নিদ্রার জড়িমা, সে বিছানায় বসে বলে, "আমি দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে চল চান করতে যাই। আমায় একটু তেল দে, মাথায় মেখে নিই।"

দিদি হিঃ হিঃ করে হাসে, "পাগাল কোথাকার, প্রাতঃস্নানে তেল মাখতে নেই। দুপুরবেলা তেল মেখে ফের মাথা ধুয়ে নিতে হয়। দাঁত মাজা, মুখ ধোয়া কিসের? ঘাটের জলে মুখ ধুয়ে বালি দিয়ে দাঁত মেজে নিবি। এখন তাড়াতাড়ি চল, প্রণাম সেরে নিই।"

প্রথমে চণ্ডীমণ্ডপে গৃহবিগ্রহ লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করে ঠাকুমা, বাবা মা, বাবার টোলের ছাত্র দাদাদের পায়ের ধুলো নিয়ে তিলু নীলু ছুটে গেল নদীর জলে ডুব দিতে।

বিপুলসলিলা পদ্মানদীর এক শাখানদী এ ক্ষুদ্র গ্রামের প্রাণস্বরূপিনী। শান্ত নদীর ধার তার পরিবেশ। তার ভাঙ্গন নেই, উদ্দামতা নেই।

তখন সূর্য্যদেব উদয় হচ্ছেন, আকাশের রক্তিম ছটা নদীর বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

ঘাট প্রায় জনশূন্য, দুই একজনা বৃদ্ধ বৃদ্ধা গলাজলে দাঁড়িয়ে ঊর্দ্ধমুখে করজোড়ে সূর্য্য প্রণাম করছেন।

গঙ্গাবিহীন গ্রামবাসীদের বিশ্বাস নিশীথের ঘোর তিমিরে গঙ্গা যমুনা গোদাবরী সকল নদীর সঙ্গেই মিশে যান। সূর্য্যের খরতাপস্পর্শে যে যাঁর স্বস্থানে ফের ফিরে যান। এই বিশ্বাসে গ্রামবাসীরা পর্ব্বদিনে প্রাতঃস্নান করে। এতেই তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়।

ঝুপ্ ঝুপ্ করে গোটা কতক ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে তিলু নীলু মহাব্যস্তে ফিরে চলে বনপথ দিয়ে। আজ তাদের অনেক কাজ, নদীবক্ষে জল খেলার সময় নেই। নইলে নদী তাদের খেলার সাথী; ডুবে সাঁতারে, হাসি গল্পে তটভূমি ওরা মুখর করে রাখে।

গোঁসাইবাড়ী হতে নদী দূরে নয়। আঁকাবাঁকা একটুখানি পথ। দুই পাশে নিবিড় অরণ্য। অরণ্যের কোলে ডাণ্ডিবন। বসন্ত তখনো ভুবন থেকে বিদায় নেয় নি। তখনও সে "জাগ্রত দ্বারে"।

পথের মাঝখানে একটা প্রাচীন গাব গাছ হেলে পড়ে ঝুর্ ঝুর্ করে ফুল ঝরাচ্ছে। তিলু চলতে চলতে ভেজা আঁচলে ফুলগুলো কুড়িয়ে তোলে।

নীলু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে, "দিদি, গাবের ফুল নিয়ে কি করবি? এ ফুল দিয়ে পূজো হয় না।"

দিদি উত্তর দেয়, "পূজোর পুষ্পপাত্রে আমি রাখব না এ ফুল। ঠাকুরকে মালা গেঁথে দেব রোজ। এ ফুঁলের কি সুন্দর গন্ধ। এর সাথে ভাঁটিফুল মিলিয়ে গোড়ে মালা গেঁথে দেব।"

নীলু গোড়ে মালা গাঁথা জানে না। সে ঈষৎ ক্ষুণ্নস্বরে বলে, "আমি রোজ বকুল ফুলের মালা গেঁথে দেব। বকুল ফুল আমার খুব ভাল লাগে। বাসি হলেও গন্ধ যায় না।"

"বেশ তো, তুই মাসভরে বকুল মালাই দিস। আমি দেব আমার যা ভাল লাগে।"

আঁচল ভরে ফুল কুড়িয়ে তিলু নীলু বাড়ী ফিরে দেখে গোশালার সামনে ঠাকুমা গোকুল পূজো করছেন। তাদের দুগ্ধবতী কাজলী গাভীটির শিংএ তেল দেওয়া হয়েছে, কপালে সিন্দুর ও চন্দনের ফোঁটা। গরুর চারখানা পা ধুইয়ে দিয়ে ঠাকুমা তাকে খাওয়াচ্ছেন মাজ পাতায় করে যবের ছাতু, গুড় ও কলা। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসময়টা যবের ছাতুর প্রচলন বেশী। সব কাজেই যবের ছাতু চাই। ছাতু কুটে ঠাকুমা মাটির পাকা হাঁড়িতে তুলে রেখেছেন আচার

নিয়মের ঘরে। ছাতু-গুড়-দই-কলা নিত্য যোগান দিতে হবে লক্ষ্মীনারায়ণের জলপানিতে।

নাতিনাত্‌নীর সাড়া পেয়ে ঠাকুমা ডাকেন, "তোদের চান হয়েছে? যা চট করে ভেজাকাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় পরে নে। আমি প্রসাদী চন্দনের টিপ্‌ পরিয়ে দিচ্ছি। আঁচল ভরে কি এনেছিস? গাবের ফুল? মুল্লুকে আর ফুল পেলি না? এ দিয়ে কি হবে?"

নীলু বলে ওঠে, "দিদি লক্ষ্মীনারায়ণের জন্যে গোড়ে মালা গেঁথে দেবে। আমি দেব বকুলের মালা।"

"যার যা দিতে মন চায় দিস, বাবু। যে যা ভক্তি করে দেয় তিনি তা পেয়েই তুষ্ট হন। ফুলগুলো ওই তুলসীতলায় কলার পাতায় রেখে দে।" বলতে বলতে ঠাকুমা চন্দনের বাটি আনতে চলে গেলেন।

মা চণ্ডীমণ্ডপ হতে বের হলেন তামার ঘটিতে জল নিয়ে। ছেলেমেয়ের কাছে এগিয়ে বল্লেন, "তিনবার একটু একটু করে ঘটে জল ঢেলে দে। মন্তর তো মনে আছে? তুলসীতলার মাটি কপালে ছুঁইয়ে যা, চন্দনের টিপ্‌ পরে নে।"

তিলু নীলু তুলসীঝারায় জল দিয়ে মায়ের মুখের দিকে চাইল, মায়ের পরিধানে লাল কস্তাপেড়ে কোরা শাড়ী। ললাটে এত বড় একটা সিন্দুরের ফোঁটা, তার উর্দ্ধে চন্দন। হাতে রাঙ্গা শাঁখা। আধঘোমটায় মুখের অর্দ্ধেক আবৃত। তাদের মা যেন শুধু তাদের জননী নয়, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা।

তিলু নীলু নববস্ত্রে চন্দনে ভূষিত হয়ে পূজোর ঘরে একবার উঁকি দিয়ে এলো। সেখানে আজ সমারোহের সীমা পরিসীমা নেই। বিপুল আয়োজন।

গোটা বৈশাখ মাস বিগ্রহ ধারা-স্নান করবেন। পূজো ও ভোগের পরে বিরাট এক তাম্রপাত্রে তাঁকে বসিয়ে রাখা হবে। মাথায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটির একটা হাঁড়ি; তার নাম সহস্রধারা। হাঁড়ির প্রতি ছিদ্রপথে কুশ। বেলা গড়িয়ে যেতে না যেতে বিগ্রহকে জলাধার হতে তুলে নিয়ে ফের পূজো করতে হবে। শীতল ফলমূল, পানীয় নিবেদন করে শয়ন করাতে হবে। সন্ধ্যায় বৈকালী আরতির সময় ফের তিনি জাগবেন। তারপরে রজনীভোর চলবে তাঁর সুখ-নিদ্রা। নববর্ষের প্রারম্ভে ও অক্ষয় তৃতীয়ায় পূজোভোগের আধিক্য হ'লেও বৈশাখ মাস ভরে তাঁকে পরমান্ন দিয়ে ভোগ দিতে হবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে। নিত্য উৎসব, নিত্য বিবিধ অনুষ্ঠান।

আজ আবার পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে যার যা সাধ্য দানছত্র খোলা হয়েছে। মণ্ডপের একদিকে কয়েকটা মাটির কলসীতে সুশীতল জল। কলসীর গলায় সাদা ফুলের মালা, সিন্দুর ও চন্দনের তিলক। কলসীর মাথায় আম্রপল্লব ও সশীর্ষ ডাব। জলদানের অদূরে ভোগ্য সাজানো। ধুতি, গামছা, আসন, খড়ম, ছাতা, তালের পাখা উৎসর্গ করা হবে পূর্ব্বপুরুষদের নামে।

কাঠের বড় বড় বারকোসে তরমুজ, ফুটি, শশা, কলা, শাঁক-আলু, আখ, নারকেল, বেল কেটে রাখা হয়েছে। পাথরের থালায় গৃহজাত মিষ্টান্ন। তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, তক্তি, ক্ষীরের নাড়ু, সরের নাড়ু, সরভাজা, বাতাসা, চিনির ছাঁচ। ফল, নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন ভাগে ভাগে সাজানো। একভাগ নারায়ণের পূজোর কাছে। আর একভাগ ভোজ্য উৎসবের কাছে।

তিলু নীলুর বাবার বাড়ীতেই টোল। ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হ'তে কয়েকটি ব্রাহ্মণ বালক টোলে অধ্যয়ন করতে এসেছে। তারা সকলে গুরুগৃহে থাকে, আব্দার করে—ঘরের ছেলে হয়ে গেছে। ঠাকুমা সকলকেই নববস্ত্র উত্তরীয় দিয়েছেন। তারা ললাট চন্দনে চর্চ্চিত করে ছুটোছুটি করে কাজ করছে। ফুল, দুর্ব্বা, বেলপাতা, তুলসী পাতা সংগ্রহ করে, জলদানের কলসীর মালা গেঁথে দিয়ে ঠাকুমা-মার সঙ্গে ওরা জলপানি সাজিয়ে দিয়েছে। লক্ষ্মীনারায়ণের যাবতীয় সেবার ভার গ্রহণ করে ওরা অধ্যাপকের শ্রমের ভার লাঘব করেছে।

তিলু নীলু মণ্ডপের পেছন থেকে এক ডালা ভাঁটি ফুল তুলে এনে নিবিষ্ট মনে মালা গাঁথতে বসে গেল, তুলসী মঞ্চের অনতিদূরে। টোলের দাদারা নীলুকে একসাজি বকুল ফুল দিয়েছে। নীলুর আর কষ্ট করে ফুল কুড়োতে হল না।

ঠাকুমা ও মা দুজনেই ভোগশালায়। আজ লোক খাবে কম নয়, আয়োজন প্রচুর। ঠাকুমা আজ বছর চারেক হল ঠাকুর ঘরে ও ভোগের ঘরে কায়েমী হয়েছেন। বাড়ীর কর্ত্তা গত বছর পরলোকে গমন করেছেন।

পিতলের বড় কড়ায় পায়েসের দুধ বসেছে। আজ পরমান্ন সকলের প্রধান প্রসাদ। দুই কড়া পায়েস হবে।

রান্নার ফাঁকে ঠাকুমা একবার বের হয়ে নাতিনাত্‌নীকে ডেকে বলেন, "বেলা ঢের হয়েছে, তোরা যে মালা নিয়েই বসে রইলি, কিছু খেয়ে নিবি চল।"

তিলু গম্ভীর হ'য়ে বলে, "পুজো আর্চ্চা হল না, পুরুত দাদু এসে পূজোয় বসলেন না, এখুনি আমরা খাব কি, ঠাকুমা? ঠাকুরের মালা গেঁথে আমরা রেখে

এসেছি পূজোর সাজে। এ মালা পুণ্যি পুকুর বর্ত্তের। পুণ্যি পুকুর কেটে ফুল এনে তবে আমরা জল খাব।"

নীলুর ক্ষুধার উদ্রেক হলেও সে দিদির কাছে পরাভব স্বীকার করতে চায় না, বলে ওঠে, "না এখন আমরা খাব না। আমাদের কত কাজ রয়েছে।"

ঠাকুমা হেসে চলে যান নিজের কাজে। তিলু নীলু একটা ফুলের সাজি হাতে বেরিয়ে যায়।

কবে যেন ঠাকুমা তিলুকে বলেছিলেন, "অগ্রহায়ণ মাসের নাটাই, ফাল্গুন মাসের ইঁটাকুমুড়, বৈশাখ মাসের পুণ্য পুকুর ব্রত সমস্তই বনদেবীর উদ্দেশে করা করা হয়। বনদেবী বনের ফুলেই পরিতুষ্ট হন বেশী।" তিলুর শিশুমনে সেই কথা গাঁথা হ'য়ে রয়েছে। তাই সে বনে বনে বিচরণ করে বনফুলে ডালা ভরে আনে। এবার তার দোসর হ'য়েছে নীলু। আনন্দের আর উৎসাহের সীমা নেই তাদের।

লাল টকটকে শিমূল ফুল কুড়োতে কুড়োতে তিলু বোষ্টমীদিদির কাছে শেখা গান ধরে,—

"আরতো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি মথুরায়।"

নীলু উল্লাসে যোগ দেয় দিদির সঙ্গে।

ফুলে ফুলে ডালা ভরে ওঠে। অনেক বেলায় তিলু নীলু বাড়ী ফিরে দেখে পুরোহিত এসে নারায়ণের পূজো সাঙ্গ করছেন। এখন অন্য অনুষ্ঠান বাকী।

আঙ্গিনায় পাড়ার ছোট ছেলেমেয়ে, ভিখারী, বৈরাগী, বোষ্টমীতে ভরে গেছে। সকলে সমবেত হয়েছে নারায়ণের জলপানি প্রসাদ নিতে। টোলের ছেলেরা ছোট ছোট কলার পাতায় ফল মিষ্টান্ন কলা গুড়ে মাখা নৈবেদ্য বিতরণ করছে তাদের হাতে হাতে। বছরের প্রথম দিনে কারোকে নিরাশ করতে নেই, বিমুখ করতে নেই। আজ যে ভাল কাজ করা যাবে, সারা বছর পাওয়া যাবে তার শুভ ফল।

তিলু নীলু ফুলের ডালা রেখে বারান্দার এক কোণে বসে গেল দুই পাতা প্রসাদ নিয়ে।

দ্বিপ্রহরে নারায়ণের ভোগের পরে সকলের ভোজন পর্ব্ব মিটতে মিটতে বেলা গড়িয়ে গেল। পল্লীগ্রামের আহারাদি সহজে সমাধা হতে চায় না। ঠাকুমার আবার সবদিকে সজাগ দৃষ্টি।

বেলাশেষের স্নিগ্ধ কোমলতা নেমে এসেছে ভুবনে। আকাশে কালবৈশাখীর জলভরা মেঘমালা ধীরে ধীরে তাদের নৃত্য গীতের আসর সাজাচ্ছে।

ঠাকুমা হাঁক ডাক সুরু করে দিলেন, "ওরে তিলু, নীলু, তোদের পুণ্যি পুকুর বর্ত্তর যোগাড় করে নে। ঝড় বৃষ্টির তাণ্ডব আরম্ভ হলে উঠোনে বসে পূজো করবি কি করে? হাত পা মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ধূপ-দীপ, ফুলমালা, নৈবিদ্যি, জলপানি সব নিয়ে আয় পুকুরের কাছে।" ঠাকুমাকে বেশি বলতে হল না। তিলু নূতন ব্রতী নয়। ক'বছর হ'ল ব্রত পালন করে পেকে ঝানু হয়ে গেছে। পূজোর উপকরণ তার সমস্তই সজ্জিত। লেপাপোঁছা তকতকে পুকুরপাড়ে আলপনা পর্যন্ত বাকী নেই।

সন্ধ্যাসমাগমে তিলু বসে গেল পূজোয়। এ ব্রত কুমারীদের একচেটে, ছেলেদের অধিকার নেই। তবু নীলু দিদির হাতের কাছে এটা-সেটা এগিয়ে দিয়ে ব্রতের অংশ নিতে লাগল। ঠাকুমা কাছে আসন নিয়ে নাতনীকে নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন। মা গৃহে গৃহে ধূপ-দীপ দেখিয়ে তুলসীতলায় মাটির প্রদীপ রেখে প্রণামান্তে চলে গেলেন আরতির আয়োজন করতে।

বৈশাখ মাসে লক্ষ্মীনারায়ণ সাক্ষাৎ দামোদর হয়ে যান। ধারা-স্নান হ'তে উঠে ফের পূজো নিয়ে নানাবিধ ফল মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টিভোগ সেরে ঘুমিয়ে আছেন রূপোর সিংহাসনে। আরতির পরে রাতে তাঁরও নিষ্কৃতি, তাঁর সেবাইতদেরও শান্তি।

সহসা সাহাপাড়া, মালীপাড়া থেকে খোল-করতাল বেজে ওঠে ঝম্ ঝম্ করে। সন্ধ্যা হতে গভীর রাত অবধি ওরা নাম কীর্ত্তন করবে পুণ্যমাসে। প্রখর বাতাসে ভেসে আসে তাদের গানের রেশ :—

"হরি বলে আমার গৌর নাচে—
তার রাঙ্গা পায়ে সোনার নুপুর রুনু ঝুনু বাজে।"

তিলু ছোট পুকুরটির পাশে আসনে বসে জোড় হাতে ভক্তিভরে মন্ত্র উচ্চারণ করছিল,—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজেরে সাঁজের বেলা।
আমি সতী লীলাবতী সাত ভাই-এর বোন পুণ্যবতী॥
হবে পুত্র মরবে না; পৃথিবীতে ধরবে না।
স্বামীর কোলে পুত্র দোলে মরি যেন অথৈ গঙ্গাজলে॥"

পূজান্তে প্রার্থনা :—"দশরথের মত শ্বশুর দিও, কৌশল্যার মতন শাশুড়ী। রামের মত স্বামী, লক্ষ্মণের মতন দেবর" ইত্যাদি—

সন্-সন্ ঝন্-ঝন্ শব্দ করে কালবৈশাখী তার আগমন বার্ত্তা প্রচার করে উঠলো চারিদিকে।

ঠাকুমা উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, "বৌমা, কোথায় তুমি, শিগ্‌গির এদিকে এসে জিনিষপত্র ঘরে তুলে নাও। ঝড়বৃষ্টি এলো, সব লণ্ড-ভণ্ড করে দেবে।" বৌমা ছুটে এলেন। ছেলেমেয়ের হাতে হাতে পুণ্যপুকুর ব্রতের সরঞ্জাম ঘরে তুল্লেন।

দু'খানা পিতলের রেকাবীতে ব্রতের ফল মিষ্টি সাজিয়ে মা ধরে দিলেন ছেলেমেয়ের সামনে।

ঠাকুমা বল্লেন, "ওদের সব্বারে রাতের মত খাইয়ে দাও বৌমা। ঝড়-বাদলের তাণ্ডব, কত রাতে কে আসবে কে জানে? সেই ভোর থেকে ওদের হৈ-চৈ স্থরু হয়েছে। এখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ুক। আবার শেষরাত থেকে চলবে প্রাতঃস্নানের ধুম।"

ছেলেমেয়ে রাতের আহারের অনিচ্ছা জানায়। তারা আর রাতে ভাত খেতে পারবে না। তাদের পেট ভরা রয়েছে। মা বলেন, "তোদের পায়েস রয়েছে। এখানেই এনে দেই? ভাত খেতে ইচ্ছে না হলে না খেলি।"

পায়েসের উল্লেখে ঠাকুমার মনে পড়ে তিনি পায়েসের কড়া চেঁচে·বাটি করে সযত্নে রেখে দিয়েছেন উনুনের পাড়ে ঢাকা দিয়ে। এ তাঁর চিরকালের অভ্যাস। চার বছরেও সে অভ্যাস যায়নি। আজ ব্যস্ততায় ভুলে গেছেন চাঁছির কথা, বৌমাও লক্ষ্য করেনি! ঠাকুমা হঠাৎ বিমনা হয়ে বল্লেন, "হবিষ্যি ঘরে উনুনের পাড়ে পায়েসের চাঁছি রেখেছি, বৌমা, আমার ভুল হয়েছিল, কারোকে দেওয়া হয়নি। ওদের এনে দাও।"

তিলু বলে, "আমাদের ঠাকুরদা পায়েসের চাঁছি খেতে ভালবাসতেন। তাই ঠাকুমা পায়েস হলেই রেখে দিতেন তাঁর জন্যে পায়েসের চাঁছি। আমি মার কাছে শুনেছি।"

নীলু বলে ওঠে, "আমিও ঠাকুরদার মতন পায়েসের চাঁছি খেতে বড় ভালবাসি।"

বধূ বেরিয়ে গেল শাশুড়ীর আদেশ পালন করতে।

বাইরে বৃষ্টি ঝরছিল ঝর্‌ঝর্ করে। প্রমত্ত পবনে ভেসে আসছিল

নামকীর্ত্তনের স্বর। ঠাকুমা সস্নেহে নীলুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন। তাঁর হৃদয়ে বাদল, নয়নে বাদল ঘনিয়ে এল।

এখানে কোন কিছুই যায় না। শেষ হয় না। প্রবীণ যায়, নবীন আসে। শুকনো পাতা ঝরে যায়, নূতন পত্রপল্লবে হাসে তরুলতা।

রথ-স্মৃতিচিত্র

অনেকদিন আগের কথা। সেকালে পাবনা জেলায় নাকালিয়া বন্দরের শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রা গ্রামাঞ্চলে সুবিখ্যাত ছিল।

নাকালিয়া গ্রামের নাম বন্দর হয়েছিল কেন? এখানকার অধিবাসী ও ব্যবসায়ী কুণ্ডুদের যত্নে ও চেষ্টায় এবং পাট-কুঠির কয়েকটি ইংরেজের বাসের ফলে গ্রামটি অর্ধেক নগরে পরিণত হয়েছিল।

হীরাসাগর নদীর উপকূলে যাত্রীবাহী ও মালবাহী দুইখানা ষ্টীমার দুইবার এসে ভিড়তো। সেই ঘাটের নাম ছিল সাধুগঞ্জ। বণিকেরা এ-অঞ্চলের সমস্ত পাট সংগ্রহ করে চালান দিত বিদেশে।

এখানে সপ্তাহে হাট বসতো দুইদিন, রবি ও বুধবার। তা ভিন্ন, নিত্যকার বাজারে মিলতো সমস্ত দ্রব্যই। ডাকঘর হাইস্কুল ঔষধপত্র সমস্তই মিলতো।

নদীর তীরে দুর্গানাথ চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর গৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল দারুকাষ্ঠ-নির্মিত জগন্নাথদেবের বিগ্রহ। তার নিত্য পূজা, ভোগারতি হলেও তখন তিনি রথারোহণ করেন নাই। তাঁর ভক্তের সংখ্যাও মন্দ ছিল না।

এখানকারই এক ঘর আদিনিবাসী ছিলেন হরচন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁর ছিল নৃত্যে, গীতে, নাট্যাভিনয়ে প্রবল অনুরাগ। কিশোর বয়সে তিনি 'রুক্মিনী হরণ' নাটক অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় ঐ রথ প্রস্তুত হয়েছিল, পরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত উকিল হয়েছিলেন। তাঁরই অধ্যাবসায়ের ফলে সেই রথখানি পরে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার মেলা চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পাশাপাশি অনেকগুলির গ্রামের অধিবাসীরা উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে প্রতীক্ষা করে এই মেলার।

এবার রথযাত্রা আষাঢ়ের প্রথম দিনে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে না হতেই সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে। রথের পূর্বে প্রতি বছর জগন্নাথদেবের অঙ্গরাগ করা হয়। রৌদ্রজলে বিবর্ণ রথের সংস্কার করা হয়।

ক্রমে দিন আগত হতে থাকে। দিগন্ত বিস্তৃত মাঠে দোকানীদের চালাঘর বাঁধবার সমারোহ পড়ে যায়। এখানকার বিরাট মেলা উল্টোরথ পর্যন্তই স্থায়ী হয় না, থাকে অনেকদিন অবধি। হেন জিনিষ থাকে না যা মেলায় আসে না। সেই মাটির কলসী হাঁড়ি সরা বেতের ধামা কাঠা মোড়া কেদারা বাঁশের কুলো চালুনি ডালা। কাঁসার পিতলের তামার পাত্র। লোহার সরঞ্জাম কাঁচ ও কলাই করা বাসন রাশি রাশি টিনের বাকস-পেঁটরা। কাপড়-জামা কম্বল শীতবস্ত্র মনোহারী জিনিষ। শোলার খেলনা, চিনির ছাঁচ বাতাসা। চামড়ার ঢাক-ঢোল, খঞ্জনী ইত্যাদি।

বৃহৎ বড় মেলা। নাগরদোলা আসে চার-পাঁচটা, পুতুল-নাচ দুই দল। খাঁচায় চিতাবাঘ, নাকে দড়িবাঁধা ভালুক। বানরনাচওয়ালা দুই তিন দল। আর পশ্চিম প্রদেশ হতে আমদানী হয় বৃহৎ নৌকা বোঝাই নটকোনা ফল। এই ফল এই মেলা ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। একদা যার সূচনা হয়েছিল নৃত্য-গীত-নাটকের মধ্য দিয়ে, মেলার উদ্যোগীরা সেটা ভুলে যাননি। জগন্নাথদেবের মণ্ডপের সামনাসামনি চালা বাঁধা হচ্ছে গানের আসরের জন্য।

গানের দল আসবেন নানা দিক থেকে। কথকতা কীর্তন যাত্রা খেমটা ঢপ কবি রামলীলা মনসামঙ্গল ঝুমুর বাউল আউল সারি জারি বৈরাগী বোষ্টম ভৈরব ভৈরবী।

দিবারাত্রি গান-বাজনার আসর সরগরম হয়ে থাকবে। রথ ও উল্টোরথের দিন এখানে আবার মহাপ্রভুর মহোৎসব হয়ে থাকে। গানের আসরের অদূরে মহোৎসবেরও চালা বাঁধা হচ্ছে।

এই মহোৎসবের অনুষ্ঠানে স্থানীয় লোক দোকানী ও পাট-কুঠির সাহেবরাও মুক্ত হস্তে ব্যয় বহন করেন। এই দুইদিন দোকানীদের আর রান্না করে খেতে হয় না। গ্রাম-গ্রামান্তর হতে দলে দলে ইতর-সাধারণ লোক আসে মহাপ্রভুর প্রসাদ প্রাপ্তির আশায়। তারা যত পারে ভোজন করে, তারপর ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যায় ঘরে ঘরে। সাধু-সজ্জন, বোস্টম-বোস্টমীরা কেউই প্রসাদে বঞ্চিত হয় না। ভোগের পরেই রাত দ্বিপ্রহর পর্যন্ত চলে এই অন্নযজ্ঞ।

রন্ধনের জন্য সারি সারি গুলো কাটা হয়েছে। ছাউনীর নিচে পর্বতপ্রমাণ শুকনো জ্বালানী কাঠ ও পাটকাঠি রক্ষিত হয়েছে। রাজ্যের ডিঙি নৌকো ঘসে-মেজে ধুয়ে বৈঠা সমেত রাখা হয়েছে। এক নৌকায় রান্নার জল থাকবে। কোনটায় পাঁচমিশালী নাবড়া তরকারি, কোনটায় মটরের ডাল, আর একটায়

থাকবে তেঁতুলমিশ্রিত লাউয়ের অম্বল। প্রকাণ্ড একটা গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে চাটাই ও কলার পাতা বিছিয়ে ধোয়া কাপড়ে মুড়ে পর্বতপ্রমাণ ভাত রাখা হয়। উপকরণ সামান্য কিন্তু এর বিরাটত্ব অসীম। যাদের অর্থ-সাহায্যের সঙ্গতি নেই, তারাও সানন্দে সাগ্রহে সামান্য চাল ডাল ও ফল তরকারি দিয়েও এই মহা-যজ্ঞের অংশ গ্রহণ করতে চায়।

কোন কোন বার উদ্যোগীরা দুর্গাদইয়ের প্রচলন করেন। দধি দুগ্ধ বিক্রেতারা সারি সারি বাঁকে করে মাটির হাঁড়িতে জলবৎ তরল পদার্থ এনে উপস্থিত করে। কলাপাতার ঠোঙা ভিন্ন তা পান করা যায় না।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পিতলের ডেকচি ও লোহার কড়া আনা হয়েছে। এতে ডাল-তরকারি সেদ্ধ করে নৌকায় ফেলে কড়া ভরে তেল মশলা ফোড়ন দিয়ে ঢেলে দিয়ে বৈঠা দিয়ে ঘণ্টন করে মহোৎসবের সুস্বাদু ডাল ব্যঞ্জন ইত্যাদি প্রস্তুত হবে। এক শ্রেণীর অধিকারী পাচক ব্রাহ্মণরা মহোৎসবের মহাপ্রসাদ রন্ধন করে থাকেন। মহোৎসবের অন্ন গ্রহণ করার পর কারোর অসুখ-বিসুখ করে না। এও মহাপ্রভুর অসীম দয়া।

জগন্নাথের বাড়ীর অদূরে বনমালি গোঁসাইয়ের বাঁশবনে ঘেরা মাটির কুটির। তার পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ছিল এক কষ্টিপাথরের মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ। তাদের সন্তানাদি ছিল না। ঠাকুরের নাম নীলমণি। নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতি এঁকে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। তাঁদের থাকার মধ্যে ছিল কয়েক খণ্ড ধানের জমি ও কয়েকটি ফলবান বৃক্ষ। এইটুকু মাত্র সম্বল রেখে বনমালি পরলোক যাত্রা করেন। তাঁর অন্তিমকালে তাঁর স্ত্রী হরিমতী কেঁদে বলেছিলেন, 'আমার কি দশা করে গেলে? তুমি না থাকলে তোমার নীলমণির সেবা হবে কি করে? মেয়েমানুষের যে বিষ্ণু পূজো করতে নেই।' বনমালি বলেছিলেন, 'যতদিন উনি আর পূজারী না আনেন তুমিই পূজা ভোগ দিও, তোমাকে নীলমণির কাছেই রেখে যাচ্ছি। তোমার ভয় নেই, নীলমণি তোমাকে দেখবেন।' হরিমতির সম্বলের ভিতরে অভয় ছিল ক্ষেতের ধান কটি আর গাছের ফল। একটা বছর যেতেই নীলমণি এনে দিলেন বনমালির খোঁড়া ভাগনে মথুরাকে।

মথুরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান। পিতার বৃত্তি ছিল যজন-যাজন। পায়ের দোষ নিয়েই মথুরার জন্ম হয়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ের ভিতরে ওর প্রতি ওর বাবা-মায়ের তেমন আদর ও যত্ন ছিল না। ছেলেটাকে অল্প বয়সে উপনয়ন

দিয়ে নিজের অধীত বিদ্যা ও পুজো-পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। পথে বেরুলেই গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা তাকে খেপাত, খোঁড়া খোঁড়া খোঁড়া,/কোথায় যাও একপেয়ে ঘোড়া?' লজ্জায় ধিক্কারে মথুরা আর পথে বেরুতো না। এক ঘনঘোর বর্ষায় হাটুরিয়ার নৌকো ধরে মাকে প্রণাম করে চলে আসে মামীর আশ্রয়ে। মামী হরিমতি তাকে গ্রহণ করে পরম আদরে নীলমণির সেবার ভার অর্পণ করেছিলেন।

অভাবী ঘরের ছেলে মথুরা, কোন অভাববোধই ছিল না। অল্পেই সন্তুষ্ট। নীলমণির পূজো, ভোগ, আরতি এই নিয়েই দিনের পর তার দিন কেটে যেতে লাগলো।

তার পায়ের দোষ থাকলেও মনটা ছিল শিল্পীসুলভ। বিগ্রহকে ফুল চন্দনে সাজিয়ে সে মনোহর বেশে রেখে দিত। পূজোর মণ্ডপের চারিপাশে তুলসী ও ফুল বৃক্ষরোপণ করে সে একটি সুন্দর কুঞ্জ রচনা করেছিল। শুধু তাই নয়, হরিমতির আঙিনা ও আশেপাশে এতটুকু জায়গা পেলেই সে শাকসবজি ও ফলমূলাদি রোপণ করত। হরিমতি দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি দোল, ঝুলন, জন্মাষ্টমী মথুরার স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন। বাড়ীর শশা, কলা, ফুটি ইত্যাদি দিয়ে মথুরা ক্রিয়াকর্ম বজায় রাখে।

কিন্তু এতেও হরিমতির মন ভরে না, তাঁর ঠাকুরের রথযাত্রা করার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ধূমধামে তাঁর প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে নীলমণির রথযাত্রার জন্য। রথের প্রধান উপাদান একখানা রথ।

সম্বলের মধ্যে তাঁর ছিল একগাছা কোমরের রূপোর গোট। তিনি একদিন মথুরাকে গোপন করে গোট-ছড়া বিক্রি করেন। তারপর ২০ টাকা এনে মথুরার হাতে দিয়ে বলেন, 'তুই যেমন করে পারিস এই দিয়ে একখানা রথ তৈরী করিয়ে নে, এবার আমি যেমন করে হোক নীলমণিকে রথে তুলবো কি তুলবোই।'

দুর্গানাথ চক্রবর্তীর পুত্র বেণীমাধবের ছেলে নীলমাধব মথুরাকে খুবই ভালবাসতো। মথুরার কাছে এসে পড়াশুনা করতো। তাদের যে ছুতোর, তাকে দিয়েই নীলমাধব ভার নিল একখানা রথ তৈরী করার। বৈশাখের প্রথমই ছোট-খাট একখানা মজবুত রথ প্রস্তুত হয়ে এল নীলমণির মণ্ডপের বারান্দায়।

রথযাত্রা এসে গেছে। ভোর হতেই নাম-কীর্তনের আসর বসেছে। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘসম্ভার ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি ঝরছে। নদী জলভারে টলমল। এপারে খালি নৌকোর সারি। ওদিকের ডাঙ্গা, জমি বিল অবধি গরুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ীতে ভরে গেছে। দর্শকের দল কতক গাড়ীতে এসেছে, কতক নৌকোয় এসেছে। কোলাহলের আদি-অন্ত নাই।

মহোৎসবের ভোগ সেদ্ধ করছেন অধিকারী ব্রাহ্মণের দল। ভোগ প্রস্তুত হলে জগন্নাথ তাঁর নিত্যকার পূজাভোগ সমাধা করে এখানে আসবেন দৃষ্টি-ভোগ করতে। তারপর তিনি রথারোহণ করবেন, সমবেত জনতা রথের দড়ি ধরে টানতে থাকবেন।

এখানে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ী নাই। বলরাম, সুভদ্রাও নাই! রথলীলা সাঙ্গ হলে তিনি যথাস্থানে ফিরে গিয়ে সুখনিদ্রা দেবেন। চারিদিক কাঁপিয়ে উচ্চৈস্বরে বাজনা বেজে উঠল। জগন্নাথদেব রথারোহণ করেছেন। জনতা সবিস্ময়ে দেখে জগন্নাথের রথের পেছনে আর একখানি রথ লোহার ছিকল দিয়ে বাঁধা। বড় রথে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত রাজবেশ ধারণ করে বসে আছেন জগন্নাথ, তাঁকে পেছন থেকে চেপে ধরে বসে আছেন বেণীমাধব। ছোট রথে শালুর বস্ত্র উত্তরীয় পরে চন্দন ও ফুলের ভূষণে ভূষিত হয়ে নীলমণি বসে আছেন। তাঁকে চেপে ধরে আছে মথুরা। তাঁর পিতলের চূড়া, বাঁশী, বালা ও নূপুর সুসজ্জিত হয়ে ঝক্‌মক্ করছে। জনতা জয়ধ্বনি করছে, 'জয় জগন্নাথ, জগৎমোহন জগৎবল্লভ, জ্যোতির্ময়।' তাদের জিগিরের সঙ্গে ধুয়া ধরছে নীলমণি, 'ছোট ঠাকুরের জয়।' সেই জয়ধ্বনি আকাশ, বাতাস দিগন্তে ছড়িয়ে যাচ্ছে, 'জয় জগন্নাথ, জয় ছোটঠাকুরের জয়'।

জনতার অন্তরাল থেকে দেখে হরিমতি আনন্দে বিগলিত হলেন, তাঁর দুই চোখ ভরা জল।

এই নাকালিয়ায় রথযাত্রার আদি ইতিহাস।